ভারতীয় অর্থনীতি

এই লেখকের লেখা :—

পৌর বিজ্ঞান
রাষ্ট্র বিজ্ঞান
ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র
অর্থনৈতিক তত্ত্ব
উচ্চতর ভারত ইতিহাস
আধুনিক ইউরোপ
বিশ্বের ইতিহাস
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
জীবন বীমার জাতীয়করণ (সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ)

New Constitution of the Indian Republic
Indian Economics
Five Year Plan : A Critical Survey

ভারতীয় অর্থনীতি

[Indian Economics for B. A. & B. Com.]

(পঞ্চম সংস্করণ)

অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ (অর্থনীতি ও ইতিহাস)
অধ্যাপক, সিটি কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ) ও স্কটিশ্ চার্চ্চ কলেজ,
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (বাগেরহাট), বিদ্যাসাগর
কলেজ (নবদ্বীপ), হরগঙ্গা কলেজ (মুন্সিগঞ্জ), ভিক্টোরিয়া
কলেজ (কুচবিহার), ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন (কলিকাতা) ।

এ, কে, পাবলিকেশনস্
২০৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
এ, ব্যানার্জী.
এ. কে, পাবলিকেশনস্ এর পক্ষে
২০৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মূল্য—আট টাকা

মুদ্রাকর :—শ্রীবীরেশচন্দ্র বসু
দি এলিট প্রেস
১০, হরমোহন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-১০।

পঞ্চম সংস্করণের মুখবন্ধ

'ভারতীয় অর্থনীতির' এই নূতন সংস্করণে উহার বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশে ইতিমধ্যে যে আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তদনুযায়ী পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন সাধিত হইল। এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে পড়িয়াছি; সুতরাং প্রথম পরিকল্পনায় কি সম্ভব হইয়াছে তাহার কিছুটা স্পষ্ট ছবি এখন ফুটিয়া উঠিতেছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতখানি কি বাকী রহিয়াছে তাহাও বুঝা যাইতেছে। সেই কারণে এই সংস্করণে প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার করণীয়—এই বিষয়গুলির উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রয়োজন বোধে প্রথম পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে যাহাতে পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বুঝিতে অসুবিধা না হয়।

নূতন নূতন বিষয়বস্তুর উদ্ভব হওয়ায় অনেকগুলি পুরাতন বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আমার নিকট মনে হইয়াছে। সেই কারণে পুরাতন বিষয়বস্তুগুলির কয়েকটি এই সংস্করণ হইতে বাদ দিলাম এবং কয়েকটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম। উহার দ্বারা যে বাড়তি পৃষ্ঠা সংখ্যা পাওয়া গেল তাহা নূতন বিষয়বস্তুর বিস্তারিত আলোচনায় নিয়োগ করিলাম। যাহারা বিস্তারিত আলোচনা দেখিলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে তাহাদের জন্য এই সংস্করণে একটি নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিলাম। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষেই উহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।

উষাকুটীর, বারাসাত
১০ই জুলাই ১৯৫৭

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

⁘ ⁘

চতুর্থ সংস্করণের মুখবন্ধ

ভারতীয় অর্থনীতির এই নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় ইহার বিভিন্ন অংশে নূতন বিষয়বস্তু যোগ করা গিয়াছে এবং পুরাতন বিষয়বস্তুর প্রয়োজন বোধে পুনর্বিন্যাস সাধিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাতন অংশে নূতন পরিসংখ্যার সাহায্য লওয়া হইয়াছে এবং সকল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিসংখ্যার তালিকা প্রদান করিয়া বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে শেষ তথ্য যাহা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্ম্মসূচীও আলোচিত হইয়াছে। সহকর্ম্মী শিক্ষকবৃন্দের বহু মূল্যবান উপদেশ গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়াসে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করিয়াছে, ইহা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

২১শে ফাল্গুন, ১৩৬২

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় যে ঘোষণা করিয়াছেন উহাতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে একদিন প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে—কিন্তু প্রথমেই ইংরাজী ও বাঙলার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে ছাত্র ছাত্রীদিগকে কেবল হতচকিত করা হইত—কোন লাভ হইত না। সেই জন্য প্রথমে ইংরাজীর পাশে বাঙলার একটু স্থান সঙ্কুলান করা হইয়াছে; কিন্তু এই স্থান সঙ্কুলানের সার্থকতা আনিতে হইবে এবং ইহার বিস্তৃতি ঘটাইতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির নিমিত্ত গত বৎসর বি, এ ছাত্র ছাত্রীদিগের জন্য "রাষ্ট্রবিজ্ঞান" প্রকাশ করিয়াছিলাম। ছাত্র ছাত্রীসমাজ এবং শিক্ষকবৃন্দ ঐ পুস্তকখানি যে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন ইহা আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছে; এবং উহার দ্বারাই "ভারতীয় অর্থনীতি" নামে বাঙলায় Indian Economics লিখিতে প্রণোদিত হইয়াছিলাম। ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জটিল সমস্যাসমূহ পরিশুদ্ধ অথচ বি, এ, বি, কম ছাত্র ছাত্রীদিগের পক্ষে সহজ-বোধ্য ভাষায় আলোচনা করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়াছি। জটিল সমস্যাগুলি পরিহার না করিয়া ঐগুলিকে যতদূর সম্ভব সরল পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিভিন্ন সমস্যাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব যথাযথ অনুধাবনের জন্য, এবং ঐগুলি সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের ধরণ এবং উহাদের যথোচিত উত্তর প্রদানের ধরণ প্রদর্শনের জন্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের প্রশ্ন প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার নিকট স্থাপন করিয়াছি। আমার মনে হইয়াছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা যথাযথ অনুধাবনের জন্য এবং ছাত্র ছাত্রীদিগের পক্ষে উহা ব্যতীতও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের যথাযথ উত্তর প্রদানের রীতি শিক্ষার জন্য, এই রীতি বিশেষ সুফলপ্রসূ হইবে।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কার্য্যে শ্রীমতী মুকুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি। তবে তাহার সহিত আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাহাতে ধন্যবাদ জানাইবার অবকাশ নাই।

"ঊষাকুটীর"
বারাসত, ২৪ পরগণা
শ্রাবণ, ১৩৫৭।

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় অর্থনীতি

সূচীপত্র

ভারতীয় অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়

দেশ ও ইহার সম্পতি

The Country and Her Resources

ভৌগোলিক অবস্থান—Geographical Position

অবিভক্ত ভারত উত্তর দক্ষিণে ছিল দুই হাজার মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ছিল আড়াই হাজার মাইল। ইহার মোট এলাকা ছিল ১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গ মাইল—সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ২২ গুণ অধিক। রাশিয়া বাদ দিলে সমগ্র ইউরোপের সমান ছিল ভারতের এলাকা। ইহার স্থল সীমানা ছিল ৪,৬০০ মাইল এবং সমুদ্র সীমানা ছিল ৪,৩০০ মাইল। পৃথিবীর মোট ভূভাগের শতকরা ৩'৪ ভাগ ছিল ভারতের অন্তভু ক্ত। ইহার পুর্ব্বে ছিল ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে ছিল বিরাট হিমালয় এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর।

দেশ বিভক্ত হইবার পরে বর্ত্তমান ভারতের মোট এলাকা হইল (কাশ্মীর সমেত) ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার বর্গ মাইল; ইহার পুর্ব্বে কতকাংশ ব্রহ্মদেশ ও কতকাংশ পুর্ব্ব পাকিস্থান, পশ্চিমে কতকাংশ আরব সাগর এবং কতকাংশ পশ্চিম পাকিস্থান, উত্তরে কতকাংশ পশ্চিম পাকিস্থান এবং অধিকাংশ হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর। উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল এবং পুর্ব্ব পশ্চিমে ১,৭০০ মাইল। আয়তনের দিক হইতে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থানের অধিকারী।

ভারতের মধ্যে সমগ্র এলাকাটিকে তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারা যায়। (১) ***হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল***—পশ্চিম পাকিস্থানের উত্তর পশ্চিম কোন হইতে সুরু করিয়া পুর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ অবধি এই অঞ্চল বিস্তৃত এবং ইহার গড় প্রস্থ (average width) হইল দুইশত মাইল। এই বিরাট পর্ব্বত প্রাচীর অপর পারের এশিয়ার অবশিষ্ট অংশ হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন

রাখিয়াছে। ইহা ভারতের প্রকৃতি-দত্ত রক্ষা-প্রাচীর বিশেষ; মধ্য এশিয়ার হিমবায়ু ইহাতে প্রতিহত হইয়া ভারতে প্রবেশ অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে এবং দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রতিহত করিয়া ইহা ভারতকে বারিবর্ষণ প্রদান করে। শস্য ও শ্যামলিমা প্রদায়িনী একাধিক নদী হিমালয়ের বিরাট ক্রোড় হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং প্রাণীজ ও অরণ্য সম্পদে হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল বিশেষ ভাবেই সমৃদ্ধিশালী। হিমালয় যে নিছক তাহার বিরাটত্বের দ্বারা ভারতবাসীর কল্পনাপ্রবণতার খোরাক যোগাইয়াছে তাহাই নহে, ভারতের অর্থ-নৈতিক জীবনেও তাহার অবদান প্রচুর। (২) ***সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা*** —হিমালয় পার্ব্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তরে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল ভূমি অবস্থিত; ইহাই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত। ইহার এলাকা হইল তিন লক্ষ বর্গ মাইল। সিন্ধু ও তাহার শাখা নদী এবং গঙ্গা ও তাহার শাখা নদীর দ্বারা এই অঞ্চল বিধৌত; পুর্ব্বদিকে বিরাট ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের আবহাওয়া সন্তোষজনক, মাটি আর্দ্র এবং উর্ব্বর, নদীর বুকের উপর চলাচলের প্রকৃতিদত্ত ব্যবস্থা আছে; উপরন্তু এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সমধিক। (৩) ***দাক্ষিণাত্যের মালভূমি***—বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে সুরু করিয়া ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং দুইদিকে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ত্রিভুজ আকৃতি অঞ্চল হইল দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। ইহার দুই পার্শ্ব পশ্চিম ঘাট এবং পুর্ব্ব ঘাট নামে পরিচিত। ইহা সমতলভূমি নহে—সমুদ্রস্তর হইতে ইহার উচ্চতা কোন স্থানে ১০০০ ফুট আবার কোন স্থানে তাহার অধিক, সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা ৩০০০ ফুট। গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি বৃহৎ নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

মাটির প্রকার ভেদ—Different Types of Soil

Q. Briefly describe the important varieties of soil in India and point out their suitability for the growth of particular kinds of crop. (B. Com. 1941).

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়:

(১) ***পাললিক মাটি*** (Alluvial soil)—উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে এই মাটি রহিয়াছে। উত্তর রাজপুতনা, পুর্ব্ব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের অর্দ্ধেক এবং মাদ্রাজের গোদাবরী, কৃষ্ণা ও তাঞ্জোর জিলাসমূহ পাললিক মাটি বিশিষ্ট এলাকা। এই মাটি স্বাভাবিক ভাবেই

উর্ব্বর এবং কৃষিকার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবেই উপযোগী। ইক্ষু, চাউল, তামাক প্রভৃতি ফসল এই মাটিতে চাষ হইয়া থাকে।

(২) ***লাল মাটি*** (Red soil)—মাদ্রাজ, মহীশূর এবং বোম্বাইয়ের দক্ষিণ পূর্ব্ব এলাকা লাল মাটি বিশিষ্ট এবং ঐ অঞ্চলগুলি হইতে সুরু করিয়া হায়দ্রাবাদ এবং মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া এই লাল মাটি অঞ্চল উড়িষ্যা, বিহারের ছোট নাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলা এবং যুক্ত প্রদেশের ঝাঁসী ও হামিরপুর জিলা অবধি বিস্তৃত আছে। আরাবল্লী পর্ব্বত এবং পূর্ব্ব রাজপুতানাতেও এই মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তর শুষ্ক বলিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর মাটি। ইহাতে লৌহ ও এ্যালুমিনিয়াম আছে কিন্তু জৈব উপাদান নাই। সন্তোষজনক সেচ ব্যবস্থায় ইহা কিছু কিছু ফসল উৎপন্ন করিতে পারে।

(৩) ***কৃষ্ণ মাটি*** (Black soil)—মাদ্রাজের রামনাদ এবং তিন্নেভেল্লী জিলায়, হায়দ্রাবাদে, বিদর্ভে, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে, কাথিয়াবারে এবং বোম্বাই প্রদেশের অধিক অংশে এইরূপ মাটি রহিয়াছে। এই জমি তুলা উৎপাদনের জন্য বিশেষ ভাবেই উপযোগী। উহা ব্যতীত গম, নীবার, ছোলা প্রভৃতি শস্যও এই মাটিতে উৎপন্ন হয়।

(৪) ***নরম গুঁড়া পাথুরে মাটি*** (Laterite soil)—এই প্রকারের মাটি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং ইহা রাসায়নিক পদার্থে (chemical properties) সমৃদ্ধ নহে। জলসেচের বন্দোবস্তের দ্বারা এই মাটিতে কিছু চাষ করা যাইতে পারে এবং করা হইয়াও থাকে। আসাম, উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যের কতকাংশে এইরূপ মাটি রহিয়াছে। এইরূপ মাটিতে অম্লপদার্থ থাকায় ইহা বিশেষ ভাবে চা উৎপাদনের উপযোগী।

বৃষ্টিপাত বা মৌসুমী বায়ু—Rainfall or the Monsoons

Q. What are the monsoons? Describe their influence on the economic life of India. (B. Com. 1937) Describe the importance of rainfall in India. (B. Com. 1945)

মৌসুমী বায়ুর দ্বারাই ভারতে বৃষ্টিপাত নির্দ্ধারিত হয়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে মৌসুমী বায়ু বলা হয়; ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত এই বায়ুর গতি পরিবর্ত্তন ঘটে এবং উহার দ্বারাই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ভারতের বৃষ্টিপাতের জন্য যে মৌসুমী বায়ু দায়ী, উৎপত্তি ও গতি অনুযায়ী উহা দুইভাগে বিভক্ত—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া

আসে—ইহা আসে জুন ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে, সাধারণতঃ আমরা যে সময়টিকে বর্ষাকাল বলি। আরব সাগর হইতে প্রবাহিত বায়ু বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও পূর্ব্বপাঞ্জাবে এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আগত বায়ু যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। মোট বৃষ্টিপাতের অধিক পরিমাণই এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হইতেই হইয়া থাকে। উত্তর পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে বলিয়া উহার মধ্যে জলীয় বাষ্পের অংশ থাকে কম, সেই কারণে এই বায়ু হইতে যে বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে তাহার পরিমাণ মোট বৃষ্টিপাতের অল্পাংশ। এই উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু হইতে যে বারিপাত ঘটে তাহার অংশ পায় মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবের কোন কোন অংশ।

ভারতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে সমতার অভাব বিশেষ ভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়—কোথাও বৃষ্টিপাত হয় অত্যধিক এবং কোথাও বৃষ্টিপাত হয় অত্যল্প। আসামের খাসিয়া পাহাড়ে অবস্থিত চেরাপুঞ্জিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ঘটে ৪৬০ ইঞ্চি কিন্তু পশ্চিম রাজপুতানায় উহার পরিমাণ ২০ ইঞ্চির কম। এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের দ্বারা বুঝায় এক একর পরিমিত জমিতে একশত টন পরিমাণের জল। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী সমগ্র দেশকে চারিটি অঞ্চলে বিভক্ত করিতে পারা যায়: (ক) সিক্ত অঞ্চল, অর্থাৎ যে সকল স্থানে ন্যূনতম বৃষ্টিপাত হইল ১০০ শত ইঞ্চি; (খ) মধ্যবর্তী অঞ্চল, অর্থাৎ যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইল ৪০ ইঞ্চি হইতে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে; (গ) শুষ্ক অঞ্চল, অর্থাৎ যে স্থানে ২০ ইঞ্চি হইতে ৪০ ইঞ্চির মধ্যে বারিপাত হয় এবং (ঘ) মরু অঞ্চল, যে স্থানে বারিপাত ২০ ইঞ্চিরও কম।

মৌসুমী বায়ুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব—দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে মৌসুমী বায়ুর সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার আচরণের তারতম্যের দ্বারা দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক ফলাফল সংঘটিত হয়। ফিসক্যাল কমিশন (১৯৪৯-৫০) হিসাব করিয়াছিলেন বর্ত্তমান ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ কৃষিজীবি। ১৯৫১ সালের আদমসুমারির (census) বিবরণী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার মধ্যে কৃষি নির্ভর শ্রেণীর অনুপাত হইল শতকরা ৬৯.৮ ভাগ। সুতরাং আমাদের দেশে মোট অধিবাসীর অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তি কৃষিজীবি—তাহাদের উপার্জ্জন কৃষির সাফল্য এবং অসাফল্যের উপর নির্ভর করে। কৃষির সাফল্য অর্থাৎ ফসল উৎপাদন নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের উপর। প্রয়োজনের তুলনায় অল্প বৃষ্টি হইলে অথবা প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া অত্যধিক বারিপাত হইলে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ফসল

ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ফসল উৎপাদনকারী কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—তাহার উপার্জ্জন হ্রাস পাইবে। কিন্তু কৃষকের উপার্জ্জন হ্রাস পাইলে কেবল কৃষককুলই দুর্ভোগ ভুগিবে—দেশের মধ্যে অন্যান্য উপজীবিকায় নিযুক্ত অপর সকল ব্যক্তি উহার কুফল ভোগ করিবে না, ইহা মনে করিলে অবাস্তব কল্পনাবিলাসের দোষে দোষী হইতে হইবে।

দেশের মধ্যে ফসল উৎপাদন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে উহার দুইটি ফলাফল ঘটিবে : (১) দেশের সংখ্যাধিক ব্যক্তির আয় কমিবে এবং (২) কৃষি-জাত সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিবে।

(১) দেশের সংখ্যাধিক ব্যক্তির (কৃষকের) আয় কমিলে, শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয় কমিতে বাধ্য ; ক্রেতার ব্যয় ক্ষমতা না থাকিলে, ক্রয় বিক্রয় হইবে কম এবং সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইবে। সামগ্রীর দাম হ্রাস পাইলে শিল্প উৎপাদনের মুনাফা কমিবে। তাহারা সামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস করিবে ; ইহার অর্থ হইল কাঁচামাল (ইহার মধ্যে কৃষিজাত সামগ্রীও আছে) তাহারা কম পরিমাণে ক্রয় করিবে (কৃষককে ইহাতে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে) এবং শ্রমিক ছাঁটাই করা হইবে ; বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা কৃষক নহে কিন্তু শিল্পোৎপাদন হইতে জীবিকা অর্জ্জন করে জনগণের সেই অংশেরও আয় কমিয়া যাইবে। সমগ্র ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইবে। এ ক্ষেত্রে উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি ব্যক্তিদিগেরও কার্য্য ক্রয় করিবার মতন অর্থ সাধারণের হস্তে না থাকায় তাহাদেরও উপার্জ্জন কমিবে।

(২) কৃষিজাত সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিলে কাঁচামালের অভাবেও শিল্প মালিকগণ শিল্প সামগ্রী উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে এবং জনসাধারণের পক্ষে খাদ্যশস্য পাওয়া দুষ্কর হইবে।

এইরূপ অবস্থায় সরকার জনগণের নিকট হইতে যে কর আদায় করেন তাহা হ্রাস পাইবে, কারণ জনগণের অধিক কর প্রদানের ক্ষমতাই থাকিবে না। সুতরাং সরকার তাঁহাদের ব্যয় কমাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন—উহার আবার বিভিন্ন ফলাফল ঘটিবে।

অপরদিকে ঠিক প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত হইলে ফসল ভাল হইবে এবং কৃষকের উপার্জ্জন হইবে ভাল ; সেক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত অবস্থার বিপরীত ফলাফল হইবে।

খনিজ সম্পদ—সাধারণ বৈশিষ্ট্য—Mineral Resources, —General Features

খনিজ সামগ্রীর সম্পর্কে ভারতের অবস্থা চারিটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা চলে :

(ক) কতিপয় খনিজ সম্পদ আছে যাহা ভারত বিদেশে রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক বাজারে আধিপত্য করিতে পারে যথা লৌহ আকরিক, অভ্র ইত্যাদি ; (খ) কতিপয় খনিজ সামগ্রী সম্পর্কে ভারত বৈদেশিক বাজারে অধিপত্য না করিতে পারিলেও যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানী করিতে পারে যথা ম্যাঙ্গানীজ্, বক্সাইট ইত্যাদি ; (গ) কতিপয় খনিজ সামগ্রী সম্পর্কে ভারত আত্মপর্য্যাপ্ত—উহা রপ্তানী করিতে সমর্থ হউক বা না হউক, যথা ফসফেট, নাইট্রেট ইত্যাদি ; (ঘ) অপরাপর খনিজ সামগ্রী ভারতে উৎপাদিত হয় অতি নগণ্য পরিমাণে, অথবা হয়ই না ; ঐগুলির জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়, যথা—রৌপ্য, নিকেল, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।

ভারতের খনিজ সম্পর্কে কতিপয় মূল বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন :

(১) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, যথা কয়লা এবং লৌহ আকরিক, সর্ব্বাধিক পরিমাণে দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত (concentrated)। সকল খনিজ সম্পদের সাধারণ স্থানিকতা লক্ষ্য করিলে, উত্তর ভারতেই উহাদের অধিক প্রাপ্তব্যতা (availability) দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার মধ্যে বিহার সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

(২) আধুনিক জীবনের অতি প্রয়োজনীয় উৎপাদন অর্থাৎ পেট্রোল আমাদের উৎপাদন হয় অতিশয় অল্প।

(৩) ম্যাগনেসাইট এবং ইল্‌মিনাইট উৎপাদনে ভারত জগতের নেতৃত্ব করে।

(৪) সমগ্র জগতে মোট যত পরিমাণ অভ্র উৎপাদিত হয় তাহার তিন চতুর্থাংশ উৎপাদিত হয় একমাত্র ভারতে।

(৫) বৃটিশ জাতিপুঞ্জের মধ্যে কয়লা ও লৌহ আকরিক উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। অতি উৎকৃষ্ট গুণের লৌহ আকরিকের অস্তিত্বের দিক হইতে জগতের মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম।

(৬) বিশ বৎসর পুর্ব্বে আমাদের দেশে উত্তোলিত খনিজ সামগ্রীর মূল্য ছিল ২০ কোটি টাকার কম ; ১৯৫১ সালে উহা ৭৫ কোটি টাকারও অধিক হয়।* ১৯৫৪ সালে মোট প্রাপ্ত খনিজ সামগ্রীর মূল্য দাঁড়ায় ৮৩'৪ কোটি টাকা এবং ১৯৫৫ সালে উহা ৮৭'৩ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।**

খনিজ সম্পদ, ধাতু ও অ-ধাতু—Mineral Resources—Metallic and Non-metallic

* ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার শতবার্ষিকী উৎসবে (জানুয়ারী, ১৯৫১ সাল) শ্রী এন্, ভি, গ্যাডগিল কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভাষণ।

** Journal of Industry & Trade. Volume vi, No. 10.

Q. Give an account of the chief mineral resources of India and point out their utility for its industrial development (B. A. 1936, '47, Patna 1953, '55). Give a brief account of the mineral production of India. (B. Com. 1937, '39, '44, '45, '47, '48)

খনিজ ধাতু সম্পদ (Metallic Minerals)

(১) **লৌহ** (Iron)—উচ্চশ্রেণীর লৌহ আকরিকের (iron ore) পরিমাণের দিক হইতে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম। লৌহ আকরিকের খনি প্রধানতঃ বিহার এবং উড়িষ্যায় অবস্থিত। এই আকরিক হইতে লৌহ সংগৃহীত হয় এবং আকরিকের মধ্যে লৌহাংশের পরিমাণ অনুযারী আকরিকের গুণ বিচার করা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার নোয়ামণ্ডিতে এশিয়ার মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ লৌহখনি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের বরাকর অঞ্চলে এবং মহীশূরেও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন যে সকল স্থানে আকরিক পাওয়া যায় যে সকল স্থানে, (যথা মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি) নিকটবর্ত্তী কয়লার খনির অভাবে আকরিক গলাইয়া লৌহ আহরণ করা সম্ভব হয় না। ১৯৫৪ সালে প্রায় ৪৩ লক্ষ টন লৌহ আকরিক উত্তোলিত হইয়াছে এবং ১৯৫৫ সালে ৪৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা ১ কোটি ২৫ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(২) **ম্যাঙ্গানীজ**—(Manganese)—ম্যাঙ্গানীজ ধাতু প্রধানতঃ ইস্পাত নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্পে এবং ড্রাই ব্যাটারী নির্ম্মাণের কার্য্যেও, ইহার প্রভূত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয় এবং মোট উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ ভারতেই উৎপাদিত হয়। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ম্যাঙ্গানীজ খনি অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশই সর্ব্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন করে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানীজ উত্তোলিত হইয়াছিল, ১৯৫৪ সালে উহার উত্তোলনের পরিমাণ হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার উৎপাদন ২০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৩) **তাম্র** (Copper)—তাম্র আকরিক প্রধানতঃ বিহারের সিংভুম জিলায় পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী অঞ্চল, আসাম, সিকিম ও গাড়োয়াল প্রভৃতি স্থানেও তাম্র পাওয়া যায়—যুক্তপ্রদেশ এবং রাজপুতানার কোন কোন এলাকাতেও ইহার সন্ধান মিলে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্পে তাম্রের অনেক ব্যবহার আছে। বৎসরে ৩ লক্ষ টনের

মতন তাম্র উত্তোলিত হয়। ১৯৫৪ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টন।

(৪) **বক্সাইট** (Bauxite)—বক্সাইট ধাতু হইতে এ্যালুমিনিয়াম তৈয়ারী হয়। এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বাসন প্রভৃতি নির্ম্মাণে এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশে বক্সাইট পাওয়া যায়। ভারতে এ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে। ১৯৫৪ সালে উহার উৎপাদন ৭৫ হাজার টনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালের জন্য উৎপাদন তাগ্ ধরা হইয়াছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন।

(৫) **স্বর্ণ** (Gold)—মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত কোলার স্বর্ণ খনিতে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। তদ্ভিন্ন হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে সামান্য কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। ১৯০০-১৯৫০ সালের মধ্যে ২ কোটি ৭ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল; উহার মধ্যে ২ কোটি আউন্সেরও অধিক আসিয়াছিল শুধু কোলার হইতে। কিন্তু জগতের মোট স্বর্ণ উৎপাদনের শতকরা একভাগেরও কম উৎপাদিত হয় ভারতে। বর্ত্তমানে এদেশে বৎসরে স্বর্ণ উৎপাদনের হার হইল ২ লক্ষ ৩৯ হাজার আউন্স।

এইগুলি ব্যতীত আমাদের দেশে ইলমিনাইট উৎপাদন হইয়াছে ২ লক্ষ ৪১ হাজার টন, ক্রোমাইট ৪৬ হাজার টন, ম্যাগনেসাইট ৭১ হাজার টন এবং কিছু কিছু ইউরেণিয়াম ও থোরিয়ামও আমাদের দেশে উৎপাদন হইয়াছে।

অ-ধাতু খনিজ সম্পদ (Non-metallic Minerals)

(১) **কয়লা** (Coal)—কয়লা উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে। এখানে বৎসরে আড়াই কোটি হইতে তিন কোটি টন কয়লা উৎপাদিত হয়। ইহার মধ্যে অধিকাংশই উৎপাদিত হয় গণ্ডোয়ানা কয়লা অঞ্চল হইতে। এই এলাকা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি অঞ্চল লইয়া প্রসারিত। এই এলাকা হইতে অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮·১৩ ভাগ পাওয়া যাইত; আবার ইহার মধ্যে অধিকাংশই উৎপাদিত হয় বাঙ্গালার রাণীগঞ্জ এবং বিহারের ঝরিয়ায়। ঐ দুই স্থান হইতে মোট উৎপাদনের শতকরা ৭২ ভাগ পাওয়া যায়। ঐ স্থান ব্যতীত, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারতের রেওয়া রাজ্য এবং বিকানীরেও কয়লা পাওয়া যায়। ১৯৫১ সালে এদেশে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩২ হাজার টন, ১৯৫৪ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮০ হাজার টনে পরিণত হইয়াছিল।

১৯৫৫ সালে উত্তোলন হইয়াছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন।. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ২ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা প্রয়োজন হইবে, ইহার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন সরকারী কয়লা খনি হইতে এবং অবশিষ্টাংশ বেসরকারী কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হইবে।

(২) **অভ্র** (Mica)—একাধিক কার্য্যে ও সামগ্রী নির্ম্মাণে অভ্র ব্যবহৃত হয়—ইহাদের মধ্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্ম্মাণ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অভ্র উৎপাদিত হইয়া থাকে—পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ ভারতে হইয়া থাকে। ভারতে বর্ত্তমানে অভ্র উৎপাদন হয় বৎসরে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার হন্দর। বিহার, মাদ্রাজ ও রাজপুতানায় ইহা পাওয়া যায়—ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণের অভ্র পাওয়া যায় বিহারের হাজারিবাগ ও গয়া জিলায়।

(৩) ***পেট্রোলিয়াম*** (Petroleum)—পেট্রোলিয়াম হইতে পেট্রল এবং কেরোসিন পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে চালন-শক্তিরূপে ইহার প্রভূত কার্য্যকারিতা। অবিভক্ত ভারতে ৮ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত হইয়াছিল; ইহা কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ০·৬৩ ভাগ মাত্র। বর্ত্তমানে ইহার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন পাকিস্থানের অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতের আসাম প্রদেশের ডিগবয় অঞ্চলে এবং পাকিস্থানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত আটক জিলায় (কিছু পরিমাণে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানে) পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ভারতে কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে এবং ভূতত্ত্ব সমীক্ষা এ বিষয়ে অগ্রণী হইতেছেন।* দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তৈল সন্ধানের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা হইবে। ইহার জন্য বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া কানাডার নিকট হইতে, সাহায্য (কলম্বো পরিকল্পনার আওতায়) পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫৬ সালের নূতন শিল্পনীতি অনুযায়ী খনিজ তৈল উত্তোলন ব্যবস্থার উন্নয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) **লবণ** (Salt)—খাদ্য হিসাবে এবং কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারীর কার্য্যে লবণ ব্যবহৃত হয়। অবিভক্ত ভারতে প্রায় সাড়ে উনিশ লক্ষ টন লবণ উৎপাদিত হইত—উহার মধ্যে এক চতুর্থাংশ বর্ত্তমান পাকিস্থানের উৎপাদন অংশ। বর্ত্তমান ভারতে লবণ উৎপন্ন হয় সম্বর লবণ হ্রদে, রাজপুতানার কতিপয় অন্যান্য অঞ্চলে এবং সমুদ্র সৈকতে। ভারতকে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের লবণ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

* "Preliminary Report on coal suitable for the manufacture of Synthetic Petroleum"—Published by Geological Survey of India.

(৫) *চুনাপাথর* (Lime stone)—এদেশে বৎসরে গড়ে ৫০ লক্ষ টন চুণাপাথর উৎপাদন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টন উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে।

(৬) *জিপসাম* (Gypsum)—রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য এবং সিমেণ্ট উৎপাদনের জন্য সম্প্রতি জিপসামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪ সালে জিপসাম উৎপাদন হইয়াছে ৬ লক্ষ টন; ২য় পরিকল্পনায় উহা ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টনে বৃদ্ধি করা হইবে।

এইগুলি ব্যতীত লিগনাইট, মোনাজাইট, গন্ধক প্রভৃতি একাধিক অ-ধাতু খনিজ সামগ্রী আমাদের দেশে পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন—Future Development of Mineral Resources

খনিজ সম্পদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর যে জোর দেওয়া হইয়াছে উহার দরুণই খনিজ উন্নয়নের কর্ম্মসূচী (programme of mineral development) ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। ইস্পাত ধাতুপিণ্ড (ingot) উৎপাদনের ক্ষমতা ৬০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে এবং উহার জন্য লৌহ আকরিক, কয়লা, চুণাপাথর, ডলোমাইট এবং রিফ্র্যাক্টরী সামগ্রীর উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য বক্সাইটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং সিমেণ্ট শিল্পের উন্নয়নের জন্য চুণাপাথর, জিপসাম এবং চীনামাটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। যদিও খনি অঞ্চল জরিপের কার্য্যে কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছে এবং প্রধান প্রধান খনি অঞ্চলগুলি জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তথাপি ভবিষ্যতের শিল্প সম্প্রসারণের স্বার্থে দেশের খনিজ বস্তুর গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ খনিজ সামগ্রীর নিম্নরূপ উৎপাদনের ভাগ (target of production) স্থির করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের ভিত্তিতে, এবং দু একটি সামগ্রীর ক্ষেত্রে রপ্তানীর ভিত্তিতেও, এই উৎপাদনের ভাগ হিসাব করা হইয়াছে।

লৌহ আকরিক—	১ কোটি ২৫ লক্ষ টন
ম্যাঙ্গানীজ আকরিক—	২০ ,, ,,
চুণাপাথর—	২ কোটি ৩৩ ,, ,,
জিপসাম—	১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টন
বক্সাইট—	১ ,, ৭৫ ,, ,,

ইহাদের মধ্যে ১৯৬০-৬১ সালে লৌহ আকরিক রপ্তানী হইবে ২০ লক্ষ টন এবং ম্যাঙ্গানীজ আকরিক রপ্তানী হইবে ১৫ লক্ষ টন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খনিজ বস্তুর জরিপ এবং অনুসন্ধান পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া চালাইতে হইবে। সেইজন্য ***জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া*** এবং ***ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অফ্ মাইন্‌স্***—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সবিশেষ বৃদ্ধি করিতে হইবে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে খনিজ সামগ্রীর সবিশেষ গুরুত্ব থাকায়, ইহাদের সদ্ব্যবহারের জন্য সরকার ক্রমশঃই অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এযাবৎ মাত্র দুইটি খনিজ বস্তুর উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছিল—কয়লা ও খনিজ তৈল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের নূতন শিল্পনীতি প্রস্তাবে সরকারের একচেটিয়া দায়িত্বের তালিকায় আরও কতিপয় খনিজ সামগ্রী যোগ করা হইয়াছে: আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ এবং ক্রোম জিপসাম, সালফার, স্বর্ণ ও হীরক, তামা, সীসা, দস্তা, টিন, মলিবডেনাম, উলফার্ম্ম। এই নীতি অনুযায়ী সম্প্রতি হীরক সংক্রান্ত কার্য্য করিবার ও তাম্র খনি খুলিবার কার্য্যক্রম (programme) সরকার রচনা করিতেছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খনিজ তৈল উত্তোলনের জন্য এবং সন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গে তৈল সন্ধানের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর সহিত সরকার যে একযোগে কার্য্য করিতেছেন তাহা চালাইয়া যাওয়া হইবে। আসাম অঞ্চলে তৈল সন্ধানের জন্য আসাম অয়েল কোম্পানীর সহিত কার্য্য করিবার একটি কার্য্যক্রম সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

অরণ্য সম্পদ—ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব—Forest Resources—Their Economic Importance

Q. Describe the importance of forests in the economic life of India. (B.Com. 1938 ; '46, '48; B.A. 1950 ; Agra 1951 ; Patna 1953).

ভারত অরণ্য সম্পদেও সমৃদ্ধ, যদিও অন্যান্য কতিপয় দেশের তুলনায় ভারতের অরণ্য সম্পদ বিশেষ অধিক বলা চলে না। বর্ত্তমান ভারতে অরণ্য এলাকা হইল ১৪,৭৭,০০০০০ একর—ইহা হইল সমগ্র এলাকার শতকরা ২২ ভাগ। উন্নত দেশগুলিতেও, যথা রাশিয়া বা আমেরিকা, মোট ভূখণ্ডের একতৃতীয়াংশ অরণ্যাঞ্চল। অধিকন্তু আমাদের দেশে অরণ্যাঞ্চল সকল এলাকায় সমানভাবে বণ্টিত নাই; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উহা ভূখণ্ডের ১১ শতাংশ ও মধ্যাঞ্চলে ৪৪ শতাংশ।

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে অরণ্য সম্পদ একাধিক কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

প্রথমতঃ, বৃক্ষসমূহ বায়ুমণ্ডলকে আর্দ্র রাখে এবং উহার দ্বারা বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে। অরণ্য বিহীন স্থান হয় শুষ্ক এবং সেহেতু বৃষ্টিহীন। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে ইহার তাৎপর্য্য সহজেই অনুমেয়।

দ্বিতীয়তঃ, মাটির উপরি ভাগের ক্ষয় (Soil erosion) নিরোধের জন্য বন সমূহ বিশেষ উপকারী। বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হইতে মাটিতে যে সকল পাতা পড়ে সেইগুলির পচনের দ্বারা মাটিতে উর্ব্বরতার যোগসাধন হয়।

তৃতীয়তঃ, বনের বৃক্ষ হইতে আমরা তক্তা পাইয়া থাকি ; এই তক্তার দ্বারা বহু প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্ম্মিত হয়। বন হইতে শুধু সামগ্রী নির্ম্মাণের তক্তাই নহে, উহা হইতে জ্বালানী কাঠও সংগৃহীত হয়। আমাদের বন-অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর ২৫।৩০ কোটী বর্গফুট তক্তা ও জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত হইয়া থাকে। শাল, সেগুন, জারুল, শিশু, বার্চ, সিডার, পাইন প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে তক্তা পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, বন হইতে অন্যান্য বহু প্রকার সামগ্রী পাওয়া যায় যেগুলি সরাসরি জনসাধারণের ভোগকার্য্যে ব্যবহৃত হয় অথবা দেশের শিল্পে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা বিদেশে রপ্তানী হইয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিপুষ্ট করে। অনেক বৃক্ষ আছে যেগুলির গাত্র বা ফল বা বীজ হইতে বিভিন্ন প্রকার তৈল পাওয়া যায়, যথা নীম, মহুয়া, জয়পাল, পাইন, চালমুগরা ইত্যাদি। কোন কোন বৃক্ষ হইতে গঁদ বা অন্যান্য নির্য্যাস পাওয়া যায়, যথা বাবুল, খয়ের, শাল, পাইন ইত্যাদি। বন হইতে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। কাষ্ঠখণ্ড (wood pulp) ও বাংশমণ্ড (bamboo pulp) কাগজ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন বনভূমি হইতে মধু, মোম, লাক্ষা ইত্যাদি বিবিধ সামগ্রীও পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, বনজসম্পদ আহরণকারীদিগের নিকট হইতে সরকার রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। অতএব অরণ্য সম্পদ হইতে সরকারের আয় হইয়া থাকে।

বৃক্ষের প্রকৃতি এবং ভূমির অবস্থান অনুযায়ী ভারতের বনভূমিকে পাঁচটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) ***শুষ্কারণ্য*** (Arid forests)—এই অরণ্য বাবুল জাতীয় বৃক্ষ বিশিষ্ট। ভারতের রাজপুতানায় এবং পাকিস্থানের সিন্ধুপ্রদেশে এইরূপ বনভূমি অবস্থিত। (২) ***পত্রমোচী অরণ্য*** (Deciduous forest)—ইহা ঘনবনভূমি ; ইহাকে মৌসুমী অরণ্যও বলা হয়। ইহাতে শাল ও সেগুন বৃক্ষ থাকে ; হিমালয়ের নিম্নাংশে ও দক্ষিণাপথের পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে এই পর্য্যায়ের অরণ্য রহিয়াছে। (৩) ***চিরহরিৎ অরণ্য*** (Evergreen forests)—এই অরণ্যে তাল, খেজুর, বাঁশ ইত্যাদি

থাকে। যে সকল অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়—যথা হিমালয়ের পূর্ব্ব দিকের আর্দ্র ও নিম্ন অঞ্চলে ও আসামের পার্ব্বত্য এলাকায়—এই অরণ্য বিদ্যমান। (৪) *পার্ব্বত্য অরণ্য* (Hill forest)—হিমালয়ের উচ্চভূমিতে যে অরণ্য অবস্থিত তাহাকে পার্ব্বত্য অরণ্য বলা হয়। দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি প্রশস্ত ও সরলবর্গীয় পত্রযুক্ত বৃক্ষাদি থাকে। (৫) *উপকূল অরণ্য* (Tidal forests) উপকূল অঞ্চলের বনভূমি এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; ইহাতে ম্যাটগ্রোভ নামক বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনে এইরূপ বৃক্ষের প্রাচুর্য্য।

সরকারের অরণ্য নীতি—Forest Policy of Government

Describe the forest policy of the Government (B. Com. 1948). Suggest measures for improving the forest resources of India (B.A. 1950)

১৮৬৫ সালের পূর্ব্বে অরণ্য সম্পদ সম্পর্কে আমাদের দেশের সরকারের কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ছিল না। বৃটিশ শাসন আরম্ভ হইবার কিছুকাল পর হইতেই বিভিন্ন কারণে অরণ্য ধ্বংস হইতে থাকে এবং অরণ্য অঞ্চল সঙ্কুচিত হইতে থাকে। সরকার অবশেষে অরণ্য সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথঞ্চিত সজাগ হন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অরণ্য সমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য ইন্‌সপেক্টার জেনারেল নিয়োগ করা হয়। ঐ সময় হইতে অরণ্যসমূহকে যথাযথ রক্ষা করিবার নীতি সরকার গ্রহণ করেন। উহার জন্য শিক্ষিত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন অনুভূত হয়। সেই উদ্দেশ্যে দেরাদুনে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে একটি ইস্কুল স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে তথায় ফরেষ্ট রেঞ্জার কলেজ রহিয়াছে। উহাতে রেঞ্জার শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণকে অরণ্য রক্ষা ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। ঐ স্থানে ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত আছে—ইহাতে অরণ্য সম্পর্কে বিবিধ পর্য্যায়ের গবেষণা পরিচালিত হয়। ইতিমধ্যে অরণ্য রক্ষা প্রাদেশিক শাসন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ইন্‌সপেক্টার জেনারেলের পদটি প্রচলিত রাখেন। দেরাদুনের গবেষণাগারটীও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় ফরেষ্ট সার্ভিস স্থাপিত হয়। ভারতীয় ফরেষ্ট সার্ভিস ব্যতীত আরও তিন পর্য্যায়ের ফরেষ্ট সার্ভিস আছে—ভারতীয় ফরেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, প্রাদেশিক ফরেষ্ট সার্ভিস, এবং সাবর্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস।

অবিবেচনা প্রসূত ধ্বংসের হাত হইতে অরণ্য সম্পদ রক্ষা করা অথচ অরণ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ করা—ইহাই হইল সরকারের অরণ্য

সম্পর্কিত নীতি। এই নীতি কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে অরণ্য সমূহকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) ***রিজার্ভ অরণ্য*** (Reserve forests)—এই শ্রেণীর অরণ্য সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন। এই অরণ্য ব্যবহার সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ তবে ইহার ব্যতিক্রমও করা হয়।

(খ) ***সংরক্ষিত অরণ্য*** (Protected forests)—এই অরণ্য সাধারণ লোকে ব্যবহার করিতে পারে বটে, তবে সরকার কর্তৃক রচিত নিয়মকানুনের আওতার মধ্যে এইরূপ ব্যবহার চলিয়া থাকে। এই নিয়মকানুনের দ্বারা প্রত্যক্ষ-ভাবে যে পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয় নাই, উহা ব্যতীত অন্য যে কোন পদ্ধতিতেই এই পর্য্যায়ের অরণ্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

(গ) ***অশ্রেণীভুক্ত অরণ্য*** (Unclassified forests)—ইহাও জনগণের দ্বারা ব্যবহার্য্য। এই অরণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নাই।

এইরূপে অরণ্য সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীতও, সরকার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণেরও প্রচেষ্টা করিয়াছেন। বৃক্ষ অপসারণের দ্বারা প্রকৃতির ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ভারসাম্য পুনরুদ্ধার প্রয়োজন ইহা উপলব্ধি করা হইয়াছে। সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন যে বন সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হইল জাতীয় উন্নতির অপরিহার্য্য উপাদান। এই "যথাযথ ব্যবহারের" অঙ্গ হিসাবে সরকার ধ্বংসকৃত অরণ্যানীর পুনরুন্নয়নে প্রচেষ্টা নিবদ্ধ না রাখিয়া, জনসাধারণকে বৃক্ষ রোপণ এবং যত্ন সহকারে উহাকে পালনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বিশেষ ভাবেই সচেষ্ট হইয়াছেন। জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে কার্য্যকরী উৎসাহ সৃষ্টির জন্যও সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা "অধিক বৃক্ষ রোপণ কর" আন্দোলনে এবং "বনমহোৎসবে" রূপান্তরিত হইয়াছে। বৃক্ষ রোপণ এবং তাহার পরিচর্য্যায় উৎসাহ প্রদানের জন্য তাঁহারা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

১৯৫২ সালের অরণ্য নীতি প্রস্তাব

ভারত সরকার ১৯৫২ সালে বনাঞ্চলের তদারক ও উন্নয়ন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই ***১৯৫২ সালের অরণ্য নীতি প্রস্তাব*** নামে পরিচিত (Forest Policy Resolution, 1952)। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়া সরকারের অরণ্যনীতি সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে জমির ভারসাম্য যুক্ত এবং অনুপূরক ব্যবহারের চেষ্টা করা হইবে (balanced and complementary land use); অর্থাৎ জমির বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকিতে পারে এবং এক এক প্রকারের জমিকে শুধু এক এক প্রকারের কার্য্যে ব্যবহার করা হইবে। প্রত্যেক জমিকে শুধু সেই কার্য্যে ব্যবহার করা হইবে যে কার্য্যে ব্যবহার করিলে উহার উৎপাদন হইবে সব থেকে বেশী অথচ জমির ক্ষতি হইবে সব থেকে কম। অনেক অঞ্চল আছে যেগুলির উর্ব্বরতা নির্ভর করে পর্ব্বত বাহিত জলধারার উপর, আবার এই জলধারা নির্ভর করে পর্ব্বতের উপরিস্থ অরণ্যের উপর। পর্ব্বতাঞ্চলের এই অরণ্যকে সেই কারণে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে। বৃহৎ নদীগুলির বৃক্ষহীন তীর ধরিয়া যে জমিক্ষয় চলিতেছে উহা প্রতিরোধ করা হইবে। সমুদ্র সৈকত অঞ্চলে ক্রমশঃ বালিয়াড়ি বাড়িয়া যাইতেছে, উহাতে জমি ক্রমশঃই চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং উহাও প্রতিরোধ করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত, জনগণের সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য এবং যথাসম্ভব প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়ার অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য বৃক্ষবহুল জমি সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার সহিত পশুচারণ ভূমির সৃষ্টি করিতে হইবে, কৃষিযন্ত্রের জন্য কাঠের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং লোকে যাহাতে গোময় পুড়াইয়া নষ্ট না করে তাহার জন্য জ্বালানি কাষ্ঠের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইবে। আবার কাঠ বা তক্তার বৃহত্তর প্রয়োজনও আছে—যথা দেশ রক্ষা, যোগাযোগ, শিল্প ইত্যাদি। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও অধিকতর যোগানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার এই সকল প্রয়োজন মিটাইয়াও সরকারের বরাবরের জন্য যথাসম্ভব বেশী একটা বার্ষিক আয়েরও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় বনোন্নয়ন

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বনোন্নয়নের জন্য ৯·৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে বনসৃষ্টি, বনাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, বন সম্পর্কিত শাসন-সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র আবাদ সৃষ্টি (village and small scale plantations) প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক পরিকল্পনা রাজ্যসরকারগুলি কার্য্যকরী করিয়াছেন। বৃক্ষ রোপণ বা বনসৃষ্টির দ্বারা ৭৫,০০০ একরেরও বেশী জমিতে বৃক্ষ-আচ্ছাদন পুনরায় সৃষ্টি করা হইয়াছে—অনেক জমিতেই উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বনাঞ্চলে প্রায় ৩০০০ মাইল রাস্তা নির্ম্মিত বা উন্নত হইয়াছে। প্রায় ২ কোটি একরের মত বনাঞ্চল ব্যক্তিগত মালিকানা বা তত্ত্বাবধান হইতে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হইয়াছে এবং এই বাড়তি

দায়িত্ব পালনের জন্য শাসন সংগঠন শক্তিশালী করা হইয়াছে। কর্ম্মসূচী রচনার কার্য্যও ত্বরান্বিত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রথম পরিকল্পনায় আরব্ধ কর্ম্মসূচীগুলি যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই চালাইয়া যাওয়া হইবে। ইহা ছাড়াও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিম্নপ্রদত্ত কর্ম্মসূচীগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইবে :

(ক) নূতন বনাঞ্চল সৃষ্টি এবং বনাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার উন্নতি।

(খ) বাণিজ্য ও শিল্পের দিক হইতে যে সকল বৃক্ষ মূল্যবান সেগুলির আবাদ।

(গ) যে সকল কার্য্যে তক্তার ও অন্যান্য বন সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও সহজে পাওয়া যাইবে সেই সকল কার্য্য আরম্ভ।

(ঘ) বন্য পশু সংরক্ষণ।

(ঙ) বনাঞ্চলের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের অবস্থার উন্নতি।

(চ) বন সম্পর্কে গবেষণা বৃদ্ধি।

(ছ) টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্পন্ন কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

(জ) সমগ্র দেশে বন-উন্নয়নের কর্ম্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সমন্বয় ও সাহায্য প্রদান।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বন-উন্নয়নের জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ২৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিবেন সেগুলি হইল—গবেষণা, শিক্ষা, প্রদর্শন (demonstration) ও সমন্বয় সাধন (Co-ordination); রাজ্যসরকারগণ বন উন্নয়নের কর্ম্মসূচী রূপায়িত করিবেন।

জলশক্তি (জলবিদ্যুৎ)—Water power (Hydro-Electricity)

Q. Discuss the scope of Hydro-electric projects for irrigation and rural industrial development in India on the lines of Tenesse Valley Project. (B. Com. 1949) Mention of principal features of the multipurpose hydel projects undertaken by the Government and envisage their prospects (Agra 1952). Discuss the importance of hydro-electric resources to agricultural and industrial development of a country. What has been done to develop such resources in India in recent years? (Agra 1948; 1950).

যন্ত্র চালনা করিবার জন্য চালনশক্তির প্রয়োজন হয়। কয়লা, খনিজ তৈল এবং বিদ্যুৎ—এই তিনটি বিষয় হইতে চালনশক্তি পাওয়া যায়। কয়লা

আমাদের দেশে পাওয়া যায় বটে কিন্তু উহা অপরিমিত পরিমাণে নাই। "কয়লা উত্তোলন কমিটি" (Coal Mining Committee) হিসাব করিয়াছেন যে আমাদের যে উৎকৃষ্ট কয়লা আছে তাহা ১২২ বৎসর মাত্র টিকিতে পারে। অতএব চালনশক্তির উৎসরূপে কয়লারও পরিমাণ একদিন নিঃশেষিত হইবে। উপরন্তু কয়লার খনিগুলি একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত—বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া নাই ; অতএব সকল স্থানে ইহা সহজ প্রাপ্য নহে। খনিজ তৈল আমাদের দেশে যাহা উৎপাদন হয় তাহার পরিমাণ খুবই কম এবং প্রয়োজনের তুলনায় উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু আমাদের নদীগুলির মধ্যে বহু পরিমাণ চালনশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে ; নদীর জল হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া এই চালনশক্তি লাভ করা যাইবে। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম খরচায় বহু পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ইহাতে কম খরচায় সহর আলোকিত হইবে এবং কারখানা চলিবে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা ট্রেণ চলাচলও করিবে। বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য এবং সস্তা হইলে কৃষিকার্য্যে আধুনিক যন্ত্রকৌশল প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে এবং গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি লাভ করিলে, বহু প্রকারের কুটির শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা দ্রুতগতিতে এবং উৎকৃষ্ট ধরণের শিল্পসামগ্রী গ্রামবাসীগণ উৎপাদন করিতে পারিবে। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিলে গ্রামে গ্রামে সস্তায় বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। জলবিদ্যুৎ শক্তি অপচয় করিবার অর্থ হইল চল্‌তি "উপার্জ্জন" (current income) অপচয় করা এবং অন্যান্য শক্তির উৎসগুলিকে যথেচ্ছভাবে অপচয় করিলে উহা হইবে "**পুঁজি**" অপচয় করিবার সমান। এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্ম্মপন্থা হইল চল্‌তি উপার্জ্জনের ব্যবস্থা রাখা এবং পুঁজিকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করা।

কিন্তু আমাদের দেশে যে অনুপাতে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইতে পারে তাহার তুলনায় বর্ত্তমানে প্রকৃত উৎপাদন হইল অত্যন্ত অল্প। সোভিয়েট রাশিয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল ১০ কোটি কিলওয়াট এবং প্রকৃত উৎপাদন হইল উহার শতকরা ২২ ভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন সম্ভাবনা হইল ৪½ কোটি কিলওয়াট এবং প্রকৃত উৎপাদন হইল উহার শতকরা ৩৪ ভাগ। ভারতে সর্ব্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইয়াছিল মহীশূরে ; পরে বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে উহা উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। বর্ত্তমানে (পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী) আমাদের জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্ভাবনা হইল ৩½ কোটি কিলওয়াট

কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার প্রথমে প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিলওয়াট*।

অবশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের দ্রুত উন্নতির আশা করিতে পারা যায় এবং ঐ দিকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টাও করা হইতেছে। জাতীয় সরকার গঠনের পর হইতেই অনেকগুলি বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা (multi-purpose river valley schemes) কার্য্যকরী করা শুরু হইয়াছে। নির্ম্মীয়মান এবং ভবিষ্যতে নির্ম্মাণের জন্য অপেক্ষমান পরিকল্পনাগুলি শেষ হইলে, জলশক্তি কার্য্যকরী করার দিক হইতে ভারত পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশের পর্য্যায়েই নিজেকে উন্নীত করিবে। যত পরিমাণ শক্তি ভারতের সমগ্র রেলপথ ব্যবহার করিয়া থাকে তত পরিমাণ শক্তি একমাত্র কোশী পরিকল্পনাতেই উৎপাদিত হইতে পারে।

বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির (Multi-purpose river valley projects) অন্যতম উদ্দেশ্য হইল বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার পূর্ব্ব হইতে এইরূপ একাধিক নদী উপত্যকা পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নির্ম্মীয়মান কার্য্যগুলিকে শেষ করাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান কার্য্য রূপে গণ্য করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে ঐগুলির জন্য ৫৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। এইগুলির দ্বারা (সেচকার্য্য ব্যতীত) প্রায় ১১ লক্ষ কিলওয়াটের মতন বাড়তি শক্তি উৎপাদিত হইবে। এইগুলি এবং অনুরূপ সকল পরিকল্পনাগুলি শেষ হইলে ১৪ লক্ষ কিলওয়াট বাড়তি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রধান উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি হইল ভাকরা-নাঙ্গল, দামোদর উপত্যকা, হীরাকুদ বাঁধ (এইগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের); কাকরাপার (বোম্বাই সরকার), তুঙ্গভদ্রা, মাচকুঁদ (মাদ্রাজ সরকার), ময়ূরাক্ষী (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে সকল সম্ভাব্য স্থান হইতে মোট ৩½ কোটি কিলওয়াট জলবিদ্যুৎ এদেশে উৎপাদিত হইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলি হইতে ১ কোটি ১০ লক্ষ, মধ্যাঞ্চলের নদীগুলি হইতে ৪০ লক্ষ কিলওয়াট এবং উত্তরাঞ্চলের নদীগুলি হইতে ২ কোটি কিলওয়াট বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে বর্ত্তমানে (১৯৫৬ সালে) সকল সূত্র হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির ক্ষমতা ৩৪ লক্ষ কিলওয়াট হইয়াছে—

* অবশ্য ইহা ব্যতীত ১৭ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইত অন্য শক্তি হইতে (thermal plant)।

১৯৬১ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে উহা ৬৭ লক্ষ কিলওয়াটে পরিণত করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৩৫ লক্ষ কিলওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন। এই ৩৫ লক্ষ কিলওয়াট অতিরিক্ত উৎপাদনের চেষ্টা করা হইবে—ইহার মধ্যে ২৯ লক্ষ কিলওয়াট আসিবে সরকারী প্রচেষ্টা হইতে, অবশিষ্ট আসিবে কোম্পানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা হইতে। সরকারী প্রচেষ্টা হইতে লভ্য ২৯ লক্ষ কিলওয়াটের মধ্যে ২১ লক্ষ কিলওয়াট আসিবে জলবিদ্যুৎ হইতে এবং ৮ লক্ষ আসিবে তাপতাড়িত পরিকল্পনা (Thermal plant) হইতে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৪টি উভয় ধরণের কর্ম্মসূচী রূপায়িত হইবে—ইহার মধ্যে ২৫টি জলবিদ্যুৎ এবং ১১টি তাপতাড়িত। ইহাদের অধিকাংশই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যেই ফল দিবে।

সারাংশ

ভৌগোলিক অবস্থান—বর্ত্তমান ভারতের মোট এলাকা হইল ১২ লক্ষ ৬৯ হাজার বর্গমাইল। উত্তর দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ২ হাজার মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৭০০ মাইল। আয়তনের দিক হইতে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম স্থানের অধিকারী। ভারতের সমগ্র এলাকাটিকে তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—(১) হিমালয়ের পার্ব্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। ইহার প্রত্যেকের নিজস্ব অর্থনৈতিক গুরুত্ব রহিয়াছে।

মাটির প্রকার ভেদ—বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি চারি প্রকারের মাটি গুরুত্বপূর্ণ। (১) পলি মাটি—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং অন্যান্য কতিপয় অঞ্চলে ইহা দেখা যায়। আখ, তামাক, চাউল প্রভৃতি ফসল ভাল ফলে (২) লাল মাটি—মাদ্রাজ, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রভৃতি স্থানে এই মাটি আছে; ইহা অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। (৩) কৃষ্ণ মাটি—মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত—তুলা উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। (৪) গুঁড়া পাথুরে মাটি—আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে—জলসেচের দ্বারা কিছু চাষ হয়। এই মাটিতে চা উৎপন্ন হয় ভাল।

বৃষ্টিপাত—ভারতে বৃষ্টিপাত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং উত্তর-

পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ুর দ্বারা। প্রথমটি হইতে উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাত হয়; দ্বিতীয়টি হইতে হয় মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমান বৃষ্টিপাত হয় না। বৃষ্টিপাত অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়—সিক্ত অঞ্চল, মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল, শুষ্ক অঞ্চল, মরু অঞ্চল। এদেশে বৃষ্টিপাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী কারণ উহার উপরেই কৃষির সাফল্য ও অসাফল্য নির্ভর করে। কৃষির সাফল্য হইলে সমস্ত দেশের আর্থিক উন্নতি হয়। কৃষিকার্য্য বিফল হইলে সমগ্র দেশ আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়।

খনিজ সম্পদ—আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি হইল ধাতু (Metallic) এবং কতকগুলি ধাতু নহে (Non-metallic)। ধাতু খনিজের মধ্যে আছে লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, তাম্র, বক্সাইট, স্বর্ণ, ইলমিনাইট, ক্রোমাইট, ম্যাগ্‌নেসাইট, ইত্যাদি। অ-ধাতু খনিজের মধ্যে আছে, কয়লা, অভ্র, পেট্রোলিয়াম, লবণ, চুণা পাথর, জীপ্‌সাম ইত্যাদি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা কতখানি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ খনিজ সামগ্রীর উৎপাদনের ভাগ্‌ স্থির করা হইয়াছে, যথা—লৌহ আকরিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ টন, ম্যাঙ্গানীজ আকরিক ২০ লক্ষ টন, চূণা পাথর ২ কোটি ৩২ লক্ষ টন, জীপ্‌সাম ১৯ লক্ষ ৭০ হাজার টন, বক্সাইট ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। ইহা ছাড়া খনিজ বস্তুর জরিপ এবং অনুসন্ধান কার্য্য পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া চালান হইবে।

অরণ্য সম্পদ—দেশের মোট এলাকার শতকরা ২২ ভাগ হইল বন এলাকা (১৪ কোটি ৭৭ লক্ষ একর)। বনাঞ্চলের উপকার অনেক: (১) বৃষ্টিপাত আকৃষ্ট হয় (২) মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ হয় (৩) তক্তা পাওয়া যায় (৪) শিল্পের অন্যান্য কাঁচা মাল এবং রপ্তানীর পণ্য পাওয়া যায় (৫) রাজস্ব সংগ্রহ হয়। এদেশে বিভিন্ন প্রকারের বনাঞ্চল আছে (১) শুষ্কারণ্য (২) পত্রমোচী অরণ্য (৩) চির হরিৎ অরণ্য (৪) পার্ব্বত্য অরণ্য (৫) উপকূল অরণ্য। দেশের সরকার অরণ্যগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং যথাযথ ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে গবেষণার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং অরণ্য-গুলিকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে ভাগ করিয়া উহাদের ব্যবহারের নীতি স্থির করা হইয়াছে। (১) রিজার্ভ অরণ্য (সাধারণের ব্যবহার নিষেধ) (২) সংরক্ষিত অরণ্য (সরকারী নিয়মকানুনের আওতায় ইহার ব্যবহার চলে) (৩) অ-শ্রেণীভুক্ত অরণ্য (ইহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত নাই)। সাম্প্রতিককালে দেশের সরকার বনাঞ্চল বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। ইহার জন্য বন মহোৎসবের আয়োজন করা হয় এবং বৃক্ষ রোপণের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৫২ সালে ভারত

সরকার এ সম্পর্কে একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ব্যাখ্যা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন উন্নয়নের জন্য ৯·৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কতিপয় নূতন কর্ম্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং সর্ব্বসমেত ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জল বিদ্যুৎ—জল বিদ্যুতের প্রয়োজন আমাদের দেশে খুবই বেশী, কারণ ইহার দ্বারা সস্তায় চালন শক্তি সৃষ্টি করা হয়—উহা দ্রুত শিল্প উন্নতি সম্ভব করে। এদেশে ৩½ কোটি কিলওয়াটের মতন বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন উহার অতি নগণ্য অংশ। প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কিলওয়াট। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ১১ লক্ষ কিলওয়াটের মতন অতিরিক্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সকল সূত্র হইতে ৩৫ লক্ষ কিলওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে ২৯ লক্ষ কিলওয়াট আসিবে সরকারী প্রচেষ্টা হইতে—আবার এই ২৯ লক্ষের মধ্যে ২১ লক্ষ কিলওয়াট আসিবে জলবিদ্যুৎ হইতে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মোট ৪৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার মধ্যে ২৫টি হইবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ ব্যবস্থা
The Social Systems

General Questions : Examine briefly the influence of social institutions on the economic life of India (B. A. 1942, '44). Discuss the various ways in which social conditions in India affect the economic life of its people (B. Com. 1942). Discuss the important features in the social structure of the people in India (B. A. 1937). Discuss the extent to which the industrial development of India is hindered or facilitated by social (and physical) conditions (B. Com. 1954).

একান্নবর্ত্তী পরিবার—The Joint Family

Q. Consider the effects of the Indian Joint Family upon the supply of enterprise and saving (B. A. 1945).

ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে একটি বৈশিষ্ট্য হইল একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বসবাস। পাশ্চাত্য দেশসমূহে পারিবারিক জীবন হইল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সাধারণতঃ স্বামী, স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র-কন্যা লইয়াই তথায় পরিবার গঠিত। পুত্র বড় হইয়া বিবাহাদি করিলে সাধারণতঃ পৃথগন্ন হইয়া যায় এবং পৃথক সংসার স্থাপন করে। আমাদের দেশে কিন্তু বহু ব্যক্তি একই পরিবারের মধ্যে বসবাস করে, ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। একই সংসারের মধ্যে বসবাসকারী এইরূপ একাধিক ব্যক্তি অবশ্য পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত; কোন সাধারণ উর্দ্ধতন পুরুষের বংশধর হইয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে রক্তসম্পর্কের দ্বারা আবদ্ধ। ইহাদের বসবাসাদির এক ব্যবস্থা, ধর্ম্ম অনুসরণে ইহারা অভিন্ন এবং ইহাদের সকলের সম্পত্তি একত্রিতভাবে সমগ্র পরিবারের যুক্ত মালিকানার মধ্যে থাকে। সম্পত্তির তদারক ও ব্যবহার এবং সমগ্র পরিবারটিকে পরিচালনার সকল ব্যবস্থাই হইল সমগ্র পরিবারের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দায়িত্ব; ইনি সাধারণতঃ কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত। পরিবারের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ এইরূপ কর্ত্তা বা অভিভাবকের স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। সঠিক একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্যবস্থায়, একই পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপার্জ্জন কর্ত্তার হস্তে জমা

দিতে হইবে—ব্যক্তিগত উপার্জ্জনের দ্বারা সমগ্র পরিবারের একত্রিত তহবিল গঠিত হইবে এবং এই একত্রিত তহবিল হইতে সমগ্র পরিবারের ব্যয়নির্ব্বাহ করা হইবে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্যবস্থায় একাধিক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়:

(১) একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিছক ভরণ-পোষণের জন্য কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। একজন ব্যক্তির উদ্‌বৃত্ত উপার্জ্জন একই পরিবারভুক্ত অপর একজনের উপার্জ্জনের ঘাটতি পূরণ করিতে পারে। কেহ উপার্জ্জনহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে অন্নাভাবের সম্মুখীন হইতে হয় না। এইভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনা-আপনি সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ বেকার বীমা ব্যবস্থা (unemployment Insurance) প্রচলিত হইয়া যায়। বিশেষ করিয়া মৃতভর্ত্তৃকা অসহায় স্ত্রীলোক অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশু একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে যে নিশ্চিত থাকিতে পারে তাহা কম লাভের কথা নহে, কারণ আমাদের দেশে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অত্যধিক।

(২) একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিলে প্রত্যেকের জীবন-ধারণের ব্যয়ে সাশ্রয় করা সম্ভব হয়; একাধিক ব্যক্তি একত্রিতভাবে বসবাস করিলে প্রত্যেকেরই ব্যয় সঙ্কোচ ঘটে। আমাদের দরিদ্র দেশে ইহা কম লাভজনক নহে। ইহাতে সঞ্চয়ে সুবিধা হয় এবং দেশেব মধ্যে পুঁজি বৃদ্ধির অবকাশ ঘটে।

(৩) এইরূপ পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের সম্পত্তি যৌথ মালিকানার মধ্যে থাকে—পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত হইয়া উহা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and fragmentation of land) প্রতিরুদ্ধ হয়। আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইন এবং কতিপয় অর্থ-নৈতিক ঘটনা যখন (কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর) জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা ত্বরান্বিত করে, তখন একান্নবর্ত্তী পরিবাররূপ সামাজিক সংগঠন উহার প্রতিরোধ-শক্তিরূপে বিরাজ করিয়াছে।

(৪) একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বৃত্তি জাগরূক হয়—একজনের অভাবে ও বিপদে অপর সকলে আগাইয়া আসে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়া সহজ ও সম্ভব হয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের অপগুণ

(১) এইরূপ পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকেই কিছুকালের জন্য অন্যের সহযোগিতায় অন্নসংস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকায়, অনেকের মধ্যে আলস্য ও

পরনির্ভরশীলতার প্রবৃত্তি জাগরূক হইতে পারে। উপার্জ্জন না করিলেও অন্ততঃ দিন কয়েকের জন্যও ভরণপোষণের অভাব হইবে না—এইরূপ চেতনা বহু ব্যক্তিকেই শিল্পোদ্যোগী হইতে বিমুখ করিয়া তুলে।

(২) যিনি পরিবারের কর্ত্তা, যাঁহার উপর একটি বৃহৎ পরিবার নির্ভরশীল, তাঁহার পক্ষে ঝুঁকি বহুল শিল্প প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

(৩) পারিবারিক সংগঠনকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লোকে যে যাহার গ্রামের মধ্যে উপার্জ্জনের উপায় সন্ধান করে। একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় গৃহ কর্ত্তা অনেক সময়ে তাঁহার পুত্রদিগকে দূরস্থানে যাইয়া উপার্জ্জনের পথ অবলম্বন হইতে বিরত করেন। ইহাতে শ্রমের গতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি সঙ্কুচিত থাকে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের বর্ত্তমান অবস্থা—আধুনিক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব বহু পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিও কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উপরন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অন্যত্র কোথাও সুনিশ্চিতভাবে উৎকৃষ্টতর আয়ের পন্থা পাওয়া যাইলে উহা দূর হইলেও পারিবারিক সংগঠন বজায় রাখিবার জন্য সেই পথ অবলম্বনে বিরত হওয়া এখন আর স্বাভাবিক নহে। কৃষির উপর অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতার দরুণ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব এবং প্রসারের দরুণ, অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। আধুনিক চলাচল ব্যবস্থা উন্নত হওয়াতে স্থানান্তর গমনও সুবিধাজনক হইয়াছে। এই সকল কারণে বর্ত্তমানে একান্নবর্ত্তী পরিবার সংগঠন শিথিল হইয়াছে।

জাতিভেদ প্রথা—The Caste System

ভারতের সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা সমাজ ব্যবস্থার আর একটি রূপ। হিন্দু সম্প্রদায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। জাতি বিভাগ মূলতঃ চারি পর্য্যায়ের,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি বিশেষ বৃত্তি বা পেশা নির্দ্ধারিত থাকে; ব্রাহ্মণের পেশা পৌরহিত্য, ক্ষত্রিয়ের পেশা যুদ্ধ ও শাসন পরিচালনা, বৈশ্যের বৃত্তি হইল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শূদ্রের হইল কায়িক শ্রম। এই মূল পর্য্যায়গুলির আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে, উহা তাহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না, তাহার জন্মের দ্বারাই তাহার জাতি নির্দ্ধারিত। জাতি পরিবর্ত্তনও সম্ভব নহে, জন্মের দ্বারা যাহার যে জাতি লাভ ঘটিয়াছে তাহাকে সেই জাতিই থাকিতে হইবে। জাতিগুলির মধ্যে আবার উচ্চনীচ বিভেদ আছে; ব্রাহ্মণ হইল সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শূদ্র হইল সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। জাতির সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ করিয়া

জাতির এই উচ্চনীচ পার্থক্য বজায় রাখা হয়। এক জাতির ব্যক্তি অপর জাতির সহিত একত্রে আহার করিবে না এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধনও স্থাপিত হইতে পারে না। সামাজিক জীবনেও একজন ব্যক্তির মর্য্যাদা তাহার জাতির দ্বারাই সূচিত ও নির্দ্ধারিত হয়—কোন জাতি অধিক মর্য্যাদা ভোগ করিতে পারে আবার কোন জাতির বিভিন্ন অক্ষমতা থাকিতে পারে।

Q. Describe the economic advantages and disadvantages of the caste system in India. (B Com. 1935).

জাতিভেদ প্রথার গুণ

(১) জাতিভেদ প্রথার দ্বারা প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। কোনো ব্যক্তিকেই কোন্ পেশায় সে নিযুক্ত থাকিবে তাহা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। তাহার জাতিই তাহার বৃত্তি বা পেশা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে।

(২) ইহার দ্বারা শ্রমবিভাগের নীতি আপনা-আপনিই কার্য্যকরী হইয়া যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ প্রবর্ত্তিত থাকিলে,—অর্থাৎ একজন বা একদল ব্যক্তি শুধু একপ্রকার কার্য্যই সম্পন্ন করিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে,—মোট উৎপাদনের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়—কারণ ক্রমাগত অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করে। জাতিভেদ প্রথা সমাজকে এই শ্রম বিভাগের সুবিধা উপহার দিয়াছে।

(৩) কোনো একটি পেশা অনুসরণ করিতে গেলে উহার নিমিত্ত বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন হয়; অনেক ক্ষেত্রে এই বিশেষ জ্ঞান আহরণ করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ইহার জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন হয়। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা থাকার দরুণ এইরূপ শিল্প-বিদ্যা অতি সহজেই অর্জ্জিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে তাহার নির্দ্ধারিত পেশার সহিত শিশুকাল হইতে পরিচিত থাকে। শিল্প চাতুর্য্য পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায়—পিতা তাহার পুত্রকে শিশু বয়স হইতেই তাঁহার শিল্প চাতুর্য্য হাতে কলমে শিখাইতে থাকেন।

(৪) প্রত্যেক জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেদের মধ্যে সহৃদয়তার ভাব বোধ করে। কোন ব্যক্তি কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে বা অন্য কোন কারণে কাহারও সাহায্য তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইলে, বহুক্ষেত্রে তাহার জাতির মধ্যেই সে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত দেখে।

জাতিভেদ প্রথার অপগুণ

(১) জাতিভেদ প্রথা ব্যক্তিকে তাহার গুণ অনুযায়ী মর্য্যাদা প্রদান করে

না—মর্য্যাদা প্রদান করা হয় জন্মরূপ দৈব ঘটনার দ্বারা। ইহা আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা ব্যাহত করে—নিজস্ব গুণ প্রদর্শন করিয়া সামাজিক মর্য্যাদা লাভের পথ রুদ্ধ থাকে। ইহার অর্থনৈতিক কুফল ঘটে,—কারণ অধিকতর অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা সামাজিক মর্য্যাদায় অগ্রসর হওয়া সাধারণ মানুষের জীবনে একটি প্রলোভন। এই প্রলোভনের দরুণ অধিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা,—এবং সেহেতু, অধিক সম্পদ সৃষ্টি, ঘটিয়া থাকে।

(২) ইহা প্রত্যেকের পেশা নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়—কিন্তু উহা নির্দ্ধারিত করা হয় একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক ক্ষমতা বা পারদর্শিতা অনুসারে নহে। কাহার কোন্ বিষয়ে পারদর্শিতা সেই অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পেশা বন্টিত হয় না, প্রত্যেকের জন্য একটি পেশা নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং তাহাকে উহাতেই পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে বলা হয়। ইহাতে বহু উদ্যমের ও প্রতিভার অপচয় ঘটে। সমাজের সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও, ইহাতে ব্যাহত হয়।

(৩) অসাম্যই হইল সমগ্র জাতিভেদের ভিত্তি—সেই কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক হিংসা বা অবজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সেই কারণে সহযোগিতার অভাব ঘটিতে পারে; শ্রমবিভাগের নিজস্ব গুণ নাই—শ্রমবিভাগের সহিত সহযোগিতার সংযোগ ঘটিলে তবেই শ্রমবিভাগের সুফল লাভ করিতে পারা যায়। জাতিভেদ প্রথা সহযোগিতার পথ ব্যাহত করিয়া শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছে; ইহা আত্মবিরোধী আর্থিক কাঠামো (self-contradictory economic order)।

(৪) কায়িক পরিশ্রমের দ্বারাই সম্পদ উৎপাদিত হয়। কায়িক পরিশ্রমকে যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন। বিশ্বকবি বলিয়াছিলেন দেবতা বিরাজ করেন সেইখানে যেখানে চাষী বারোমাস পরিশ্রম করে এবং মজুর পাথর কাটিয়া পথ নির্ম্মাণ করে। জাতিভেদ প্রথা শূদ্রকে সকল জাতির নিম্নে স্থান দিয়া কায়িক পরিশ্রমের উপর অবজ্ঞার ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে।

জাতিভেদ প্রথার বর্ত্তমান অবস্থা—বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বহু পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা জাতিভেদের কঠোরতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত সমাজকে বহুপরিমাণে সজাগ করিয়াছে; আধুনিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতির দ্বারা পেশা নির্দ্ধারণ বজায় রাখা ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। প্রবল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে জাতিগত পেশায় নিযুক্ত থাকিবার ক্ষতি এবং অসম্ভাব্যতা (impracticability) ক্রমশঃই উপলব্ধি করা হইয়াছে। তবে সামাজিক এবং ধর্ম্মগত জীবনে জাতিভেদ মূলক ব্যবস্থা বহু পরিমাণেই প্রচলিত আছে।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থা—The System of Inheritance

উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরাধিকার নির্দ্ধারণে দুইপ্রকার আইন আছে—দায়ভাগ এবং মিতাক্ষর। বাঙ্গালা প্রদেশে দায়ভাগ ব্যবস্থা বিদ্যমান—অন্যান্য প্রদেশে যে ব্যবস্থা আছে তাহার নাম মিতাক্ষর। উভয় পদ্ধতির দ্বারাই পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্যদেশের কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠের উত্তরাধিকার (law of primogeniture) আমাদের দেশে প্রচলিত নাই।

দায়ভাগ পদ্ধতির মধ্যে পিতা যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন তাঁহার সকল সম্পত্তির তিনিই একমাত্র মালিক। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সম্পত্তির উপর পুত্রদিগের কোনই দাবী নাই। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে; এবং সকল ভ্রাতা একসাথে বাস করিলেও তাহাদিগের সম্পত্তি পৃথক করিয়া লইতে পাবে। পুর্ব্বে কন্যাগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারিত না; পিতা অপুত্রক হইলে তবেই পারিত। কিন্তু ১৯৫৬ সালেব হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে তাহাদিগকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। মিতাক্ষর পদ্ধতিতে পিতার জীবদ্দশাতেই তাঁহার সম্পত্তির উপর পুত্রদিগের এবং পৌত্র থাকিলে পৌত্রদিগেরও মালিকানা থাকে। পিতার মৃত্যুর পর মালিকানার পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুত্রগণ সম্পত্তির অংশীদার ছিল। পুর্ব্বে কন্যাগণ যতদিন অবিবাহিতা থাকিবে ততদিন ভরণপোষণ পাইবে মাত্র ও বিবাহের ব্যয় পাইবে এবং বিধবাগণ কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারিণী থাকিবে এইরূপ নিয়ম ছিল। কিন্তু এক্ষণে উপরোক্ত নূতন আইনে স্থির হইয়াছে যে কন্যাগণও উত্তরাধিকার পাইবে এবং স্ত্রীলোকগণ তাহাদের সম্পত্তির পরিপুর্ণ অধিকার পাইবে।

মুসলমান আইন অনুসারে পুত্র ও কন্যা উভয়েই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে, তবে কন্যার অংশ হইল পুত্রের অংশেব অর্দ্ধেক। সম্পত্তির মালিকের তাঁহার জীবদ্দশায় সম্পত্তির উপর অপ্রতিহত অধিকার থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর অনেক ব্যক্তির উপরে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্ত্তায়—পুত্র, কন্যা, পিতামাতা, ইত্যাদি।

মোট কথা ভারতের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তির মালিকানা বণ্টিত হয়। ইহার সুবিধা হইল (১) ইহা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার (social security scheme) মতন ক্রিয়া করে। একভ্রাতা সম্পত্তির অধিকারী আর সকলেই নিঃস্ব এইরূপ না ঘটিয়া সকলেই জীবনযাত্রা সুরু করিবার কিছু পরিমাণ পাথেয় লাভ করে। (২) ইহাতে ধনবণ্টনের সাম্য বিধান

সম্ভব হয় (equality in the distribution of wealth)। কিন্তু এই ব্যবস্থার অপগুণও রহিয়াছে : (১) সম্পদ ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় কাহারও পক্ষে উৎপাদনের কার্য্যে অধিক পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। ইহাতে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যাহত হয়। (২) ইহার দ্বারা জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বতা (subdivision and fragmentation) বৰ্দ্ধিত হয় ; ইহা উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্যে বিঘ্নস্বরূপ।

সারাংশ

ভারতের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন (১) একান্নবর্ত্তী পরিবার (২) জাতিভেদ প্রথা (৩) উত্তরাধিকার ব্যবস্থা।

একান্নবর্ত্তী পরিবার—অভিন্ন রক্ত সম্পর্কের দ্বারা সম্পর্কিত একাধিক ব্যক্তি যখন একই পরিবারের মধ্যে একই অন্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে তখন তাহাকে একান্নবর্ত্তী পরিবার বলা হয়। সকলের পক্ষ হইতে সমগ্র পরিবারটির কর্ত্তা সকল ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেন। সমগ্র পরিবারটির সম্পত্তি সকলের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় এবং সকলের উপার্জ্জন একত্রিত হইয়া সকলের স্বার্থে প্রযুক্ত হয়। এইরূপ ব্যবস্থার সুবিধা হইল—প্রথমতঃ, বহু অসহায় ব্যক্তি ভরণ পোষণ পায়, দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের প্রত্যেকের জীবন যাত্রার ব্যয় কম পড়ে, তৃতীয়তঃ, জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতার কুফল প্রতিরুদ্ধ হয়, চতুর্থতঃ, পারস্পরিক সহযোগিতার প্রবৃত্তি জাগে এবং ঝুঁকিবহুল শিল্পে নামিবার সাহস হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাব দোষ হইল যে প্রথমতঃ ইহার দ্বারা আলস্য এবং পরনির্ভরশিলতা বাড়ে, দ্বিতীয়তঃ পরিবারের কর্ত্তার পক্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যে ঝুঁকি লওয়া সম্ভব হয় না, তৃতীয়তঃ ইহার দ্বারা শ্রমের গতিশীলতা (Mobility of labour) প্রতিরুদ্ধ হয়।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের প্রসারে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংগঠন বৰ্ত্তমানে ক্রমশঃই শিথিল হইতেছে।

জাতিভেদপ্রথা—জাতি বিভাগ মূলতঃ চার প্রকারের। ইহাদের মধ্যে আবার নানারূপ ভাগ আছে। জন্মের দ্বারাই জাতি নির্দ্ধারিত হয় এবং জাতির দ্বারাই পেশা বা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক আচারের দ্বারা

জাতিগুলির সংমিশ্রন প্রতিরুদ্ধ থাকে। জাতিভেদ প্রথার গুণ হইল প্রথমত: কোন ব্যক্তিকেই তাহার পেশা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, দ্বিতীয়ত: ইহার দ্বারা দেশের মধ্যে শ্রম বিভাগের সুবিধা পাওয়া সম্ভব হয়, তৃতীয়ত: কোন বিশেষ শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা সহজে হয়, চতুর্থত: প্রত্যেক জাতির লোকের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগে। কিন্তু ইহার একাধিক দোষও দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথমত: ইহাতে অধিক সম্পদ সৃষ্টি ব্যাহত হয়, কারণ একজন ব্যক্তি অর্থনৈতিক উন্নতি যতই করুক না কেন তাহার সামাজিক মর্য্যাদা নিজের জাতির দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত: স্বাভাবিক ক্ষমতা বা পারদর্শিতা অনুযায়ী পেশা নির্দ্ধারিত হয় না। তৃতীয়ত: অসাম্যই ইহার ভিত্তি, সুতরাং ইহার দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার পথ রুদ্ধ থাকে। চতুর্থত: ইহার দ্বারা কায়িক পরিশ্রমকে অবজ্ঞা করা হয়।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবধারায় এবং অর্থনৈতিক কারণে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ক্রমশ:ই শিথিল হইতেছে।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থা—আমাদের দেশে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকারের তবে উহাদের মধ্যে দায়ভাগ এবং মিতাক্ষর এই দুইটিই প্রধান। দায়ভাগ ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিক জীবদ্দশায় তাঁহার সম্পত্তির উপর পরিপুর্ণ অধিকার রাখেন। মিতাক্ষার ব্যবস্থায় মালিকের জীবদ্দশাতেই তাঁহার সম্পত্তির উপর পুত্রদিগের এবং পৌত্রদিগেরও অধিকার থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই কন্যাদিগের উত্তরাধিকারের অধিকার ছিল না কিন্তু ১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইনের দ্বারা কন্যাদিগকেও উত্তরাধিকারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগকে সম্পত্তির ভোগদখল এবং বিক্রয়ের পরিপুর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এদেশের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় বহু ব্যক্তির মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হয়। ইহার গুণ হইল (১) প্রত্যেকই কিছু পায় (২) ধন বণ্টনের সমতা বিধান হয়। কিন্তু দোষ হইল (১) কাহারও হাতে বেশী পুঁজি জমে না এবং (২) জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন

Economic Transition in India

অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের অর্থ—Meaning of Economic Transition

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আরম্ভ হইতে, বিশেষ করিয়া গত এক শতাব্দী যাবৎ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠোমো প্রাচীন পদ্ধতি হইতে নূতন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইতেছে। অর্থনৈতিক কাঠামোর এই ধীর রূপান্তরকেই দেশের অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন রূপে অভিহিত করা হয়। এই অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন যে একমাত্র আমাদের দেশেই ঘটিতেছে তাহা নহে—উহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ঘটিয়াছে এবং আজিও ঘটিতেছে। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কাঠামো নূতন কাঠামোর দ্বারা স্থানচ্যুত হইয়াছে এবং বিবর্ত্তনের যুগ শেষ হইয়াছে। ভারতের কিন্তু এই বিবর্ত্তন অদ্যাপি শেষ হয় নাই, শুধু সাম্প্রতিক কালে ত্বরান্বিত হইতেছে।

গ্রামে এবং সহরে প্রাচীন অর্থনৈতিক কাঠামো—Old Shape in Villages and Towns

এই বিবর্ত্তন অনুধাবনের জন্য প্রথমে প্রাচীন আমলের আর্থিক গঠন বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণ প্রয়োজন দুই দিক হইতে: (ক) গ্রাম এবং উহার শিল্প ও (খ) সহর এবং উহার শিল্প।

(ক) পূর্ব্বে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে গ্রামই ছিল মূল কেন্দ্র। গ্রামের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি; সেই কারণে গ্রামবাসীদিগের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবিশ্রেণী। কৃষিজীবি ব্যতীতও গ্রামে বহুসংখ্যক কারিগর থাকিত এবং শাসন প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক কর্ম্মচারী থাকিত। এই তিন শ্রেণীর অধিবাসী লইয়া গ্রামগুলি ছিল এক একটি আত্মপর্য্যাপ্ত অঞ্চল (self sufficient unit); গ্রামগুলি ছিল পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ গ্রামের মধ্যে উৎপাদিত হইত। গ্রামের এই বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মপর্য্যাপ্তি কখনও কখনও বাহিরের ব্যবসায়ীর আগমনে অথবা গ্রামে উৎপাদিত হয় না এরূপ কোন সামগ্রী (যথা

লবণ) আমদানীর প্রয়োজনে ভঙ্গ হইত। এরূপ অবস্থায় লোকের উপার্জ্জনের প্রধান দুইটি উৎস ছিল কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প। কৃষির সংগঠন ছিল ভরণপোষণ মূলক (subsistence farming) ; কৃষকগণ মূলতঃ নিজস্ব প্রয়োজনেই চাষ করিত —বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নহে। চাষের পদ্ধতি ছিল পুরাতনী এবং উপকরণও ছিল মামুলী এবং প্রাচীন ধরণের। গ্রাম্য শিল্পগুলি ছিল সমষ্টিগত গ্রাম্য জীবনের পরিপোষক ; প্রত্যেক গ্রামেই বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর থাকিত—কর্ম্মকার, কুম্ভকার, চর্ম্মকার, ছুতোর ইত্যাদি ; ইহারা গ্রামবাসীদিগকে কার্য্য প্রদান করিত ; বিনিময়ে তাহারা সাম্বাৎসরিক ভরণপোষণ লাভ করিত।

(খ) পূর্ব্বেকার নগরগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল একাধিক বিষয় হইতে—এই-গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কোন কোন স্থান তীর্থস্থান বলিয়া, কোন কোন স্থান রাজধানী বলিয়া এবং কোনগুলি বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়া নগরাঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে তৃতীয়টি অপেক্ষা প্রথম দুইটিরই গুরুত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক। এই নগরাঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প সামগ্রী উৎপাদিত হইত— সূতীর কাপড়, পশম, ধাতুদ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, কারুকার্য্য, জাহাজ নির্ম্মাণ ইত্যাদি। এই সকল শিল্প জাতির ভিত্তিতে "গিল্ড" রূপ সংগঠনে সংগঠিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকাল হইতে এই সকল শিল্প সমেত সংশ্লিষ্ট নগরগুলির পতন ঘটিতে শুরু হয়। ইহার কারণ ছিল দেশীয় রাজ-দরবারের অবসান, বিদেশী প্রভাবে রীতি ও রুচির পরিবর্ত্তন, সস্তা যন্ত্রোৎ-পাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির দেশীয় শিল্পকে দমনের সুস্পষ্ট নীতি।

প্রাচীন এবং নূতন আমলের মূল পার্থক্য—Essentials of Old and New

পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর যে বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হইল ক্রমে উহা নূতন অর্থনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তরিত হইতেছে। পুরাতন কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে উহাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রধান নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায় প্রথা এবং নির্দ্দিষ্ট মর্য্যাদা (custom and status)। প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা সম্পাদিত চুক্তির (competition and contract) অবকাশ থাকে কম, পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলির মধ্যে গ্রামবাসীগণ আত্মপর্য্যাপ্ত জীবন যাপন করে, কৃষিই থাকে প্রধান উপজীবিকা এবং সেই হেতু কৃষিজীবির সংখ্যাই মোট জনসমষ্টির বৃহত্তম অংশ হয়। পণ্যের বাজার থাকে সঙ্কীর্ণ, শ্রম বিভাগ হয় অত্যন্ত সরল এবং স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন কারিগরদিগের দ্বারা ক্ষুদ্র আয়তনে শিল্প উৎপাদন হইয়া থাকে। বিনিময় ঘটে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে সামগ্রীর মধ্যে এবং কর্জ্জ ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটে না।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় নূতন ধরণের অর্থনৈতিক সংগঠন সহজেই অনুধাবন করিতে পারা যায়। এই নূতন আর্থিক সংগঠনে জনগণ তাহাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা এবং চুক্তির দ্বারা চালিত হইতে সক্ষমতা অর্জ্জন করে। ক্রমশঃ জটিলতর শ্রমবিভাগ করা হইয়া থাকে, পণ্যের বাজার বিস্তৃত হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা গড়িয়া উঠে। যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির এবং সম্প্রসারণের দ্বারা ইহা সম্ভব হয়। কৃষি মূল উপজীবিকার স্থান হইতে বিচ্যুত হইতে থাকে, উহা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে; সুদক্ষ আঁত্রে-প্রণাদের অধীনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প স্থাপিত হয়, বহুসংখ্যক শ্রমিক একই সাথে নিযুক্ত হয় এবং রাশীকৃত পরিমাণে উৎপাদন ঘটে। সরাসরি সামগ্রী বিনিময় তিরোহিত হয়, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটে, কর্জ্জ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়।

বর্ত্তমানে ভারত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাচীন পদ্ধতির যুগ হইতে বাহির হইয়া নূতন পদ্ধতির যুগের মধ্য দিয়া চলিতেছে। সেইজন্যই ভারত অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের মধ্যে রহিয়াছে।

বিবর্ত্তনের কারণ—Causes of the Transition

কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের দ্বারাই এই বিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল। বিষয়গুলি হইল—

প্রথমতঃ, যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন। অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্ত্তনে সহায়তাকারী সকল বিষয়গুলির মধ্যে ইহাই হইল এককভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে যদি কখনও কিছু পরিমাণে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বাণিজ্য-বিপ্লব (Commercial revolution) তাহার অগ্রবর্ত্তীরূপে ক্রিয়া করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেতনার উদ্ভব। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তনে এবং বাস্তব অবস্থার পরিবর্ত্তনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেতনার উদ্ভব ঘটিতেছিল। এইরূপ চেতনায় আবিষ্ট হইয়া ব্যক্তি তাহার দলগত এবং সমষ্টিগত জীবনের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে অস্বীকার করিতেছিল। সেই কারণেই অর্থনৈতিক জীবনের নূতন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপন। নূতন সাম্রাজ্যকে সুসংহত করিবার প্রয়োজনে বৈদেশিক শাসকশ্রেণী বিকেন্দ্রীভূত গ্রাম-জীবনের (decentralised pattern of village life) পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইহাতে গ্রামগুলির মধ্যে এবং জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা

দূরীভূত হইতে লাগিল ও শান্তি শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। উহা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্প্রসারণের সহায়করূপে ক্রিয়া করিল।

চতুর্থতঃ, বৈদেশিক পুঁজি। ভারতে বৈদেশিক পুঁজির আমদানী হইবার পর প্রতীচ্যের কারবার সংগঠন ক্রমশঃই এদেশে প্রচলিত হইতে থাকে। উহার দ্বারা এদেশে নূতন ধরণের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কার্য্য শুরু হইয়াছিল।

গ্রাম এবং সহরে নূতন প্রবণতা—New Tendencies in Villages and Towns

ঐ সকল বিষয়ের ক্রিয়ায় যে নূতন প্রবণতার সৃষ্টি হইল উহা দুইটি ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইল: (১) কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প সমেত গ্রামে এবং (২) নগরগুলিতে—অর্থাৎ নূতন নগর এবং নূতন শিল্পের উদ্ভবে।

(১) ***গ্রাম***—গ্রামের বিচ্ছিন্ন আত্মপর্য্যাপ্ত জীবন ভাঙ্গিয়া গেল। গ্রাম সমূহ নিজদিগের মধ্যে, এবং সহরের সহিত, ক্রমশঃ অধিকতর সংযুক্ত হইল। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে স্থানান্তর যাতায়াতের অভ্যাস (শ্রমিকের গতিশীলতা) ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সরসরি সামগ্রী বিনিময়ের স্থলে মুদ্রার দ্বারা বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে লাগিল। কৃষির ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ মূলক কৃষি বাণিজ্য-মূলক কৃষিতে পরিণত হইতে লাগিল। এই প্রবণতাগুলির সহিতই গ্রামে শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাইতে লাগিল। রায়তগণ উৎখাত হইয়া অ-কৃষিশ্রেণীর হস্তে জমি হস্তান্তর হইতে লাগিল। গ্রামের হস্তশিল্প বিলুপ্ত হইতে লাগিল এবং উহার সহিত জমির বিভাজন এবং অসম্বদ্ধতা (Sub-division and fragmentation) বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে সকল কারিগর টিকিতে পারিল তাহারা কিছু কিছু আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে লাগিল। বাৎসরিক ভরণপোষণের পরিবর্ত্তে কারিগরগণ নগদ পারিশ্রমিক পাইতে লাগিল।

(২) ***নগর***—পুর্ব্বে যে সকল স্থান রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা পাইবার অথবা তীর্থস্থান হইবার নিমিত্ত নগর পর্য্যায়ভুক্ত ছিল এক্ষণে তাহাদের গৌরব তিরোহিত হইল। পুর্ব্বেকার বাণিজ্য কেন্দ্র যেগুলি ছিল সেগুলিরও মর্য্যাদা তিরোহিত হইল—কারণ নূতন যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত অনেকেই খাপ খাইল না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমিক প্রসারের সহিত, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সহিত এবং নূতন যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা অনুযায়ী নূতন নগর গড়িয়া উঠিতে লাগিল। শিল্পোন্নতির পথে দেশ পদক্ষেপ করিল। শিল্পোন্নতির এই প্রবণতা যে বিষয়গুলি হইতে পরিস্ফুট হয় সেগুলি হইল—শিল্পজীবি ব্যক্তিদের অনুপাতে ক্রমিক বৃদ্ধি, নগরগুলির সম্প্রসারণ এবং মোট জনসংখ্যার

মধ্যে সহরাঞ্চলের লোকের অনুপাত বৃদ্ধি, মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে শিল্প-লব্ধ আয়ের অনুপাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে শিল্প-জাত পণ্যের রপ্তানীর অনুপাত।

সারাংশ

অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাচীন পদ্ধতি হইতে নূতন পদ্ধতিতে রূপান্তরকে অর্থনৈতিক বিবর্ত্তন বলা হইয়া থাকে। (ক) গ্রাম এবং উহার শিল্প এবং (খ) সহর ও উহার শিল্প—এই দুই ক্ষেত্রে প্রাচীন আমলের আর্থিক গঠন বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। গ্রামগুলি ছিল পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন এবং কৃষি কেন্দ্রিক। উপরন্তু গ্রামের সকল প্রয়োজন গ্রামের মধ্য হইতেই মিটান হইত। কৃষি ছিল ভরণপোষণমূলক যতটা, বাণিজ্যমূলক ততটা নহে। তিন শ্রেণীর সহর অঞ্চল ছিল—তীর্থস্থান, রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গিল্ডরূপ সংগঠনের আওতায় বিভিন্নপ্রকারের হস্তশিল্প এই সহরাঞ্চলগুলিতে দেখা যাইত।

ইহাই ছিল প্রাচীন কাঠামো। বর্ত্তমানে উহার স্থলে নূতন কাঠামো সৃষ্টির প্রবণতা দেখা গিয়াছে। পুরাতন কাঠামোর মূল কথা ছিল প্রথা—নূতন কাঠামোর মূল কথা হইল প্রতিযোগিতা। নূতন কাঠামো সৃষ্টির কারণ হইল (১) যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার (২) ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চেতনার উদ্ভব (৩) শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা (৪) বৈদেশিক পুঁজি এবং ব্যবস্থাপনায় নূতন শিল্প সৃষ্টি। এই অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনের দরুণ (১) গ্রামে এবং (২) সহরে নূতন প্রবণতা দেখা গেল। গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়ায় গ্রামগুলির আত্মপর্য্যাপ্ত বিচ্ছিন্ন জীবনের পরিসমাপ্তি হইল। নগরাঞ্চলগুলিতে নূতন শিল্প সৃষ্টি সুরু হইল। পূর্ব্বেকার নগরগুলির গৌরব শেষ হইল এবং শিল্প সৃষ্টির ভিত্তিতে নূতন নগর গড়িয়া উঠিল।

———

চতুর্থ অধ্যায়

জনসংখ্যা
Population

ভারতের জনসংখ্যার কতিপয় বৈশিষ্ট্য—Some Salient Features of India's Population

Q. Discuss the main features of India's population problem (B. A. 1941)

মোট জনসংখ্যা—১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী অবিভক্ত ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৮,৮৯,৯৭,৯৫৫—অর্থাৎ প্রায় ৩৯ কোটি। অবিভক্ত ভারতের এই জনসংখ্যা ছিল সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ এবং সমগ্র জগতের লোকসংখ্যার মধ্যে ইহা ছিল প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বর্ত্তমান ভারত প্রজাতন্ত্রের লোকসংখ্যা ৩৫,৬৮,৭৯,৩৯৪ বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু এই হিসাবের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের এবং আসামের 'খ'-শ্রেণীর পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকসংখ্যার হিসাব অন্তর্ভুক্ত নাই। প্রথমোক্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার বলিয়া অনুমিত হয় এবং শেষোক্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ৬০ হাজারের কাছাকাছি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এই সকল হিসাব একত্রিত করিলে বর্ত্তমান ভারত প্রজাতন্ত্রের মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ কোটি ১৯ লক্ষের মতন। লোক গননা হয় নাই এরূপ অঞ্চলগুলি বাদ দিলে বর্ত্তমান ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলির ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী হিসাব করিলে ঐ লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬৬ হাজারের মতন দেখা যাইবে। সুতরাং ১৯৪১ এবং ১৯৫১ এই দশ বৎসরের মধ্যে মোটামুটি ভারতের লোকসংখ্যা ৪ কোটি ২১ লক্ষের মতন বাড়িয়াছে। সুতরাং এই দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৩·৪ ভাগ। জনসংখ্যার বিপুলতার দিক হইতে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়; প্রথম স্থান হইল চীনদেশের—তথায় জনসংখ্যা হইল প্রায় ৬০ কোটি। ভারতের লোকসংখ্যা হইল সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ১৫·১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় সাতভাগের একভাগ।*

* বর্ত্তমানে ভারতের লোক সংখ্যা আরও ২ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কারণ প্রতি বৎসরই এদেশের লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষের মতন (কিছু কম) বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

গ্রাম্য ও সহরাঞ্চল অধিবাসী—সহর এবং গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনুপাত বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ পরিবর্ত্তন হইতেছিল বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। ১৯১১ সালে সহরাঞ্চলের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯·৩ ভাগ, ১৯২১ সালে উহা শতকরা ১০·৩ ভাগ এবং ১৯৩১ সালে শতকরা ১১ ভাগে পরিণত হয়। অবিভক্ত ভারতের সর্ব্বশেষ আদমসুমারীতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭·২ ভাগ ছিল গ্রামের অধিবাসী এবং ১২·৮ ভাগ ছিল সহরের অধিবাসী। বর্ত্তমান ভারতে (১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী) গ্রামের অধিবাসী হইল শতকরা ৮২·৬ ভাগ এবং সহরাঞ্চলের অধিবাসী হইল শতকরা ১৭·৪ ভাগ। অনুপাতের এই পার্থক্যের কারণ—পাকিস্থান অধিক গ্রামপ্রধান এবং ভারতে জনসংখ্যার সহরমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবুও প্রগতিশীল পাশ্চাত্য দেশসমূহের তুলনায়, ভারতের জনসংখ্যার গ্রামাঞ্চল এবং সহরাঞ্চলের মধ্যে বণ্টন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাধারণ মাপকাটি অনুযায়ী অনগ্রসর রূপেই গণ্য করিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে সহরাঞ্চলের অধিবাসী শতকরা ৭৭ ভাগ, জার্ম্মাণী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৫৬ ভাগ, ইটালিতে ৭১ ভাগ। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে সহরাঞ্চলের অধিবাসীর অনুপাত অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিমাপ করা হইয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী সংখ্যার আধিক্য এবং সহরাঞ্চলে উহার আপেক্ষিক স্বল্পতা আমাদের শিল্প বাণিজ্যের অনগ্রসরতার পরিচয় বহন করে। আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে, উহা জাতীয় চরিত্রেরও পরিচায়ক। গ্রামের শতগুণ থাকিলেও উহা রক্ষণশীলতার আধার, সহর শত দোষযুক্ত হইলেও সভ্যতা আমদানী রপ্তানীর বন্দর।

উপজীবিকা অনুসারে বণ্টন—

Q. Describe the pattern of the occupational distribution of the working population in India. To what extent does this pattern present a picture of an undeveloped economy? (W. B. C. S. 1955)

ভারতের মোট জনসংখ্যা উপজীবিকা অনুসারে বণ্টন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মোট অধিবাসীর মধ্যে কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক। ফিসক্যাল কমিশনের হিসাব অনুযায়ী কৃষিজীবির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ। "জাতীয় আয় কমিটি" National Income Committee) ১৯৪৮-৪৯ সালের জন্য উপজীবিকা বণ্টনের একটি হিসাব প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কমিটির হিসাব অনুযায়ী, বর্ত্তমান ভারতে উপার্জ্জনকারী এবং কর্ম্মরত পোষ্যের মোট সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৬৮·২ ভাগ জীবিকা অর্জ্জন করে পশুপালন ও কৃষি হইতে, শতকরা ১৩·৬ ভাগ শিল্প

হইতে, ৬'২ ভাগ বাণিজ্য হইতে, ১'৮ ভাগ পরিবহন ব্যবস্থা (transport) হইতে।

১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা হইল মোট জনসংখ্যার ৬৯'৮% ভাগ এবং অকৃষি জনসংখ্যা হইল অবশিষ্ট ৩০'২%। এই ৩০'২% ভাগের মধ্যে জনসংখ্যার শতকরা ১০'৬ ভাগ উপার্জ্জন করে শিল্প হইতে, ৬% ভাগ বাণিজ্য হইতে, ১'৬% ভাগ পরিবহণ হইতে এবং ১২% ভাগ অন্যান্য সূত্র হইতে।

বৃত্তিগত বণ্টনের ধাঁচ— (১৯৫১ সালের আদমসুমারী)

(১) শ্রেণী	মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ	প্রত্যেক শ্রেণীর লোকসংখ্যা কোটি	লক্ষ
(ক) নিজস্ব জমির চাষী এবং পোষ্য	৪৬'৯	১৬	৭৩
(খ) নিজস্ব জমির চাষী নহে এবং পোষ্য	৮'৯	৩	১৬
(গ) কৃষি শ্রমিক এবং তাহাদের পোষ্য	১২'৫	৪	৪৮
(ঘ) চাষী-শ্রেণী বহির্ভূত জমির মালিক, খাজানাভোগী এবং তাহাদের পোষ্য	১'৫		৫৩
মোট কৃষক শ্রেণী—	৬৯'৮	২৪	৯০
(২) অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা			
(ঙ) শিল্প	১০'৬	৩	৭৭
(চ) বাণিজ্য	৬'০	২	১৩
(ছ) পরিবহন	১'৬		৫৬
(জ) অন্যান্য কার্য্য	১২'০	৪	৩০
মোট কৃষি বহির্ভূত শ্রেণী	৩০'২	১০	৭৭
মোট—	১০০'০	৩৫	৬৬

কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার আতিশয্য এবং শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল সংখ্যার সেই অনুপাতে স্বল্পতা ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনের মৌলিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। অত্যধিক ব্যক্তি কৃষিজীবি ও

অন্যান্য ব্যক্তি শিল্পজীবি। এই অনুপাতের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন কারণ ইহার মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান দৌর্ব্বল্য রহিয়া গিয়াছে। কৃষিকার্য্যের উপর অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতা থাকিলেই যে উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য থাকিবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই—বরং অধিক কৃষিজীবির সহিত আমাদের দেশে জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা (Subdivision and fragmentation of land) অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উপর অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তির নির্ভরশীলতা থাকিলে উহার বিপদ হইবে—প্রথমতঃ কৃষিকার্য্য অধিক পরিমাণে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলিয়া প্রকৃতির খেয়াল খুশী অনুযায়ী, কৃষির মধ্য দিয়া, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটে; দ্বিতীয়তঃ, কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে "ক্রমিক আয়হ্রাসের নিয়ম" (Law of Diminishing Return) শীঘ্রই ক্রিয়া করিতে থাকে। সুতরাং অন্যান্য শিল্প বা ব্যবসা বাণিজ্যের মতন কৃষিকার্য্য ততটা লাভজনক বৃত্তি নহে।

[Q. Enumerate the chief factors which affect the size of India's population (B. A. 1950)]

জন্মহার—ভারতে জন্মহার (১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী) প্রতি হাজার লোকপিছু ৪০। ফ্রান্সে জন্মহার প্রতি হাজার লোকপিছু ২১, যুক্তরাজ্যে ১৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২৪।* ভারতে জন্মহার প্রগতিশীল দেশগুলির তুলনায় কিছু অধিক। জন্মহারের এই আপেক্ষিক আধিক্যের জন্য একাধিক কারণ দায়ী। আমাদের দেশে গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ার দরুণ যৌবনাগম হইয়া থাকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে; শিক্ষার অভাবের দরুণ দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানের যে অভাব ঘটে তাহাও অধিক জন্মহারের অন্যতম কারণ। জনগণের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের মানও অনেক নিচু। সেই কারণে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের দ্বারা জীবন উপভোগের অবকাশ কম বলিয়া দৈহিক লালসামূলক প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণের মাধ্যমে জীবন-উপভোগের অবকাশ সন্ধানের প্রবণতা অধিক মাত্রায় ক্রিয়া করে। উপরন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের দেশে খুবই ব্যপক। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন লাভের পরে তবেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য, এই নীতি খুব কম লোকেই অনুসরণ করে। সামাজিক আচার, এমন কি ধর্ম্মীয় অনুশাসন অল্প বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে জনগণকে অত্যধিক মাত্রায় প্রণোদিত করে।

ভারতের জন্মহার অধিক হইলেও উহার এই আধিক্যকে অতিরঞ্জিত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আদম সুমারীর হিসাব ১০ বৎসরের গড় হিসাব—

* U. N. Statistical Year Book, 1949-50, 1951-52.

উহা প্রতি বৎসরের নহে। প্রতি বৎসরের হিসাবে, ১৯৪৯ সালের জন্মহার ছিল ২৬.২ এবং ১৯৫০-৫১ সালে ২৪.৯ ও ১৯৫২ সালে ২৪.৮।• নিছক জন্মের হারের দিক হইতে লক্ষ্য করিলে ভারতের সহিত সমান অথবা ভারত অপেক্ষা অধিক জন্মহার বিশিষ্ট একাধিক রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যাইবে (কানাডা ২৭.১, জাপান ২৫.৬, পর্ত্তুগাল ২৪.২)। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে বিবিধ কারণে কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে জন্মের হার হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের জন্মের হার ছিল প্রতিহাজার লোক পিছু ৩২, ১৯৪২ সালে ২৯, ১৯৪৩ সালে ২৬। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে উহা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু পরে উহা হ্রাস পায়। মোট কথা, অবিভক্ত ভারতের জন্মহার ছিল অনেক বেশী, এক্ষণে উহা হ্রাস পাইতেছে।

মৃত্যুহার—আমাদের দেশে জন্মের হার যেরূপ আশা ব্যঞ্জক নহে, (হ্রাস প্রাপ্তি সত্ত্বেও) মৃত্যুর হারও সেইরূপ আনন্দদায়ক নহে। ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় অতিশয় অল্প, তাহার দারিদ্র্য প্রায় বর্ণনার অতীত। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ তাহার ভাগ্যে নাই বলিলেই চলে—পেট পুরিয়া খাওয়াও জুটে না। তাহার জীবনযাত্রার পরিবেশও নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। এই সকল কারণে তাহার রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প। ১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী প্রতি হাজার লোক পিছু ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা হইল বৎসরে ২৭টি। যুক্তরাজ্যে এই হার হইল ১১.৭ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯.৭।* আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর হারও অত্যধিক; প্রতিবৎসরে হাজার শিশুর মধ্যে (১৯৫১ সালের হিসাবে) ১২৪টি শিশু মারা যায়; এই হার কত অধিক তাহা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের শিশু-মৃত্যুর হার হইতে বোধগম্য হইবে। ঐ হার হইল যথাক্রমে ৩০.৯ ও ২৮.৬।* প্রতিবৎসর ভারতে দুইলক্ষ প্রসূতির মৃত্যু ঘটে।

অবশ্য কিছুকাল যাবৎ ভারতে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া তবেই উপরে প্রদত্ত সংখ্যায় দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে (decade) মৃত্যুহার ছিল হাজার পিছু ৩৪। তৃতীয় দশকে উহা ২৬-এ পরিণত হয়। ১৯৪১ সালে উহা ছিল ২২ এবং পর বৎসর উহা হইয়াছিল ২১। ১৯৪৩-৪৪ সালে দুর্ভিক্ষ জনিত অবস্থায় মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাইয়াছিল (সেই কারণেই ১৯৫১ সালের আদম সুমারীতে দশ বৎসরের হিসাব ধরিয়া গড় বাৎসরিক মৃত্যুহার ২৭) কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর উহা পুনরায় হ্রাস পাইয়াছিল। এ সম্পর্কে ১৯৪৪-৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন (Famine Commission of 1944-45) বলিয়াছিলেন, "মহামারীর বিরুদ্ধে জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা, প্রসূতি ও শিশু-মঙ্গল সম্পর্কিত সেবাকার্য্য, হাসপাতাল-

* U. N. Statistical Year Book, 1949-50, 1951-52.

গুলির উন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা মৃত্যুহারের উপর ক্রমবর্দ্ধমান পুষ্টিহীনতার সম্ভাবিত, ফলাফল বিনষ্ট হইয়াছে।" ১৯৫০ সালে, ভারতে মৃত্যুহার ছিল হাজার পিছু ১৬'১। ১৯৫১ সালে উহা ১৪'৪-এ এবং ১৯৫২ সালে ১৩'৬-এ পরিণত হইয়াছে।

বসতি-ঘনত্ব,—ইহার নির্দ্ধারক—Density of Population —its determinants

Q. Discuss the factors that determine the density of population in India (B. Com. 1936).

প্রতি বর্গমাইলে গড়ে যত সংখ্যক লোক বসবাস করে তাহাকেই জনগণের বসতি-ঘনত্ব বলা হয়। বর্ত্তমানে ভারতের, গড় ঘনত্ব হইল (১৯৫১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী) ৩১২। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি ঘনত্বের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী বসবাস করে। আবার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং প্রান্তস্থিত মরু-অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব অল্প। ভারতের দিল্লী রাজ্যে বসতি ঘনত্ব হইল ৩০১৭, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বসতি ঘনত্ব হইল ১০। পশ্চিমবঙ্গে উহা ৮০৬। যে বিষয়গুলির দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি ঘনত্ব নির্দ্ধারিত হয় সেগুলি এইভাবে বিশ্লেষণ করা চলে:

(১) বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার প্রকৃতির উপরে বসতি ঘনত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে; যে সকল স্থানে অত্যধিক শীত বা অত্যধিক গরম, সেই সকল স্থানে অন্য কোন কারণে বসবাস কর লাভজনক না হইলে—জনগণ ঐ সকল স্থানে বসবাস পরিহার করিয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সেই কারণে বসতি ঘনত্বের অধিক্যের প্রবণতা দেখা যায়।

(২) যে সকল অঞ্চলে জমি স্বাভাবিক ভাবেই উর্ব্বর সেই সকল অঞ্চল কৃষিকার্য্যের জন্য প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। প্রকৃতি যেখানে মানুষের প্রচেষ্টাকে অকৃপণ হস্তে পুরস্কৃত করে, কৃষিপ্রধান দেশের অধিবাসী স্বভাবতঃই সেই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(৩) কৃষিকার্যের জন্য জল অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান—স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হইতে যেখানে বিনা প্রচেষ্টায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল পাওয়া যায় সেই সকল স্থানে কৃষিকার্য্য সহজ-সাধ্য হয় এবং সেই সকল স্থানে লোক সংখ্যার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) কৃত্রিম ভাবে মানুষের প্রচেষ্টায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—ইহাকে বলা হয় জলসেচ ব্যবস্থা। সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলে (irrigated areas) বসতি ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়।

(৫) যে সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর, কোন বিশেষ ধরণের রোগের প্রাচুর্য্য যে সকল অঞ্চলে আছে, সে সকল অঞ্চল জনসাধারণ পরিহার করে এবং যথা সম্ভব রোগমুক্ত স্থান তাহারা বাছিয়া লয়।

(৬) দেশের কোন কোন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীভূত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে কলকারখানা ও অফিসে নিশ্চিত উপার্জ্জনের পথ পাওয়া যায় বলিয়া জনসাধারণের বসবাস বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যা ও খাদ্যসরবরাহ—Population and Food Supply

Q. Discuss the growth of population in the country in relation to the growth in the food supply. (B. A. 1944)

আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি, ১৮৭২ সালে উহা ২০ কোটি ৩০ লক্ষে দাঁড়ায় এবং ১৮৮১ সালে ঐ সংখ্যা ২৫ কোটিতে পরিণত হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে, ১৯২১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ভারতের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩২ কোটি; দশ বৎসর পরে ঐ সংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটিতে পরিণত হয়, এবং আবও দশ বৎসর পরে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ কোটি। ভারত ও পাকিস্থানেব মিলিত লোকসংখ্যা উহা অপেক্ষাও যথেষ্ট অধিক হইয়াছিল; অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি, এই একশত বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কিন্তু ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯১১ সালে গড় আবাদী জমির (average net area sown) পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৮০ লক্ষ একর; ১৯৪১ সালে উহার পরিমাণ হইয়াছিল ২১ কোটি ৫০ লক্ষ একর মাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পাঁচবৎসর পুর্ব্বের গড় হিসাব করিয়া ঐ সময়কার জনসংখ্যাকে ১০০ সংখ্যা এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনকে ১০০ সংখ্যা ধরিয়া উহার সহিত তুলনা করিয়া পরবর্ত্তী কালের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্যবৃদ্ধির একটি সুচক সংখ্যা (index-number) গঠন করা যাইতে পারে এবং উহাদের যথাক্রমে শতকরা হার নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পুর্ব্ববর্ত্তী পাঁচবৎসরের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ২৫ ভাগ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১০ ভাগ; ১৯৩১-৩২ সাল হইতেই প্রতিবৎসর আমাদিগকে বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হইযাছে। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অনুযায়ী ১৯৩১ সালেই

ভারতে মাত্র ২৯ কোটি ১০ লক্ষ লোকের খাদ্য ছিল কিন্তু প্রকৃত লোকসংখ্যা ঐ সময়ে ছিল ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ। তাঁহার হিসাব অনুযায়ী, সাধারণ বৎসরেই ভারতে শতকরা ১২ ভাগ খাদ্যের অপ্রতুল থাকে। ইহা শুধু খাদ্যের পরিমাণের দিক হইতে; খাদ্যের গুণের দিক হইতেও অনুরূপ অসন্তোষজনক অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। স্যার বয়েড্ ওর্ (Sir Boyd Orr) বলিয়াছেন, "সাধারণ সময়েই (ভারতে) শতকরা ত্রিশভাগ লোক যথেষ্ট আহার্য্য পায় না এবং উহা অপেক্ষা বৃহত্তর শ্রেণীকে সুনিশ্চিতভাবে ভারসাম্যবিহীন খাদ্য গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়—এ খাদ্যে থাকে শস্য খাদ্যের আধিক্য এবং উচ্চস্তরের পুষ্টিমূলক সার বিশিষ্ট রক্ষামূলক খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য।" পুষ্টিবিশারদ ডাক্তার এ্যাক্রয়েড্ (W. R. Aykroyd) আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতির পরিমাণ দেড়কোটি টন বলিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও আমাদের দেশে প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। কিন্তু উহাতে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজন, খাদ্যের পরিমাণের দিক হইতে ও গুণের দিক হইতে মিটে নাই।

যুদ্ধের পর সমগ্র জগতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল এবং বৈদেশিক বাজার হইতে ভারতের খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার ক্ষমতার উপরে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছিল; সেই কারণে যুদ্ধোত্তর কালে খাদ্যশস্য বৃদ্ধির ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন (Famine Commission of 1880) বলিয়াছিলেন যে তখন খাদ্যোৎপাদনের যে উদ্বৃত্ত ছিল তাহার দ্বারা দেশের যে কোন দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের প্রয়োজন মিটানো যাইত বটে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা শীঘ্রই এই উদ্বৃত্তটুকু গ্রাস করিয়া ফেলিবে; ভারতে তখন খাদ্যাভাব প্রবল আকার ধারণ করিবে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধি সম্পর্কে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সেই ভবিষ্যৎবাণী শীঘ্রই ফললাভ করিয়াছিল।

তবুও কিন্তু এই বর্দ্ধিত জনভার দেশ বহন করিতেছে; বরং গত কয়েক বৎসর মৃত্যুহার কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় মোটামুটি তিন ভাবে: (১) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার দ্বারা মৃত্যুসংখ্যা কমিয়াছে; (২) প্রতিবৎসর প্রভূত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে এবং (৩) জনসাধারণ শরীর গঠনের দিক হইতে হ্রাসমান খাদ্য পরিমাণের সহিত নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতেছে। ১৯৪৪-৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের ভাষায়, "এই সম্ভাবনা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খাদ্যের নিকৃষ্টতার দরুণ গড় উচ্চতা ও ওজন হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ মাথাপিছু

খাদ্য সরবরাহের হ্রাসমান পরিমাণের সহিত শারীরিক সংযোজনের প্রক্রিয়া ঘটিয়াছে। জনসংখ্যা খাদ্য পাইতেছে বটে কিন্তু নিকৃষ্ট স্তরের। অল্প পুষ্টি ও পুষ্টিহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে।" ["The possibility may also be mentioned that average height and weight have fallen as a result of deterioration in diet, i.e. that there has been a process of physical adaptation to a decreasing per capita food supply...The population is indeed being fed but fed at a low level. Under-nutrition and malnutrition are widespread."]

পনের হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স্কা নারীর—অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রজননক্ষম বয়সের নারীর সংখ্যা-বৃদ্ধি দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে ভবিষ্যতেও ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ ভাবেই ঘটিতে থাকিবে। অবিভক্ত ভারতের জন্য অধ্যাপক ফিশার (Prof. R. A. Fisher) হিসাব করিয়াছিলেন যে ১৯৬৫-৭০ সালে উহার জনসংখ্যা ৫০ কোটি দাঁড়াইবে। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির জনসংখ্যা সম্পর্কিত সাব কমিটিও প্রায় অনুরূপ হিসাব করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫১ সালে দশ বৎসরের পূর্ব্বেকার তুলনায় জনসংখ্যা শতকরা ১৩'৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন; ভারতের ভূতপূর্ব্ব কৃষিকমিশনার ডাঃ বার্নস ভারতে কৃষিসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তাহা একাধিক কৃষিসামগ্রীর ক্ষেত্রে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন। জাতীয় সরকার দেশকে যথাশীঘ্র সম্ভব খাদ্যসামগ্রীতে আত্মপর্য্যাপ্ত করিবার জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু এ সম্পর্কে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। খাদ্যশস্য ও জনসংখ্যার মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য আনিবার জন্য খাদ্যশস্যের বৃদ্ধি যেরূপ প্রয়োজন, জনসংখ্যার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করাও সেইরূপ প্রয়োজন।

ভারত কি অতি-জনাকীর্ণ?—Is India Over-populated?

Q. How far is it true to say that over-population is the main cause of India's poverty? (B. A. 1936; '40). "The problem of population is not one of mere size but of efficient production and equitable distribution." Explain (B. Com. 1938). "A rapidly growing population is the most fundamental obstacle

to economic progress in India." (B. Com. 1950). Under what conditions could a country be said to be over-populated? Is India over-populated? (Delhi, 1952) What do you understand by the term over-population? Is India over-populated? Give reasons for your answer. (B. Com. 1955)

একশত বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি; অবিভক্ত ভারতে ১৯৪১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৯ কোটি। বর্ত্তমান ভারতেই ১৯৫৭ জনসংখ্যা ৩৭ কোটির উপর। এই বিপুল জনসংখ্যার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের মান অত্যধিক নিচু; যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালে ভারতবাসীর বাৎসরিক গড় মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫–৭০ টাকার মতন। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে ১৯৫০-৫১ সালে এদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ২৫৪৲ টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ২৮১ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহা কিন্তু ভারতবাসীর অতিশয় নিচু জীবন যাত্রার মান সূচনা করে। আমাদের দেশে জন্মের হারও অধিক, মৃত্যুর হারও কিছু কম নহে। দেশে খাদ্যসামগ্রীর একান্ত অভাব; যে অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। পুষ্টিহীনতা অতিশয় ব্যাপক।

এই সকল কারণে একাধিক অর্থনীতিবিদ্ অভিমত দিয়াছেন যে ভারত জনাধিক্যের দ্বারা প্রপীড়িত, ভারতের দারিদ্র্যের দ্বারা এই জনাধিক্যই প্রমাণিত হয় এবং এই জনাধিক্যই হইল ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। অধ্যাপক কারসণ্ডার্স বলেন যে মালথাসের দ্বারা বর্ণিত অবস্থা ভারতে প্রত্যক্ষ করা যায়।

কিন্তু ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে জনাধিক্যের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিলে ভুল হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সেই অনুপাতে যদি সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলেই দারিদ্র্য আসিবে। সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও জাতীয় আয় (National Income) বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দারিদ্র্যের পরিবর্ত্তে স্বাচ্ছল্য ঘটিতে পারে।

আমাদের দেশে সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টাই করা হইয়াছে—যে পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করা সম্ভব তাহা উৎপাদিত হইয়াছে অথচ মাথা পিছু আয় কম,—ইহা প্রতিপন্ন করা সম্ভব নহে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধির দুইটি উৎস হইল কৃষি এবং শিল্প। কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির এখনও প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ

কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদিত হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টা সাধনের দ্বারা তাহা বিশেষ ভাবেই বৰ্দ্ধিত করা যাইতে পারে। প্রয়োজন হইল, কৃষি উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি সাহসিকতাপূর্ণ পরিকল্পনা এবং উহা কার্য্যকরী করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প। শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। শিল্প সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান অষ্টম। কিন্তু ভারতে যে পরিমাণ শিল্প সম্ভাবনা আছে সে তুলনায়, শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছে খুবই কম। ভারতে বিপুল পরিমাণ শ্রমিক আছে, কাঁচা মাল আছে প্রভুত (কৃষির উন্নতির দ্বারা যেটুকু নাই সেটুকুও পাওয়া সম্ভব) এবং দেশের মধ্যেই বিস্তীর্ণ বাজার আছে। পুঁজি যাহা আছে তাহাও নগণ্য নহে—উহার উপরেও যে পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন তাহা বাহির হইতে আনিতে পারা যায়। পুঁজি সামগ্রী (capital goods) এবং যন্ত্রকুশলীর (technician) আমদানীর দ্বারা দেশকে অতিক্রত শিল্প সমৃদ্ধ করা যাইতে পারিবে। মোট কথা দক্ষ উৎপাদন, অর্থাৎ অধিক উৎপাদন, প্রয়োজন।

কিন্তু নিছক অধিক উৎপাদনের দ্বারা উহার অনুপাতেই গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ জাতীয় আয়ের অধিকাংশই যদি মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া যায় তাহা হইলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির অনুপাতে সাধারণের জীবনে সমৃদ্ধি ঘটিবে না। উহার জন্য প্রয়োজন যে উৎপাদিত সম্পদ যাহাতে ন্যায় সঙ্গত পরিমাণে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে উহা ন্যায় সঙ্গত পরিমাণে জনসাধারণ লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিক উৎপাদনের আয়োজন এবং উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায় সঙ্গত বণ্টন—ইহা যদি ঘটে তাহা হইলে ৩৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ভারতেও মাথাপিছু আয় বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। মাথাপিছু আয় যে দেশে বৰ্দ্ধিত হইতে পারে—হইবার প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে—সে দেশে দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করিয়া একটি জনাধিক্যের মতবাদ প্রচার বিভ্রান্তিকর।

অধ্যাপক সেলিগম্যান বলেন, "জনসংখ্যার সমস্যা নিছক সংখ্যার সমস্যা নহে—ইহা দক্ষ উৎপাদন এবং ন্যায় সঙ্গত বণ্টনের সমস্যা।"

[Q. Outline a population policy for India in the light of the future economic development of the country? (W. B. C. S. 1953)]

কিন্তু তবুও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বর্ত্তমানে আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া থাকেন। যে ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে উহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী বলিয়াই অভিমত প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই অভিমতও অগ্রাহ্য করিবার নহে। ইহার কারণ হইল যে অধিক উৎপাদন এবং

উপযুক্ত বণ্টনের দ্বারা মাথাপিছু আয় বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় বটে কিন্তু উহা হইল দীর্ঘ-কালীন ব্যবস্থা। জনসংখ্যার সহিত শুধু খাদ্যদ্রব্যেরই নহে সকল প্রকার উৎপাদিত সম্পদের তুলনা করা বিধেয় ইহা সত্য; ইহাও সত্য যে শুধু খাদ্যশস্যই নহে, সকল প্রকার সম্পদের বৃদ্ধির দ্বারাই জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয় এবং সেহেতু মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু আমাদের দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি এরূপ পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে যাহাতে ভবিষ্যতে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উপলব্ধির পক্ষে উহা প্রবল অন্তরায় হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। জনসংখ্যার যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে স্বাস্থ্য-সম্মত এবং বুদ্ধি-সম্মত জীবন যাপন ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কৃষি ও শিল্পের পরিপূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ,—বহু পরিশ্রম ও ধৈর্য্যসাপেক্ষ। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অপ্রচুর খাদ্য সঙ্গতির চাপ বৃদ্ধি করিতেছে, শিক্ষাহীন ও স্বাস্থ্যহীন জীবন যাপনে জনগণকে বাধ্য করিতেছে—মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যে অধিক বৃদ্ধি প্রয়োজন তাহাও পিছাইয়া যাইতেছে।

সেই কারণে মেলিথসের তত্ত্ব স্বীকার করিলেও, ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। আসল কথা, খাদ্য সঙ্গতির উপর জনসংখ্যার চাপ হইল আশু সমস্যা এবং আরও সমস্যা হইল সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক হইতে সক্ষম করিয়া তোলা। "বিশ্ব স্বাস্থ্য সঙ্ঘের"[2] (World Health Organisation) পরামর্শদাতা ডাঃ এব্রাহাম ষ্টোন কলিকাতায় রোটারী ক্লাবে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ৩০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশ্বের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত মন্থর এবং ক্রমিক (Slow and gradual)। বিগত তিনশত বৎসরের মধ্যে (পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত অল্প সময়) পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৫০ কোটি হইতে ২২৫ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গতি এবং খাদ্য সরবরাহ যদি উহার সহিত তাল রাখিতে পারিত তাহা হইলে উহা আনন্দেরই বিষয় হইত। বর্ত্তমানে কিন্তু মানবিক উর্ব্বরতার বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার উর্ব্বরতার হ্রাস ঘটিতেছে। এই সমস্যার সমাধান হইল সকল উপায়ে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা করা, দ্বিতীয়তঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা (family planning) করা। "আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে কিছুটা জৈব পরিকল্পনা থাকিতেই হইবে।" ["We have to plan for our social and economic developments. But in our social planning there must also be certain amount of biological planning"—Dr. Abraham Stone]

পরিবার পরিকল্পনা ("পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা")—Family Planning ("Five-year Plan")

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন পোস্তের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবেই বলিয়াছিলেন। ঐ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তাঁহারা একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিশন বলিয়াছিলেন যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা হইল একটি অত্যাবশ্যক কার্য্য। ঐ উদ্দেশ্যে অল্পকালীন ব্যবস্থা হইবে জনসাধারণকে বংশ বৃদ্ধি রোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পকে সচেতন করিয়া তোলা। জন্ম নিয়ন্ত্রণের কার্য্যক্রমকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করিতে হইবে—উহাতে স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেক পরিবারের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে। সাব কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন (১) স্বাস্থ্যের কারণে প্রয়োজন হইলে, রাষ্ট্র জন্ম-নিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিবে এবং সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংসের ব্যবস্থাও প্রদান করিবে; (২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে যাহাদের প্রয়োজন হইবে তাহাদিগকেও রাষ্ট্র ঐ পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করিবে, (৩) আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য উপায়ে, রাষ্ট্র জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবেষণার এবং তথ্য সরবরাহের কেন্দ্র সংগঠনে উদ্যোগী হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে পরিবার পরিকল্পনার কর্ম্মসূচীকে জোরালো করিয়া তুলিবার জন্য এবং জনসংখ্যার সমস্যা ক্রমাগত ও সুসমঞ্জসভাবে পর্য্যালোচনার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করিতে হইবে। বৃহৎ সহর এবং অন্যান্য নগরাঞ্চলগুলিতে ক্লিনিক স্থাপন করা হইবে—দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৩০০টি সহরাঞ্চল ক্লিনিক এবং ২,০০০টি গ্রাম্য ক্লিনিক স্থাপন করা হইবে।

সারাংশ

মোট জনসংখ্যা—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং আসামের খ-শ্রেণীর পার্ব্বত্য অঞ্চল ধরিলে বর্ত্তমান ভারতের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ কোটি ১৯ লক্ষ। ইহা সমগ্র পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার ৭ ভাগের ১ ভাগ।

গ্রামাঞ্চল এবং সহরাঞ্চল বণ্টন—বর্ত্তমান ভারতে ১৯৫১ সালের

হিসাব অনুযায়ী মোট লোকসংখ্যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এবং সহরাঞ্চলের অধিবাসী হইল যথাক্রমে শতকরা ৮২'৬ ভাগ এবং ১৭'৪ ভাগ। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যার আধিক্য দেশের কৃষি নির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে এবং প্রগতির অভাবের সাক্ষ্য দেয়।

উপজীবিকা অনুসারে বণ্টন—মোট লোকসংখ্যার মধ্যে ৬৯'৮ শতাংশ হইল কৃষি নির্ভরশ্রেণী এবং ৩০'২ শতাংশ হইল অন্যান্য শ্রেণী। এই অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে শিল্প নির্ভর লোকসংখ্যার অনুপাত হইল মোট লোকসংখ্যার ১০'৬ শতাংশ। জনসংখ্যার মধ্যে কৃষি নির্ভর অংশের আতিশয্য এবং শিল্প-নির্ভর অংশের স্বল্পতা অনগ্রসর অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিফলন কারণ শিল্পের ন্যায় কৃষি উৎপাদন ততটা নিশ্চিত নহে এবং ততটা লাভজনকও নহে।

জন্মহার—ভারতে জন্মহার হাজার পিছু ৪০ (প্রতি বৎসর); প্রগতিশীল দেশের তুলনায় ইহা যথেষ্ট বেশী। ইহার কারণ আমাদের দেশে (১) যৌবনাগম হয় অল্প বয়সে, (২) লোকের জীবন যাত্রার মান নিচু, (৩) উপার্জ্জনের পর বিবাহ করা উচিত এই নীতি পালিত হয় না। সুখের বিষয় অবিভক্ত ভারতের তুলনায় ভারত প্রজাতন্ত্রের জন্মহার হ্রাস পাইতেছে।

মৃত্যুহার—এদেশে মৃত্যুহার হাজার পিছু ২৭ (প্রতি বৎসর)। প্রগতিশীল অন্য অনেক দেশের তুলনায় মৃত্যুহারও যথেষ্ট বেশী। ইহার কারণ (১) অত্যল্প আয় ও দারিদ্র্য, (২) জীবনযাত্রার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, (৩) পুষ্টিহীনতা, সুতরাং রোগ প্রতিরোধের অক্ষমতা। সুখের বিষয় মৃত্যুহার কয়েক বৎসর যাবৎ কমিতেছে। শিশু মৃত্যুর হারও অনেক বেশী,—বৎসরে প্রতি হাজারে ১২৪।

বসতি ঘনত্ব—ইহার অর্থ হইল গড়ে প্রতি বর্গ মাইলের লোক সংখ্যা। সমগ্র ভারতের বসতি ঘনত্ব হইল ৩১২, পশ্চিমবঙ্গে ৮০৬। বিভিন্ন অঞ্চলের বসতি ঘনত্বে অনেক পার্থক্য আছে। বসতি ঘনত্বে এই পার্থক্য নির্ভর করে যে সকল বিষয়ের উপর সেগুলি হইল (১) আবহাওয়ার প্রকৃতি (অত্যধিক শীত না গ্রীষ্ম) (২) জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা (৩) বৃষ্টিপাত (৪) জলসেচ (৫) স্বাস্থ্যকর স্থান কিনা (৬) শিল্পাঞ্চল কিনা।

জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহ—আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এদেশের জনসংখ্যা তিনগুণ হইয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ২৫ শতাংশ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১০ শতাংশ। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হিসাবে সাধারণ সময়েই ভারতে

১২ শতাংশের মতন খাদ্যাভাব থাকে এবং স্যার বয়েড ও'র বলিয়াছেন যে সাধারণ সময়েই ভারতের শতকরা ৩০ ভাগ লোক যথেষ্ট আহার্য্য পায় না। পুষ্টি বিশারদ এ্যাক্রয়েড বলিয়াছেন যে এদেশে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য-ঘাট্‌তির পরিমাণ ১½ কোটি টন। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে প্রচুর খাদ্য ঘাট্‌তি ছিল। যুদ্ধের পরে এই ঘাট্‌তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইতিমধ্যে জনসংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই বর্দ্ধিত জনভার দেশ বহন করিয়াছে। বরং মৃত্যুহার কমিয়াছে; কারণ (১) স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, (২) বাহির হইতে খাদ্য আমদানী (৩) হ্রাসমান খাদ্য পরিমাণের সহিত শারীরিক গঠনের সামঞ্জস্য বিধান। তবে ভবিষ্যতেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে ইহা নিশ্চিত, সুতরাং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে: (১) অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন এবং (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রয়োজন।

ভারত কি অতি জনাকীর্ণ—কতিপয় বিষয় লক্ষ্য করিলে ভারত অতি জনাকীর্ণ বলিয়া মনে হয়। প্রথম, জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, অত্যল্প মাথাপিছু আয় (ইহার দ্বারা নিচু জীবনযাত্রার মান সূচিত হয়), তৃতীয়, জন্মহার ও মৃত্যুহারে আধিক্য; চতুর্থ, আনুপাতিকভাবে খাদ্য উৎপাদণের বৃদ্ধি না ঘটা।

কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাত্রই জনাধিক্য নহে। উহার সহিত সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা জনাধিক্য ঘটিবে না। এদেশে সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয় নাই—সুতরাং শুধু জনসংখ্যারই একতরফা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কিন্তু শিল্প এবং কৃষি—সম্পদ সৃষ্টির এই দুইটি প্রধান বিষয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। সম্পদ উৎপাদন যদি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং উহার সহিত যদি উৎপাদিত সম্পদের সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু এই বৃদ্ধি সময়-সাপেক্ষ। সেই কারণে ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি এবং ইহার সমস্যা সমূহ
Agriculture and its Problems

ভারতের কৃষির গুরুত্ব—Importance of Indian Agriculture

কৃষিকার্য্য হইল ভারতের মোট লোকসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের উপজীবিকা। মোট জনসংখ্যার এত অধিক অংশের নির্ভরতা থাকার দরুণ আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষিকার্য্যের সমধিক গুরুত্ব। কৃষির সাফল্য এবং অসাফল্যের উপর শুধুই যে জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের আর্থিক অবস্থার উত্থান পতন নির্ভরশীল তাহাই নহে, উহার সহিত পরোক্ষভাবে সমগ্র জনসমষ্টির আর্থিক ভাগ্য জড়িত। কৃষকের আয়ের উপর জনসাধারণের অন্যান্য অংশের আয় এবং সরকারের রাজস্ব বহুপরিমাণে নির্ভরশীল। কৃষিকার্য্যের দ্বারা আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার খাদ্যই আমরা উৎপাদন করিয়া থাকি। কৃষিজাত সামগ্রীর দ্বারা আভ্যন্তরীণ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। উপরন্তু আমাদের বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষিজাত সামগ্রীর সমধিক প্রাধান্য। বিদেশ হইতে আমরা যে সকল সামগ্রী আমদানী করিয়া থাকি, তাহার দরুণ মূল্যের অধিকাংশই আমরা কৃষিজাত সামগ্রী বাহিরে প্রেরণ করিয়া প্রদান করিয়া থাকি।

ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপর্য্য **ফিসক্যাল কমিশন** এইরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন: "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতে উন্নয়নমূলক কোন নীতি গ্রহণ কালে দেশের জীবনে এবং অর্থনীতিতে কৃষিকার্য্যের মৌলিক তাৎপর্য্য সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু, কৃষি নিছক একটি পেশাই নহে—ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু কোটি ব্যক্তির চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করিয়াছে এইরূপ একটি জীবন দর্শন। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপর্য্য ইহা অপেক্ষাও গভীরতর কারণ কৃষির যুক্তিসিদ্ধ সম্প্রসারণ এবং শিল্পোন্নয়ন পরস্পরের সহিত গভীরভাবে জড়িত এবং সংযুক্ত ভিত্তিতেই ইহাদের পরিকল্পনা প্রয়োজন।"

প্রধান কৃষিজাত ফসল—Chief Agricultural Crops

বিভিন্ন প্রকারের কৃষিজাত সামগ্রী আমাদের দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইগুলিকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, খাদ্যশস্য, দ্বিতীয়তঃ, তন্তুময় উদ্ভিদ্, তৃতীয়তঃ, তৈলবীজ, চতুর্থতঃ, ভেষজ ও পানীয় উপাদান।

(১) *খাদ্যশস্য*—**Food crops**

Q. Give a critical estimate of the food resources of India. Discuss in the connection how this country's food economy has been affected by Partition (B. A. 1949)

(ক) *চাউল*—সমগ্র পৃথিবীতে মোট উৎপাদিত চাউলের মধ্যে অর্দ্ধেক পরিমাণ চাউলের উৎপাদন ভারতেই হইত। অবিভক্ত ভারতে মোট কৃষিভূমির শতকরা ৩০ ভাগ চাউল উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। প্রায় সাড়ে সাত কোটি একর জমিতে বৎসরে প্রায় আড়াই কোটি টন চাউল উৎপন্ন হইত। দেশ বিভাগের পরে পাকিস্থানের অংশে পড়িয়াছিল প্রায় ৮০ লক্ষ টনের মত উৎপাদন। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে চাউলের উৎপাদন হইয়াছে সাড়ে সাত কোটি একর জমিতে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টন—অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের সমান। ধান চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু আবশ্যক। সেই জন্য দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্ব্ব ভারতেই ধান চাষ করা হইয়া থাকে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে ধান চাষ হইয়া থাকে। মে হইতে আগষ্ট মাসের মধ্যে যে ধান বপন করা হয় এবং শীতকালে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয় তাহাকে বলা হয় আমন ধান। ইহা ভিন্ন আউস ও বোরো, এই দুই প্রকার ধানও আছে। তবে মোট উৎপাদিত ধানের মধ্যে আমন ধানের উৎপাদনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

(খ) *গম*—কৃষিজ সামগ্রীর মধ্যে চাউলের পরেই গমের স্থান। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও শীতল জলবায়ুতে ইহা ভাল জন্মায়। অবিভক্ত ভারতে গম চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৪১ লক্ষ একর এবং উহাতে গমের উৎপাদন হইত ৩৫ লক্ষ টন। সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মধ্যে ইহা ছিল শতকরা ২০ ভাগ। বর্ত্তমানে ১৯৫৫-৫৬ সালে গমের উৎপাদন হইয়াছে অনুমান করা হয় ৮৫ লক্ষ টন। ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল ৮৫ লক্ষ টন। বর্ত্তমানে গম চাষের এলাকা প্রায় ২½ কোটি একর।

ভারতের পূর্ব্ব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই এবং রাজপুতানায় এবং পাকিস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে গম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ২½ কোটি একর জমিতে ৬৫ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়।

(গ) *ইক্ষু*—ইক্ষুর চাষের জন্য প্রচুর জল এবং উষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন; সেই কারণে উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতেই প্রধানতঃ ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। অবিভক্ত ভারতের ৪০ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইত এবং ইহা হইতে ৫০

লক্ষ টন গুড় পাওয়া যাইত। অবিভক্ত ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইক্ষু উৎপাদন হইত।

অবিভক্ত ভারতের মোট উৎপাদনের মধ্যে দেশ বিভাগের দরুণ ভারতের অংশে পড়ে শতকরা সাড়ে চুরাশি ভাগ এবং পাকিস্থানের অংশে শতকরা সাড়ে পনর ভাগ। ভারতে উহা উৎপন্ন হয় পূর্ব্ব পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই ও আসামে। পাকিস্থানে উৎপন্ন হয় পুর্ব্ববঙ্গে। বর্ত্তমানে ভারতে ৩৫।৩৬ লক্ষ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদন হইয়াছে ৫৫ লক্ষ টন গুড়।

(ঘ) **নীবার ও ভুট্টা**—জোয়ার ও বজরা এই দুই প্রকারের নীবার (millets) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ভারতের লোকসংখ্যায় প্রায় এক তৃতীয়াংশের খাদ্য এবং পরিমাণের দিক হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে ইহার স্থান তৃতীয়। অবিভক্ত ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি একর পরিমিত জমিতে জোয়ার ও বজরার চাষ হইত এবং উৎপাদন হইত বৎসরে ৭০ লক্ষ টন। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে ভুট্টার চাষ হয়।

বর্ত্তমানে পাকিস্থানের অংশ হইল জোয়ার উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ, বজরা উৎপাদনের শতকরা ১২ ভাগ এবং ভুট্টা উৎপাদনের শতকরা ১৮ ভাগ। পাকিস্থানের পশ্চিম পাঞ্জাবে নীবার উৎপন্ন হয় এবং ভারতে উহা উৎপন্ন হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে। বর্ত্তমানে ভারতের জোয়ার ও বজরা চাষের এলাকা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলাকা হইল ৩৬ কোটি একরের উপর এবং উৎপাদন হইল ১৯৫৪-৫৫ সালে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টন।

(ঙ) **ডাইল**—ভারতে বিভিন্ন প্রকার ডাইল উৎপন্ন হয়—এবং প্রায় সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগের খাদ্যের মধ্যে ডাইল অন্তর্ভুক্ত। ছোলা, মুগ, মসুর, মটর, কলাই ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ছোলা ও ডাইল উৎপন্ন হইয়াছে ১ কোটি ৫ লক্ষ টন।

এই সকল খাদ্যশস্য ভিন্নও ভারতে নানাপ্রকার মশলাদ্রব্য উৎপন্ন হয়—যথা লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, গোলমরিচ, জায়ফল ইত্যাদি। আম, জাম, লেবু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ফলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। আলু, পিয়াজ, কপি, বেগুন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ফসলও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশ বিভাগের দরুণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিক হইতে ভারতের প্রভুত ক্ষতি হইয়াছিল। দেশ বিভাগে ভারতের অংশে লোকসংখ্যা পড়িয়াছিল শতকরা ৭৭.৭ ভাগ কিন্তু ধান চাষের জমি পড়িয়াছিল ৭২.৫ ভাগ এবং গম চাষের জমি ৭০ ভাগ। সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলের ৩০ ভাগ পড়িয়াছিল পাকিস্থানের

অংশে ; অবিভক্ত ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সেচব্যবস্থাগুলি উহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উৎকৃষ্ট ধরণের গম উৎপাদনের অঞ্চল অধিকাংশ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে খাদ্য ঘাট্‌তির অন্যতম কারণ এই দেশ বিভাগ। ১৯৪৮ সালে খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছে ২৮ লক্ষ টন, ১৯৪৯ সালে ৩৭ লক্ষ টন, ১৯৫০ সালে ২১ লক্ষ টন, ১৯৫১ সালে ৪৭ লক্ষ টন।* কিন্তু প্রথম পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ভালই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে মোট খাদ্য- শস্যের উৎপাদন ছিল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন, ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদন হইয়াছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টন।

(২) *বাণিজ্য ফসল (বা নগদ ফসল)*—Commercial Crop (or Cash Crop)

Q. Give an account of the commercial crops of India at present.

State the regional distribution of the more important commercial crops of India. Consider in this connection how Partition has affected India's position as a source of agricultural raw materials (B. A. 1951)

(ক) **তুলা**—তুলা উৎপাদনের দিক হইতে অবিভক্ত ভারতের স্থান ছিল পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। তুলা চাষের জমি ছিল ২ কোটি একরেরও অধিক এবং উৎপাদন ছিল ৪০ লক্ষ গাঁইট। ছোট আঁশযুক্ত তুলার পরিমাণই ছিল অধিক ; লম্বা আঁশযুক্ত তুলা (যাহার দ্বারা সুক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করা হয়) বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। দেশ বিভাগের পর তুলা উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগ পাকিস্থানের অংশীভূত হয় ; ইহার মধ্যে অধিকাংশই লম্বা আঁশযুক্ত ; এই ধরণের তুলা উৎপাদনে পাকিস্থানের অংশ ভারতের প্রায় দ্বিগুণ। পাকিস্থান সৃষ্টি ব্যতীতও নানা কারণে ভারতে তুলা উৎপাদন সাম্প্রতিক কালে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে কাঁচা তুলার উৎপাদন ছিল ২১ লক্ষ ৮৮ হাজার গাঁইট কিন্তু পরে নানাবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা উহার উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে তুলার উৎপাদন হইয়াছে ৪৩ লক্ষ গাঁইট—অর্থাৎ দেশ বিভাগের সময়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। আরও একটি সুখের বিষয় হইল, মোট উৎপাদনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধরণের তুলার অনুপাত বৃদ্ধি ; ১৯৪৭-৪৮ সালে লম্বা, মাঝারি ও ছোট আঁশযুক্ত তুলার (long, medium and short staple cotton) অনুপাত ছিল মোট উৎপাদনের যথাক্রমে ১৫, ৫১ ও ৩৪ শতাংশ ; ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা যথাক্রমে ৩৭, ৪৪ ও ১৯

*পরিসংখ্যা প্ল্যানিং কমিশন দ্বারা প্রদত্ত।

শতাংশে পরিণত হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ, 'পূর্ব্ব পাঞ্জাব, বরোদা, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানে তুলা উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ মাটি অঞ্চল তুলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ ভাবেই উপযোগী।

(খ) *পাট*—পাট ছিল অবিভক্ত ভারতের একচেটিয়া উৎপাদন—তখন সমগ্র ভারতে পাট উৎপাদন হইত মোট ২ কোটি একর জমিতে। উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বৎসরে ১২৫ লক্ষ গাঁইট; ইহার মধ্যে ৬৫ লক্ষ গাঁইট বিদেশে রপ্তানী হইত এবং ৬০ লক্ষ গাঁইট দেশের মিলগুলিতে ব্যবহৃত হইত। অবিভক্ত ভারতে মোট রপ্তানীর মধ্যে পাট রপ্তানী ছিল ২০।২৫ ভাগ। দেশ বিভাগের পর ভারতকে পাট সম্পর্কে বিশেষ অসুবিধাতেই পড়িতে হইয়াছিল। ভারতের পক্ষে উৎপাদনের অংশ পড়িয়াছিল মাত্র ১৭ লক্ষ গাঁইট—পাট উৎপাদক অঞ্চলের অধিকাংশই পড়িয়াছে পাকিস্থানে।* দেশের অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব অত্যধিক বিধায় সরকার দেশের মধ্যে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যত্নবান হইয়াছেন। পাটের মূল্যবৃদ্ধিও উহার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে পাট চাষের জমি সাড়ে ছয় লক্ষ একর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া চৌদ্দ লক্ষ একর হইয়াছিল এবং ১৯৫১-৫২ সালে উহা হইয়াছিল সাড়ে উনিশ লক্ষ। ১৯৫০ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ৩৩ লক্ষ গাঁইট।* পরবর্ত্তী দুই বৎসর পাট উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে উৎপাদন ছিল ৪৬ লক্ষ ১০ হাজার গাঁইট এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে উৎপাদন হইয়াছে ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার গাঁইট। ইহার প্রধান কারণ পাটের মূল্য হ্রাস এবং বন্যা ও পতঙ্গের জন্য ক্ষতি।** সরকার নানাভাবেই কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন—যথা অর্থদান, ঋণদান, সার সরবরাহ, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ। বারাকপুরে উৎপাদিত ১৯৭ মন উৎকৃষ্ট বীজ বিভিন্ন রাজ্যের (states) মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতে পাট উৎপাদন অঞ্চল হইল পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪০ লক্ষ গাঁইট উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

(৩) *তৈলবীজ*—(Oil seeds)

পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তিল, রেড়ি, সরিষা, তিসি, চীনাবাদাম, তুলাবীজ—প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজ এইস্থানে জন্মে। এই সমুদয় নিষ্পেষণ হইতে তৈল পাওয়া যায় এবং

*Progress Report of Five Year Plan (September, 1954)

**কলিকাতায় সেন্ট্রাল জুট কমিটির ত্রিংশ অধিবেশনে সর্দ্দার দাতার সিং কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ হইতে এই পরিসংখ্যা গৃহীত হইল।

অবশিষ্টাংশ জমির সার এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন তিল ও চীনাবাদামের অর্দ্ধেক, সরিষা ও তুলা বীজের এক তৃতীয়াংশ, মসিনারের এক চতুর্থাংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত রেড়ি ও তিসি যথেষ্ট পরিমাণেই ভারতে উৎপন্ন হয়। তৈল আহরণযোগ্য প্রচুর পরিমাণ নারিকেলও এই স্থানে উৎপন্ন হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সকল বীজ উৎপন্ন হয়—যথা মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব। অবিভক্ত ভারতের মোট রপ্তানীর মধ্যে প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ থাকিত তৈলবীজ।

দেশ বিভক্ত হইবার পরেও তৈলবীজের দিক হইতে ভারতের সঙ্গতিতে বিশেষ পার্থক্য ঘটে নাই। পাকিস্থানে তৈলবীজ উৎপাদনের অংশ অতি অল্প; পূর্ব্ব পাকিস্থানে কিছু পরিমাণ নারিকেল ও সরিষা এবং অন্যান্য পাকিস্থান প্রদেশে কিছু পরিমাণ রেড়ি উৎপন্ন হয়। তুলাবীজও পাকিস্থানে উৎপন্ন হয়। ভারতে প্রধান তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে ১৯৫৩-৫৪ সালে ৫৩ লক্ষ টন এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫৯ লক্ষ টন।

(৪) *পানীয় ও ভেষজ*—(Beverages and Drugs)

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পানীয় দ্রব্যের—অর্থাৎ চায়ের উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। পর্ব্বতের ঢালুদেশে এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে জলবায়ু উষ্ণ এবং আর্দ্র এবং প্রচুর সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায়—সেই সকল স্থানই চা উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী। ভারতে চা উৎপাদনের প্রধান এলাকা হইল উত্তর ভারতের আসাম, দার্জ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার (Dooars) অঞ্চল। আট লক্ষ একরেরও অধিক জমি চা উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এবং ৫০ কোটি পাউণ্ড চা প্রতিবৎসর উৎপন্ন হয়। মোট উৎপাদনের প্রায় তিনচতুর্থাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পাকিস্থানে শ্রীহট্টে চা উৎপন্ন হয়।

কফি উৎপাদনও ভারতে হইয়া থাকে। মাদ্রাজ, কুর্গ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে কফি উৎপন্ন হয়। বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহার মধ্যে অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়।

ভেষজ সামগ্রীর মধ্যেও অনেকগুলি ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমগ্র পৃথিবীর তামাক উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ ভারতে উৎপন্ন হয়। তামাক উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ৬ লক্ষ টন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়, তবে বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা, বিহার, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে।

সিনকোনা এবং অহিফেনের চাষও আমাদের দেশে হইয়া থাকে। সরকারের একচেটিয়া কারবাররূপে সিনকোনা উৎপাদন হইয়া থাকে—ইহা উৎপন্ন হয়

দার্জিলিং এবং নীলগিরি পর্ব্বতে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও মালাবারে গাঁজা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কৃষির অনগ্রসরতা এবং ইহার কারণ—Agricultural Backwardness and its Causes

Q. State briefly the chief causes of the low productivity of agriculture in India. (B. A. 1946). Discuss the main features of agriculture in Bengal (B. Com. 1938).

কৃষি উৎপাদনের স্বল্পতা

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ—এই দেশের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণে কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং অবনতির সহিত ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতি গভীরভাবে জড়িত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে অন্যান্য কতিপয় দেশের সহিত তুলনা করিলে ভারতের কৃষিকার্য্যের, অনগ্রসরতা অনুভব করিতে হয়—একাধিক কৃষিসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেই এই অনগ্রসরতা বিশেষভাবে প্রকটিত। এখানে কৃষি-সামগ্রীর উৎপাদন যে খুব কম হয় তাহা নহে, তবে বিভিন্ন দেশে সমপরিমাণ জমির হিসাবে কত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার তুলনার দ্বারাই কোন্ দেশ কৃষিকার্য্যে কি পরিমাণে অগ্রসর তাহা বুঝা যায়। ভারত ও পাকিস্থানে মিলিত ভাবে পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভারতেই হউক বা পাকিস্থানেই হউক, একর প্রতি জমিতে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় পৃথিবীর অপর অনেক দেশে তাহা অপেক্ষা সমপরিমাণ জমিতে অধিক চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে প্রতি একর জমিতে ৭২৯ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয় কিন্তু চীনদেশে উৎপন্ন হয় ১,৪০০ পাউণ্ড, মিশরে ১,৮৪৫ পাউণ্ড, জাপানে ২,১২৪ পাউণ্ড এবং ইতালিতে ২,৭৯৭ পাউণ্ড। গম উৎপাদনের পরিমাণ এক একর জমিতে ৭১৩ পাউণ্ড; চীনদেশে উহা ৮৯৮, জাপানে ১,৭১৩ এবং মিশরে ১,৯২৮ পাউণ্ড। অন্যান্য অনেক খাদ্যশস্য (Food crops) এবং নগদ শস্যের (Cash crops) পক্ষেও একই কথা প্রযোজ্য।* ভারতের কৃষির এই অনগ্রসরতার দরুণ দেশের সমগ্র অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত। এই অনগ্রসরতার

*১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে ভারতের প্রধান কৃষিজাত ফসলের একর-প্রতি গড় উৎপাদন হইল নিম্নরূপ : চাউল—৭২৯ পাউণ্ড ; তামাক—৬৪৬ পাউণ্ড

জোয়ার—৪৭৯ ,,	চীনে বাদাম - ৬৭৭ ,,
বজ্‌রা—২৯১ ,,	রেড়ী—১৯৭ ,,
গম—৭১৩ ,,	পাট—৯৯১ ,,
আখ—৩১৫৯ ,,	তুলা— ৯২ ,,

কারণ সমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে উৎপাদনে কার্য্যকরী বিভিন্ন উপাদানগুলির সহিত এই কারণ সমূহ জড়িত রহিয়াছে।

(ক) **জমি**—কৃষিকার্য্যের জন্য যথাযোগ্য জলসরবরাহ একান্তই প্রয়োজন কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জমিতে সন্তোষজনক জল-ব্যবস্থা নাই—অনেক ক্ষেত্রে বর্ষা নিয়মিতভাবে হয় না; কোথাও বা অনাবৃষ্টি কোথাও বা অতিবৃষ্টি। অনাবৃষ্টি পরিপূরণের জন্য যে জলসেচ ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে; অতিবৃষ্টির প্রতিবিধানের জন্য জল নিকাশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। দ্বিতীয়তঃ, জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা (subdivision and fragmentation of land) উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্যের গুরুতর অন্তরায়। চাষের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত (খণ্ডীকরণ) এবং একজন চাষীর চাষের জমি একই স্থানে একত্রিত ভাবে থাকে না—বিভিন্নদিকে ছড়াইয়া থাকে (অসম্বদ্ধতা)। ইহা দ্বারা কৃষিকার্য্যে উন্নত ধরণের ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ অসম্ভব হয়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন কারণে জমির স্থায়ী উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়া উঠে না। রাসায়নিক সার ব্যবহারের পদ্ধতি একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। দরিদ্র কৃষকদিগের পক্ষে সহজলভ্য সার, অর্থাৎ গোময়, অনুৎপাদক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া যায়। চতুর্থতঃ, বহুপরিমাণ জমি আছে যাহা বর্ত্তমানে চাষ করা হয় না কিন্তু যেগুলি সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করিলে উহারা চাষযোগ্য হইতে পারে। ভারতে মোট প্রায় ৭২ কোটি ৮৩ লক্ষ একর জমির ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে চাস করা যায় অথচ চাষ করা হয় নাই এরূপ জমি হইল প্রায় ১৮ কোটি একর। ইহার মধ্যে ৬ কোটি ৮১ লক্ষ একর হইল বর্ত্তমানে ফেলিয়া রাখা জমি (current fallows) এবং ১১ কোটি ১৮ লক্ষ একর হইল চাষের মধ্যে আনাই হয় নাই, এরূপ জমি (uncultivated land)।

(খ) **কৃষি শ্রমিক**—কৃষিকার্য্যে যাহাদের মেহনতের উপর নির্ভর করিতে হয় সেই কৃষকদিগের একাধিক ত্রুটি রহিয়াছে এবং তাহাদিগকে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। কৃষকদিগের এই সকল ত্রুটি ও অসুবিধার জন্য, ভারতের কৃষিকার্য্য বিশেষভাবেই ব্যাহত। প্রথমতঃ, শিক্ষা-বিস্তারের অভাবে ভারতের কৃষকগণ অধিকাংশই নিরক্ষর এবং অজ্ঞ—ইহার ফলে তাহারা অধিক মাত্রায় রক্ষণশীল, প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণে তাহারা অক্ষম। চিরাচরিত পদ্ধতি ভিন্ন নূতন কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনে তাহারা বিমুখ। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের দারিদ্র্যের জন্য, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহারা হীনস্বাস্থ্য। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন কারণে তাহারা গভীরভাবে

ঋণজালে আবদ্ধ—ইহা প্রকারান্তরে তাহাদের আয় বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে। ইহাতে তাহাদের কর্ম্মোদ্যম ও কর্ম্মশক্তি উভয়ই ব্যাহত হয়।

(গ) ***পুঁজি***—একজোড়া বলদ একখানি লাঙ্গল এবং কিছু বীজ—ইহাই হইল আমাদের চাষীর একমাত্র পুঁজি—কিন্তু অনেকের ইহাও নাই। প্রতিবৎসর জমির চাষ করিবার জন্য যে চল্‌তি পুঁজি (working capital) প্রয়োজন তাহা বহু কৃষকের নাই। উপরন্তু যদি কোন কারণে কৃষকের কোন থোক্ ব্যয় প্রয়োজন হয়—যথা নূতন বলদ বা লাঙ্গল ক্রয়, তাহা হইলে অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে মহাজনের নিকট ঋণ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। পুঁজির অভাবে দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী কৃষি-উন্নয়নমূলক কোন ব্যবস্থা করা কৃষকদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিবার পদ্ধতি আমাদের দেশে নাই।

(ঘ) ***ব্যবস্থাপনা***—কৃষির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বহু ত্রুটি রহিয়াছে। গতানুগতিক পদ্ধতির দ্বারা কোন ক্রমে কিছু পরিমাণ ফসল উৎপাদন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের মতন কিছু অর্থসংগ্রহ কৃষকদের প্রধান চিন্তা; উন্নত ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বনের বিশেষ কোন প্রয়াস নাই। উপরন্তু জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য উন্নত ব্যবস্থাপনা করিবার অবকাশও থাকে কম। অন্যান্য প্রাণীতে বহু শস্য নষ্ট করে, তাহার যথাযথ প্রতিবিধান করা হয় না। শুধুই যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অব্যবস্থা তাহাই নহে, উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যেও ত্রুটী রহিয়াছে যাহার জন্য কৃষকগণ তাহাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য সংগ্রহে সক্ষম হয় না।

কৃষি উন্নয়ন পদ্ধতি—Methods for Improving Agriculture

Q. Suggest measures by which it (agriculture) can be improved (B. Com. 1938.)

কৃষির উন্নয়নের জন্য উত্তম জলসেচ ব্যবস্থা ও জলনিকাশের ব্যবস্থা প্রয়োজন কারণ জলের অপ্রাচুর্য্য যেরূপ কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর, জল জমায়েতও (water logging) সেইরূপ ক্ষতিকর। জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার প্রতিকার করা প্রয়োজন—ইহা সম্ভব হইবে আইনের দ্বারা এবং সমবায়ের ভিত্তিতে। বিভিন্ন প্রকার সার ব্যবহারের সহিত কৃষকদিগকে পরিচিত করাইতে হইবে, বিশেষ করিয়া রাসায়নিক সার; এবং সরকারী দপ্তর ও সমবায় সমিতির মারফৎ ইহা কৃষককে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষযোগ্য পতিত জমির আবাদ করিলে কৃষিসামগ্রীর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

কৃষকের ত্রুটী ও অসুবিধা সমূহ দুরীভূত না করিলে কৃষির উন্নয়ন সম্ভব নহে। কৃষকের শ্রমের দ্বারা কৃষি—তাহার ঘাম মাটিতে পড়িয়া ফসল উৎপন্ন

করে। তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা প্রগতিশীল ভাবধারার অনুপ্রবেশ করানো প্রয়োজন যাহাতে তাহারা রক্ষণশীলতা অতিক্রম করিতে পারে—কোন কিছু নুতনের ভয়ে ভীত না হয়। ইহাতে তাহারা উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনে প্রণোদিত হইবে। তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি করিতে হইবে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে তাহাদিগের ঋণ জাল হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু সেই সঙ্গেই তাহাদিগকে অল্প সুদে ঋণ প্রদানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে; তাহাদের চল্‌তি পুঁজির প্রয়োজন মিটাইতে হইবে এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থাও যাহাতে তাহারা করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদা ঋণ দানেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইতে হইবে।

উন্নত ধরণের ব্যবস্থাপনার দ্বারা কি ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, তাহার বাস্তব ফলাফল কৃষকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। শস্য যাহাতে পতঙ্গপাল বা অন্যান্য প্রাণীর দ্বারা নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করিয়া শস্যের মূল্যের ন্যায়সঙ্গত অংশ যাহাতে চাষী পায় তাহা দেখিতে হইবে। কারণ উহার দ্বারা চাষীর চাষের উদ্যম বৃদ্ধি পাইবে।

চাষজমির সম্প্রসারণ—Extension of Cultivation

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হইল আরও জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা; অর্থাৎ চাসের এলাকা সম্প্রসারণ করা। কিন্তু প্রাচীন দেশমাত্রেই কৃষি এলাকার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়। আমাদের দেশে মোট ৮১ কোটি ৮ লক্ষ একর জমি আছে; ইহার মধ্যে ৭১ কোটি ৮৩ লক্ষ একর জমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রায় ৭২ কোটি একর তথ্য সংগ্রহযোগ্য জমির মধ্যে ১১ কোটি ৫৬ লক্ষ একর হইল বনভুমি এবং ১২ কোটি ৩ লক্ষ একর হইল কৃষিবহির্ভূত জমি। ফসল ফলানো হয় এরূপ জমির মোট পরিমাণ হইল ৩৩ কোটি ৭৫ লক্ষ একর; কিন্তু উহা ছাড়া ১৭ কোটি ৯৯ লক্ষ একর জমি আছে যাহাতে চাষ হইতে পারে কিন্তু হয় না। ইহার মধ্যে ৬ কোটি ৮১ লক্ষ একর হইল চল্‌তি অনাবাদী জমি (current fallows)—অর্থাৎ এক সময়ে আবাদ হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমানে অনাবাদী রূপে পড়িয়া আছে—এবং ১১ কোটি ১৮ লক্ষ একর হইল অন্যান্য অনাবাদী জমি অর্থাৎ যেখানে পুর্ব্বে চাষ করা হয় নাই কিন্তু হইতে পারে। চলতি অনাবাদী জমিতে কোন না কোন সময়ে চাষ হইয়াছিল এবং পুনরায় হওয়া

অসম্ভব নহে কিন্তু পুরাতন অনাবাদী জমির সবটুকুতে যে চাষ হইতে পারে এবং যেটুকুতে হইতে পারে তাহাতেও যে সহজে হইতে পারিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু চলতি অনাবাদী জমি এবং অন্যান্য অনাবাদী জমি—এই দুইটি মিলিয়া চাষের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা প্রদর্শন করে।

চল্তি অনাবাদী রূপে জমি পড়িয়া থাকিবার একাধিক কারণ থাকে এবং এইগুলির কোন কোনটির মধ্যে বেশ কিছু জটিলতাও থাকে। প্রথমতঃ, এইরূপ জমির উর্ব্বরতা এমন ভাবে ক্ষয় পাইয়া থাকিতে পারে যাহাতে উহার চাষ পোষায় না। দ্বিতীয়তঃ, চাষী শেষ পর্য্যন্ত জলাভাবের সম্মুখীন হইয়া ঐ জমিতে হাল ছাড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ, বহু শরিকের মধ্যে এমন ভাবে বিবাদ বাধিয়াছে যে কেহই আর ঐ জমিতে পুঁজি ঢালিতে সম্মত নহে আবার সকলে একমত হইতে না পারায় জমি অন্য কাহাকে বন্দোবস্তে দেওয়াও সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, জমি এত ক্ষুদ্র এবং মালিকের বাসস্থান হইতে এত দূর যে উহাতে চাষ করা পোষায় না। পঞ্চমতঃ, জমি এরূপ দুরধিগম্য স্থানে অবস্থিত হইতে পারে যেখানে চাষ করা পোষাইলেও ফসল আনিয়া বিক্রয় করিতে অনেক খরচা পড়িয়া যায়। ষষ্ঠতঃ, ব্যাপক কোন রোগের জন্য জমি পরিত্যক্ত হইয়া থাকিতে পারে। ইহা ব্যতীত নানারূপ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য অনাবাদী জমিরূপে যে চাষযোগ্য জমি পড়িয়া রহিয়াছে সেগুলি কোন না কোন কারণে বহুকাল যাবৎ অনাবাদীরূপে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ, বহু অগভীর জলাজমি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, এরূপ দুরধিগম্য স্থানে অবস্থিত থাকিতে পারে যেখানে উন্নত ধরণের পরিবহণ ব্যতীত চাষের প্রচেষ্টা হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এই শ্রেণীর মধ্যে অনেক জমি রহিয়াছে যেগুলি সঠিক বনাঞ্চল না হইলেও ঘন আগাছাযুক্ত। এরূপ জমিতে চাষ সুরু করিবার খরচা অনেক। চতুর্থতঃ, মৃত্তিকাক্ষয়ের জন্য (soil erosion) বহু জমি আছে যেগুলিতে বহু কাল পূর্ব্বেই চাষের প্রচেষ্টা ত্যাগ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, বহুকাল পূর্ব্বে কোন মহামারির সময়ে পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং তদবধি চাষ হয় নাই এরূপ জমিও থাকিতে পারে। ষষ্ঠতঃ, দলিল দস্তাবেজে জমির অস্তিত্ব আছে কিন্তু ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনের দরুণ অকেজো হইয়া গিয়াছে এরূপ জমিও থাকিতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের পতিত জমি যথাসম্ভব পুনরুদ্ধারের দ্বারা চাষের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা বিভিন্ন কারণেই প্রয়োজন। প্রথমতঃ, খাদ্যশস্য বৃদ্ধির প্রয়োজন নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। এমনিতেই যুদ্ধোত্তর যুগে খাদ্যশস্যের যথেষ্ট দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিয়াছিল, প্রথম পরিকল্পনার শেষে অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছিল বটে কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন পুনরায় হ্রাস পাইয়াছে। বস্তুতঃ

পক্ষে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য খাদ্য শস্যের যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় নগদ ফসল (cash crops) আছে আভ্যন্তরীণ শিল্পোন্নতির জন্য যাহাদের চাষবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন, অথচ পুরাতন জমিতে চাষ যতটুকু হইবার হইতেছে ; যথা পাট, তুলা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, কতিপয় বস্তু আছে যাদের চাষের এলাকা বৃদ্ধি করিলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনে যথেষ্ট সহয়তা হইবে যথা বিভিন্ন ধরণের তৈলবীজ। চতুর্থতঃ, পুর্ব্ব পাকিস্থান এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত বহু উদ্বাস্তু হইল কৃষিজীবি। ইহাদের পুনর্বাসন শুধু সামাজিকই নহে, অর্থনৈতিক সমস্যাও। চাষের জমি বাড়াইলে এই পুনর্বাসন সহজ হইবে।

চাষ-জমি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতেই ভারত সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পতিত জমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা স্বরূপ ১৯৫০ সালেই ভারত সরকার পতিত জমি উদ্ধারের একটি কার্য্যক্রম স্থির করিয়াছিলেন—তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন ৪০ লক্ষ একর আগাছা যুক্ত জমি এবং ২০ লক্ষ একর নুতন জমি উদ্ধার করা হইবে। উদ্ধারকৃত এই জমির যেগুলি সরকারই উদ্ধার করিবেন সেগুলিতে খাদ্যশস্যই উৎপন্ন হইবে, উন্নত বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্ররূপেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সরকারের অনুমোদনক্রমে কৃষকগণও পতিত জমি উদ্ধার করিতে পারে এবং এইরূপ জমিকে খাদ্যশস্য ফলানোর সময় হইতে ১৫ বৎসরের জন্য নিষ্কর রাখা হইবে। পতিত জমি উদ্ধারের এই সকল কার্য্যক্রম কিছুটা পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব দিয়াছেন প্রথম পরিকল্পনাকালের প্রথম চার বৎসরে ১০ লক্ষ একর জমি "কেন্দ্রীয় ট্র্যাক্টর সংগঠনের" দ্বারা এবং ১৪ লক্ষ একর জমি "রাজ্য ট্র্যাক্টর সংগঠনগুলির" দ্বারা উদ্ধার করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমি নানাবিধ কর্ম্মসূচীর মধ্য দিয়া কৃষকদের দ্বারাই উন্নত করা হইয়াছে। চাষের এই সম্প্রসারণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশাতীত ভাবেই সাহায্য করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাকালের পুর্ব্বে (১৯৪৯-৫০) কৃষিজমির এলাকা ছিল ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ একর, ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ৩৫ কোটি ২০ লক্ষ একরে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং কৃষির সম্প্রসারণ হইয়াছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ একর জমিতে ; ১½ কোটি একর বাড়িয়াছে খাদ্যশস্যে এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ একর বাড়িয়াছে অন্যান্য শস্যে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধারের এবং ২০ লক্ষ একর জমিতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনেরও আয়োজন হইয়াছে।

ইহাও করা হইবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ট্র্যাক্টর সংগঠনের মাধ্যমে এবং চাষীদিগের শারীরিক পরিশ্রমে।

তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এদেশে মোট এলাকার মধ্যে চাষ জমির অনুপাত অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অধিক। আমাদের দেশে চাষের এলাকা হইল মোট ভৌগোলিক এলাকার ৪৫ শতাংশ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উহা হইল ২৫ শতাংশ, চীনদেশ এবং রাশিয়ায় ৯ হইতে ১১ শতাংশ, কানাডায় ৪ শতাংশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং ব্রেজিলে ২·৫ শতাংশ। চাষ জমির মোট এলাকার দিক হইতেও ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। প্রথম হইল রাশিয়া (৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ একর), দ্বিতীয় হইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ একর) এবং তাহার পরেই ভারত (৩৬ কোটি ৬০ লক্ষ একর)।* এরূপ অবস্থায় নূতন জমিতে চাষের ব্যবস্থা করিয়া চাষ জমি সম্প্রসারণের অবকাশ ভবিষ্যতে যে খুব বেশী পাওয়া যাইবে তাহা মনে হয় না।

জলসেচ ব্যবস্থা—Irrigation Works

ভারতের মাটীতে সোনা ফলে এবং উহা ফলাইবার অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান হইল জল। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবি; এখানকার সম্পদ উৎপাদনের প্রধান উৎস হইল কৃষি। কৃষকের আয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের সকল স্তরের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে; অপরপক্ষে কৃষকের আয় হ্রাস হইলে সকল ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উহার ফলাফল ভোগ করিতে হইবে; কারণ ভারতের মোট জন-সংখ্যার মধ্যে বিপুলাংশই হইল কৃষককুল এবং বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ইহাদের ব্যয় হইতেই আয় করিয়া থাকে। সরকারের বাজেট পর্য্যন্ত কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষকের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে কৃষির ফলনের উপর এবং কৃষির ফলন বহুলাংশে নির্ভর করে জল সরবরাহের উপর। সেইজন্যই বলা হয়, ভারতে স্বর্ণ অপেক্ষা জলঅধিক মূল্যবান। কিন্তু বৃষ্টির জল সকল সময়ে বা অঞ্চলে পর্য্যাপ্ত ও নিশ্চিত নহে; সেই কারণে কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়। ইহারই নাম সেচ ব্যবস্থা (irrigation)।

বিভিন্ন পর্য্যায়ের সেচ কার্য্য—Different Types of Irrigation Works

Q. Give an account of the various types of irrigation works

*"Estimates of Area and Production of Principal crops in India in 1952-53", issued by Directorate of Economics and Statistics, Union Ministry of Food and Agriculture. এই পরিসংখ্যার সহিত পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা প্রদত্ত পরিসংখ্যার কিছুটা অমিল রহিয়াছে তবে মূল বিষয় বস্তু বুঝা যাইতেছে।

in India and indicate their economic importance. (B. A. 1937; B. Com. 1939, '41, '43, '47.) What are the different types of irrigation that are to be found in different parts of the country? Critically estimate their importance. (B. Com. 1955)

ভারতে তিন পর্য্যায়ের সেচ ব্যবস্থা আছে :—

(১) **কূপ**—কূপের মধ্যে পাতকুয়া ও নলকূপ*, উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। সেচ ব্যবস্থাযুক্ত মোট এলাকার প্রায় এক চতুর্থাংশের সেচ ব্যবস্থা হইল কূপের সাহায্যে। এই সকল কূপ হইতে কায়িক শ্রমে অথবা পশুর সাহায্যে জল উত্তোলন করা হয়, এবং নালার সাহায্যে উহা ক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত করা হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে কূপ সাহায্যে জল সেচ প্রচলিত আছে। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে বিদ্যুৎ চালিত কূপের সাহায্যে ও জল সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। ভারতে প্রায় বিশ লক্ষ সেচ কূপ আছে। এইগুলি জনসাধারণের উদ্যোগেই নির্ম্মিত তবে বহুক্ষেত্রে সরকার এই উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে কূপের দ্বারা জলসেচ সমন্বিত জমির আয়তন হইল ১,৬৪,৫৭,০০০ একর।*

(২) **পুষ্করিণী**—পুষ্করিণীর সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা অল্প বিস্তর প্রায় সকল অঞ্চলেই বিদ্যমান, তবে মাদ্রাজ প্রদেশেই ইহার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে ৯৮ লক্ষ ৫৭ হাজার একর পরিমিত জমিতে পুষ্করিণীর দ্বারা সেচ ব্যবস্থা আছে।*

(৩) **খাল**—খালের দ্বারা জল সেচ ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই খালের দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা আছে; ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাব অনুযায়ী ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৫ হাজার একর জমিতে এইরূপ খাল-সেচ ব্যবস্থা আছে। জল সেচ খাল আছে তিন পর্য্যায়ের :

(ক) **প্লাবন খাল** (Inundation canals)—প্লাবন খালে সারা বৎসর জল থাকে না, এই খালগুলি নদী হইতে কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয় কিন্তু নদী অপেক্ষা ইহা কম গভীর। সেই কারণে নদীতে একটি নির্দ্দিষ্ট স্তর অবধি জল উঠিলে তবেই এই খালগুলি জলপূর্ণ হয় এবং সেই স্তর হইতে নদীর জল নামিয়া

*পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ১ম পরিকল্পনার পূর্ব্বে ২½ হাজার সেচ নলকূপ ছিল এবং ইহাদের দ্বারা জলসেচ হইত এরূপ জমির পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ একর। প্রথম পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত টেকনিক্যাল সহযোগিতার কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ২৩৫০টি, "অধিক খাদ্য ফলাও" কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ৭০০টি এবং রাজ্য সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪৮০টি নলকূপ বসানো হইবে। এই তিনটি পর্য্যায়ে ১৯৫৫ সালের শেষ অবধি যথাক্রমে ২২৮৬টি, ৯৩টি এবং ২০৪৩টি নলকূপ বসানো হইয়াছে।

এই হিসাব পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা প্রদত্ত। Second Five Year Plan পৃষ্ঠা ৩৬০

গেলে এই খালগুলি আর জল বহন করে না। সুতরাং এই ধরণের খাল কেবলমাত্র বর্ষাকালেই কার্য্যকরী হয়। মাদ্রাজ এবং বর্ত্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু-প্রদেশে এই ধরণের খাল বর্ত্তমান।

(খ) ***নিত্যবহ খাল*** (Perennial canals)—নিত্যবহ খালগুলি সারা বৎসরই জলপূর্ণ থাকে। হিমালয় হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ নদীগুলিতে নিত্যবহ খাল নিৰ্ম্মিত হয়। এই নদীগুলি হিমালয়ের তুষার গলিত জলদ্বারা বারোমাস পূর্ণ থাকে। সেচ ব্যবস্থার উৎস স্থলে নদীর মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং খালগুলির মধ্যে জল পরিচালনা করা হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে এইরূপ খাল আছে।

(গ) ***সঞ্চয় বিশিষ্ট খাল*** (Storage canals)—বর্ষাকালে উপত্যকায় আড়া আড়িভাবে বাঁধ গঠন করিয়া জল সঞ্চয় করা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাসমূহে এই সঞ্চিত জল বিভিন্ন খালের সাহায্যে প্রবাহিত করা হয়। প্রধানত: দাক্ষিণাত্য এবং মধ্যপ্রদেশে এই ধরণের খাল বিদ্যমান।

সরকারের পক্ষ হইতে এই সকল সেচ কার্য্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল। উৎপাদনশীল কার্য্যগুলি ঋণের দ্বারা অথবা দুর্ভিক্ষ নিবারণী তহবিল (Famine Insurance Grant) হইতে অর্থ লইয়া সম্পন্ন করা হয়। এই পর্য্যায়ের সেচ কার্য্য হইতে সরকার আয় আশা করেন এবং এই সেচ কার্য্য এইরূপ হইবে বলিয়া আশা করা যায় যাহাতে ঐ কার্য্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহার জন্য প্রদেয় সুদ এবং উহাদিগকে চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় চল্‌তি খরচা উসুল হইয়া যাইবে। সরকারের দ্বারা সম্পাদিত সেচকার্য্য হইতে জল যোগান দেওয়া হইলে কৃষক অধিক শস্য ফলাইতে পারিবে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাইবে; এক্ষেত্রে কৃষকের নিকট হইতে সেচকর আদায় করা হইবে। অনুৎপাদনশীল সেচকার্য্যগুলি সরকারের চল্‌তি আয় হইতে সম্পন্ন করা হয় এবং এইগুলি হইতে সরকার আয় করেন না; ইহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ দুর্ভিক্ষ নিবারণী তহবিল হইতেও লওয়া হয়। এই ধরণের সেচকার্য্য প্রধানত: দুর্ভিক্ষ নিবারক।

সেচকার্য্য—ইহার পরিমাণ, গুরুত্ব, এবং পর্য্যাপ্তি—
Irrigation—its Extent, Importance and Adequacy

Q. Discuss the development and importance of irrigation in India (**Patna**, 1955)

অবিভক্ত ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার দ্বারা মোট সিক্ত এলাকার পরিমাণ ছিল (দেশীয় রাজ্যসমূহ সমেত) সাত কোটি একর জমি। পৃথিবীতে যে দেশগুলিতে

উত্তমরূপে জলসেচ ব্যবস্থা আছে, এইরূপ দশটি দেশ একত্রিত করিলে তাহাদের যে পরিমাণ জমি জলসেচ-ব্যবস্থা-সমন্বিত হয়, ভারতের সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত জমির পরিমাণ তাহা অপেক্ষাও অধিক ছিল। শুধু জমির পরিমাণের দিক হইতেই নহে, সেচ ব্যবস্থা পরিকল্পনার বিরাটত্বের দিক হইতে দেখিলেও মানুষের দ্বারা সম্পাদিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেচকার্য্য ভারতেই ছিল—বর্ত্তমানে উহা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত—অর্থাৎ সুক্কুর বাঁধ (Sukkur barrage)। ১৯৪১-৪২ সাল পর্য্যন্ত অবিভক্ত ভারতের ব্রিটিশ এলাকায় সেচকার্য্যে মোট ১৪৫ কোটি টাকার অধিক মূলধনী ব্যয় (capital expenditure) হইয়াছিল। কেবলমাত্র ব্রিটিশ ভারতেই মোট সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি একরেরও উপর। এই সকল সেচকার্য্য হইতে ভারতের (এবং বর্ত্তমানে পাকিস্থানের) কৃষিকার্য্য প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছে। ভারতের (ও পাকিস্থানের) কতিপয় অঞ্চল আছে যে স্থানে ভূমি অতিশয় শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাত অতিশয় অল্প। ভারতের রাজপুতানা (এবং পাকিস্থানের সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব) এই প্রকার অঞ্চল। এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্য্য হইত অতি কম, কৃষিগত আয় ছিল অতি অল্প। সেচ ব্যবস্থার দ্বারা এই সকল অঞ্চল সুজলা সুফলা হইয়া উঠিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সকল এবং অন্যান্য সেচ ব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলে কৃষকদিগের দ্বারা অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয় এবং কৃষিকার্য্য হইতে আয় সেই কারণে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত শতাব্দী অপেক্ষা বর্ত্তমান শতাব্দীতে গম এবং ইক্ষুর চাষ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সেচ ব্যবস্থাই ইহার প্রধান কারণ। কৃষিসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষজনিত ব্যয় কমিয়া গিয়াছে এবং কৃষির আয় বৃদ্ধির দরুণ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সেচকার্য্য হইতে সস্তায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সেচ ব্যবস্থার খাল পণ্য দ্রব্য বহনের জন্য ব্যবহৃত হইবার এবং সেই দিক হইতে ব্যবসায়ে সহায়তা করিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে—যথা মেদিনীপুর খাল।

কিন্তু যে সকল বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমি সদৃশ জমি হইতে সুজলা ও শস্য শ্যামলা জমিতে পরিণত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই দেশবিভাগের দরুণ পাকিস্থানে পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় জলসেচ ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নহে। ১৯৫০-৫১ সালে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে জলসেচ করা হইয়াছিল এরূপ জমির আয়তন ছিল ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইয়াছিল সরকারী খালের দ্বারা, ২৮ লক্ষ একর জমিতে বেসরকারী খালের দ্বারা, ৮৮ লক্ষ একর জমিতে পুষ্করিণীর দ্বারা, ১ কোটি ৪৭ লক্ষ একর জমিতে কূপের দ্বারা এবং ৭৩ লক্ষ একর জমিতে অন্যান্য বিবিধ

পদ্ধতিতে। জলসেচ প্রাপ্ত এই এলাকা ছিল আমাদের মোট চাষ এলাকার ১৭.৫ শতাংশ মাত্র। ইহা যে প্রয়োজনের তুলনায় একান্তই কম ছিল তাহা আর বিশদ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন—বিশেষ করিয়া যে দেশ প্রায়ই খাদ্য ঘাট্‌তির সম্মুখীন হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন— **Development of Irrigation under the First & Second Five Year Plans**

প্রথম পরিকল্পনার কার্যক্রম

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পুর্ব্ব হইতেই কতিপয় সেচ পরিকল্পনা দেশের মধ্যে কার্য্যকরী করা শুরু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কতকগুলি বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা (Multipurpose River valley Projects)। ১৯৫১ সালে অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে যে পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হইতেছিল সেগুলি শেষ করিতে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৭৬৫ কোটি টাকা। ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ্চ অবধি ইহাদের জন্য ব্যয় হইয়াছিল ১৫৩ কোটি টাকা।

এইরূপ বৃহৎ পরিমাণ ব্যয় যে সকল কার্য্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অগ্রে শেষ করিতে হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। এই সকল চল্‌তি স্কীমগুলির জন্য পাঁচ বছরে ৫১৮ কোটি টাকা ব্যয় ববাদ্দ করা হইয়াছিল। এই সকল নির্ম্মীয়মান স্কীমগুলি শেষ করিবার উপরেই প্রধান গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল; আবার ইহাদের মধ্যে যেগুলি খাদ্যোৎপাদনের পক্ষে অধিকতর সহায়ক সেইগুলিকে অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। বহুমুখী পরিকল্পনাগুলিকে এরূপ ভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছিল যাহাতে উহাদের সেচব্যবস্থা প্রদায়ী ক্ষমতাকে অগ্রে লাভ করা যায়, শক্তি উৎপাদন ধীরে ধীরে চাহিদা অনুযায়ী করা হইবে। পাঁচ বৎসরের শেষে এই সকল স্কীম হইতে ৮৫ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে জলসেচ হইবে এবং ১১ লক্ষ কিলওয়াট বাড়তি জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়াছিল। যখন এই স্কীমগুলি (পরবর্ত্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা) পুরাপুরি শেষ হইয়া যাইবে তখন উহাদের দ্বারা ১ কোটি ৬৯ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচ হইবে এবং ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার কিলওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

আরব্ধ স্কীমগুলির উপরেই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইলেও, কিছু কিছু নূতন স্কীম প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। এই

স্কীমগুলি হইল কোশী, কয়না, কৃষ্ণা, চম্বল, রিহান্দ। এইগুলির জন্য মোট ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে—তাহার মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

এই বৃহৎ সেচকার্য্যগুলি ব্যতীতও পরিকল্পনা কমিশন ছোট ছোট সেচকার্য্যের কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন। পাঁচ বৎসরে এই ছোট সেচ কার্য্যগুলির জন্য ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল; ইহাদের দ্বারা বাড়তি ৮২ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। এইগুলি ব্যতীতও ৩০ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে জলসেচ হইবে এইরূপ কতিপয় ছোট এবং মাঝারি সেচ পরিকল্পনা রচনা করা হইবে কথা হইয়াছিল। ইহাদের নিমিত্ত ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৩০ কোটি টাকা।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অনেকগুলি বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ছিল বহু উদ্দেশ্যমূলক (multipurpose projects)। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল সেচকার্য্যে বর্ষাকালে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বাঁধ এবং জলাধার নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সকল কর্ম্মসূচীর কতকগুলিতে এখনও কাজ চলিতেছে এবং ইহাদের অধিকাংশই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শেষ হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় যে সকল বৃহৎ এবং মাঝারি সেচকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল ১৯৫৬ সালে সেগুলি হইতে বাড়তি ৬৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ পাওয়া সম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত ছোট সেচ কার্য্যগুলি হইতে এক কোটি একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে অনুমান করা হয়। আবার কতিপয় ছোট সেচকার্য্যের এলাকা বৃহত্তর সেচকার্য্যের উপকার পাইবে। এই সব হিসাব করিলে নীট ফল দাঁড়ায় যে প্রথম পরিকল্পনা কালে জল সেচ এলাকার নীট বৃদ্ধি হইবে ১½ কোটি একর জমি। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের মোট চাষযোগ্য এলাকার মধ্যে জলসেচ এলাকার অংশ (১৭·৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া) ২০ শতাংশে পরিণত হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যক্রম

পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে জলসেচ করা হইবে। ইহার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে বৃহৎ ও মাঝারি সেচকার্য্যের দ্বারা এবং ৯০ লক্ষ একর জমিতে ছোট সেচ কার্য্যের দ্বারা। বড় এবং মাঝারি পরিকল্পনাগুলির দ্বারা যে ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে উহার মধ্যে ৯০ লক্ষ একর জমি বর্ত্তমানের চলতি

কার্য্যক্রম হইতে (অর্থাৎ যে স্কীমগুলি চালু করা হইয়া গিয়াছে) জলসেচ পাইবে এবং ৩০ লক্ষ একর জমি জলসেচ পাইবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শুরু করা হইবে এরূপ কার্য্যক্রম হইতে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের সেচ ব্যবস্থার প্রসার সম্পর্কে দুইটি বিষয় প্রণিধান-যোগ্য : (ক) কতিপয় কার্য্যক্রম আছে যেগুলি প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও যেগুলির নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে থাকিবে ; (খ) প্রথম পরিকল্পনাকালে আরব্ধ কার্য্যক্রম ছাড়াও কতিপয় কার্য্যক্রম দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নির্ম্মাণ শুরু করা হইবে। প্রথম শ্রেণীর সেচকার্য্যগুলির জন্য মোট ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৭২০ কোটি টাকা ; ইহার মধ্যে ৮০ কোটি টাকা প্রথম পরিকল্পনার পুর্ব্বেই ব্যয় হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৬৪০ কোটি টাকার মধ্যে ৩০৪ কোটি টাকা প্রথম পরিকল্পনা কালে ব্যয় হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হয়। অবশিষ্ট থাকে ৩০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় হইবে ২০৯ কোটি টাকা ; বাকী যাহা থাকে তাহা ব্যয় হইবে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেচকার্য্যগুলির জন্য মোট ব্যয় হইবে ৩৮০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে ৩৮০ কোটির মধ্যে ১৭২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে—বাকী ২০৮ কোটি টাকা পরবর্ত্তী পরিকল্পনাকালে ব্যয় হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেচকার্য্যের জন্য ব্যয় হইবে ৩৮১ কোটি টাকা।

এই ৩৮১ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় হইবে বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনাগুলির জন্য—ইহাদের দ্বারা জলসেচ হইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে। উহা ব্যতীত, ৯০ লক্ষ একর জমিতে ছোট সেচ কার্য্যের দ্বারা জলসেচ হইবে। এই ছোট সেচকার্য্যগুলি নির্ম্মিত হইবে রাজ্য সরকারদের কৃষি-উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্ম্মসূচীর আওতায় এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ কর্ম্মসূচীর আওতায়। ইহাদের মধ্যে কৃষি-উন্নয়নের কর্ম্মসূচীর আওতায়ই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জলসেচের জন্য ৬৬ কোটি টাকা (বৃহৎ ও মাঝারি সেচ কার্য্যের জন্য ৩৮১ কোটি টাকার উপরে) ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই ছোট সেচ-কার্য্যগুলির মধ্যে নলকূপ সাহায্যে সেচকার্য্য গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে। ১ম পরিকল্পনার পুর্ব্বে আমাদের দেশে ২,৫০০ সেচ-নলকূপ ছিল, ইহাদের দ্বারা ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইত। প্রথম পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ৪৪২২টি নলকূপ বসানো হইয়াছে (১৯৫৫ সালের শেষ অবধি হিসাব)। ২য় পরিকল্পনায় ৩৫৮১টি নলকূপ বসাইবার কর্ম্মসূচী রচিত হইয়াছে।

বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা—Multipurpose River Valley Projects

Q. Give an account of the river valley projects in India. Discuss

their influence on (a) agriculture and (b) industries. (Agra, 1955)

কোন নদীর তীরস্থ অঞ্চলকে নদী উপত্যকা বলা হইয়া থাকে। নদীকে নানাভাবে কাজে লাগাইয়া উহার সন্নিহিত অঞ্চলকে অনেক উপকার প্রদান করা যাইতে পারে। নদীকে কাজে লাগাইয়া বিবিধ প্রকারে নদী-উপত্যকাগুলির উন্নতি বিধানের জন্য আমাদের দেশে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। বিবিধ উপায়ে নদী-উপত্যকাকে সমৃদ্ধ করিবার এই কার্য্যক্রমকে বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা বলা হইয়া থাকে। 'বহুমুখী' শব্দটির অর্থ হইল বহু উদ্দেশ্যসাধক—অর্থাৎ একই নদীকে নানারূপ উদ্দেশ্য উপলব্ধির কার্য্যে লাগানো হইবে। এই উদ্দেশ্যগুলি হইল প্রধানতঃ জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নৌচলাচল। ইহা ব্যতীত আরও কতিপয় উদ্দেশ্য আছে যথা বনসৃষ্টি, মৎস চাষ এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ।

জলসেচ (Irrigation)—এইরূপ পরিকল্পনার দ্বারা নদীর মধ্যে আড়া-আড়ি ভাবে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জল ধরিয়া রাখা হয়। এরূপ স্থানে বাঁধ নির্ম্মাণ করা হয় যে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ জল আসিয়া জমা হইবার সম্ভাবনা। অতঃপর এই জলাধার হইতে খাল কাটিয়া যে দিকে জল লইয়া গেলে কৃষিক্ষেত্রে জলের জোগান দেওয়া সম্ভব হইবে সেই দিকে লইয়া যাওয়া হয়।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন (Power Generation)--জলপ্রবাহকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কার্য্যেও লাগানো যাইতে পারে। জলপ্রবাহের যে বেগ আছে তাহাকে দিয়া যন্ত্র ঘুরাইয়া লওয়া চলে এবং যন্ত্র ঘুরাইবার কিছুটা ক্ষমতা যদি বাহির হইতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আরও জটিল যন্ত্রাদির সাহায্যে সেই শক্তিকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রয়োজন হইল যে স্থির জল হইতে কৃত্রিম ভাবে জলপ্রবাহ বা জলপ্রপাত সৃষ্টি করা। আমাদের দেশে একাধিক নদীর ক্ষেত্রেই এইরূপ করিবার অবকাশ ছিল বলিয়া নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে ইহা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাক্‌রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ (Flood Control)—অনেক অঞ্চল আছে যেগুলি নদী থাকিবার জন্যই বারংবার বন্যায় প্লাবিত হইয়া জনগণকে অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। বাঙ্গলা দেশের দামোদর নদীকে ঠিক এই কারণেই দুঃখের নদী (river of sorrow) বলা হইত। প্রবল বৃষ্টিপাতের সময়ে এই সকল নদী জলোচ্ছাস ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া বন্যার আকারে ফাটিয়া পড়িত। উপত্যকা পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সংশ্লিষ্ট নদীকে বাঁধ নির্ম্মাণের দ্বারা

এমনভাবে বাঁধিয়া ফেলা যাহাতে উহা কূল ছাপাইয়া সন্নিহিত অঞ্চল ভাসাইয়া দিতে না পারে ; ঐ জলই প্রয়োজনের সময়ে আবাদী জমিতে চালান করিয়া সেচ কার্য্য সম্পন্ন করিবে। দামোদর এবং কোশী পরিকল্পনায় এই বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

নৌচলাচল (Navigation)—নৌচলাচলের সুবিধা থাকিলে বৃহদায়তনের সামগ্রীর সস্তায় চলাচল সম্ভব হয়। সেইজন্য কোন কোন উপত্যকা পরিকল্পনায় খালগুলিকে নাব্য—অর্থাৎ নৌচলাচলের উপযোগী-করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিয়াছে।

বনসৃষ্টি (Afforestation)—কোন কোন উপত্যকা পরিকল্পনায় সন্নিহিত বনসৃষ্টির কার্য্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বনসৃষ্টির প্রয়োজন সম্পর্কে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই ; ইহার প্রয়োজন অশেষ। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় এবং ভাক্রা-নাঙ্গল পরিকল্পনায় বনসৃষ্টির কার্য্যক্রমকে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

মৎস চাষ (Fish Culture)—খাদ্যাভাবের দেশে মৎস চাষের প্রয়োজন সম্পর্কেও নূতন কথা কিছু বলিবার নাই। যে নদী এবং খালের দ্বারা জলসেচ হইবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে এবং বন্যা নিরোধ হইবে উহাতেই মৎস চাষ হইতে পারিবে। ভাক্রা-নাঙ্গল, দামোদর, হীরাকুদ, তুঙ্গভদ্রা এবং মাচকুঁদ—বিশেষ করিয়া এই পরিকল্পনাগুলিতে মৎস চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ (Malaria Control)—জলাধার, খাল এবং অন্যান্য স্থানে যাহাতে ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশকের সৃষ্টি হইতে না পারে তাহার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইবে। ফলে, এতদঞ্চলগুলি স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইবে।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—**Damodar Valley Project**

Q. What do you know of the Damodar Valley Project? Estimate the effects it will produce on the wealth and welfare of West Bengal. (B.A. 1949)

Write a brief essay on the scheme of Damodar Valley Corporation. What benefits has it conferred or is it likely to confer on the people living in its area? Has the scheme been profitable? (**Patna** 1956)

প্রকৃতিদত্ত নদীর জল মানুষের দ্বারা যথাযথ নিয়ন্ত্রিত না হইলে বন্যার দ্বারা উহা মানুষের বহু অপকার সাধন করিতে পারে ; আবার যথাযথ ভাবে

নিয়ন্ত্রিত হইলে উহা মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করিতে পারে। খেয়ালী দামোদর নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার অপকার সাধনের ক্ষমতা হরণ এবং উপকার সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার নাম "দামোদর উপত্যকা বহুমুখী পরিকল্পনা" (Damodar Valley Multipurpose Project)। যে সকল বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার পূর্ব্বেই শুরু হইয়াছিল এবং পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হইয়াছে, দামোদর পরিকল্পনা তাহাদের অন্যতম।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে "দামোদর উপত্যকা করপোরেশন" (Damodar Valley Corporation) নামে স্বায়ত্ব শাসন ভোগী একটি সংস্থার উপর। ১৯৪৮ সালে একটি পার্লামেণ্ট বিধির দ্বারা ইহা সৃষ্ট হইয়াছিল। তিন জন সদস্য লইয়া এই করপোরেশন গঠিত।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল দামোদর নদীতে একাধিক বাঁধ ও জলাধার নির্ম্মাণ করা। ইহার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এলাকায় চারিটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে: (১) বন্যা এবং মাটির উর্ব্বরতা ক্ষয় প্রতিরোধ (২) বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচ (৩) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং (৪) নৌ-চলাচল যোগ্য খাল নির্ম্মাণ। দামোদর নদীতে একাধিক বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে এবং জলাধার (reservoirs) সৃষ্টি করা হইবে। প্রথমে চারিটি বাঁধ নির্ম্মাণের কথা—তিলায়া, মাইথন, পাঞ্চেৎ এবং কোনার। মাইথন এবং পাঞ্চেতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ থাকিবে এবং সর্ব্বোচ্চ বন্যাসীমানা ৬$\frac{1}{2}$ লক্ষ কিউসেক হইতে ২$\frac{1}{2}$ লক্ষ কিউসেকে পরিণত করা হইবে। এই পরিমাণ জল দামোদর নদীর ব-দ্বীপ-অংশ (deltaic portion) দক্ষিণ দিক প্লাবিত না করিয়াই এবং বাম পার্শ্বের বাঁধ না ভাঙ্গিয়াই প্রবাহিত করিতে পারিবে। চারিটি বাঁধ হইতেই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে—১ লক্ষ ২৪ হাজার কিলওয়াট। ইহা ছাড়াও বোকারো নামক স্থানে তাপতাড়িত বিদ্যুৎ কেন্দ্র (thermal plant) প্রতিষ্ঠিত করা হইবে—ইহার বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি হইবে ২ লক্ষ কিলওয়াট।

সেচকার্য্যের ক্ষেত্রেও ইহার প্রচুর সম্ভাবনা উপলব্ধির আয়োজন করা হইয়াছে। বাঁধগুলির নীচে নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ দুর্গাপুরে ধরা হইবে এবং এইস্থানে বাঁধ (barrage) নির্ম্মাণের দ্বারা ঐ জল খালের মধ্যে প্রবাহিত করা হইবে। এই সকল খালের দ্বারা খারিফ শস্য ফলনের জমির ১০ লক্ষ ২৬ হাজার একর এবং রবি শস্য ফলনের জমির ৩০ লক্ষ একর জলসেচ লাভ করিবে। এই খাল ব্যবস্থার একাংশ নৌ চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হইবে—ইহার দ্বারা রাণীগঞ্জ কয়লাখনি এবং কলিকাতার মধ্যে জলপথ থাকিবে।

বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনার কাজ বহু পরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

১৯৫৩ সালেই বোকারোর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহাতে বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইতেছে ৫০,০০০ কিলওয়াট। তিলায়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কার্য্য সুরু করিয়াছে। ১৯৫৪ সালের মে মাসে কোনার বাঁধ নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে দুর্গাপুর বাঁধের উদ্বোধন হইয়াছে।

এই সালের (১৯৫৭) ২০শে মার্চ্চ তারিখে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের বাজেট এষ্টিমেটের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে তিলাইয়া, কোনার এবং দুর্গাপুরের বাঁধের কার্য্য এবং বোকারোর তাপতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কার্য্য, সামান্য কিছু অংশ বাদে (এগুলিতে কাজ চলিতেছে) প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। মাইথন বাঁধের কাজ শেষ হইতে বেশী বিলম্ব নাই। এক্ষণে, মাইথনে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পাঞ্চেৎ পরিকল্পনা, দামোদর উপত্যকার নিম্নভাগের সেচখালগুলি, এবং বিদ্যুৎশক্তি বহনী ও বিতরণী ব্যবস্থা (transmission and distributior system)—এই বিষয়গুলির কার্য্য ত্বরান্বিত করিবার দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের কার্য্যক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দামোদর উপত্যকার জন্য ৮২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

*অন্যান্য বহুমুখী পরিকল্পনা**—Other Multipurpose Projects

Q. Discuss the principal river valley projects in India (Agra, 1953).

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বৃহৎ নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি হইল :

(১) ***হীরাকুঁদ বাঁধ***—(Hirakud Dam Project)--উড়িষ্যার মহানদী উপত্যকার উন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার দ্বারা নদীমুখস্থ অঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, ১৯ লক্ষ একর জমি জলসিক্ত করা হইবে এবং প্রায় ২ লক্ষ কিলওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হইবে।

* ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকারের "জলসেচ ও বিদ্যুৎ' বিভাগের ডেপুটি মিনিষ্টার শ্রীজয় সুকলাল হাতি লোকসভায় তথ্য প্রদান করিয়াছিলেন যে ভারত সরকার নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির নির্ম্মাণের জন্য একটি বিশেষ সংস্থা সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার নাম "জাতীয় নির্ম্মাণ কর্পোরেশন" (National Construction Corporation)। ইহার পুঁজি হইবে ২ কোটি টাকা এবং এই পুঁজি ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলি প্রদান করিবেন। প্রথমে ইহা চম্বল পরিকল্পনার খাল নির্ম্মাণের দ্বারা কার্য্য সুরু করিবে।

এই বাঁধ প্রায় ১৫ হাজার ফুট দীর্ঘ; ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে ইহাই হইবে পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ। ইহার দ্বারা ৬৭ লক্ষ একর ফুট পরিমিত জল ধরিয়া রাখা হইবে এবং ইহার দ্বারা যে হ্রদ সৃষ্টি করা হইবে তাহার আয়তন হইবে প্রায় ২৮৮ বর্গমাইল। সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী এই পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইবে ৯২ কোটি টাকা।

এই পরিকল্পনা রূপায়িত করায় যথেষ্ট অগ্রগতি হইয়াছে। ইহার প্রথম স্তরের (Stage I) নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং ১৯৫৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন। একলক্ষ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইয়াছে এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের প্রথম ইউনিট দ্বারা ২৪,০০০ কিলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে আরও তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট কার্য্য আরম্ভ করিলে মোট ১,২৩,০০০ কিলওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের তাগে পৌঁছানো যাইবে এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে আরও ৪½ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে।

(২) *ভাকরা নাঙ্গল পরিকল্পনা**—(Bhakra-Nangal Project)—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাকরার নিকট শতদ্রু নদীতে ৮০ ফুট উঁচু একটি জমায়েৎ বাঁধ (Storage dam) নির্ম্মিত হইবে, আট মাইল নীচে নাঙ্গলে আর একটি বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে। বহুসংখ্যক সেচ খাল কাটা হইবে—বৎসরে ঐগুলির দ্বারা প্রায় ৩৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হইবে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের খাল (Hydel canal) কাটা হইবে; মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার কিলওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইবে।

এই পরিকল্পনার মধ্যে নাঙ্গল বাঁধ, নাঙ্গল জলবিদ্যুৎ খাল (Nangal hydel canal) এবং পাঞ্জাবে ভাকরা খাল খনন—এই কার্য্যগুলী সমাপ্ত হইয়াছে। ৪৮৮৮ মাইলের মতন ছোট বড় খাল ও তাহাদের শাখা প্রশাখা নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে (রাজস্থানে ৯১৩ মাইল সমেত)। আংশিক-ভাবে সেচকার্য্য সুরু হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৪ সালে ৩ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য্য হইয়াছিল, পরবৎসর উহা ১০ লক্ষ একরে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৫৬ সালে উহা ২০ লক্ষ একরে দাঁড়াইয়াছে। গাঙ্গুবাল এবং কোতলা পাওয়ার হাউস দুইটির প্রত্যেকটিতে ২৪,০০০ কিলওয়াট করিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৫৪ সালে জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী খাল-ব্যবস্থার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। গাঙ্গুবালের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ১৯৫৫ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করিয়াছেন এবং ঐ সালের নভেম্বর মাসেই প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে ভাকরা বাঁধের কংক্রীট অংশের

* Q. Write note on—Bhakra Nangal Project (Patna 1955).

নির্ম্মাণ কার্য্য আনুষ্ঠানিক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ভাক্‌রা বাঁধের নির্ম্মাণ ১৯৬০ সাল নাগাদ শেষ হইবে, শেষ হইলে উহার দ্বারা ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে।

(৩) ***ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা*** (Maurakshi Project)—দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ে সিউড়ির নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে একটি গতি-পরিবর্ত্তনী বাঁধ (diversion barrage) নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার দুইদিক হইতে দুইটি খাল প্রবাহিত হইয়া ৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ঐ বাঁধ হইতে ২০ মাইল দূরে একটি জমায়েৎ বাঁধ (storage dam) নির্ম্মিত হইবে; ইহাতে ৫ লক্ষ একর ফুট জল জমা থাকিতে পারিবে। এই পরিকল্পনা মূলতঃ সেচ-পরিকল্পনা হইলেও ইহাতে চার হাজার কিলওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৪) ***মাচকুঁদ পরিকল্পনা*** (Machkund Project)—এই পরিকল্পনায় জলপুতে ৬ লক্ষ ১'২ হাজার একর ফুট জল জমা রাখিবার মত জমায়েৎ বাঁধ এবং ১৭ মাইল নীচে একটি উচ্চ গতি-পরিবর্ত্তনী বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহাতে একলক্ষ কিলওয়াটের কিছু অধিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইবে। জলপুতে বাঁধের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে এই বাঁধের দৈর্ঘ্য হইল ১,৩০০ ফুট এবং উচ্চতা হইল ১৩৪ ফুট।

(৫) ***তুঙ্গভদ্রা বাঁধ পরিকল্পনা*** (Tungabhadra Dam Project)——ইহাতে তুঙ্গভদ্রা নদীতে ৮০০০ ফুট লম্বা বাঁধ নির্ম্মিত হইবে। নদীর দক্ষিণ দিক হইতে একটি খাল অন্ধ্র এবং মহীশূর রাজ্যের ২½ লক্ষ একর জমি, এবং বাম ভাগ হইতে একটি খাল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ৪½ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবে। ইহাতে মোট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইবে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কিলওয়াট।

ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। গাঁথার কার্য্যের দুই তৃতীয়াংশ শেষ হইয়াছে এবং ২০০ মাইল দীর্ঘ খাল খনন হইয়াছে।

(৬) ***নাগার্জ্জুনসাগর পরিকল্পনা***—(Nagarjuna Sagar Project) নাগার্জ্জুন সাগর পরিকল্পনাটি অন্ধ্র সরকারের পরিকল্পনা; ইহাতে ৮৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহাতে কৃষ্ণা নদীর উপরে নাগার্জ্জুনকোণ্ড নামক স্থানে একটি গাঁথনি বাঁধ (masonry dam) নির্ম্মাণ করা হইবে। এই বাঁধের উচ্চতা হইবে স্পিলওয়ে অংশে (Spillway section) ৩০২ ফুট এবং স্পিলওয়ে বহির্ভূত অংশে (non-spillway section) ৩৪২ ফুট। এই বাঁধের দ্বারা ৫৪ লক্ষ একর-ফুট জল ধরে এরূপ জলাধার (reservoir) নির্ম্মাণ করা হইবে। ইহার দ্বারা ২১ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে।

(৭) ***কোশী পরিকল্পনা*** (Kosi Project)—কোশী নদী উত্তর বিহারে বন্যারূপে উপছাইয়া অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা ছড়াইয়া থাকে। কোশী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যই হইল এই বন্যা নিরোধ, তবে ইহার দ্বারা ১৬ লক্ষ একরের মতন জমিতে জলসেচ হইবে। ১৮ হাজার কিলোওয়াটের মতন বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাও এখানে করা হইবে। এই পরিকল্পনায় কার্য্য সুরু হইয়াছে মাত্র ১৯৫৪ সালে। এই পরিকল্পনার সহিত নেপাল সরকারও সংশ্লিষ্ট।

(৮) ***চম্বল পরিকল্পনা***—(Chambal Project)—চম্বল নদী মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই নদীর উপর তিনটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জলসেচ ব্যবস্থা করা হইবে; ইহার দ্বারা ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে। ইহা ব্যতীত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনায় থাকিবে।

জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা—Subdivision and Fragmentation of Land

Q. "One of the main causes for backwardness of agriculture in India is the endless subdivision and fragmentation of land." Discuss (B. A. 1943). Examine the causes and effects of subdivision and fragmentation of agricultural holdings in India. What remedies would you suggest? (B. A. 1948; Patna 1953; Delhi '53; Agra '54)

ভারতের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী, জমির মালিকের মৃত্যুর পর তাহার বিভিন্ন উত্তরাধিকারীর মধ্যে তাহা সমভাবে বণ্টিত হইয়া যায়। এইভাবে জমি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গলায় একজন কৃষকের গড়ে প্রায় ৩ একর পরিমাণ জমি আছে মাত্র, এবং কোন কোন প্রদেশে কৃষকের জমি-মালিকানা (land holding) উহা অপেক্ষাও অল্প খণ্ডের উপর। উপরন্তু একজন কৃষকের মোট যত পরিমাণ জমি আছে—তাহার সমস্তটাই একত্রিতভাবে রহিয়াছে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। একজন ব্যক্তির গ্রামের বিভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জমি থাকিতে পারে; তাহার মৃত্যুর পর তাহার ওয়ারিশগণ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সকলপ্রকার জমির অংশ গ্রহণ করিবে। ফলে একজন ব্যক্তির মোট যে পরিমাণ জমি আছে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে—একই স্থানে সুসংবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে না।*

---

* জমির মালিকানা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকিলেও ইতস্ততঃ ভাবে কিছুটা তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তর কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে গড়ে একজন ব্যক্তির যে জমি আছে তাহা হইল আসামে ৪·৮ একর

খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণ সমূহ—(Causes of sub-division and fragmentation)—প্রকৃতপক্ষে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। (১) আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইনের দ্বারা বহু ব্যক্তি জমির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। সেই কারণে জমি ক্রমশঃই খণ্ডিত হইতে থাকে। (২) যতদিন ভারত শিল্প সমৃদ্ধ ছিল, কুটির শিল্পে সামগ্রী উৎপাদন করিয়া এবং দেশ বিদেশে সেই পণ্য বিক্রয় করিয়া দেশের জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিত, ততদিন প্রত্যেক জমির মালিকই কৃষিকার্য্য করিত না; অনেকেই তাহাদের জমি পার্শ্ববর্ত্তী জমির মালিককে বিক্রয় করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না, অন্ততঃ ভাড়া দিয়া দিত। কিন্তু যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবার পর এবং সেই অনুপাতে আধুনিক যন্ত্রশিল্প আমাদের দেশে স্থাপিত না হইবার দরুণ, ক্রমশঃই অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কৃষিকার্য্যকেই উপজীবিকা করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে যে ব্যক্তি যেটুকু জমির মালিক সে সেই জমিটুকুতেই নির্ভর কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে এবং খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। (৩) প্রতি দশবৎসর অন্তর জনসংখ্যার হিসাব হইতে দেখা যায় যে জনসংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়াছে; সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জমি ক্রমশঃই ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। (৪) একান্নবর্ত্তী পরিবারে বসবাসের রীতি আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সম্পত্তি যুক্তভাবেই থাকিত। এক্ষেত্রে জমির মালিকানা অনুযায়ী জমিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইত না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উগ্র প্রভাবে একান্নবর্ত্তী পরিবার ধ্বংস হইতেছে। উহাতে জমির মালিকানা পৃথক ভাবে ভাগ করিয়া লওয়া হইতেছে। (৫) কৃষকগণ বিভিন্ন কারণে চাষের জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়াও চাষজমি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। দেনার দায়ে ও খাজনার দায়ে চাষী তাহার জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, খানিকটা রাখিয়াছে এবং খানিকটা বিক্রয় করিয়াছে; সেইজন্যও অনেক ক্ষেত্রে জমি টুকরা হইয়া গিয়াছে।

উড়িষ্যায় ৪·৯, মাদ্রাজে ৪·৫। সর্ব্বাপেক্ষা কম হইল উত্তর প্রদেশে (২·৫ একর) এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইল বোম্বাইতে ১১·১ একর। ইহা গড় হিসাব। সুতরাং ইহা হইতে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায় মাত্র। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব দিয়াছেন যে ৫ একরের কম জমি আছে এরূপ জমির মালিকের অনুপাত (মোট জমি-মালিকের মধ্যে) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৯৪.৯ শতাংশ, মাদ্রাজে ৬৭·৬ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৫৯·৪ শতাংশ, অন্ধ্রতে ৬৬·৮ শতাংশ এবং বোম্বাইতে ৫১.৩ শতাংশ।

ইহার ফলাফল—(Its effects)—জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা কৃষিকার্য্যের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহার একাধিক কুফল ফলিয়াছে। (১) খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতার দরুণ আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যে বৃহদায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কৃষিকার্য্যে অগ্রসর দেশগুলিতে কৃষিকার্য্যে বৃহদায়তন-উৎপাদনের আয়োজন করা হয়—বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য কৃষিকার্য্যে উন্নত ধরণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা পোষায় এবং সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের দেশে চাষীর জমির পরিমাণ একেই অল্প; তাহার উপর যাহা আছে তাহাও আবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। এক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনও সম্ভব নহে এবং বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রপাতি ব্যবহারও সম্ভব নহে। (২) দীর্ঘ মেয়াদী কোন উন্নয়ন-ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র জমিতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়ে উন্নয়ন-মূলক কার্য্য করিলে উহা হইতে যথোচিত অর্থাৎ আনুপাতিক ভাবে আয় দিবে না। কারণ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন-মূলক কার্য্যকে জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতার দরুণ পরিপুর্ণরূপে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। সেই কারণে জমিতে উন্নয়ন-মূলক কার্য্য করিতে (যথা কূপ বা পুষ্করিণী) চাষী তো একেই সমর্থ নহে, আবার সমর্থ হইলেও উৎসাহিত নহে। (৩) প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির খণ্ড পৃথক করিবার জন্য যে বেড়া অথবা আইল নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয় উহাতে বহু পরিমাণ জমি চাষ-বহির্ভূত থাকিয়া যায়। (৪) সকল সময়েই কৃষিকার্য্যের তদারকের জন্য এবং ফসলের উপর নজর রাখিবার জন্য চাষের জমির নিকটেই গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিলে কৃষক লাভবান হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা সম্ভব হয় না, কারণ চাষীর সকল জমিই তো আর একস্থানে নাই। (৫) চাষী তাহার বলদ ও লাঙ্গল লইয়া বিভিন্ন খণ্ডজমিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাষ করে। ইহাতে প্রচুর সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটে।

প্রতিবিধান—(**Its remedies**)

Q. Suggest measures for preventing subdivision and fragmentation (B. A. 1944). Discuss the lines on which attempts have been made in some parts of India to remedy the evils of subdivision and fragmentation. What methods would you suggest for remedying them ? (B. Com. 1944).

জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা যাহাতে ঘটিতে না পারে এবং যাহা ঘটিয়াছে তাহা যাহাতে একত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার

যথোচিত ব্যবস্থা করাই একান্ত প্রয়োজন। এক একজন চাষীর জমির পরিমাণ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সে ঐ জমির চাষ হইতে নিজের ও পরিবারবর্গের ন্যায়-সঙ্গত জীবন যাত্রার মানে ভরণপোষণ করিতে পারে। প্রত্যেকের জমির পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উহা "আর্থিক জমি মালিকানা" (economic holding) রূপে বিবেচিত হইতে পারে। **প্রথমতঃ,** উত্তরাধিকার আইনের যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অবশ্য ইংলণ্ডের ন্যায় পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে এইরূপ আইনের প্রবল বিরোধিতা হইবে এবং উহা করা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না। পিতার সম্পত্তি সকল পুত্রসন্তানদিগের মধ্যে সমানভাবে বিভাগ হইবে, ইহার সহিতই ভারতবাসী আবহমান কাল হইতে পরিচিত। তবে এইরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অন্যান্য ভ্রাতার সম্পত্তি ন্যায্য মূল্যে (আদালত হইতে উহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে) ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসম্মত বা অসমর্থ হইলে, তাহার পরবর্ত্তী ভ্রাতাকে এইরূপ ইচ্ছাপ্রয়োগের অধিকার (option) দেওয়া হইবে; এবং সে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইলে, তাহার পরবর্ত্তী ভ্রাতাকে—এইরূপ চলিতে থাকিবে। অনেকগুলি ভাই থাকিলে যে কোন দুইভাই বা তিনভাই অন্যান্য ভাইদের ভূসম্পত্তি কিনিতে পারিবে। নীতিটি গৃহীত হইলে বিস্তারিত ক্রিয়াপদ্ধতি বাহির করা দুরূহ নহে। **দ্বিতীয়তঃ,** পৃথক মালিকানা বজায় রাখিয়াই যৌথ কৃষির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; পাশাপাশি অবস্থিত জমির খণ্ডগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকারভুক্ত থাকিলেও, সকল মালিকের সহযোগিতার দ্বারা উহা একত্রিতভাবে চাষ করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল জমির খণ্ডগুলি একত্রিতভাবে একটিমাত্র খণ্ডের ন্যায় হইবে; ফসল উৎপন্ন হইলে বিভিন্ন মালিকের মধ্যে তাহাদের জমির পরিমাণ ও অন্য কোন যথাযোগ্য মাপ অনুযায়ী উৎপন্ন ফসল বা উহার দাম বণ্টন করা হইবে। সেই অনুপাতে মালিকগণ খরচাও বহন করিবে। পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের ভিত্তিতে এইরূপ একত্রিত চাষের সুপারিশ করিয়াছেন। **তৃতীয়তঃ,** জমির সংহতি সাধনের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। বিভিন্ন জমির মালিকগণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জমি হস্তান্তরিত করিয়া প্রত্যেকের বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি একত্রিত করিয়া লইতে পারে। এইরূপ সংহতি সাধন ইচ্ছামূলক হইতে পারে অথবা বাধ্যতামূলক হইতে পারে। সমবায় সমিতি স্থাপনের দ্বারা ইচ্ছামূলক সংহতি সাধন করা যাইতে পারে এবং বাধ্যতামূলক সংহতি সাধন করা যাইতে পারে সরকারের আইন প্রণয়নের দ্বারা।

খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা—Measures taken against Subdivision and Fragmentation

খণ্ডীকরণের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা আমাদের দেশে অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলিকে দুই পর্য্যায়ে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, প্রতিশেধমূলক ব্যবস্থা (Preventive Measures) এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা (Corrective & Curative Measures)

(১) **প্রতিশেধমূলক ব্যবস্থা**—প্রতিশেধমূলক ব্যবস্থা বলিতে সেই ব্যবস্থা বুঝায় যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধ করা যায়। ইহার জন্য জমির একটি ন্যূনতম আয়তন বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং বলা যাইতে পারে যে এইরূপ ন্যূনতম আয়তনের জমি ভবিষ্যতে খণ্ডিত হইতে পারিবে না। নানারূপ বিবেচনায় পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছিলেন। একাধিক রাজ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া আইন প্রণীতও হইয়াছে। এই রাজ্যগুলি হইল উত্তর প্রদেশ (৬¼ একর), দিল্লী (৮ একর), মধ্যভারত (১৫ একর), ভূপাল (২.৫ একর), বিন্ধ্য-প্রদেশ (৫ একর জলসেচ সমন্বিত জমি এবং ১০ একর শুষ্ক জমি)। হায়দ্রাবাদ এবং রাজস্থানেও অনুরূপ আইন প্রণীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৫ সালের ভূমি সংস্কার আইনে সরকার কর্তৃক জমির ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে কোন জমি এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তনে নামিয়া আসিবার পর শরিকদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য উহাকে আর টুকরা করা যাইবে না; এরূপ ক্ষেত্রে জমি বিক্রয় করিয়া দিয়া নগদ অর্থ বণ্টিত করা হইবে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং পেপ্সু'তে এ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারকে জমির ন্যূনতম আয়তন নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

(২) **প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা**—প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় খণ্ডিত জমিগুলিকে পারস্পরিক হস্তান্তরের দ্বারা বৃহত্তর খণ্ডে পরিণত করা। ইহাকেই জমির সংহতি সাধন (Consolidation of holdings) রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সংহতি সাধনের অবলম্বিত পদ্ধতি—বিভিন্ন রাজ্যে সংহতি সাধনের জন্য অবলম্বিত পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পেপসু, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লী এই রাজ্যগুলিতে সংহতি সাধনের আইন প্রণীত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যবস্থা আছে যে যদি কোন এলাকার একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অধিবাসী জমির সংহতি সাধন চাহে, তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মালিকদিগের উপর আংশিকভাবে সরকার

বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। উত্তর প্রদেশে মুজাফরনগর এবং সুলতানপুর জিলায় বিক্ষিপ্ত জমির বাধ্যতামূলক সংহতির কার্য্যক্রম চালু করা হইয়াছে। যাহারা উহার দ্বারা উপকৃত হইবে তাহারাই উহার ব্যয়ভার বহন করিবে। ক্রমশঃ এই কার্য্যক্রম ঐ রাজ্যের অন্যান্য অংশেও সম্প্রসারিত হইবে। তবে উত্তর প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে অনেক সংহতি সমবায় সমিতির দ্বারা সাধিত হইতেছে। বোম্বাই, পেপসু, দিল্লী এবং কিছু পরিমাণে পাঞ্জাবে সংহতি সাধনের কার্য্য রাজ্যসরকারদিগের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যে জমি সাব্‌লেট করা নিষিদ্ধ হইয়াছে; কোন কোন রাজ্যে জমি সাব্‌লেট করিলে প্রজা ঐ জমিতে কিছুটা স্বত্ব অর্জ্জন করিবে এইরূপ বিধান জারী করিয়া সাব্‌লেট বন্ধের চেষ্টা হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যে সরকার নিয়ম করিয়াছেন যে চাষের জমি একটি নির্দ্দিষ্ট কালের বেশী সময় পর্য্যন্ত অকর্ষিত থাকিলে সরকার ঐ জমি লইয়া লইতে এবং চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ১৯৫৫ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ অবধি কতিপয় রাজ্যে সংহতি সাধন সম্পর্কে যেরূপ অগ্রগতি হইয়াছে সে সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য দেওয়া যাইতে পারে: পাঞ্জাব—৪০ লক্ষ একর; মধ্য প্রদেশ—২৫ লক্ষ একরের উপর; পেপসু—১০ লক্ষ একরের উপর; বোম্বাই—১০৬০টি গ্রাম; দিল্লী—২১০টি গ্রাম; উত্তর প্রদেশ—২১টি জিলায় কার্য্য চলিতেছিল। সুতরাং দেখা যায় এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে দৃষ্টি প্রদান করিলেও সুফল খুব বেশী কিছু পাওয়া যায় নাই।

আর একটি প্রতিকারমূলক উপায় হইল কোন একজন ব্যক্তি কতখানি জমির মালিক থাকিতে পারে তাহার একটি উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। ইহার উপরকার জমি রাষ্ট্র লইয়া লইতে পারে এবং ভূমিহীন চাষীদিগের মধ্যে বিলাইতে পারে, বা অতি ক্ষুদ্র টুকরা জমির সহিত যোগ করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তনের জমিতে পরিণত করিয়া দিতে পারে। কোন কোন রাজ্যের জমির এইরূপ উর্দ্ধতম সীমা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে যথা, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যভারত। পশ্চিমবঙ্গের "জমিদারী উচ্ছেদ আইনে" এবং 'ভূমি সংস্কার আইনে' এইরূপ উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য ৩৩ একর এবং রায়তদিগের জন্য ২৫ একর।

সারাংশ

কৃষির গুরুত্ব—এদেশে কৃষিকার্য্যের গুরুত্ব অসাধারণ কারণ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৮·২ ভাগ ব্যক্তির উপজীবিকা হইল পশুপালন সমেত কৃষি। আবার শুধু কৃষকেরই নহে, জনগণের অন্যান্য অংশের আর্থিক অবস্থা এবং সরকারের অর্থ ব্যবস্থা কৃষিকার্য্যের সাফল্য ও অসাফল্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে কৃষি নিছক একটি পেশাই নহে—"ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু কোটি ব্যক্তির চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করিয়াছে এরূপ একটি জীবনদর্শন" (ফিসক্যাল কমিশন)।

প্রধান কৃষিজাত ফসল—প্রধান কৃষিজাত ফসল মোট ৪ প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে (ক) খাদ্যশস্য (খ) বাণিজ্য ফসল (গ) বিবিধ প্রকার তৈলবীজ (ঘ) পানীয় ও ভেষজ।

খাদ্যশস্যের মধ্যে আছে (১) চাউল—৭½ কোটি একর জমিতে প্রায় ২½ লক্ষ টন (২) গম—২৫ লক্ষ টন (৩) আখ—৫৫ লক্ষ টন গুড় (৪) নীবার (জোয়ারও বজরা)—১ কোটি ৬২ লক্ষ টন (৫) ডাইল—১ কোটি ৫ লক্ষ টন (ছোলা সমেত)।

বাণিজ্য ফসলের মধ্যে আছে (১) তুলা—৩৩ লক্ষ গাঁইট (২) পাট ৪০ লক্ষ গাঁইট। তৈলবীজ—তিল, তিসি, রেড়ি, সরিষা, চিনাবাদাম, নারিকেল, তুলাবীজ। পানীয় ও ভেষজ—চা (৫০ কোটি পাউণ্ড), কফি (৩½ কোটি পাউণ্ড), তামাক (৬ লক্ষ টন), সিন্‌কোনা, গাঁজা প্রভৃতি।

কৃষির অনগ্রসরতা ও ইহার কারণ—অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের দেশে জমি পিছু কৃষি উৎপাদন কম, যথা প্রতি একরে এদেশে গড় চাউল উৎপাদন ৭২৯ পাউণ্ড কিন্তু চীনদেশে উহা ১৪০০ পাউণ্ড। গম উৎপাদন ৭১৬ পাউণ্ড কিন্তু মিশরে উহা ১৯২৮ পাউণ্ড। কৃষির এই অনগ্রসরতার অনেক কারণ আছে—এই কারণগুলি জমি, শ্রমিক, পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট। জমির ক্ষেত্রে ত্রুটি হইল (১) বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা এবং যথেষ্ট সেচ ব্যবস্থার অভাব (২) খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা (৩) জমির উন্নতি বিধানের চেষ্টা নাই (৪) বহু চাষযোগ্য জমি পতিত আছে। শ্রমিকের ক্ষেত্রে ত্রুটি হইল (১) শিক্ষার অভাবে রক্ষণশীল (২) অর্থের অভাবে হীনস্বাস্থ্য (৩) ঋণজালে আবদ্ধ। পুঁজির ত্রুটি হইল (১) চল্‌তি পুঁজির অভাব (২) থোক্ ব্যয় প্রয়োজন হইলে মাঝারী মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাওয়া কঠিন। সুতরাং অধিক পুঁজি প্রয়োগে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। (৩) বৈজ্ঞানিক বা আধুনিক পুঁজি সামগ্রীর ব্যবহার নাই। ব্যবস্থাপনার ত্রুটি হইল (১) নিছক ভরণপোষণমূলক চাষ (Subsistence Farming)

(২) উন্নত ধরণের সংগঠন নাই (৩) ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদন (৪) শস্য রক্ষার ব্যবস্থা নাই (৫) বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটির দরুণ চাষী ভাল দাম পায় না এবং সেইজন্য ভাল উৎপাদনে উৎসাহ পায় না।

কৃষি উন্নয়নের পদ্ধতি—কৃষি উন্নয়নের জন্য উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূর করিবার এবং নানাদিক হইতে কৃষকদিগকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১) জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থা, (২) আইন ও সমবায়ের দ্বারা খণ্ডীকরণও অসম্বদ্ধতার প্রতিকার, (৩) সার সরবরাহ, (৪) পতিত জমি আবাদের ব্যবস্থা, (৫) চাষীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, (৬) স্বাস্থোন্নয়নের ব্যবস্থা, (৭) ঋণ হইতে উদ্ধারের ব্যবস্থা এবং সস্তায় ধার দিবার ব্যবস্থা, (৮) জমির উন্নয়নে উৎসাহ দান, (৯) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া এবং উহাদের সুফল দেখাইয়া দেওয়া, (১০) আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন, (১১) পতঙ্গপালের হাত হইতে শস্য রক্ষা, (১২) সমবায় চাষ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া দক্ষ ও বৃহৎ আয়তনের উৎপাদন, (১৩) বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি বিধান।

চাষ জমির সম্প্রসারণ—কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির আর একটি উপায় হইল বাড়তি জমিতে চাষ করা। এদেশে প্রায় ৭ কোটি একর জমি আছে, যেগুলি চল্‌তি অনাবাদী জমি এবং ১১ কোটি একরেরও বেশী জমি আছে যাহাতে চাষ হয় নাই কিন্তু হইতে পারে। চল্‌তি অনাবাদি জমিতে বর্ত্তমানে চাষ না হইবার কারণ প্রথমতঃ মাটির উর্ব্বরতা ক্ষয়, দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত জলাভাব, তৃতীয়তঃ শরিকদের মধ্যে বিবাদ, চতুর্থতঃ ক্ষুদ্র আয়তন ও দূর অবস্থান, পঞ্চমতঃ চাষ পোষাইলেও ফসল বিক্রয়ে অসুবিধা, ষষ্ঠতঃ রোগ আক্রমণ। অন্যান্য জমি অনাবাদী হইবার কারণ প্রথমতঃ জলাভূমি, দ্বিতীয়তঃ পরিবহনের অভাব, তৃতীয়তঃ ঘন আগাছা, চতুর্থতঃ মৃত্তিকা ক্ষয়, পঞ্চমতঃ মহামারিতে পরিত্যক্ত, ষষ্ঠতঃ ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন। বিভিন্ন কারণে এই সকল জমি চাষের অধীনে আনা উচিৎ। প্রথমতঃ খাদ্য শস্য বৃদ্ধির প্রয়োজন, দ্বিতীয়তঃ শিল্পোন্নতির জন্য কাঁচা মাল প্রয়োজন, তৃতীয়তঃ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য প্রয়োজন, চতুর্থতঃ উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে সহায়তা হইবে। সম্প্রতি চাষ জমি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে ভারত সরকার পতিত জমি উদ্ধারের একটি কার্য্যক্রম স্থির করিয়াছিলেন। প্রথম পরিকল্পনাকালে ৪ বৎসরে ২৪ লক্ষ একর জমি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ট্রাক্টর সংগঠনগুলির দ্বারা উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৫০ লক্ষ একর জমি কৃষকদের দ্বারা উন্নত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে যে ১৫ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার করা হইবে এবং ২০ লক্ষ একর জমিতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা হইবে। তবে চাষজমি বৃদ্ধির অবকাশ আমাদের এই প্রাচীন দেশে খুব বেশী নহে। সুতরাং পুরানো জমিতে উন্নত ব্যবস্থাপনার প্রবর্ত্তন করাই একান্ত প্রয়োজন।

জলসেচ ব্যবস্থা—কৃষিকার্য্যের সাফল্যের জন্ম এদেশে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব খুবই বেশী। কারণ এখানে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নিয়মিত নহে, নিশ্চিত নহে এবং পর্য্যাপ্তও নহে। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে সেচ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আধুনিক সময়ে অবশ্য ইহার আরও সম্প্রসারণের দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে। এদেশে বিভিন্ন পর্য্যায়ের সেচ কার্য্য আছে; (১) কূপ (১৬,৪৫,৭০০০ একর) সাধারণ পাতকুয়া ছাড়া নলকূপও আছে। প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব্বে ২২ হাজার সেচ নলকূপ ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে ৪,৫২২টি নলকূপ বসান হইয়াছে। (২) পুষ্করিণী (৫৮ লক্ষ ৫৭ হাজার একর) (৩) খাল (২ কোটি ২৫ লক্ষ একর); খাল তিন প্রকারের (ক) প্লাবন খাল (মাদ্রাজ) (খ) নিত্য বহ খাল (মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব) (গ) সঞ্চয় বিশিষ্ট খাল (দাক্ষিণাত্য এবং মধ্যপ্রদেশ)।

সেচ কার্য্যের পর্য্যাপ্তি—অবিভক্ত ভারতে জলসেচ ব্যবস্থা আছে এরূপ জমির পরিমাণ ছিল ৭ কোটি একর জমি। বহু অঞ্চলেই এই সেচ ব্যবস্থা কৃষির উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে; বিশেষ করিয়া গত এক শতাব্দী ধরিয়া গম এবং আখের উৎপাদন বৃদ্ধির ইহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। সেচ ব্যবস্থার প্রসার হইলেও কিন্তু দেশ বিভাগের দরুণ অনেক ভাল ভাল সেচ ব্যবস্থার এলাকা পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সেচ ব্যবস্থা আছে এরূপ জমির মোট আয়তন ছিল ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর। ইহা তখনকার মোট চাষ এলাকার ১৭.৫ শতাংশ মাত্র ছিল। সুতরাং অনেক জলসেচ ব্যবস্থা থাকিলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা ছিল অনেক কম। প্রথম পরিকল্পনাকালে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের অনেক আয়োজন করা হইয়াছিল, ফলে প্রথম পরিকল্পনাকালে ১২ কোটি একর জমিতে নূতন সেচকার্য্য সম্ভব হইয়াছে এবং মোট চাষ এলাকার মধ্যে সেচ এলাকার অংশ ১৭.৫ শতাংশ হইতে ২০ শতাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বড ও মাঝারি পরিকল্পনাগুলির দ্বারা ১ কোটি ২০ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে এবং ছোট সেচ কার্য্যের দ্বারা ৯০ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে জলসেচ হইবে। ইহা ছাডাও ৩,৫৮১টি নলকূপ বসাইবার কর্ম্মসূচী রহিয়াছে।

বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা—বড বড় নদীগুলিকে নানা উদ্দেশ্যেই কাজে লাগান যাইতে পারে। উহার দ্বারা একই সঙ্গে বহু প্রকারের কাজ পাওয়া যায়। এই ধরণের কতিপয় পরিকল্পনা আমাদের দেশে কার্য্যকরী করা সুরু হইয়াছে। ইহাদের বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে রহিয়াছে (১) জলসেচ (২) বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন (৩) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (৪) নৌচলাচল (৫) বনসৃষ্টি (৬) মৎস চাষ (৭) ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ।

দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনা—দামোদর নদী বাংলা দেশে এবং বিহারে বহু অঘটন ঘটাইয়া থাকে (বন্যা) অথচ প্রয়োজনের সময়ে সন্নিহিত অঞ্চলের লোকেরা জল পায় না। সেই কারণে দামোদর নদীকে বাঁধিবার এক ব্যাপক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই নদীকে নানাভাবে কাজে লাগান হইবে। এই কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হইয়াছে (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন)। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল চারিটি (১) বন্যা ও উর্ব্বরতা ক্ষয় প্রতিরোধ (২) জলসেচ (৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন (৪) নৌ চলাচল। এই পরিকল্পনার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া-গিয়াছে।

অন্যান্য বহুমুখী পরিকল্পনা—(১) হীরাকুঁদ বাঁধ (২) ভাক্রা নাঙ্গল (৩) ময়ুরাক্ষী (৪) মাচকুঁদ (৫) তুঙ্গভদ্রা (৬) নাগার্জ্জুনসাগর (৭) কোশী (৮) চম্বল।

জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা—আমাদের দেশে চাষের জমি ক্রমশঃই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। ফলে গড়ে একজন লোকের যত পরিমাণ জমি আছে তাহা অত্যন্ত কম, যথা বাংলায় ৩ একর, উত্তর প্রদেশে ২.৫ একর। ইহার নাম খণ্ডীকরণ। আবার এই ক্ষুদ্র জমিও একত্রিত ভাবে নাই, এখানে খানিকটা ওখানে খানিকটা ছড়াইয়া আছে—ইহার নাম অসম্বদ্ধতা। এইরূপ খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার অনেক কারণ রহিয়াছে। (১) উত্তরাধিকার আইন (২) দেশীয় শিল্পের বিনাশ (৩) জনসংখ্যার বৃদ্ধি (৪) একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভাঙ্গন (৫) দেনার দায়ে ও খাজনার দায়ে জমি বিক্রয়। জমির এই খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার অনেক কুফল আছে—ইহার দরুণ (১) বৃহৎ আয়তনের চাষ সম্ভব হয় না (২) জমির দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন সম্ভব হয় না (৩) বহু জমির অপচয় হয় (৪) কৃষিকার্য্যের তদারকির অসুবিধা (৫) বিভিন্ন টুক্‌রা জমিতে ঘুরিবার দরুণ সময়ের অপচয়। এই সমস্যার সমাধানের কতিপয় প্রস্তাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ উত্তরাধিকার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন; দ্বিতীয়তঃ একত্রিত চাষের আয়োজন; তৃতীয়তঃ টুক্‌রা জমির একত্রীকরণ (সংহতি সাধন)। খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে কতকগুলি আছে প্রতিশেধমূলক (Preventive) এবং কতকগুলি আছে প্রতিকারমূলক (Corrective)। প্রতিশেধমূলক ব্যবস্থা হইল জমিকে একটি ন্যূনতম আয়তনের নীচে খণ্ডিত হইতে না দেওয়া। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হইল খণ্ডিত জমিগুলিকে পারস্পরিক হস্তান্তরের দ্বারা একত্রিত খণ্ডে পরিণত করা। ইহা বাধ্যতামূলক অথবা ইচ্ছামূলক হইবে। আর একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হইল জমির উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া। বাড়তি জমি ক্ষুদ্র জমির সহিত যোগ করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তনে আনা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষিকার্য্য ঃ ঋণগ্রস্ততা, ঋণব্যবস্থা ও বিক্রয়ব্যবস্থা

Agriculture : Indebtedness, Finance & Marketing

কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার সমস্যা—Problem of Agricultural Indebtedness

আমাদের দেশে কৃষককুল গভীরভাবে ঋণজালে আবদ্ধ। তাহারা মহাজন-দিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋণের সুদ দিতে দিতেই জীবন অতিবাহিত করিয়া দেয়, আসল পরিশোধ করা হইয়া উঠে না। ভারতের কৃষক "জন্মগ্রহণ করে ঋণের মধ্যে ; ঋণের মধ্যেই সে জীবন অতিবাহিত করে, এবং ঋণের মধ্যে থাকিয়াই সে মৃত্যুবরণ করে।" ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তদন্ত কমিটি অনুমান করিয়াছিলেন যে সমগ্র ভারতে কৃষকদিগের ঋণের পরিমাণ ছিল ৯০০ কোটি টাকার মতন। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল মাদ্রাজ প্রদেশে। সেখানে কৃষিগত ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি টাকা। বাঙ্গালায় এই ঋণের পরিমাণ ছিল একশত কোটি টাকার মতন। ব্যাঙ্ক ব্যবসায় তদন্ত কমিটি যে সময়ে এই হিসাব করিয়াছিলেন তাহার পরবর্ত্তীকালে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়—কারণ উহার পর হইতে ক্রমশঃই বাজার মন্দা হইতে থাকে। কৃষকদিগের এই বিপুল ঋণভার আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি সমস্যা। কারণ এই অত্যধিক গুরুভার বহন করিতে বাধ্য হইয়া কৃষক যথাযথভাবে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিতে বা কৃষির উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হয় না। কৃষক-দিগের এই ঋণকে "গ্রাম্য-ঋণ"ও (Rural indebtedness) বলা হইয়া থাকে।

কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার কারণ—Causes of Agricultural Indebtedness

Q. Analyse the causes of agricultural indebtedness in India. (B. A. 1936, '49 ; B. Com. 1937, '41, '46). Examine the problem of indebtedness of the Indian agriculturist. (Cal. B. Com. 1955)

আয় হইতে যখন ব্যয় সঙ্কুলান না হয় তখনই ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে কৃষকদিগের আয় অতি অল্প কিন্তু ব্যয়াধিক্যের

প্ররোচনামূলক বিবিধ বিষয় ও সামাজিক আচার রহিয়াছে। উপরন্তু ঋণ গ্রহণের উপায় বর্ত্তমান না থাকিলে ঋণগ্রস্ততা সম্ভব নহে। অতএব কৃষিগত ঋণের মোটামুটি কারণ হইল : (ক) কৃষকের আয়ের স্বল্পতা (খ) কৃষকের ব্যয় বাহুল্য (গ) ঋণপ্রাপ্তির সুবিধা।

(ক) ***আয়ের স্বল্পতা***—ভারতের কৃষকগণ অতিশয় দরিদ্র। অত্যধিক সংখ্যক ব্যক্তি কৃষির উপর নির্ভরশীল বলিয়া জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। সুতরাং এমন অবস্থা শীঘ্রই আসিয়া পড়ে যে অবস্থায় জমিতে "ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম" ক্রিয়া করিতে থাকে (Law of Diminishing Returns)। জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা সুষ্ঠু কৃষিকার্য্যের প্রবল অন্তরায়। উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহার ন্যায়-সঙ্গত অংশ কৃষকদের হস্তগত হয় না; উহার মোটা অংশ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসাদার বা ফড়ে মহাজন গ্রাস করিয়া ফেলে। কৃষিকার্য্য সারাবৎসর ধরিয়া চলে না অথচ তাহাদের পার্শ্বজীবিকার (Bye-occupation) সুবিধা নাই। সেচকার্য্য প্রয়োজন মত নাই, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুণ তাহাকে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাহার স্বাস্থ্য ভাল নহে, অসুস্থতা এবং পরিশ্রমে অক্ষমতাও (বিমুখতা নহে) তাহার আয়ের স্বল্পতার কারণ।

(খ) ***ব্যয় বাহুল্য***—অত্যধিক পরিমাণে মামলা মোকর্দ্দমার স্পৃহা কৃষকের ব্যয়বাহুল্যের অন্যতম কারণ। জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইনে বহু জটিলতা থাকার জন্য এবং বহু উত্তরাধিকারীর অস্তিত্ব থাকার জন্য বহুক্ষেত্রে মামলা-মোকর্দ্দমা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। চাষীর বলদের মৃত্যু হইলে বা লাঙ্গল ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে চাষীর পক্ষে ঋণ ভিন্ন উপায় থাকে না। সামাজিক জীবনে তাহাদের বহু অপব্যয়ও আছে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে অথবা কন্যার বিবাহে অথবা অপরাপর বিবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে তাহারা বহু অর্থব্যয় করিয়া ফেলে। পৈতৃক ঋণের গুরু বোঝাও তাহাদিগকে বহন করিতে হয় এবং প্রতি বৎসর তাহার দরুণ সুদ বাবদ বহু টাকা প্রদান করিতে হয়; এই সুদের হারও অত্যধিক। ব্রিটিশ সরকার যে ভূমি রাজস্ব আদায় করিতেন তাহা সমসাময়িক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অত্যধিক ছিল। দরিদ্র কৃষকগণ এত উচ্চহারে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িত।

(গ) ***ঋণপ্রাপ্তির সুবিধা***—গ্রামাঞ্চলের মহাজনদিগের নিকট কৃষকগণ ঋণ চাহিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা পাইয়া থাকে। দুই একজন এইরূপ মহাজনের উপস্থিতি প্রায় গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের নিকট হইতেই কৃষকগণ ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতে

ব্রিটিশ শাসন পত্তন হইবার পর হইতে বিভিন্ন কারণে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; চাষীর সম্পত্তির এই মূল্য বৃদ্ধি তাহার ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা বর্দ্ধিত করে, কারণ ইহার দ্বারা মহাজন ঋণ প্রদান করিতে অধিক প্রণোদিত হয়। অধিকন্তু ইংরাজদিগের বিচার পদ্ধতির উৎকর্ষের দরুণ, প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবার সুবিধা বৃদ্ধি পায় ; সেই কারণেও মহাজন তাহার ঋণ প্রদানের অনিচ্ছাকে অধিক অতিক্রম করিতে পারে। অবশ্য মহাজন এই ঋণের জন্য যে সুদ দাবী করে তাহা অত্যধিক—আসল অপেক্ষা সুদই তাহার নিকট অধিক মূল্যবান। কৃষকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করা মহাজনদিগের পক্ষে সহজ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে মহাজন ঋণের প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ কর্জ্জপত্রের মধ্যে লিখাইয়া লইত এবং যেহেতু সুদের হার ছিল অত্যধিক এবং সুদ প্রদানের যথারীতি রশিদ প্রদান এবং হিসাব রক্ষা সকল সময় করা হইত না সেহেতু একবার ঋণ জালে আবদ্ধ হইলে উহা হইতে বাহির হইয়া আসা কৃষকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

***কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার প্রতিবিধান*—Remedies of Agricultural Indebtedness**

Q. Suggest measures for checking such indebtedness (B. Com. 1955).

কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার প্রতিবিধানমূলক যে সকল ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেগুলি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

(ক) কৃষকদিগের আয়বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাই কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার প্রধান প্রতিবিধান। কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধি হইলে তবেই তাহারা পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগের আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান হইলে তাহাদিগের পক্ষে কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। ব্যয়ের উপর আয় তাহাদের যতই অধিক থাকিবে ততই তাহাদের সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই অনুপাতে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হ্রাস পাইবে। অবশ্য এই বিষয়টি বড়ই জটিল, কারণ কৃষকের আয় বৃদ্ধি নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতির উপরে, ইহার জন্য বিস্তারিত, সুষ্ঠু এবং বলিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য জমির সংহতি সাধন, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার এবং উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রয়োজন।

(খ) কিন্তু পুরাতন ঋণের বোঝা যতদিন কৃষকদিগকে বহন করিতে

হইবে ততদিন উন্নয়নমূলক কার্য্যগুলি সুসাধিত করা কষ্টকর হইবে এবং তাহার সুফলগুলি বহুলাংশে বাতিল হইয়া যাইবে। অতএব পুরাতন যে ঋণ রহিয়াছে তাহা লাঘব করিতে হইবে। ঋণ শালিসের (Debt-conciliation) দ্বারা ইহা করা যাইতে পারে। প্রাপক ও খাতকের মধ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আপোষ করিয়া পুরাতন ঋণের হ্রাস করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সহজ কিস্তিবন্দিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।

(গ) মহাজনদিগের অপপদ্ধতি (malpractices) বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মহাজনদিগকে লাইসেন্স করাইয়া তাহাদিগকে বাধ্য করিতে হইবে যাহাতে তাহারা যথাযথ হিসাব রাখে এবং যথাযথ সুদ প্রদানের ও আসল পরিশোধের রসিদ প্রদান করে। তাহাদের সুদের হারও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ তাহাদিগকে উৎখাত করিলে কৃষকদিগেরই অনিষ্ট হইবে। কৃষকদিগের পক্ষে দুঃসময়ে মহাজনদিগকে প্রয়োজন হইবে। কৃষিগত অর্থনীতিতে গ্রাম্য মহাজনদিগের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বাস্তবক্ষেত্রে অস্বীকার করা যাইবে না।

(ঘ) ইতিমধ্যে অন্য উপায়ে কৃষকদিগকে অল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ শিল্পের ন্যায় কৃষিকার্য্যেও উৎপাদনের চলতি খরচার জন্য (working expenses of production) কর্জ্জ করা প্রয়োজন হইবে। এই উদ্দেশ্যে সমবায় ঋণদান সমিতির প্রসার প্রয়োজন।

(ঙ) উৎপন্ন সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। বিক্রীত সামগ্রীর দামের একটি ন্যায্য অংশ যাহাতে কৃষকদিগের হস্তগত হয় সেই উদ্দেশ্যে বিক্রয় ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করিতে হইবে।

(চ) ধর্ম্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কৃষকদিগের যে ব্যয় বাহুল্যের অভ্যাস আছে তাহা দূর করিতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষার বিস্তার এবং উপযুক্ত প্রচারকার্য্য প্রয়োজন। উপযুক্ত আইন প্রণয়নও প্রয়োজন হইতে পারে।

গ্যাডগিল কমিটি (Agricultural Finance Sub Committee) প্রস্তাব করেন যে বাধ্যতামূলক ভাবে আসলের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া "জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক"গুলির মাধ্যমে উহা পরিশোধের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু উহার অসুবিধা হইল একসঙ্গে এত পরিমাণ অর্থ বাজারে সংগ্রহ করা বর্ত্তমান টাকার বাজারে সম্ভব নহে; শুধু তাহাও নহে, উহা করিতে হইলে চলতি কৃষি ঋণের সমগ্র অংশই সরবরাহ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, উহাও সম্ভব নহে।

অবলম্বিত ব্যবস্থা—Measures that have been adopted

Q. To what extent has the debt legislation recently enacted in the different provinces helped to solve the problem ? (B. Com. 1941). What steps have been taken by the Government to solve this problem of indebtedness ? (B. A. 1949). What are the main objects of debt legislation in India ? How far have they been successful ? (B. A. 1952).

কৃষিগত ঋণ-গ্রস্ততার ব্যাপকতা ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ইহার প্রতিবিধানের জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, তাঁহারা কৃষকদিগকে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে "ভূমি উন্নয়ন ঋণ বিধি" (Land Improvement Loan Act of 1883) প্রণীত হয় ; ইহার দ্বারা ভূমির কোন স্থায়ী উন্নতি বিধানের জন্য কৃষককে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হয় ; পরবৎসর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "কৃষকদিগের ঋণ বিধি" (Agriculturists Loan Act of 1884) প্রণীত হয়। ইহার দ্বারা কৃষককে চল্‌তি খরচার জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্ত্তীকালে সরকারী উদ্যোগে সমবায় সমিতি স্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা আইন প্রণয়নের দ্বারা কৃষকদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। "দাক্ষিণাত্য কৃষক পরিত্রাণ বিধির" (Deccan Agriculturists Relief Act) দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে নির্দ্দিষ্টভাবে যদি দায়-বদ্ধ না থাকে তাহা হইলে কৃষকের জমি ঋণের দায়ে বিক্রয় করা যাইবে না ; ইহা অত্যধিক সুদের হারও হ্রাস করিয়াছিল। উপরন্তু এই আইনের দ্বারা ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার দরুণ কৃষককে কয়েদ করিবার ব্যবস্থা রহিত করা হইল এবং প্রাপক ও খাতকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধনের জন্য আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া হইল।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রদেশে মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই সকল আইনের দ্বারা কৃষককে প্রদত্ত ঋণের সুদের হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মহাজনদিগকে লাইসেন্স করাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মহাজনেরা যাহাতে রীতিমত হিসাব রাখে এবং সুদ ও আসল প্রদানের যথাযথ রসিদ প্রদান করে তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, ঋণের দায়ে সহজে যাহাতে জমি হস্তান্তরিত হইতে না পারে কোনো কোনো প্রদেশে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল মহাজনেরা ঋণের দায়ে জমি দখল লইতে পারিবে না, ইহা জানিলে

তাহারা অত্যধিক ঋণপ্রদানে বিরত হইবে; অপরদিকে কৃষকগণ জমি হারাইয়া নিঃস্ব হইতে বাধ্য হইবে না।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্নপ্রদেশে ঋণ সালিশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ঋণ সালিশ বোর্ড গঠন করা হয়। ইহার মধ্যস্থতায় পুরাতন ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিয়া উহা সহজ কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বেই একাধিক প্রদেশ এইরূপ আয়োজন করিয়াছিল যথা মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, আসাম এবং মাদ্রাজ। কোন কোন প্রদেশে বাধ্যতামূলকভাবে আসলের পরিমাণ কমাইয়া দিবার এবং সুদ বা আসল মকুব করাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—যথা মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই এবং যুক্তপ্রদেশ (১৯৩৯)।

বিভিন্নপ্রদেশের এই সকল ঋণ সংক্রান্ত আইন ঋণ লাঘবের ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। কারণ প্রত্যেক দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও চলতি কৃষিকার্য্যের জন্য কৃষকদিগের পক্ষে কর্জ্জ করা প্রয়োজন হইবেই। পুরাতন ঋণ লাঘব করা প্রয়োজন কিন্তু সেই সঙ্গে নূতন ঋণ সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অধিকন্তু মহাজনদিগকে আইনের দ্বারা বাঁধিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং কিন্তু গ্রাম্য অর্থনীতিতে এখনও যে মহাজনদিগের সবিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে এবং বহুকাল অবধি যে তাহাদের কাজ বা কারবার গ্রাম্য চাষীদের পক্ষে প্রয়োজন হইবে তাহা উপলব্ধি করা হয় নাই। গ্রামে ঋণ সরবরাহের সন্তোষজনক বিকল্প ব্যবস্থা করা হইলেও উহার মধ্যে গ্রাম্য মহাজনদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে।

কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার বর্তমান অবস্থা—Present Condition of Agricultural Indebtedness

যুদ্ধের মধ্যে এবং যুদ্ধোত্তর কালে কৃষিগত ঋণগ্রস্ততার হ্রাস হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কর্ণাটক এবং দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এসম্পর্কে একটি অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪ সালের মধ্যে গ্রাম্য ঋণগ্রস্ততার বেশ কিছু হ্রাস ঘটিয়াছিল। তবে ইহার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস ঘটিয়াছিল বৃহৎ কৃষিজীবিদের ক্ষেত্রে; ক্ষুদ্র কৃষিজীবিদিগের ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ততার হ্রাস হইয়াছিল অল্পই। অর্থনীতিক ডাঃ বি, ভি, এন, নাইডু মাদ্রাজে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে তথায় কৃষি-ঋণ প্রায় শতকরা ২০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ঋণগ্রস্ততার হ্রাস অধিকাংশই ঘটিয়াছে বৃহত্তর কৃষিজীবিদিগের ক্ষেত্রে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিতে

ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হইতেও কৃষিঋণের হ্রাস অনুমান করিতে পারা যায়। ১৯৫০ সালে "গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি" বলিয়াছিলেন "যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা গ্রাম্য ঋণের মুদ্রানুযায়ী বোঝা এবং যথার্থ বোঝার বেশ কিছু হ্রাস ঘটিয়াছে এবং বর্ত্তমানে সম্ভবতঃ অধিকাংশ কৃষিজীবিই তাহাদের ঋণ আরও সহজে বহিতে সক্ষম।" ["War and post-war inflation had led to a substantial reduction in the money and real burden of rural debt and the majority of the cultivators are now probably in a position to bear their debts more easily "] এই কমিটি আরও বলিয়াছেন, যে কৃষিঋণের পরিমাণ এখনও অধিক হইলেও উহার অধিকাংশই চল্তি ঋণ—অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের চল্তি পুঁজি।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর কৃষি শ্রমিকদিগের সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই অনুসন্ধান হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কৃষি শ্রমিক পরিবারদিগের শতকরা ৪.০ ভাগ ঋণগ্রস্ত এবং পরিবার পিছু গড় ঋণগ্রস্ততা (average indebtedness per indebted family) হইল ১০৫ টাকা। গরওয়ালা কমিটি দেখিয়াছিলেন যে গ্রামের গড় হিসাবে (village average) পরিবার পিছু ঋণ হইল ২৯৲ টাকা হইতে ১২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত; জিলার গড় হিসাবে (district average) পরিবার পিছু ঋণ হইল ১০০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা।

*কৃষিকার্য্যে অর্থসরবরাহ সমস্যা—Problem of Agricultural Finance

Q. What are the main sources of supply of rural credit in India ? (B. A. 1955). Examine the existing agencies for financing agriculture in India. What have been their limitations ? What steps have been taken in recent years to remove them ? (Patna 1956)

কৃষিকার্য্যে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন—যথাযথ ব্যবস্থা না থাকিলে ত্রুটিবহুল কোন না কোন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবেই। কিন্তু কৃষিকার্য্যে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে, উন্নত কৃষিকার্য্য সম্ভব হয় না। সেই কারণে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে সমস্যার উদ্ভব ঘটে।

শিল্পের ন্যায় কৃষিকার্য্যে দীর্ঘমেয়াদী (long term) এবং স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী (Short cum medium term) ঋণের প্রয়োজন হয়।

*এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য "গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমস্যা : গ্রাম্য ঋণ" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ঐ অধ্যায়ে গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি কি করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা আছে।

স্বল্প মেয়াদী ঋণ—যে সকল ব্যয় চল্‌তি খরচা বলিয়া গণ্য করা হয় সেই সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য কৃষকগণ যে ঋণ গ্রহণ করে তাহাই স্বল্প মেয়াদী ঋণরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। বীজ এবং সার ক্রয় করা, শ্রমিক-দিগকে মজুরী দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের জন্য এই অর্থ প্রয়োজন হয়। ঐ বৎসরের ফসল বিক্রয় করিয়া এই চল্‌তি ব্যয় উসুল করিয়া লইতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে হয়। সেই জন্যই এই ঋণের মেয়াদ অল্প কালের।

মাঝারি মেয়াদী ঋণ—যে সকল ঋণের মেয়াদ দুই হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেইগুলিকে মাঝারি মেয়াদী ঋণ বলা হইয়া থাকে। এই ঋণের অর্থ ঠিক চল্‌তি খরচারূপে ব্যয় করা হয় না, বেশ কিছুকালের জন্য চাষের সুবিধা হইবে এরূপ কার্য্যে উহা ব্যয় করা হয়; যথা, কূপ খনন, বলদ ক্রয় ইত্যাদি।

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ—মাঝারি মেয়াদী অপেক্ষাও বেশী সময়ের জন্য যে ঋণ চলিবে তাহাকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বলা হয়। এই ঋণের মেয়াদ সাধারণতঃ ১০ হইতে ২০ বৎসরের মত। দামী যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য, বা নূতন জমি কিনি-বার জন্য, বা পুরাতন পৈতৃক ঋণের বোঝা শোধ করিয়া নূতনভাবে আরম্ভের জন্য একসঙ্গে বেশী পরিমাণ ঋণের যে চাহিদা হয় তাহাই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ।

কিন্তু আমাদের কৃষিকার্য্যের একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকিবার দরুণ, উহাতে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং ক্ষুদ্র আয়তনের; অল্প সঙ্গতি বিশিষ্ট কৃষি মালিক স্বয়ং এবং ভাড়া করা শ্রমিকের সাহায্যে জমি চাষ করিয়া থাকে। যৌথ খামার (collective farming) বা বৃহৎ কৃষি ব্যবস্থা নাই। সুতরাং কৃষক কোন বৃহৎ বা মূল্যবান জামিন (security) প্রদান করিতে পারে না। অধিকন্তু কৃষিকার্য্যে খুব অধিক লাভ হয় না এবং টাকাও খুব শীঘ্র ফিরৎ আসে না। কৃষকগণ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত—সুতরাং যথাযথ সুদ আদায় এবং আসল আদায় দুষ্কর এবং হিসাব বুঝানোও অনেক সময়ে কষ্টকর। এই সকল কারণে, কৃষকদিগের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখিতে পারে কেবলমাত্র এরূপ ব্যক্তিই কৃষিকার্য্যে ঋণ সরবরাহ করিতে সক্ষম।

সুতরাং গ্রামের মহাজন এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণই কৃষিঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। তবে সমবায় সমিতি স্থাপনের দ্বারা এবং সরকার কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবেও কৃষিঋণ যোগান দেওয়া হইয়া থাকে। বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক (commercial banks) ঠিক উৎপাদনমূলক ব্যয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে না। ফসল ক্রয়বিক্রয় কার্য্যের জন্য উহারা ব্যবসায়ীদিগকে ঋণ দিয়া থাকে। মহাজনরা জামিন লইয়া এবং কখন

কখন বিনা জামিনে কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান করে। সুদের হার শতকরা ১২৲ হইতে ৫০৲ টাকা এবং বকেয়া সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে হিসাব করা হয়। স্থান কাল পাত্রভেদে সুদের হারের পার্থক্য ঘটে। মহাজনদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক কুখ্যাত অপকার্য্য আছে—সেই কারণে বর্ত্তমানে সরকার ইহাদের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ বিশেষ বিশেষ জাতিভুক্ত এবং পারিবারিক ব্যবসা হিসাবে ইহারা ব্যাঙ্কিং কার্য্য করিয়া থাকে।

মহাজন ও দেশীয় ব্যাঙ্কার (অনেক সময়ে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানা সম্ভব হয় না) ছাড়া কৃষিঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিও কিছু কিছু কার্য্য করিয়া থাকে। বস্তুত:পক্ষে আমাদের সমগ্র সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলিই সংখ্যায় ও কার্য্যে বেশী গুরুত্বপুর্ণ। সমবায় সমিতিগুলির নিকট হইতে অনেক কিছুই আশা করা হইয়াছিল, কারণ ইহারা গ্রামের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও সহানুভূতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। ১৯৫৩-৫৪ সালের হিসাবে এদেশে সমবায় কৃষিঋণ সমিতির সংখ্যা ছিল ১,২৬,৯৫৪ এবং ঐ সালে উহারা নূতন ঋণ দিয়াছিল ২৯.৬৯ কোটি টাকা। এই সকল কৃষিঋণ সমিতি ব্যতীত, ঐ সালে, এদেশে ২৯১টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল এবং ইহারা ঋণ দিয়াছিল ১.৪০ কোটি টাকা।

সরকার কর্ত্তৃকও কৃষকদিগকে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা অনেকদিন যাবৎই প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকার এ সম্পর্কে দুইটি আইন রচনা করিয়াছিলেন : জমি উন্নয়ন ঋণ বিধি (১৮৮৩) এবং কৃষকদিগের ঋণ বিধি (Agriculturists Loans Act), ১৮৮৪। প্রথম আইনটির আওতায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং দ্বিতীয় আইনটির আওতায় স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরকার প্রদান করিয়া থাকেন। এই ঋণকে তাকাভি ঋণ বলা হইয়া থাকে।

দেশের সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি (commercial banks) ফসল উৎপাদনে সাহায্য করিবার জন্য কৃষকদিগকে ঋণ প্রদানে অগ্রসর হয় না। বস্তুত: পক্ষে ইহারা যে ধরণের কারবার করিয়া থাকে তাহাতে চাষের কার্য্যে অর্থ সরবরাহে ইহারা যে সাহসী হইবে না উহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। ব্যাঙ্ক-গুলির পক্ষে লাভযোগ্যতা (profitability) এবং সম্পত্তির তরলতা (liquidity of assets) উভয়ই বজায় রাখিতে হইবে। এই দুইটি একই সঙ্গে বজায় রাখিয়া কৃষিকার্য্যে ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তবে ইহারা কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের কার্য্যে ঋণ দিয়া থাকে। এই ঋণ অবশ্য দেওয়া হয় বড় বড় বেপারী-দিগকে, যাহাদিগের কার্য্য হইল কৃষিপণ্য ষ্টক করা, একস্থান হইতে অপর স্থানে চালান দেওয়া এবং খুচরা বাজারে চালান দেওয়া।

ঋণপ্রদানের এই সূত্রগুলি কতদূর ফলপ্রদ ?

বিভিন্ন সূত্র হইতে কৃষিঋণের অর্থ আসিলেও সন্তোষজনক কৃষিঋণের ব্যবস্থা এদেশে গড়িয়া উঠে নাই। এইসকল বিভিন্ন সূত্র হইতে কে কতখানি ঋণ প্রদান করিয়াছে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব গরওয়ালা কমিটি প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী মহাজন এবং সাধারণ মহাজন (অর্থাৎ সুদের ব্যবসায়ই যাহাদের প্রধান কাজ)—এই দুই ধরণের মহাজনে মোট কৃষিঋণের শতকরা ৭০ ভাগ যোগান দিয়া থাকে। কৃষিঋণের ক্ষেত্রে গ্রাম্য মহাজনদের উপর এই অত্যধিক নির্ভরতা বহুবিধকারণে অত্যন্ত কুফলপ্রসূ। ইহারা ঋণের জালে চাষীকে বাঁধিয়া ফেলে, শোষণ করে, পূর্ব্বেই দাদন দিয়া শস্য বন্ধকী করিয়া ফেলে, এবং এই সকলের দ্বারা চাষকার্য্যকে অ-লাভজনক পেশায় পরিণত করিয়া দেয়। কৃষিঋণের ক্ষেত্রে মহাজনদের এই আধিপত্য কৃষিঋণের অব্যবস্থার পরিচয় দেয়।

সমবায় সমিতিগুলি কৃষিঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ করিলেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের কার্য্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গরওয়ালা কমিটি বলিয়াছিলেন যে মোট প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণের ইহারা ৩.১ শতাংশ মাত্র যোগান দিয়া থাকে। অথচ ইহার উপর আমরা কতই না ভরসা রাখিয়াছিলাম এবং এখনও রাখিয়া থাকি। সমবায় সমিতির সহিত একত্রে যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারাও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের যোগানে কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতে পারে নাই।

১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালের আইন অনুযায়ী সরকার চাষীদিগকে যে ঋণ দিয়া থাকেন উহা মোট কৃষি ঋণের ৩.৩ শতাংশ মাত্র। এই ধরণের ঋণ নানাকারণেই জনপ্রিয় হয় নাই। এই ঋণ একটি নির্দ্দিষ্ট কাজে ব্যয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয় বলিয়া চাষীগণ ইহাকে সুনজরে দেখেনা। সরকার টাকা আদায় করেন অত্যন্ত কড়াভাবে, সুতরাং চাষীরা ভয় পায়। অধিকন্তু এই ঋণের টাকা সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে বাহির করা কষ্টকর। অবশ্য সম্প্রতি তাকাভি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা কিছুটা সুখের কথা। তবে সরকার কর্ত্তৃক সরাসরি চাষীকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নানাকারণেই অসুবিধাজনক এবং আপত্তিজনক।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এদেশে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা একটি জটিল সমস্যা, এবং যে ভাবে বর্ত্তমানে কৃষি ঋণ সরবরাহ করা হয় তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। অথচ কৃষিঋণ সরবরাহের সন্তোষজনক ব্যবস্থা না থাকিলে কৃষির উন্নতি—তথা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নহে।

গড়ওয়ালা কমিটির অভিমত—গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত শ্রী এ, ডি, গড়ওয়ালার সভাপতিত্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল সেই কমিটি তাঁহাদের বিবরণীতে (১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত) গ্রাম্য ঋণ প্রাপ্তির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই বিবরণীতে কমিটি বলেন যে গ্রাম্য ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার এবং সমবায় সমিতিগুলি যে কার্য্য করিয়া থাকে তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। গড়ে প্রতিবৎসর ভারতের কৃষককুলের ঋণের প্রয়োজন হইল ৭৫০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকার প্রদান করিয়াছেন শতকরা ৩.৩ ভাগ এবং সমবায় সমিতিগুলি প্রদান করিয়াছে শতকরা ৩.১ ভাগ মাত্র। এই অকিঞ্চিৎকর ঋণের বৃহদংশই আবার বড় চাষীগণই পাইয়া থাকে—ছোটখাটো চাষীগণ সরকার ও সমবায় সমিতিগুলির নিকট হইতে যে ঋণ পাইয়া থাকে তাহা একান্তই নগণ্য। অন্যান্য দিক হইতে বিবেচনা করিলেও যথা ঋণের টাকাকে উৎপাদনমূলক কার্য্যে নিয়োগ করা, - সরকার এবং সমবায় ব্যবস্থার কার্য্য সন্তোষজনক ঋণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কৃষকের প্রয়োজনের শতকরা ৭০ ভাগ এবং ততোধিক অংশ বেসরকারী ঋণ প্রদাতৃগণ সরবরাহ করিয়া থাকে। এই সকল মহাজনগণ দেশের একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বা সম্পদের সুসম বন্টনে কোনই সহায়তা করে না।

কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন—*Improvement of Agricultural Finance

Q Suggest some measures for improving the organisation of rural credit. (Cal. B. A. 1955). What are your suggestions for the reorganisation of rural credit in India ? (Cal. B Com. 1955).

কৃষিকার্য্যে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও কমিটির দ্বারা বিভিন্ন প্রস্তাব প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে গ্যাড্‌গিল কমিটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া কৃষি ঋণ কর্পোরেশন (Agricultural credit corporation) স্থাপন করা যাইতে পারে; যে সকল প্রদেশে সমবায় সমিতি তাহাদের প্রকৃত বা সম্ভাবিত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে—সেই সকল প্রদেশ ভিন্ন অন্যান্য সকল প্রদেশে এইরূপ সংস্থা স্থাপন করা লাভজনক হইবে। ইহার কারণ হইল যে সমবায় সমিতিগুলি গ্রামবাসীদিগের একটি নগণ্য অংশের উপকার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং অল্প কতিপয় স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্রই উহাদের কার্য্যের অসাফল্যই প্রকটিত হয়। সেই কারণে কৃষি ঋণ সংস্থারূপে একটি বিশেষ সংস্থার স্থাপন কৃষি ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকার প্রদর্শন করিতে পারে। এইরূপ সংস্থাকে স্বায়ত্তশাসনী সংগঠন রূপে (autonomous body) প্রতিষ্ঠিত করা হইবে—ইহার পুঁজির শতকরা ৫০ ভাগ সরকার প্রদান করিতে পারেন এবং অবশিষ্ট ৫০ ভাগ প্রদান করিতে

* গ্রাম্য ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে কি করা হইয়াছে তাহার আলোচনার জন্য "গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা : গ্রাম্য ঋণ" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পারে যৌথপুজি ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি ইত্যাদি। এই সংস্থা বিভিন্ন প্রকারের ঋণ প্রদানের জন্য এজেন্সি এবং শাখা স্থাপন করিবে। গ্যাড্‌গিল কমিটির এই প্রস্তাব কিন্তু প্রভাবশালী মহলে বিশেষ ব্যাপক সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। ১৯৪৬ সালের "সমবায় পরিকল্পনা কমিটি" (Co-operative Planning Committee) এই প্রস্তাবের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন; তাঁহারা বলেন যে এইরূপ সংস্থা কৃষকদিগকে যে সুবিধা প্রদান করিবে বলিয়া ধারণা করা হয় অনুরূপ সুবিধা প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক বা সমবায় কেন্দ্রীয় অর্থ সরবরাহ অন্য প্রতিষ্ঠান প্রদান করিতে পারে। সুতরাং প্রস্তাবিত সংস্থাকে যে সকল সাহায্য প্রদানের কথা বলা হইয়াছে সরকার কর্তৃক সেই সকল সাহায্য প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রদান করা হইলে পৃথক কোন সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হইবে না।

কোন কোন মহলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে ইন্‌ডাসট্রিয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশনের ন্যায় একটি কেন্দ্রীয় এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন স্থাপন করা যাইতে পারে। এই কর্পোরেশন বৃহৎ চাষীদিগকে সরাসরিভাবে অথবা সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে মাঝারী-মেয়াদী (medium-term) এবং দীর্ঘ-মেয়াদী (long term) ঋণ সরবরাহ করিবে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের ইহা শীর্ষস্থানীয় ব্যাঙ্ক রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই প্রস্তাবেরও এই বলিয়া বিরোধিতা করা হয় যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা এবং ভূমি-সংক্রান্ত আইনের বহু পার্থক্য থাকায় এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার দ্বারা ঠিক পথে কৃষি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হইতে পারে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অধিকাংশের নিকটেই কৃষি ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপায় হইল সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়ন করা,—বিশেষ করিয়া জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রসার ঘটানো। কি উপায়ে ইহা সাধিত হইতে পারে তাহা সমবায় সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচ্য, তবে একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কৃষি কার্য্যে অর্থ সরবরাহের পরিকল্পনায় যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্কগুলিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত নহে। বাস্তবক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কগুলি কৃষিসামগ্রী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বহু কোটি টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং শস্যের বন্ধকীতে কৃষকদিগকে অর্থ প্রদানের ক্ষমতা এই ব্যাঙ্কগুলির রহিয়াছে। নিয়ন্ত্রিত বাজার (Regulated Markets) স্থাপন করিলে এবং মাননির্ণয় ও শ্রেণী-বিভাজন ব্যবস্থার (standardisation and grading) উন্নতি করিতে পারিলে এই বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলি কৃষিগত অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্রমশঃই অধিক অংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে। "গ্রাম্য ব্যাঙ্কব্যবসায় অনুসন্ধানী কমিটি" (Rural Banking Enquiry Committee) একদিকে বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক এবং অপরদিকে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি

মধ্যে কৃষির ক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহের কার্য্যকে ভাগ করিয়া দিবার পক্ষপাতী— অবশ্য অভিন্ন উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য উহাদের কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা হইবে।

সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন পর্য্যায়ের ঋণদান প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতম সম্প্রসারণের দ্বারাই ভারতের কৃষির আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে পারা যায়। যথাযথ তত্ত্বাবধান করিলে এবং উত্তম ভিত্তির উপর স্থাপন করিলে সমবায় সমিতিসমূহ এই কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে। ইহাদের কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিবে একদিকে বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক এবং অপরদিকে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক। কিন্তু গ্রাম্য মহাজনদিগের উৎকৃষ্ট বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্যের পরিধি সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। গ্রাম্য ঋণ সমীক্ষার ভারপ্রাপ্ত "গরওয়ালা কমিটি" এসম্পর্কে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে গ্রামে কৃষিঋণ এবং কৃষি উন্নয়নের পদ্ধতি রূপে সমবায়ের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা প্রয়োজন। এই সাফল্য যাহাতে সম্ভব হয় সেইরূপ বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হইবে "গ্রাম্য ঋণের একত্রিত পরিকল্পনার" (Integrated Scheme for Rural Credit) দ্বারা। এই পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হইল সমবায় ব্যবস্থার বিভিন্ন সংগঠনের স্তরে রাষ্ট্রের অংশীদারি। রাজ্যসরকার গুলির দ্বারা এইরূপ অংশীদারির সহিত আরও থাকিবে সরকারগুলির সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধিকতর সহযোগিতা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা বেশ উপযুক্ত পরিমাণে অর্থসাহায্য। গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য এই কমিটি রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক স্থাপনেরও সুপারিশ করিয়াছিলেন।

কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা—Agricultural Marketing

Q. Describe the difficulties of the marketing of agricultural produce in India. Show how these difficulties can be overcome or mitigated (B. A. 1943). What measures would you suggest for removing the existing difficulties of marketing of agricultural crops in India. (B. A. 1952). Write note on agricultural marketing in India (Patna. 1955)

আমাদের দেশে কৃষি সামগ্রীর উত্তম বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব কৃষকদিগের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ। উৎপাদিত ফসল বাজারে ক্রেতাদিগের নিকট যে দামে বিক্রয় হয় উহার ন্যায্য অংশ যদি কৃষকদিগের হস্তগত হইত, তাহা হইলে সন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থা আছে বলা চলিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাষীদের উৎপাদিত ফসল যে দামে চূড়ান্ত ভোগকারীগণ কিনিয়া থাকে তাহার শতকরা ৫০ ভাগের কম চাষীদের হস্তগত হয়।

অপকৃষ্ট বিক্রয় ব্যবস্থার কারণ—(Causes of bad marketing system) অসন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য একাধিক কারণ বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

(১) কৃষকদিগের ফসল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা কম। তাহারা এতই দরিদ্র এবং ঋণভারগ্রস্ত যে ফসল উৎপন্ন হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহারা উহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ফসল উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই উহার দাম কমিয়া যায় কিন্তু পরে উহার দাম বৃদ্ধি পায়। কৃষকগণ ফসল উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি বিক্রয় না করিয়া নিজেদের কাছে উহা কিছুকাল রাখিয়া দিতে পারে তাহা হইলে পরে বর্দ্ধিত বাজার দামেই তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া বর্দ্ধিত দামের সুফলটুকু লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু কৃষকগণ তাহাদের ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয় এবং ফড়ে মহাজন বা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ উহা ক্রয় করিয়া মজুদ করিয়া ফেলে। দাম বাড়িলে ইহারা ফসল বাজারে বিক্রয় করে। এইভাবে ক্রেতারা যে দামে ফসল ক্রয় করে তাহার একটি বৃহৎ অংশ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগের হস্তগত হয়।

(২) উপরন্তু ঋণভারগ্রস্ত কৃষক প্রায়ই মহাজনের দ্বারস্থ হয়। একাধিক ক্ষেত্রে এই ঋণদাতা মহাজন হইল স্বয়ং বেপারী—এবং কর্জ্জ দিবার সময়ে মহাজন কৃষকদিগের উপর এই সর্ত্ত আরোপ করে যে কৃষক সেই বৎসর যে ফসল উৎপন্ন করিবে উহা মহাজনকেই বিক্রয় করিতে হইবে। এইভাবে বীজ-বপনের সময়েই সম্ভাবিত ফসলের বিক্রয় কার্য্য অগ্রিম সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ কর্জ্জদানকে দাদন বলা হয়। অনেক সময়ে দাদন দিবার কালে চাষী মহাজনকে কি দামে ফসল বিক্রয় করিবে তাহাও মহাজন স্থির করিয়া দেয়; এক্ষেত্রে কৃষক কর্জ্জ লইবার সময়ে মহাজনের সহিত বেশী দর কষাকষি করিতে পারে না, কারণ মহাজন অসন্তুষ্ট হইলে হয়তো কর্জ্জ পাওয়াই যাইবে না।

(৩) গ্রামগুলির মধ্যে উত্তম রাস্তা না থাকায় দূর বাজারের সহিত সংযোগ রক্ষা করা গ্রামের চাষীদিগের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। বাজারে ফসল লইয়া যাইবার মতন যানবাহনাদি রক্ষা করাও সকল চাষীর পক্ষে সম্ভব হয় না। এই সকল কারণে চাষী গ্রামের নিকটস্থ হাট-বাজারে ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। গ্রামের ফড়িয়া বা বেপারী এই ফসলের অধিকাংশই ক্রয় করিয়া লয়; ঐ সকল ফসল তাহারা দূর সহরে পাঠাইয়া অধিক দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে সক্ষম হয়; কারণ সাধারণ চাষী অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ অধিক সঙ্গতিশালী এবং তাহাদের অধিক লোকবল ও যানবাহনাদি থাকে।

(৪) কৃষকদিগের অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, বাজার দাম সম্পর্কে

তাহারা সকল সময়ে সম্যক অবহিত থাকে না—বেপারীদিগের দ্বারা প্রদত্ত দামই তাহারা যথার্থ দাম বলিয়া বিবেচনা করে। উপরন্তু তাহাদিগের অজ্ঞতার ও সরলতার সুযোগ লইয়া বেপারীগণ তাহাদের নিকট হইতে বাড়তি বা ফাউ আদায় করে এবং এইভাবেও চাষীগণ প্রবঞ্চিত হয়।

(৫) পাল্লার ওজনের মধ্যেও নানা প্রকার তারতম্য দেখা যায়। ফড়িয়াগণ অনেক সময়ে অধিক ওজনের পাল্লার সাহায্যে কৃষকদিগের নিকট হইতে ফসল ক্রয় করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওজনের পাল্লা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার দরুণ একদিকে যেরূপ কৃষকদিগের বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় অপরদিকেও সেইরূপ বেপারীদিগের পক্ষে কৃষকদিগকে প্রবঞ্চিত করা সহজসাধ্য হয়।

অপকৃষ্ট বিক্রয় ব্যবস্থার প্রতিবিধান—(Remedies of Bad Marketing System)—যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বিক্রয় ব্যবস্থার এই সকল অসুবিধা দূরীভূত করা সম্ভব।

(১) কৃষকদিগের মধ্যে যাহাতে "সমবায় বিক্রয় সমিতি" গঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা কবিতে হইবে। সমবায় বিক্রয় সমিতি কৃষকগণের ফসল একত্রিত কবিয়া যেস্থানে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দামে বিক্রয় হইতেছে সেই স্থানে—অর্থাৎ সরাসরি চূড়ান্ত ভোগকারীদের নিকট বিক্রয় করিবে; অতঃপব বিক্রয়লব্ধ অর্থ কৃষকদিগেব ফসলের পরিমাণ অনুযায়ী তাহাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে সমবায় সমিতি গঠনের দ্বারা কৃষকগণ সরাসরিভাবে ক্রেতার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে এবং বিক্রয়দামের মধ্যে যে অংশটি মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগের নিকট চলিয়া যাইত, তাহা নিজেদের নিকটেই রাখিতে পারে। একাধিক প্রদেশে এইরূপ সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা হইয়াছিল; তবে সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক এবং অর্থ এই দু'য়েরই অভাবের দরুণ ইহাদের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটে নাই।

(২) এই সকল সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি যাহাতে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে গুদাম ঘর (Warehouse) নির্ম্মাণ করিতে পাবে তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। কৃষকগণ উৎপন্ন শস্য এই গুদামে জমা রাখিয়া রসিদ লইতে পারিবে। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি এই রসিদের উপর ভিত্তি করিয়া কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান করিলে কৃষকদিগকে আর ফড়ে মহাজনের কবলে পড়িতে হইবে না। অন্যায় সর্ত্তে কৃষকগণ মহাজনের নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকেই ফসল বিক্রয় করিতে পূর্ব্ব হইতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিবে না।

(৩) মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড এবং সরকারের উদ্যোগে গ্রামের

মধ্যে, এবং গ্রামের সহিত সহরাঞ্চলের সংযোগ স্থাপনের জন্য উত্তম পথ নির্ম্মাণ প্রয়োজন।

(৪) সর্ব্বত্রই যাহাতে সাধারণ গ্রাহ্য মাপের পাল্লা অর্থাৎ সমান ওজনের পাল্লা ব্যবহৃত হয় এবং উহার অভাবে ব্যবসায়ীগণ যাহাতে কৃষকদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে না পাবে, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে। একাধিক প্রাদেশিক সরকার এইরূপ ব্যবস্থা কার্য্যত: অবলম্বন করিয়াছেন।

(৫) একই ফসল বিভিন্ন গুণের থাকিতে পারে এবং গুণের ভিত্তিতে ফসলের প্রকার-ভাগ (Grading) করিলে এবং প্রত্যেক প্রকারের নমুনা করণের (Sampling) ব্যবস্থা থাকিলে, সরাসরি ক্রেতার নিকট মাল বিক্রয় করা বিশেষ সুবিধা হয়।

বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থা—Steps taken for Improving Marketing

কৃষি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, ১৯৩৫ সালে একটি কেন্দ্রীয় কৃষি বিপণিকরণ দপ্তর (Central Agricultural Marketing Department) স্থাপিত হইয়াছিল। এই দপ্তরের উদ্দেশ্য হইল কৃষি-ফসলের প্রকারভাগ (grading) এবং গুণগত মান নির্দ্ধারণ (standardisation), নিয়ন্ত্রিত বাজার (regulated markets) স্থাপন, কৃষিসামগ্রী সংগ্রহ ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করানো এবং গ্রাম্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান। বিপণিকরণ দপ্তরের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতিপয় বিপণিকরণ কর্ম্মচারী (Marketing officers) নিয়োগ করা হইয়াছে। এই কর্ম্মচারী-গণ বিপণিকরণ সম্পর্কিত পরিস্থিতির এবং সমস্যা সমূহের অনুসন্ধান কার্য্য পরিচালনা করেন, বিপণিকরণ সম্পর্কিত ত্রুটি সমূহ অপসারণে সাহায্যের দ্বারা উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা করেন এবং মান নির্দ্ধারণ সম্পর্কেও কার্য্য করেন। বিপণিকরণ দপ্তর একাধিক বিষয় সম্পর্কে বাজার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া-ছেন এবং একাধিক কৃষিজাত পণ্যের বাজার সম্পর্কে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে "কৃষিসামগ্রী বিধি" (Agricultural Produce Act) প্রণীত হইয়াছিল—অন্যান্য বন্দোবস্তের মধ্যে ইহা "আগমার্ক" (AGMARK) চিহ্ন প্রদানের বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যে সামগ্রী সরকারের দ্বারা এইরূপ চিহ্নিত হইবে উহা সরকারের দ্বারা নির্দ্ধারিত মানের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি দপ্তর বিভিন্ন রাজ্যে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হয় তাহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নিকট একটি খসড়া বিল প্রেরণ করিয়া-

ছিলেন এবং ইহার ভিত্তিতে একাধিক রাজ্যসরকার স্বীয় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপনের আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই আইনের দ্বারা "বাজার কমিটি" (Market Committee) গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির কার্য্য হইল বাজারের পরিচালনা যাহাতে সততার সহিত করা হয় তাহা দেখা, নির্দ্ধারিত মানের ওজন যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা এবং সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ে ব্যবসাদারীর একটা মান বজায় রাখা।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় বিক্রয় সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। তবে সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার ইতিহাস অসাফল্যের দৃষ্টান্তেই ভারাক্রান্ত। বর্ত্তমানে ইহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হইতেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ—পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিসামগ্রী বিক্রয় ব্যবস্থার অসন্তোষজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং সকল রাজ্যেই "কৃষিদ্রব্য বিক্রয় বিধি" প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। অবশ্য কমিশনের অভিমতে বাজারের কাঠামো পরিবর্ত্তন না করিয়া বিক্রয় খরচা এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কমানো সম্ভব নহে। কোন কোন রাজ্যে সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা করা হইয়াছে বটে কিন্তু বিক্রয় সমিতির সাফল্য খুব বেশী হয় নাই। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে ইহারা সহযোগিতা তো দূরের কথা, বিরোধিতাই পাইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির নিজদিগের প্রসেসিং ব্যবস্থা এবং মাল রাখিবার সন্তোষজনক ব্যবস্থা (storage) থাকা প্রয়োজন। গুদামঘর নির্ম্মাণের জন্য রাজ্যসরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা উচিত।

সম্প্রতি, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা নিযুক্ত "গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা অনুসন্ধানকারী কমিটি" কৃষিসামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। এই সকল সুপারিশ একদিকে, সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা এবং প্রসেসিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অপরদিকে মাল গুদামজাত করিবার ব্যবস্থার উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন—Improvement of the Agricultural Marketing in the Second Five Year Plan

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও পরিকল্পনা কমিশন কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন ও পন্থার কথা বিশেষ জোর দিয়াই বলিয়াছেন। প্রসেসিং ব্যবস্থা ও বিক্রয় ব্যবস্থাকে সমবায়ের ভিত্তিতে সম্প্রসারিত করিয়া গ্রাম্য বিক্রয় ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থাকে (rural marketing and finance) সুসমঞ্জস

করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ১০ শতাংশ সমবায় সমিতিগুলির মধ্য দিয়া বিক্রীত হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়। উৎপাদকের স্বার্থে সেই কারণে বাজার এবং বাজার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা একান্তই প্রয়োজন। বাজার নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের উপর সমবায় ভিত্তিক বিক্রয়ের সাফল্য নির্ভর করিবে।

কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছুই এ যাবৎ হইয়া উঠিল না। প্রথম পরিকল্পনাকালে সমবায় ভিত্তিক বিক্রয় ব্যবস্থা বাদে কৃষিবাজার নিয়ন্ত্রণের কোন কর্মসূচী অধিকাংশ রাজ্যই রচনা করে নাই। নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা বর্তমানে ৪৫০; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহা দ্বিগুণ হইবে আশা করা যায়।* কৃষিপণ্যের বিভাজন (grading) সম্পর্কিত আইন ১৯৩৭ সালে বিধিবদ্ধ হইলেও ঐ বিষয়ে সেরূপ কিছু অগ্রগতি হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় বিভিন্ন রপ্তানী সামগ্রীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শ্রেণী বিভাজনের কথা বলা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইতিনটি সামগ্রীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, যথাশীঘ্র সম্ভব এই ধরণের সকল বস্তুর সম্পর্কেই বাধ্যতামূলক শ্রেণীবিভাজনের ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু রপ্তানী-পণ্যের ক্ষেত্রেই নহে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের স্বার্থেও উহা প্রয়োজন। আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের জন্য ও কৃষিপণ্যের বাজার বিস্তৃত করিবার জন্য ওজন ও পরিমাপের মান নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তিতেও মান নির্দ্ধারিত থাকা উচিত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নিখিল ভারত বাজার সংবাদ সরবরাহী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উহা ব্যতীত বাজার সম্পর্কে গবেষণাও প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কৃষি বিপণিকরণ সংগঠন এ সম্পর্কে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের কাঠামোতে এবং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের গঠনে প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে; সুতরাং গবেষণা সংক্রান্ত কার্য্য নূতন করিয়া করা প্রয়োজন।

সারাংশ

কৃষিগত ঋণ গ্রস্ততা—আমাদের দেশে কৃষককুল গভীরভাবে ঋণজালে আবদ্ধ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি হিসাব করিয়াছিলেন যে এই ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা।

*আইনের দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বর্তমানে ১০টি রাজ্যে প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ৪৬০। (Journal of Industry and Trade, Oct. 1956.)

কারণ—কৃষকদিগের এই ঋণগ্রস্ততার কারণ হইল মোটামুটি তিনটি : (ক) আয়ের স্বল্পতা—কৃষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র ; চাষের কার্য্য ততটা লাভজনক নহে ; বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ; সেচকার্য্য যথেষ্ট নহে ; জমির খণ্ডীকরণের জন্য চাষের ভাল সংগঠন নাই ; ফসল বিক্রয়ে ফড়ে মহাজনদের আধিপত্য ; সুস্বাস্থ্যের অভাব, সুতরাং পরিশ্রমে অক্ষমতা।

(খ) ব্যয় বাহুল্য—জমি সংক্রান্ত আইনে জটিলতার দরুণ অত্যধিক মামলা মোকর্দ্দমা ; বলদের মৃত্যু ও লাঙ্গলের প্রয়োজন ; সামাজিকতা বজায় রাখিবার অপব্যয় ; পৈতৃক ঋণের বোঝা ; অত্যধিক ভূমিরাজস্ব।

(গ) ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা—গ্রামে মহাজনদের উপস্থিতি এবং ঋণ দিবারজন্য তাহারা সদাই প্রস্তুত ; জমির মূল্যবৃদ্ধিতে ঋণ পাইবার সুবিধা ; উন্নত ধরণের দেওয়ানী মামলার বিচার পদ্ধতি। কিন্তু মহাজনগণ অতি উচ্চহারে সুদ লয় এবং নানা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চাষীদিগকে বাঁধিয়া ফেলে।

প্রতিবিধান—(ক) কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্ভর করে সমগ্রভাবে কৃষি-উন্নয়নের উপর ; ইহার জন্য চাই জমির সংহতি সাধন, জলসেচ, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার, উন্নত যন্ত্রপাতি।

(খ) পুরাতন ঋণের বোঝা লাঘব করিতে হইবে, অন্যথায় আয় বৃদ্ধির সুফল পাওয়া যাইবে না। এজন্য চাই ঋণ সালিশ এবং অল্প অল্প কিস্তিবন্দীতে ঋণ পরিশোধের সুবিধা।

(গ) মহাজনদের কারসাজি বন্ধ করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন যথাযথ হিসাব, সুদের হার নিয়ন্ত্রণ।

(ঘ) বিশেষ করিয়া সমবায় সমিতির প্রসারের দ্বারা চাষীকে অল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিতে হইবে যাহাতে চাষী তাহার ফসলের ন্যায্য দাম পায়।

(চ) ধর্ম্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাহারা যাহাতে অপব্যয় না করে তাহার শিক্ষা দিতে হইবে।

কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে—(১) সরকারের প্রচেষ্টায় তাকাভি ঋণ এবং সমবায় সমিতি, (২) "কৃষক ত্রাণ বিধি", (৩) মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ, (৪) চাষী-বহির্ভূত শ্রেণীর নিকট জমি হস্তান্তর রহিত, (৫) ঋণ সালিশের ব্যবস্থা ; এই সকল ব্যবস্থা কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছে বলা কঠিন।

ঋণগ্রস্ততার বর্ত্তমান অবস্থা—কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৪ সালের মধ্যে গ্রাম্য ঋণগ্রস্ততার যথেষ্ট লাঘব

হইয়াছিল। তবে এই লাঘবের শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস হইয়াছিল বড় চাষীদের ক্ষেত্রে। গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটি (১৯৫০) মনে করেন যে যুদ্ধোত্তর যুগে কৃষি ঋণের বোঝা হ্রাস পাইয়াছে। শ্রম দপ্তরের অনুসন্ধানে (১৯৫৪) কৃষি পরিবারদের শতকরা ৪০ ভাগ ঋণগ্রস্ত এবং পরিবার-পিছু ঋণগ্রস্ততা ১০৫৲ টাকা। গারওয়ালা কমিটি দেখিয়াছিলেন জিলার গড় হিসাবে পরিবার পিছু ঋণ হইল ১০০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকার মধ্যে।

কৃষিকার্য্যে অর্থ সরবরাহ সমস্যা—শিল্পের ন্যায় কৃষিকার্য্যেও ঋণের প্রয়োজন হয়। কৃষিকার্য্যে প্রয়োজনীয় ঋণ তিন প্রকারের: (১) স্বল্প মেয়াদী, (২) মাঝারি মেয়াদী, (৩) দীর্ঘ মেয়াদী। কিন্তু এদেশে কৃষি-কার্য্যের একাধিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সব রকম প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চাষীকে কর্জ্জ দেওয়া সম্ভব হয় না। এদেশে চাষের কাজের জন্য চাষীকে ঋণ দেয় যাহারা তাহারা হইল: (১) গ্রাম্য মহাজন ও দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, (২) সমবায় সমিতি, (৩) সরকার, (৪) সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্ক (শুধু ফসল ক্রয় বিক্রয়ের জন্য)।

কিন্তু বিভিন্ন সূত্র হইতে কৃষিঋণের অর্থ আসিলেও এখানে কৃষিঋণের সন্তোষজনক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। মহাজনেরাই মোট কৃষিঋণের ৭০ ভাগ দেয় কিন্তু ইহাদের কারবারে কৃষকদের শোষণ চলে। সমবায় সমিতিগুলি দেয় ৩·১ শতাংশ মাত্র এবং সরকার ৩·৩ শতাংশ মাত্র। গরওয়ালা কমিটি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন আমাদের দেশে বৎসরে কৃষি-ঋণের প্রয়োজন যেক্ষেত্রে ৭৫০ কোটি টাকা সেক্ষেত্রে সরকার ও সমবায় সমিতি আর কতটুকু দেয়। বেশীই দেয় গ্রাম্য মহাজন। এই মহাজনগণ দেশের একটি বিশেষ প্রয়োজন মিটাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বা সম্পদের সুষম বণ্টনে তাহারা কিন্তু কোনই সহায়তা করে না।

কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন—কৃষিকার্য্যে ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অনেকেই অনেক প্রস্তাব করিয়াছেন। গ্যাডগিল কমিটি (১৯৪৫) বলিয়াছিলেন যে সমবায় সমিতিগুলি বিশেষ কিছু উপকার দিতে পারে নাই। সুতরাং যে সকল প্রদেশে এই সমিতিগুলি শক্তি দেখাইতে পারে নাই সে সকল প্রদেশে "কৃষিঋণ কর্পোরেশন" নামে বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। এই প্রস্তাব তেমন সমর্থন লাভ করে নাই। "সমবায় পরিকল্পনা কমিটি" ইহার সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ হইতে যে বিশেষ সাহায্য দিতে হইবে তাহা সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রদান করিলে বেশী উপকার হইবে। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন যে একটি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন স্থাপন করা যাইতে পারে; ইহা সরাসরি অথবা সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া ঋণ সরবরাহ করিবে এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের শীর্ষস্থানে

থাকিবে। কিন্তু ইহাতেও অনেক অসুবিধা আছে। আসলে কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হইল সমবায় ব্যবস্থার প্রসার, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ, বানিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলিকে কৃষিঋণ ব্যবস্থার কাজে লাগানো। বিভিন্ন প্রকার ঋণদান প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতম সম্প্রসারণের দ্বারাই ভারতীয় কৃষির আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে পারা যায়। গবওয়ালা কমিটি "গ্রাম্য ঋণের একত্রিত (integrated scheme of rural credit) সুপারিশ করিয়াছেন। সমবায়, পরিকল্পনা" সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা চালু হইবে।

কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা—কৃষি সামগ্রীর বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বড়ই অব্যবস্থা, ফসলের দামের শতকরা ৫০ ভাগের মত মাত্রই চাষীরা পায়; বাকীটা লয় কড়িয়া দালালগণ। অপকৃষ্ট বিক্রয় ব্যবস্থার কারণ হইল (১) চাষীদের ফসল ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই, (২) মহাজনের কারসাজি, (৩) গ্রাম্য রাস্তার অভাব, (৪) কৃষকদের অজ্ঞতার দরুণ তাহাদের প্রতারণা করা সহজ, (৫) পাল্লার ওজনে তারতম্য। ইহার প্রতিবিধান করিবার উপায় হইল : (১) সমবায় বিক্রয় সমিতি গঠন, (২) গুদাম ঘর নির্ম্মাণ, (৩) গ্রাম্য রাস্তা তৈয়ারী (৪) পাল্লার সমতা বিধান, (৫) প্রকার ভাগ ও নমুনাকরণ। বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে পদ্ধতিগুলি গৃহীত হইয়াছে সেগুলি হইল : কেন্দ্রীয় কৃষি বিপনিকরণ দপ্তর স্থাপন, বিপণিকরণ কর্ম্মচারী নিয়োগ, কৃষি সামগ্রী বিক্রয় বিধি প্রণয়ন, 'আগমার্ক' চিহ্ন প্রবর্ত্তন, বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন। পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে বাজারের কাঠামো পরিবর্ত্তন না করিয়া বিক্রয়-খরচা বা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কমানো যাইবে না। গবওয়ালা কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থা এবং প্রসেসিং ব্যবস্থার উন্নয়ন করিতে হইবে এবং মাল গুদামজাত করিবার ব্যবস্থারও উন্নয়ন করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে প্রসেসিং ব্যবস্থা ও বিক্রয় ব্যবস্থাকে সমবায়ের ভিত্তিতে প্রসারিত করিয়া গ্রাম্য বিক্রয় ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থাকে সুসমঞ্জস করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক শ্রেণী বিভাজনের (Grading) ব্যবস্থা করিতে হইবে বাজার সম্পর্কে গবেষণাও প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিকার্য্য ঃ কৃষি-পরিধি, পদ্ধতি ও উন্নয়ন

Agriculture : Scale, Technique and Development

কৃষিকার্য্যের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং পদ্ধতি—

Necessity and Methods of Enlarging the Scale

বৃহৎ পরিধিতে উৎপাদনের প্রয়োজন

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য হয় অল্প পরিধিতে, কিন্তু বৃহৎ পরিধিতে উৎপাদন করিলে যে অনেকগুলি সুবিধালাভ সম্ভব হয় তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। বৃহৎ পরিধির উৎপাদনের দ্বারা কৃষি সামগ্রীর উৎপাদনে এবং বিক্রয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংগঠনী ক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ ঘটে। ইহার দ্বারা কৃষিকার্য্যে উৎকৃষ্ট কিন্তু ব্যয়বহুল পুঁজী সামগ্রী ব্যবহার করা সম্ভব হয়। ব্যয়বহুল হইলেও এই সকল পুঁজী-সামগ্রীর দ্বারা ভবিষ্যতে উৎপাদন ঘটে অনেক অধিক। সুতরাং দীর্ঘকালীন বিবেচনায় ইহাদের ব্যবহার ব্যয়সঙ্কোচমূলক (Economical)। অনুরূপভাবে বৃহৎ পরিধিতে কৃষিকার্য্য করিলে বীজ এবং সারের উপর অনেক অধিক ব্যয় করা পোসাইবে এবং সেইকারণে অত্যুৎকৃষ্ট বীজ এবং সার ব্যবহার করা সম্ভব হইবে। বৃহদায়তনের উৎপাদনের দ্বারা কৃষক কর্ত্তৃক জমির স্থায়ী উন্নতিবিধানের প্রয়াস করা সম্ভব হইবে। বিক্রয় ব্যবস্থার দিক হইতেও কৃষিকার্য্যের আয়তন বৃদ্ধির সুফল লাভ সহজেই অনুমেয়। বৃহদায়তনের উৎপাদক অধিকতর সঙ্গতিবিশিষ্ট হইবে এবং এই সঙ্গতি বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োগ করিতে পারিবে। বাজারের অবস্থা সম্পর্কে তাহার অধিকতর জ্ঞান থাকিবে এবং এই বিশেষজ্ঞশীল জ্ঞানের ভিত্তিতে বাজারের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। সেক্ষেত্রে কৃষিসামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া পড়িবে। অবশ্য আমাদের দেশে বৃহৎ পরিধির উৎপাদন বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব কিনা তাহা নির্ভর করে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের উপর এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রজাসত্ব আইনের যথাযথ পরিবর্ত্তনের উপর। ইহার সাফল্য নির্ভর করে যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতি (Mechanical Farming) কি পরিমাণে গৃহীত হইতেছে তাহার উপর। কিন্তু জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদের কার্য্য নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হইলেও এবং যান্ত্রিক

কৃষিপদ্ধতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হইলেও বৃহৎ পরিধির কৃষিকার্য্য বাস্তবক্ষেত্রে কি আকার গ্রহণ করিবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থাকিয়া যায়।

বৃহৎ পরিধি উৎপাদনের পদ্ধতি

একমালিকানা

একমালিকানা সংগঠনের মধ্যে বৃহৎ পরিধির কৃষিকার্য্য সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে একজন বড় চাষী এককভাবে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড চাষ করিতেছে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা বিভিন্ন কারণেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশ্য এ কথা সত্য যে আমাদের দেশের চাষী সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিতে অথবা কৃষিকার্য্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানে যে নিতান্তই হীন এরূপ ধারণা করা একান্তই অসঙ্গত। তথাপি আমাদের দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মধ্য হইতে এরূপ ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যাইবে যাহারা আর্থিক সঙ্গতিতে, বিশেষত্বশীল জ্ঞানে এবং সংগঠনী প্রতিভাতে একটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র পরিচালনায় নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে। ইহা সম্ভব হইলেও এই শ্রেণীর বৃহৎ পরিধির উৎপাদন বিভিন্ন কারণেই আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয়। ইহার দ্বারা কৃষিকার্য্যে পুঁজিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে এবং অতীতের জমিদারী ব্যবস্থার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর কোন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিবে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বিপজ্জনক কৃষিসংগঠন গড়িয়া তুলিবার কোনই যৌক্তিকতা নাই।

Q. Discuss the merits and demerits of co-operative farming and collective farming with reference to their applicability to India after the Zemindari abolition (Delhi 1952).

যৌথ খামার

বৃহৎ আয়তন কৃষিকার্য্যের আর একটি পদ্ধতি হইল যৌথ খামার (Collective Farming)। ইহার দ্বারা দেশের সকল জমি সমষ্টিগতভাবে জনগণের দ্বারা অর্থাৎ রাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত হয়। সুতরাং সমগ্র জমির রাষ্ট্রায়ত্ত-করণ হইল এই ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ। অতঃপর বিভিন্ন অঞ্চলে জমিগুলি বিভক্ত করিয়া এক একটি বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রে বহু শ্রমিক কার্য্য করে। উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা রাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরই রচনা করে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দায়িত্ব বহু পরিমাণে কৃষি শ্রমিকদিগের উপরেই অর্পণ করা হয়। শ্রমিকগণ তাহাদের কার্য্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুযায়ী মজুরী লাভ করিয়া থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ায় এই ধরণের যৌথ কৃষি প্রবর্তিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে নানা সুফলও লাভ সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে একাধিক অসুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের

দেশে কৃষককুল জমির অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। সামান্যতম জমিতে সামান্যতম মালিকানা সত্ব তাহারা অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং সরকারের দ্বারা জমির সত্ব হইতে বিচ্যুত হইলে প্রজাসাধারণ উহার তীব্রতম বিরোধিতা করিবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভরশীল এবং জনসাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে সংখ্যাধিক অংশ হইল কৃষিজীবি। অতএব কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কৃষকদিগকে উত্তেজিত করাইয়া দিয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব! সুতরাং এরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে উহা হিংসাত্মক বিপ্লবের দ্বারাই করিতে হইবে এবং ইহার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন "এই ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রকর্ত্তৃক ভীতি প্রদর্শনের দ্বারাই বজায় রাখিতে হইবে।" এ সম্পর্কে অবশ্য সকলেই একমত নহেন। তবে যৌথ খামারের বিরুদ্ধে এ সমালোচনা সহজেই করিতে পারা যায় যে পুঁজিবাদীদিগের ব্যক্তি মালিকানা হইতে পুঁজি কাড়িয়া না লইয়া রাষ্ট্র কর্ত্তৃক কৃষকদিগের নিকট হইতে জমি মালিকানা গ্রহণ করিয়া লওয়া ন্যায়ধর্ম্ম বিরোধী।

সমবায় চাষ

বৃহৎ পরিধিতে কৃষি কার্য্যের আর একটি পদ্ধতি হইল সমবায় চাষ (Co-operative farming)। এই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র চাষীগণ তাহাদের ক্ষুদ্র জমিখণ্ডগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি বৃহত্তর কৃষিক্ষেত্র গঠন করে। যে জমির যে মালিক ছিল সেই জমির উপর সে তাহার মালিকানা স্বত্ব বজায় রাখিল কিন্তু এই সকল মালিকগণ সম্মিলিত হইয়া বৃহত্তর কৃষিক্ষেত্রটি চাষের জন্য একটি সমবায় সমিতি গঠন করে; এই সমিতিকে তাহারা তাহাদের জমি, শ্রম এবং কার্য্যকরী পুঁজি (working capital) প্রদান করে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক চাষী একাধারেই মালিক এবং শ্রমিক। বাহিরের শ্রমিকও নিয়োগ করা যাইতে পারে এবং শ্রমিক হিসাবে সকলেই সমবায় সমিতির নিকট হইতে মজুরী লাভ করিবে; উহা ব্যতীত যাহারা জমি প্রদান করিয়াছে তাহারা একটি মালিকানা-ডিভিডেণ্ড (ownership-dividend) লাভ করিবে। ফসল উৎপন্ন হইলে সমিতির দ্বারা উহা বিক্রয় হইবে এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে খরচা বাদে যে নীট লাভ থাকিবে তাহাই মুনাফারূপে সদস্যদিগের মধ্যে বণ্টিত হইবে। এই মুনাফা মালিকানার ভিত্তিতেও প্রদান করা যাইতে পারে—তখন আর স্বতন্ত্র কোন মালিকানা-ডিভিডেণ্ড প্রদান করা হইবে না।

সমবায় চাষের সুবিধা

এইরূপ সমবায় কৃষিতে যৌথ খামারের একাধিক ত্রুটি পরিহার করা সম্ভব হয়। (১) ইহার দ্বারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে, সুতরাং ইহা

ব্যক্তির স্বত্ব চেতনা জাগরূক রাখিয়া তাহার আন্তরিক সহযোগিতা এবং উদ্যম আকর্ষণ করিতে পারে। (২) অথচ ইহার দ্বারা বৃহদায়তনের উৎপাদনের সকল সুবিধা লাভ সম্ভব। (৩) বর্ত্তমানের কৃষি সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যারও ইহা সমাধান করিতে পারিবে—ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা হইল কৃষিকার্য্যে কার্য্যকরী পুঁজি সরবরাহ এবং কৃষিসামগ্রীর বিক্রয়।

সমবায় চাষের প্রতিবন্ধক

আমাদের দেশে সমবায় কৃষিপদ্ধতির কতিপয় অন্তরায় রহিয়াছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ, কৃষকদিগের মধ্যে সমবায়মূলক মনোবৃত্তির অভাবে সমবায় আন্দোলন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই এবং ঐ অভাবই সমবায় কৃষির সাফল্যের অন্তরায় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সমবায় সমিতির ভিত্তিতে বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র সংগঠনের মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয়তঃ, সমবায় সমিতিগুলি যন্ত্রব্যবহারে সক্ষম হইবে এবং সেক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিকের মধ্যে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থতঃ, এই সমিতিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারিবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। তবে এই সকল বাধা সরকারের যথাযথ সাহায্য এবং তত্ত্বাবধানের দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব হইবে।

সমবায় চাষের প্রস্তাব

১৯৪৯ সালে কংগ্রেসের কৃষি-সংস্কার কমিটি (Congress Agrarian Reforms Committee) গ্রামে গ্রামে এইরূপে সমবায় কৃষির প্রবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া অভিমত প্রদান করেন। তাঁহারা এরূপও বলিয়াছিলেন যে ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা যদি সেরূপ ফলপ্রদ না হয় তাহা হইলে কিছুপরিমাণে বাধ্যতা-মূলক আদেশ প্রদানও যুক্তিসঙ্গত হইবে। অবশ্য কমিটি এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কালক্রমে সরকারের সাহায্য ও তত্ত্বাবধান পাইলে ভারতের কৃষককুল ক্রমশঃই সমবায় কৃষিক্ষেত্র গঠন করিবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সমবায় কৃষি প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন ঘটিবে অল্পই।

পরিকল্পনা কমিশন সমবায় কৃষি সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় কমিশন বলিয়াছিলেন যে ক্ষুদ্র জমি-মালিকানাগুলি কৃষিউন্নতির অন্তরায় সমূহের প্রধান উৎস। জমির উপর যত চাপ পড়িতেছে ক্ষুদ্র জমিখণ্ডের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং ছোট এবং মাঝারি চাষীগণ যাহাতে ইচ্ছাকৃতভাবে সমবায় কৃষিসমিতি গঠন করে তাহার জন্য সাহায্য এবং উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের একাধিক কর্ম্ম প্রস্তাবও (suggestions) পরিকল্পনা কমিশন প্রদান করিয়াছেন।

[পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ভবিষ্যতের কৃষি পদ্ধতিরূপে সমবায় চাষ ব্যবস্থার যতদূর সম্ভব সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু এ বিষয়ে অগ্রগতি হইয়াছে খুবই কম। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এ বিষয়ে প্রধান করণীয় হইবে ভবিষ্যতে সমবায় চাষের যথেষ্ট সম্প্রসারণ হইতে পাবে এরূপভাবে শক্তিশালী বনিয়াদ গড়িয়া তুলা—যাহাতে আগামী দশ বৎসরে কৃষি-জমির বেশ কিছু অংশ সমবায় চাষের অধীন করা সম্ভব হয়।

সমবায় চাষ বলিতে ঠিক কি বুঝায় এ সম্পর্কে যে প্রায়ই প্রশ্ন তুলা হইয়া থাকে তাহাও কমিশন স্মরণ করিয়াছেন। সমবায় চাষের গোড়ার কথাই হইল বিভিন্ন লোকের জমি একত্রিত করা এবং সকলে মিলিয়া যুক্তভাবে উহার ব্যবস্থাপনা করা। ইহা বাস্তবে কি আকার গ্রহণ করিবে তাহাতে নানা বৈচিত্র্য থাকিতে পারে ; বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা বা সংগঠনের মধ্য দিয়া এইরূপ চাষের ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে পারে। আবার একটি সমবায় চাষকেন্দ্রের মধ্যে কর্ম্মপরিচালনা বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিতে পারে ; যথা একটি খামারকে সকল বিষয়ের জন্য অথবা কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য একটি মাত্র কেন্দ্ররূপে গন্য করিতে পারা যায়। অথবা একটি সমবায় খামারের মধ্যে কতিপয় পরিবার একটি অনু-একক (Sub-unit) গঠন করিতে পারে। এইভাবে নানা পদ্ধতির কথাই চিন্তা করিতে পারা যায়, ভবিষ্যতের পর্য্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সব থেকে কার্য্যকরী পদ্ধতি কোন্‌টি তাহা বাছিয়া লওয়া যাইবে।

ছোট চাষীরা যাহাতে স্বেচ্ছায় সমবায় কৃষি-সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের সাহায্য এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য একাধিক কর্ম্মপ্রস্তাব ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিশেষ কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। তবে অনেক রাজ্যেই একাধিক সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে অল্প কয়েকটি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে কিন্তু অনেকগুলিই বিস্তর বাধার সম্মুখীন হইয়াছে, সেই জন্য তাহারা প্রয়োজনীয় সাফল্য লাভে সক্ষম হয় নাই। ফলে উৎসাহের মধ্যে যে-কাজ সুরু করা হয় তাহা অসাফল্যের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে বর্ত্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ১০০০টি সমবায় সমিতি আছে। সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্ম্মসূচীতে এই সমিতিগুলির প্রতি প্রথমেই দৃষ্টি প্রদান করিতে হইবে. ইহাদের মধ্যে যত বেশী সংখ্যক সমিতিকে সাফল্য লাভে সহায়তা করা যাইবে ততই লোকে এইরূপে সমিতি স্থাপনে উৎসাহ পাইবে।

জোতের সংহতি সাধনের কার্য্য যখন সুরু হইবে তখন জনসাধারণকে সমবায়িক চাষের সুবিধা সম্পর্কে বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইবে। উহা বুঝাইয়া দিলে, যাহারা সমবায় কৃষি সমিতিতে যোগদানে ইচ্ছুক হইবে তাহারা প্রথম হইতেই তাহাদের টুকরা জমিগুলিকে একটি বৃহত্তর খণ্ডে গঠিত করিয়া লইতে পারে। যাহাই হউক, লোকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যে সমবায় কৃষি সমিতি গঠন করিবে, সেগুলিকে কৃষি উন্নতির জন্য নিয়োজিত সঙ্গতি হইতে সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। জাতি সম্প্রসারণ এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অঞ্চলগুলিতে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধাগুলি প্রদান করা যাইতে পারে : (১) সরকার বা সমবায় সংস্থাসমূহ ঋণ প্রদান করিতে পারে, (২) উৎকৃষ্ট বীজ, সার প্রভৃতি যোগানে পক্ষপাতিত্ব প্রদান করা চলে, (৩) সমবায় খামারের মধ্যেকার জমির সংহতি সাধনে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে, (৪) উদ্ধারকৃত জমি, চাষযোগ্য পতিত জমি প্রভৃতির পাট্টা প্রদানে চাষ সমিতিকে পক্ষপাতিত্ব দেওয়া চলে, (৫) এরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যে, যতদিন একটি সমবায় কৃষি সমিতি চালু থাকিবে

ততদিন ইহার সদস্যদের স্বার্থের পরিপন্থী হয় এরূপ কোন অধিকার অন্য কাহাকেও দেওয়া হইবে না, (৬) কলাকৌশলবিদ্ কর্ম্মচারীর (Technical Personnel) সাহায্য প্রদান করা যাইতে পারে, (৭) এই সমিতির সদস্যগণ যাহাতে চাষ ছাড়া অন্যান্য কার্য্য করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কৌশলগত (Technical) এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইতে পারে, (৮) কিছুকালের জন্য সরকার এইরূপ সমিতি পরিচালন খরচার একাংশ বহন করিতে পারেন। তবে এই ধরণের সাহায্য সত্যকার সমিতিগুলিকেই দেওয়া উচিৎ। যত্রতত্র ভুঁইফোড় সমিতিগুলিকে এইরূপ সাহায্য দিলে ঐ সমিতিগুলি কারবার গুটাইলেই সরকারের অনেক লোকসান হইয়া যাইবে।]

কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান পদ্ধতি—Existing Metnods of Indian Agriculture

Q. Discuss the existing methods of Indian agriculture and suggest measures for improving them. (B. Com. 1940).

আমাদের কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি হইল পুরাতনী—বংশ-পরম্পরাগত-ভাবে যে পদ্ধতি কৃষকগণ দেখিয়া আসিতেছে, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই তাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতির আওতার সম্পূর্ণ বাহিরে থাকিয়াই তাহারা কৃষিকার্য্য করে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেশে যে জমিতে গম উৎপন্ন হয় তাহা বৎসরে কয়েক-মাস অকর্ষিত থাকে ; এই সময়ে কোনো কিছু পশুখাদ্যশস্য (fodder crops) জন্মানোর জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে এইরূপ প্রগতিশীল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। উপরন্তু আমাদের চাষীরা বীজ সম্পর্কে সেরূপ বিচার করে না ; উন্নত ধরণের বীজের উপকারিতা সম্বন্ধে তাহারা সচেতন বা আগ্রহান্বিত নহে—ফলে আমাদের কৃষিকার্য্যে উন্নত ধরণের বীজের ব্যবহার ব্যাপক নহে। পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন শস্য হইতে বীজ রাখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাই পর বৎসর চাষী ব্যবহার করে—উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহারের জন্য সে আগ্রহান্বিত হয় না। পালা করিয়া শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে খুবই কম ; অন্যান্য অগ্রসর দেশে পাল্টি-শস্য উৎপাদনের (crop rotation) কাজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ারূপে সম্পন্ন হয়। মাটিকে চাষোপযোগী করিবার যে প্রাথমিক কার্য্য চাষীরা সম্পন্ন করে তাহাও যথেষ্ট নহে। সার প্রদানের রীতিও পুরাতন ধরণের। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সার প্রদান চাষীর পক্ষে সম্ভব হয় না—কোনো কোনো ধরণের সার প্রদান ধর্ম্মগত সংস্কার বা রক্ষণশীলতার জন্য সম্ভব হইয়া উঠে না। অবশ্য ধীরে ধীরে এই অবস্থার উন্নতি ঘটিতেছে এবং বৈজ্ঞানিক সার সহজ প্রাপ্য হইলে উহা ব্যবহারের জন্য কৃষকদিগের আগ্রহ সুপরিস্ফুট হয়। চাষীর চাষের যন্ত্র কিন্তু সেই চিরপুরাতন একটি লাঙ্গল এবং একজোড়া বলদ। উন্নত ধরণের আধুনিক যন্ত্র

ব্যবহারের দ্বারা কৃষিকার্য্য করিবার পদ্ধতি সাধারণ কৃষকের মধ্যে নাই।*

চাষের পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন (ক) যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা গ্রহণ এবং (খ) সাধারণভাবে কৃষিকার্য্যের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (Rationalisation of Agriculture).

ভারতে যান্ত্রিক কৃষি—Mechanised Agriculture in India

Q. Would you like mechanised agriculture in India ? Explain clearly its possibilities and drawbacks in a country like India. (B. A. 1951) Discuss the possibilities and limitations of mechanised farming in India. (Cal. B. A. 1955 ; W. B. C. 1953)

সুষ্ঠুভাবে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য—অর্থাৎ অধিক ও উৎকৃষ্ট ফসল ফলাইবার জন্য, বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যকরী যন্ত্র আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশ সমূহে এই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া কৃষিকার্য্যের পদ্ধতিতে যেরূপ আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও সেইরূপ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য যে ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রয়োগ-যোগ্যতা সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া যান্ত্রিক কৃষিপদ্ধতি অবলম্বনকারী দেশ সমূহের নিকট আমরা খাদ্যশস্য যাচ্ঞা করিতে যাইলে আমাদের দেশে যান্ত্রিক কৃষি কেন অবলম্বিত হয় না, সে সম্পর্কে কারণ দর্শাইবার প্রয়োজন ঘটে।

লাঙ্গল ও বলদের সাহায্যেই আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু ট্রাক্টর সাহায্যে জমি কর্ষণ করা এবং কৃষিসম্পর্কিত অন্যান্য কার্য্যে অপরাপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা আমাদের কৃষিকার্য্যের পক্ষে সুস্পষ্ট ভাবেই লাভজনক হইত। এক জোড়া বলদ ৮।১০ একর জমি চাষযোগ্য রাখে, একটি ট্রাক্টর ১০০ একর জমি চাষযোগ্য রাখিতে পারে। বলদ চালিত লাঙ্গলে একদিনের ৮ ঘণ্টা পরিশ্রমে এক বিঘা জমি খুঁড়িতে পারা যায় কিন্তু ট্রাক্টরের সাহায্যে ঐ একই সময়ে ২৫।৩০ বিঘা জমি চষিতে পারা যায়। এক জোড়া বলদের দাম ৮০০।১০০০৲ টাকা—এক জোড়া বলদ রাখিবার বাৎসরিক খরচাও ৬০০।৭০০৲ টাকা। অথচ এক জোড়া বলদ অপেক্ষা একটি ভালো ট্রাক্টর ২৫।৩০ গুণ অধিক কার্য্য প্রদান করিবে ; সেইদিক হইতে বিচার করিলে দীর্ঘকালীন দিক হইতে উহাদের খরচায় কোনই পার্থক্য থাকে না।

* **Suggest measures for improving them—** নীচে দ্রষ্টব্য

অবশ্য যান্ত্রিক কৃষি বলিতে নিছক ট্রাক্টর বুঝায় না। খুব দামী যন্ত্র ব্যবহার না করিয়াও ছোট খাটো যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যান্ত্রিক কৃষির প্রচলন করিতে পারা যায়। তবে আসল কথা হইল যে বিংশ শতাব্দীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্ত্তনের যে কোনরূপ বিরোধিতা করা হয় না, তাহা নহে। ইহার বিরোধিতার যুক্তি হইল, অজ্ঞ ও দরিদ্র কৃষকদিগের পক্ষে যন্ত্র ব্যবহার করা শিক্ষার দিক হইতে এবং আর্থিক ক্ষমতার দিক হইতে সম্ভব নহে; দ্বিতীয়তঃ, জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা ট্রাক্টর রূপ যন্ত্র ব্যবহারের গুরুতর অন্তরায়, কারণ একজন চাষীর একসঙ্গে অনেকখানি জমি না থাকিলে তাহার পক্ষে এইরূপ যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নহে; তৃতীয়তঃ, যন্ত্র ব্যবহারের দ্বারা কৃষি শ্রমিকদিগের মধ্যে অধিকতর বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এ যুক্তির প্রত্যেকটিই উহার মধ্যেকার নিহিত ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাই প্রদর্শন করে; ঐ ত্রুটী সংশোধন শুধু যান্ত্রিক কৃষির জন্যই নহে, কৃষির যে কোন উন্নয়নের জন্যই অবশ্য প্রয়োজন। কৃষি উন্নয়নের যে কোন পরিকল্পনা করিলেই কৃষকদিগের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে, জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার প্রতিকার করিতে হইবে এবং শিল্প-সম্প্রসারণের দ্বারা বাড়তি কৃষি শ্রমিক টানিয়া লইতে হইবে।

যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস—ভারত সরকার রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় ভারতে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্ত্তনের জন্য প্রয়াস করিতেছেন। কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল—পতিত জমি উদ্ধারের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ট্রাক্টর সরবরাহ করা ইহার কার্য্য। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকারের অনুরোধ ক্রমে "আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক" (International Bank for Reconstruction and Development) ভারতে পতিত জমি উদ্ধারের নিমিত্ত যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য ভারত সরকারকে ১ কোটি ডলার ঋণ প্রদান করিয়াছেন। এই ঋণের সহিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন যে ট্রাক্টরের সাহায্যে কর্ষিত জমিতে বৎসরে অন্ততঃ একবার খাদ্যশস্য ফলাইতে হইবে। ভারত সরকারের নির্দ্দেশে রাজ্য সরকারগুলি এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে। কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সঙ্ঘ সম্প্রতি পুনর্গঠিত করা হইল। ডিসপোজাল হইতে ২৮০টি ট্রাক্টর ক্রয় করা হইল ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রের আমদানীর উপর বাধা নিষেধ অপসারিত হইল। ট্রাক্টর-কর্ষিত ভূমিতে অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কার্য্যক্রমও রাজ্য সরকারগুলি, ভারত সরকারের উদ্যোগে, প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথম দিকে এই সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার অসুবিধাজনকই হইয়াছিল; প্রায়ই ইহারা খারাপ হইয়া যাইত এবং নূতন

যন্ত্রাংশ (parts) পাওয়া যাইত না, ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরও অভাব ছিল। প্রাথমিক এই অসাফল্যের পরে কিন্তু যান্ত্রিক কৃষি ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইতেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠন চারিটি রাজ্যে ২৭৯টি ট্রাক্টর কাজে লাগাইয়াছিল। ইহা ছাড়া একাধিক রাজ্যসরকার ট্রাক্টর সংগঠন সৃষ্টি করিয়া পতিত জমি উদ্ধারের কাজে ট্রাক্টর লাগাইয়াছিল এবং চাষীদিগকে ট্রাক্টর ইহারা ভাড়ায় দিয়া থাকে। ১৯৫১-'৫২, '৫২-'৫৩ এবং '৫৩-'৫৪ সালে ৭,৪০০টি, ১,২২৭টি এবং ৩,১৯৫টি ট্রাক্টর আমদানি করা হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজ্যেই বর্ত্তমানে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার হইতেছে; শেষ পর্য্যন্ত এই সংস্কারের রূপ কি দাঁড়ায় তাহা দেখিবার অপেক্ষায় অনেকে ট্রাক্টর ব্যবহার ইচ্ছুক হইলেও অগ্রসর হইতেছে না। ট্রাক্টর ছাড়াও এদেশে বৈদ্যুতিক মটর, ডীজেল ইঞ্জিন প্রভৃতি শক্তিচালিত যন্ত্র মাঠে জলযোগানের জন্য গ্রামাঞ্চলে ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইতেছে। এসব সত্ত্বেও, বর্ত্তমানে এদেশে কৃষির ব্যপকতার তুলনায় যন্ত্র ব্যবহারের অনুপাত একান্তই নগন্য।

জাপানী প্রথায় ধান উৎপাদন—A Note on the Japanese Method

ভারতের মোট অধিবাসী সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশের মূল খাদ্য হইল চাউল কিন্তু চাউল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই দুষ্প্রাপ্যতা অনুভূত হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সরকারের মনোযোগ সেই কারণে জাপানী প্রথায় ধান উৎপাদনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। জাপানে আমাদের দেশ হইতে স্বতন্ত্র প্রথায় ধান উৎপাদনে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনেক বেশী পাওয়া গিয়া থাকে। সরকার আমাদের দেশে জাপানী প্রথা প্রবর্ত্তনের অভিযান সুরু করিয়াছেন; ১৯৫৩ সালে ১৬ই মার্চ্চ খাদ্যসচিব শ্রীদেশমুখ ইহা আরম্ভ করিয়াছেন। জাপানী প্রথায় চাষে দেশীয় পদ্ধতির অপেক্ষা কম পরিমাণ বীজ ব্যবহৃত হয়, বেশী পরিমাণ সার ব্যবহার হয় এবং বীজ বপনের পুর্ব্বে জমি তৈয়ারী হয় স্বতন্ত্র ভাবে। একর পিছু ৮ হইতে ১২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ধান বীজ রূপে ব্যবহৃত হয়; আমাদের দেশে সমপরিমাণ জমিতে ৪০ হইতে ৬০ পাউণ্ড ধান ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তদ্বারা ২০ কোটি টাকার ধান প্রতি বৎসর অপচয় হয়। জাপানী প্রথায় মাটি এরূপ ভাবে সাজানো হয় যাহাতে উহা জমি হইতে কিছুটা উঁচু হয় এবং প্রতি চার ফুট অন্তর একফুট নালা থাকে। মাটি খুব উত্তমরূপে নাড়াচাড়া করাও হইয়া থাকে। অধিকন্তু তিনদফায় সার প্রয়োগ করা হয়।

আমাদের দেশে এই প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রকৃত চেষ্টা হইয়াছে ১৯৫৩ সাল হইতে। জাপানী পদ্ধতি ব্যবহারের দরুণ বাড়তি চাউল উৎপাদন হইয়াছে ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৩১,৩৯৫ টন; ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪,৪৬,৪০০ টন; এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৮,২৮,৮৯০ টন। এই পদ্ধতিতে চাষ করা হইয়াছে এরূপ এলাকা ছিল ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪ লক্ষ একর এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৩·২ লক্ষ একর; কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা ২০·০৬ লক্ষ একরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে যে ধান চাষ হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে

দেশী পদ্ধতিতে চাষের দ্বারা প্রতি একর জমিতে গড়ে ১৩'৩৩ মন চাউল পাওয়া গিয়াছে কিন্তু জাপানী পদ্ধতিতে সম পরিমাণ জমিতে গড়ে ২৪.৮৯ মন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে জাপানী প্রথায় চাষের এলাকা অন্তত: ৪০ লক্ষ একরে পরিণত করা হইবে।

কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন—Rationalisation of Agriculture

Q. What, in your opinion, should be the main lines of agricultural re-organisation in India? (Cal. B. Com. 1954)

আমাদের দেশের কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসকাল কমিশন ইহার উপর বিশেষ ভাবেই জোর দিয়াছিলেন। শিল্প সম্প্রসারণের সহিত তাল রাখিয়া কৃষিকার্য্যের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনকে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের কৃষির ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণ উন-কর্ম্মসংস্থান (under-employment) এবং ছদ্মবেশী বেকার অবস্থার (disguised unemployment) অস্তিত্ব রহিয়াছে। একইসাথে দ্বিবিধ কার্য্যক্রম অবলম্বনের দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব: (১) কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি উন্নয়নের দ্বারা এবং মিশ্র কৃষি-ব্যবস্থার (mixed farming) ব্যাপক অনুসরণের দ্বারা একর প্রতি উৎপাদনের হার বর্দ্ধিত করিয়া যতদূর সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধি এবং (২) জমি হইতে বাড়্তি শ্রমিক টানিয়া লইয়া শিল্প এবং অন্যান্য পেশায় গ্রহণ করিতে হইবে।

ফিসকাল কমিশন একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ কৃষিনীতির একটি আভাষ প্রদান করিয়াছিলেন—এই নীতিকে ব্যাপক কৃষিসংস্কারের পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমত:, বৃহৎ সেচ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা এবং ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত:, উর্ব্বরতা ক্ষয়ের দ্বারা (soil erosion) যে সকল জমি চাষের অযোগ্য হইয়াছে তাহাদের যথাযথ ব্যবহারের জন্যও যথাযোগ্য পরিকল্পনা থাকিতে হইবে। তৃতীয়ত:, কৃষিকার্য্যের পদ্ধতি যাহাতে উন্নত হয় তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ইহা করা হইবে গবেষণার দ্বারা. গবেষণার ফল জমিতে প্রয়োগ করিয়া, উৎকৃষ্ট বীজ এবং সার সরবরাহ করিয়া, জমিতে হাল দিবার পদ্ধতি উন্নত করিয়া এবং যেখানে সম্ভব সেখানে বাড়তি জমি চাষে আনিয়া। সমবায় পদ্ধতিতে জমির সংহতি সাধন করিতে হইবে এবং বিবিধ প্রকার শস্যের চাষ (diversified agriculture) করিতে হইবে। চতুর্থত:, সু-পরিকল্পিত পার্শ্বজীবিকার (subsidiary occupations) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। পঞ্চমত:, বিক্রয় ব্যবস্থা এবং গুদামজাত করণ ব্যবস্থা (storage arrangements) উন্নত করিতে হইবে। ষষ্ঠত:,

কৃষিতে অর্থ সরবরাহ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধে দাম-সমর্থন ব্যবস্থা (price-support measures) করিতে হইবে। সপ্তমতঃ, উহার সহিত একাধিক অনুপূরক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যথা ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, গ্রাম্য শিক্ষার বিস্তার, গ্রাম্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি। জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যের (Extension Service) ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের সংগঠনের প্রস্তাবও ফিসকাল কমিশন প্রদান করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃপক্ষে আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের পুনর্গঠনের জন্য একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। জমির একক-পিছু (unit) উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রয়োজন (productivity per unit of land) চারাসৃষ্টি (plant-breeding) পদ্ধতির উন্নয়ন, উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার, আগাছা এবং পতঙ্গ ধ্বংস, বিভিন্ন প্রকারের সার অধিকতর প্রয়োগ যথা গোময়, সবুজ সার বা পচাই এবং রাসায়নিক সার, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফসলের পাল্টি চাষ করা (crop relation) এবং সুনিশ্চিত সেচ ব্যবস্থা। শ্রমের একক-পিছু উৎপাদন (prductivity per unit of labour) বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে যে ব্যবস্থাগুলির দ্বারা সেগুলি হইল উন্নত ধরণের সরঞ্জাম-সামগ্রী (implements) ব্যবহার, শ্রমের সাশ্রয় হয় এরূপ পদ্ধতি অবলম্বন, কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এবং সমবায় চাষ পদ্ধতি। অন্যান্য আনুষঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় সুবিধা লাভ করিতে পারা যাইবে যে বিষয়গুলির দ্বারা (যে বিষয়গুলির দ্বারা জমি পিছু এবং শ্রমপিছু উভয় ধরণের উৎপাদন বৃদ্ধিই সম্ভব হইবে) সেগুলি হইল পশুপালন পদ্ধতির উন্নয়ন, মিশ্র চাষ (mixed farming) প্রবর্ত্তন, মৃত্তিকা সংরক্ষণের আয়োজন, দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্রে ও গুদামে অপচয় নিবারণ, কৃষিতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান এবং কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন।

মোট কথা, আমাদের দেশে কৃষির ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে পদ্ধতিগত উন্নতি বিধানের (technological improvement) একান্ত প্রয়োজন। এই পদ্ধতিগত উন্নয়নের প্রয়োজন যে কত সে বিষয়ে নূতন করিয়া আর বলিবার কিছু নাই। খাপছাড়া ভাবে এখানে জোড়া দিয়া ওখানে তালি দিয়া এ ফসলের ক্ষেত্রে কিছুটা এবং ও ফসলের ক্ষেত্রে কিছুটা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে বটে কিন্তু উহার দ্বারা সামগ্রিকভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান করা সম্ভব হইবে না।

কিন্তু পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকার কার্য্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহার মধ্যে অধিকাংশের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রকে অগ্রণী হইতে হইবে। আমাদের কৃষিকার্য্যের মধ্যে যে গতানুগতিকতার ভাব কায়েমী হইয়া বসিয়া গিয়াছে উহার জন্যই কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে সচলতা (dynamism) নাই। পদ্ধতিগত

উন্নয়নের গোড়ার কথাই হইল এই সচলতা সৃষ্টি। কিন্তু কৃষকশ্রেণী এবং সমগ্রভাবে কৃষি ব্যবস্থা এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যেখানে ভিতর হইতে সচলতা সৃষ্টির অবকাশ খুব কম। বাহির হইতে সরকারের সাহায্য, উদ্যোগ, অনুপ্রেরণা এবং নির্দ্দেশ প্রয়োজন। শুধু ইহা করিলে ভাল হয়, উহা করিলে উপকার হয়—এইরূপ বলিবার সার্থকতা খুবই কম। সাধারণতঃ, পদ্ধতিগত উন্নয়ন সৃষ্টির কার্য্যে সরকারের যাহা করণীয় আছে সেগুলি নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়: (১) বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রকে সমষ্টিগত বা সামাজিক পুঁজি (collective or social capital) সৃষ্টি করিতে হইবে; ইহা করা হইবে, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন এবং সেচ ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা, অকর্ষিত বা পতিত জমি চাষযোগ্য করিয়া, পরিবহণ পদ্ধতির উন্নতি এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিয়া; (২) কৃষি গবেষণা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বাস্তব চাষের ক্ষেত্রে গবেষণার ফল যাহাতে প্রযুক্ত হয় ও বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি যাহাতে গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা করা;

(৩) উন্নত চারা সৃষ্টি (plant breeding), গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং আগাছা ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা;

(৪) উন্নত ধরণের কৃষি সরঞ্জাম, ভাল জাতের বীজ এবং উৎকৃষ্ট ধরণের সার সরবরাহ করা,

(৫) ট্রাক্টর সরবরাহের দ্বারা যান্ত্রিক কৃষিতে উৎসাহ প্রদান,

(৬) গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা,

(৭) গুদাম নির্ম্মাণ, ফসলের শ্রেণী বিভাজন এবং ফসল বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা,

(৮) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা,

(৯) বনরক্ষার এবং মৃত্তিকা ক্ষয় নিরোধের ব্যবস্থা করা,

(১০) কৃষিগত সম্প্রসারণ কার্য্যের (extension service) প্রসার—যাহাতে স্বাবলম্বনের এবং পারস্পরিক সহযোগিতার স্পৃহা সৃষ্টি হয় এবং উন্নত কৃষি পদ্ধতির জ্ঞানের প্রসার হয়,

(১১) ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার ও ভূমি-নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়ন—Agricultural Improvement in the First Five Year Plan

কৃষিজাত এবং উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন বাড়াইবার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ব্যাপক আয়োজন করা হইয়াছিল। ভারতের কৃষি সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পরিকল্পনা রচনা করিতে এবং উহার সার্থকতা বিচার করিতে উহাদিগকে নানা ভাবে

কাজে লাগাইয়াছিলেন। পরিকল্পনা কতখানি প্রয়োজন তাহা বুঝাইবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন আমাদের কৃষিগত ফসলের ক্ষেত্রে কিরূপ ঘাট্‌তি তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।

এই ঘাটতি যথাসম্ভব পুরণের জন্য কমিশন বিভিন্ন কৃষি সামগ্রীর উৎপাদনের তাগ (target of production)—অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে কতখানি উৎপাদন বাড়াইতে হইবে—তাহা স্থির করিয়াছিলেন। রাজ্য সরকারগুলির সহিত পরামর্শ ক্রমে এই উৎপাদন-তাগ স্থির করা হইয়াছিল : কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ সামগ্রীর তাগ স্থির হইয়াছিল নিম্নরূপ :

সামগ্রী	পরিমাণ (মিলিয়ন)	বৃদ্ধির হার
খাদ্যশস্য	৭'৬ (টন)	১৪%
তুলা	১'২৬ (বেল)	৪২%
পাট	২'০৯ (বেল)	৬৩%
ইক্ষু	০'৭ (টন)	১২%
তৈলবীজ	০'৪ (টন)	৮%

এই তাগ ছিল ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় বাড়তি উৎপাদন-তাগ। খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনের দুইটি হিসাব ছিল। একটি হিসাব ছিল রাজ্য সরকারগুলির কার্য্যসুচীর ফল স্বরূপ, ইহাতে মোট ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাড়তি উৎপাদন হইত ; আর একটি হিসাব ছিল পরিকল্পনা কমিশনের দ্বারা প্রস্তাবিত অনুপুরক কার্য্য সুচীর (supplementary schemes) ফল স্বরূপ, ইহাতে ১৬ লক্ষ টন বাড়তি উৎপাদন হইত। ১৯৫৫-৫৬ সালে সর্ব্বশুদ্ধ মোট উৎপাদন হইবে আশা করা হইয়াছিল নিম্নরূপ :

খাদ্যশস্য—৬ কোটি ১৬ লক্ষ টন ; তুলা—৪২ লক্ষ ২০ হাজার বেল, পাট—প্রায় ৫৪ লক্ষ বেল ; ইক্ষু—৬৩ লক্ষ টন ; তৈলবীজ—৫৫ লক্ষ টন। খাদ্যশস্যের বাড়তি আসিবে বড় এবং ছোট সেচকার্য্য হইতে, পতিত জমি উদ্ধার এবং উন্নয়ন হইতে, এবং সার প্রদান এবং উন্নত বীজ ব্যবহার হইতে।

সুনির্দ্দিষ্ট মূল্য-নীতি অনুসরণ যে খুব প্রয়োজন, এ কথা ও পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ ভাবেই বলিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মূল বক্তব্য ছিল যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করিতে দেওয়া উচিৎ হইবে না ; জিনিষ পত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং দাম বাঁধিয়া রাখা খুবই প্রয়োজন। ইহার সহিতই কমিশন সুনির্দ্দিষ্ট খাদ্য-নীতি অনুসরণের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছিলেন।

কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয় জমিতে এবং জমির স্বত্বের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেইজন্য পরিকল্পনা কমিশন ভূমি-নীতির প্রশ্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহারা যে সুপারিশ করিয়াছিলেন সেগুলি হইল,—একজন ব্যক্তি

কতখানি জমি রাখিতে পারে তাহার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণ করা, যে সকল বড় মালিক নিজে চাষ করেন তাঁহাদিগকে কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া, চাষের কাজে যাহাতে একটি দক্ষতার মান বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা, ছোট এবং মাঝারি মালিকদের চাষে সমবায় ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা।

কৃষি উন্নয়নের পথে যত বাধা তাহাদের মূলে আছে ছোট এবং অলাভজনক জমি (small and uneconomic holding)। জমির উপর লোক সংখ্যার যতই চাপ পড়ে, ততই জমি ক্রমশ: এইরূপ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হয়। সেই জন্য ছোট এবং মাঝারি কৃষকদিগকে সমবায় কৃষি সমিতি গঠন করিতে উৎসাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সমবায় কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায় ক্রিয়াকলাপ শুধুই যে ছোট এবং মাঝারি কৃষকদিগের উপকার সাধন করিবে তাহাই নহে, উহা গ্রামের সমগ্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন উন্নততর করিবে।

দরিদ্র চাষীদের পক্ষে ভাল চাষের অর্থ নাই—অথচ প্রয়োজনীয় অর্থ না পাইলে ভাল বীজ, সার প্রভৃতি ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সেই কারণে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহের নির্দ্দিষ্ট সুপারিশ পরিকল্পনা কমিশন প্রদান করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বর্ত্তমানে কৃষি সামগ্রীর বিক্রয়-ব্যবস্থা (marketing arrangement) অত্যন্ত অসন্তোষজনক। এ সম্পর্কে কৃষকদিগের অক্ষমতা দূরীকরণের জন্য একাধিক রাজ্যে নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপিত হইয়াছে। ১ম পরিকল্পনাকালের মধ্যে সকল রাজ্যে "কৃষিদ্রব্য বিক্রয় বিধি" প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া কমিশন অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন।

[Q. The Five Year Plan has accorded the highest priority to Agriculture. How far do you think this emphasis on Agriculture is justified (Cal. B Com. 1951 ; Cal. B. A. 1953).

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জলসেচ, বিদ্যুৎ ও সমাজ উন্নয়ন সহ কৃষির উপরেই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। জলসেচের উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন জলসেচ পরিকল্পনার আনুষঙ্গিক এবং উহার সহিতই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) গ্রাম উন্নয়নের কর্ম্মসূচী এবং গ্রাম যেহেতু কৃষি-প্রধান সেহেতু সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কৃষি উন্নয়নের সহায়ক। এইগুলি মিলিয়া পরিকল্পনার মোট ব্যয় ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ৯২১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৪.৬ ভাগ কৃষি-উন্নতির জন্য বরাদ্দ হইয়াছিল। আমাদের দেশে সকলেই কিন্তু এযাবৎ শিল্পের সম্প্রসারণই সব থেকে বেশী

প্রয়োজন বলিয়া শুনিয়া আসিতেছিল। সেই কারণে প্রশ্ন উঠে যে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর এত অধিক গুরুত্ব প্রদান ঠিক হইয়াছিল কিনা।

আসলে কিন্তু মনে হয় উহা ঠিকই হইয়াছিল। শিল্পোন্নয়ন আমাদের একান্ত প্রয়োজন—কিন্তু উহা সম্ভব করিবার জন্য দ্রুত কৃষির উন্নতি প্রয়োজন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে সঙ্কটের (crisis) স্থান নাই। সঙ্কট ঘটিলে বুঝিতে হইবে, পরিকল্পনা সফল হয় নাই। এই সঙ্কটের সম্ভাবনা দূর করিয়া আমাদের দেশে যদি স্থায়ী ভারসাম্যযুক্ত অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া তুলিতে চয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম কৃষির সর্ব্বাধিক উন্নয়ন সাধনই প্রয়োজন। কৃষির উন্নতি হইলে তবেই (১) যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে ; ইহা পাওয়া না গেলে ঘাটতি ব্যয়ের (deficit financing) দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ঘটিয়া সবই বানচাল হইয়া যাইবে, শ্রমিক বিক্ষোভ হইবে এবং দেশে স্থায়ীপুঁজি অর্থাৎ কলকারখানা গঠন (যাহার উপর শিল্পোন্নতি একান্তই নির্ভরশীল) সম্ভব হইবে না ; (২) শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (raw material) যথোচিত গুণের এবং যথেষ্ট পরিমাণে যোগান হইতে পারিব (৩) গ্রামবাসীদের হাতে পয়সা আসিবে এবং তাহারা শিল্প সামগ্রী কিনিবার ক্ষমতা লাভ করিবে। অনগ্রসর দেশে, যেখানে কৃষিই সংখ্যাধিক ব্যক্তির উপজীবিকা অথচ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, সেখানে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নাই, কিন্তু আর্থিক কাঠামো ভিত্তি হইতে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রথমে কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়োজন।

কৃষির ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পরিকল্পনার লাভালাভ সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়াছেন। কমিশন বলেন যে ১৯৫২-৫৩ সালের পর হইতে কৃষি উৎপাদনে যে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে উহার দ্বারা সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা নিবারণে প্রচুর সহায়তা হইয়াছে এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিস্থিতি নিবারিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক জীবনের অন্যান্য অংশের শ্রীবৃদ্ধিতেও কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি অনেক সহায়তা করিয়াছে। ১৯৪৯-৫০ সালে কৃষি উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে, ১৯৫০-৫১ সালে উহা ৯৬-তে নামিয়া গিয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ১১৪-তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৯৫৫ সালে উহা ১১৫-তে পরিণত হইয়াছে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় উৎপাদন ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে অনুরূপ অনুপাতেই।

প্রধান কৃষিজাত ফসলগুলির উৎপাদনের তাগ্ (target of production) এবং প্রথম পরিকল্পনার শেষদিকে প্রকৃত উৎপাদনের হিসাব নিম্নরূপ :

ফসল	পরিমাণ একক	ভিত্তিবৎসরে উৎপাদন	বাড়তি তাগ্	১৯৫৪-৫৫ উৎপাদন	১৯৫৫-৫৬ প্রত্যাশিত
খাদ্যশস্য	নিযুত টন	৫৪.১	৭.৬	৬৫.৮	৬৫.০
প্রধান তৈলবীজ	,, ,,	৫.১	০.৪	৫.৯	৫.৫
ইক্ষু (গুড়)	,, ,,	৫.৬	০.৭	৫.৫	৫.৮
তুলা	,, গাঁইট	২.৯	১.৩	৪.৩	৪.২
পাট	,, ,,	৩.৩	২.১	২.৯	৪.০

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ এবং তুলা—এই তিনটি সামগ্রীর ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার আশা ফলবতী হইয়াছে ; কিন্তু ইক্ষু এবং পাট—এই দুইটি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদন প্রত্যাশিত উৎপাদন অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে, কারণ ইহার দ্বারা আমরা বাহির হইতে প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানীর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। এই সকল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে ক্ষুদ্র সেচকার্য্য, অধিকতর সার প্রয়োগ, পতিত জমি উদ্ধার এবং চাস জমির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। এই ৫ বৎসরে মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমিতে বাড়তি জলসেচ হইয়াছে, সার প্রয়োগ (এ্যামোনিয়াম সালফেট্-এর হিসাবে) বৃদ্ধি পাইয়াছে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন হইতে ৬ লক্ষ ১০ হাজার টনে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংগঠনের দ্বারা ২৪ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার হইয়াছে এবং ৫০ লক্ষ একর জমি চাষীদিগের দ্বারা উন্নত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাকালের পূর্ব্বে সমগ্র দেশে কৃষি উৎপাদনের জমির আয়তন ছিল (cropped area) ৩২ কোটি ৬০ লক্ষ একর, ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ৩৫ কোটি ২০ লক্ষ একরে পরিণত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন—Agricultural Development in the Second Five Year Plan

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উন্নতির যে কর্ম্মসূচী রচিত হইয়াছে উহাতে বাড়তি লোক সংখ্যার প্রয়োজনে বাড়তি খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে এবং শিল্প সম্প্রসারণের জন্য ও রপ্তানীর জন্য কাঁচামাল যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহা দেখা হইবে। তবে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপরেই সব থেকে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অপেক্ষাকৃত বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে শিল্পের উপর। তথাপি কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ব্যয় হইবে বেশী।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে মোট লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, সহরাঞ্চলের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজন, মুদ্রাস্ফীতির চাপ লাঘবের প্রয়োজন, খাদ্যগ্রহণ অভ্যাসের ধরণে পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে বৎসরে ৭½ কোটি টন। সেই জন্য ২য় পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বৎসরে খাদ্যোৎপাদন এক কোটি টন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্ত্তন এবং সেই জন্য উৎপাদনের ধরণ পরিবর্ত্তনের কথাও পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন; অর্থাৎ সুসম খাদ্যগ্রহণে (balanced diet) সাহায্য করিবার জন্য কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করা হইবে। অধিকন্তু ১ম পরিকল্পনায় দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই এরূপ একাধিক সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ২য় পরিকল্পনায় নজর দেওয়া হইবে, যথা, সুপারি, নারিকেল, লাক্ষা ইত্যাদি।

অবশ্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়াইবার অবকাশ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে খুবই কম। নূতন চাষের জন্য যদি জমি বাড়ানো যায়, উহা হইবে নিকৃষ্ট ধরণের জমি; উহাতে নিকৃষ্ট ধরণের শস্যই উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট ধরণের শস্যের চাহিদাই বাড়িতে থাকিবে কারণ লোকের হাতে যত আয় বাড়ে ততই তাহারা ভালো জিনিষ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং পূর্ব্বেকার জমিতেই অধিকতর প্রচেষ্টার দ্বারা অধিকতর লাভজনক চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুত:পক্ষে যথাযথ ব্যবস্থার দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশী বৃদ্ধি করিবার অবকাশ রহিয়াছে। কমিশন সুপারিশ করেন যে দেশের প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য প্রত্যেক শস্যের একটা গড় উৎপাদন তাগ নির্দ্ধারণ করা উচিত। এই গড় উৎপাদন তাগে পৌঁছাইবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির যে কর্ম্মসূচী রচিত হইবে, উহা প্রত্যেক গ্রাম এবং প্রত্যেক পরিবারের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ২য় পরিকল্পনাকালে প্রধান কৃষি সামগ্রীগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে নিম্নরূপ:

কৃষি সামগ্রী		১৯৫৫-৫৬ অনুমিত উৎপাদন	বাড়তি উৎপাদন তাগ	১৯৬০-৬১ প্রত্যাশিত উৎপাদন
১। খাদ্যশস্য	(টন)	৬ কোটি ৫০ লক্ষ	১ কোটি	৭ কোটি ৫০ লক্ষ
২। তৈলবীজ	,,	৫৫ ,,	১৫ লক্ষ	৭০ লক্ষ
৩। ইক্ষু (গুড়)	,,	৫৮ ,,	১৩ ,,	৭১ ,,
৪। নারিকেল তৈল	,,	১ ,, ৩০ হা:	৮০ হা:	২ ,, ১০ হা:
৫। সুপারি	(মণ)	২২ ,,	৫ ,,	২৭ ,,

কৃষি সামগ্রী	১৯৫৫-৫৬ অনুমিত উৎপাদন	বাড়তি উৎপাদন ভাগ	১৯৬০-৬১ প্রত্যাশিত উৎপাদন
৬। লাক্ষা, মণ	১২ লক্ষ	৪ লক্ষ	১৬ লক্ষ
৭। তুলা (গাঁইট)	৪২ ,,	১৩ ,,	৫৫ ,,
৮। পাট ,,	৪০ ,,	১০ ,,	৫০ ,,
৯। মরিচ (টন)	২৬ হাঃ	৬ হাঃ	৩২ হাঃ
১০। কাজু বাদাম ,,	৬০ ,,	২০ ,,	৮০ ,,
১১। চা (পাউণ্ড)	৬৪ ,, ৪০ ,,	৫ কোটি ৬০ ,,	৭ ,,
১২। তামাক (টন)	২ ,, ৫০ ,,	———	২ ,, ৫০ ,,

কৃষি উন্নতির দ্বারা এই বাড়তি উৎপাদনের জন্য একাধিক কর্ম্মসূচী অনুসরণ করা প্রয়োজন—সেচকার্য্য, সার প্রয়োগ, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ, জমি উদ্ধার, শুষ্ক চাষ পদ্ধতি (dry farming), বৃক্ষ সংরক্ষণ ইত্যাদি। ২য় পরিকল্পনা কালে ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য্য করা হইবে; ১ কোটি ২০ লক্ষ একরে বৃহৎ ও মাঝারি সেচকার্য্য থাকিবে এবং ৯০ লক্ষ একরে ছোট সেচকার্য্য থাকিবে। ছোট সেচকার্য্যের ব্যবস্থা থাকিবে কিছুটা রাজ্যগুলির কৃষি উন্নয়নের কর্ম্মসূচীতে এবং কিছুটা জাতি সম্প্রসারণ ও সমষ্টি উন্নয়ন কর্ম্মসূচীতে। বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৩,৫০০টি সেচ নলকূপ বসানো হইবে। সারপ্রয়োগ সম্পর্কে কমিশন বলেন যে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের প্রয়োগ আগামী পাঁচ বৎসরে ৬,১০,০০০ টন হইতে (১৯৫৫) ১৮ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করিতে হইবে; ফসফেট সার প্রয়োগও বাড়াইতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন সার প্রয়োগ সম্পর্কে তথ্য ব্যাপক ভাবে প্রচার করা। বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির পরিকল্পনায় ৯৩,০০০ একর জমিতে তিন হাজারটি বীজ চাষের খামার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোটামুটি প্রত্যেক জাতি সম্প্রসারণ ব্লকে একটি করিয়া বীজ-খামার (seed farm) ও বীজাগার (seed store) স্থাপিত থাকিবে। ১৫ লক্ষ একর পতিত জমি উদ্ধার এবং ২০ লক্ষ একর জমিতে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের আয়োজন হইয়াছে। শুষ্ক চাষ সম্পর্কে কমিশন বলেন যে সেচকার্য্যের বিস্তারিত ব্যবস্থা যতই করা হউক না কেন, অনেক জমিকেই প্রাকৃতিক বারিধারার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং শুষ্ক চাষ পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপক আয়োজন থাকা প্রয়োজন। উহা ব্যতীত ২য় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির বৃক্ষ সংরক্ষণ (plant protection) ব্যবস্থার অনেক সম্প্রসারণের আয়োজন হইবে।

কৃষি সম্পর্কে গবেষণা ও শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনের উপর কমিশন বিশেষ জোর দিয়াছেন। কৃষি গবেষণার জন্য ২য় পরিকল্পনায় ১৪·১৫ কোটি টাকা

বরাদ্দ করা হইয়াছে। "ভারত-মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র টেকনিক্যাল সহযোগিতা কর্ম্মসূচীর" আওতায় ১৮টি কেন্দ্রে চাষ সংক্রান্ত প্রয়োগ পরীক্ষা চালানো হইয়াছে; ২য় পরিকল্পনায় উহা আরও ১৬টি কেন্দ্রে প্রসারিত করা হইবে। কৃষি সামগ্রীর বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও পরিকল্পনা কমিশন বহু মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন এবং কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার পরেও, পরিকল্পনা কমিশন, ভারত সরকারের কৃষিদপ্তর এবং রাজ্যসরকারগুলি,—ইঁহারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার কৃষি উৎপাদনের তাগ্ আরও বাড়াইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হ'ন। ১৯৫৬ সালের জুন মাসের শেষে মুসৌরীতে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রীদের অধিবেশনে এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয় এবং পরে রাজ্য সরকারদিগের সহিত আরও বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনের নূতন সংশোধিত তাগ্ স্থির হইয়াছে। এই নব-নির্দ্ধারিত তাগ হইল নিম্নরূপ:

সামগ্রী	একক	পূর্ব্বের তাগ	সংশোধিত তাগ
খাদ্যশস্য	নিযুত টন	৭৫	৮০.৪
তৈলবীজ	,, ,,	৭	৭.৬
ইক্ষু (গুড)	,, ,,	৭.১	৭.৮
তুলা	,, গাঁইট	৫.৫	৬.৫
পাট	,, ,,	৫.০	৫.৫

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেরূপ উৎপাদনের তাগ্ ধরা হইয়াছিল তাহাতে এই পাঁচ বৎসরে কৃষি উৎপাদন শতকরা ১৭.৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবার কথা ছিল,—খাদ্য শস্যের বৃদ্ধি ১৬ শতাংশ এবং অন্যান্য ফসলের বৃদ্ধি প্রায় ২১ শতাংশ। কিন্তু এই নূতন তাগ্ অনুযায়ী কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি হইবে ২৮ শতাংশ—খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি হইবে ২৫ শতাংশ এবং বাণিজ্য ফসলের ক্ষেত্রে ৩৪ শতাংশ।

সারাংশ

কৃষিকার্য্যের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজন ও পদ্ধতি—এদেশে কৃষিকার্য্য হয় অল্প পরিধিতে, সেই কারণে ইহা যদি বা কিছুটা লাভজনক হইতে পারিত বাস্তবে তাহা হইতে পারে না। বৃহৎ পরিধিতে যদি চাষ হয় তাহা হইলে উহাতে উৎকৃষ্ট সংগঠন (Better organisation) সৃষ্টি সম্ভব। বৃহ-

দায়তনের উৎপাদন হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এবং মূল্যবান পুঁজির সাহায্যে অনেক বেশী উৎপাদন করা সম্ভব হয়; অপরদিকে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয়ে উৎপাদনকারীগণ নিজেরাই ব্যবস্থা করিতে পারে—মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী বা দালালদের হাতে পড়িতে হইবে না। বৃহৎ পরিধি উৎপাদনের সম্ভাবনা নির্ভর করে ভূমি সংস্কারের উপর এবং সাফল্য নির্ভর করে যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের অবকাশের উপর।

বৃহৎ পরিধির উৎপাদন তিন পদ্ধতিতে হইতে পারে (১) ***ব্যক্তি মালিকানা***—অর্থাৎ একজন মাত্র ব্যক্তি বৃহৎ পরিমাণ জমির মালিক এবং চাষের সংগঠক কিন্তু এদেশে ব্যক্তি মালিকানার অধীনে বৃহৎ চাষের সম্ভাবনা খুবই কম কারণ (ক) একজনের বেশী জমি নাই (খ) নিরক্ষর চাষীর সংগঠনী প্রতিভা নাই (গ) আর্থিক সঙ্গতি নাই (ঘ) ইহাতে পুঁজিবাদী চাষ সৃষ্টি হইবে। (২) ***যৌথ খামার***—ইহাতে জমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রই বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দেয়। কৃষি শ্রমিকদিগের উপর আভ্যন্তরীণ দায়িত্ব থাকে কিন্তু উপরকার নিয়ন্ত্রণ থাকে সরকারের হাতে। এদেশে এই ব্যবস্থার অনেক অসুবিধা। চাষীদিগকে জমির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা দুরূহ, কারণ সরকারকে চাষীদিগের ভোটের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। (৩) ***সমবায় চাষ***—এই ব্যবস্থায় চাষীরা তাহাদের জমি একত্রিত করিয়া সমবায় সমিতি গঠন করে এবং এই সমিতিকে জমি, শ্রম এবং কার্য্যকরী পুঁজি প্রদান করে। চাষী শ্রমের জন্য মজুরী পায় এবং উৎপন্ন ফসল বিক্রয় হইলে লাভের অংশ পায়। সমবায় চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ ভাবেই উপযোগী। ইহার দ্বারা স্বত্ব-চেতনা বজায় থাকে, পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নত হয় এবং উন্নত ধরণের চাষ পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন সমবায় চাষ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী। সমবায় চাষের যাহাতে প্রসার হয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নানারূপ সুপারিশ করিয়াছেন এবং সরকার কর্ত্তৃক ইহাদিগকে নানারূপ সুযোগ সুবিধা প্রদানের যৌক্তিকতা উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান পদ্ধতি—এদেশে কৃষিপদ্ধতি হইল প্রাচীন-পন্থী। পশুখাদ্যশস্য উৎপাদনের আয়োজন করা হয় না, উন্নত ধরণের বীজের উপকারিতা উপলব্ধি হয় না, পাল্টিশস্য উৎপাদনের (crop rotation) ব্যবস্থা করা হয় না, মাটিকে চাষোপযোগী করিবার প্রাথমিক কার্য্য হয় না, সার প্রদানের রীতি পুরাতনী, চাষের সরঞ্জাম পুরাতন লাঙ্গল ও বলদ। কৃষিপদ্ধতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন (১) যান্ত্রিক কৃষি (২) কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (rationalisation of agriculture)।

ভারতে যান্ত্রিক কৃষি—আধুনিক বিজ্ঞান-উদ্ভূত যন্ত্র ব্যবহার করা

প্রয়োজন ; প্রগতিশীল দেশগুলিতে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্ত্তনের দ্বারা কৃষিপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে নাঙ্গল ও বলদের পরিবর্ত্তে ট্র্যাক্টর ব্যবহার করিলে আপাততঃ বেশী খরচা পড়িলেও আখেরে খরচা অনেক কম। অবশ্য যান্ত্রিক কৃষি বলিতে নিছক ট্র্যাক্টর বুঝায় না—ছোটখাটো নানারূপ যন্ত্র ব্যবহার করিয়াও যান্ত্রিক কৃষি অবলম্বিত হইতে পারে। এদেশে যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্ত্তনের অসুবিধা হইল : (১) কৃষকদের অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য ; (২) খণ্ড খণ্ড জমি (৩) কৃষিশ্রমিক বেকার হইতে পারে-এইগুলি কিন্তু চূড়ান্ত বাধা নহে। যান্ত্রিক কৃষি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস কিছুটা সম্প্রতি করা হইয়াছে। ইহার জন্য ট্র্যাক্টর সংগঠন স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাদের ট্র্যাক্টর পতিতজমি উদ্ধারের কাজে লাগানো হইয়াছে এবং চাষীদের ভাড়াও দেওয়া হইয়াছে।

কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন—উন-কর্ম্মসংস্থান (under employment) এবং ছদ্মবেশী-বেকার অবস্থার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য এবং কৃষিকার্য্যকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য আধুনিক রীতি-নীতির ভিত্তিতে উহাকে উন্নত করিতে হইবে। ফিসক্যাল কমিশন এইরূপ পুনর্গঠনের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন : (১) বৃহৎ ও ছোট সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ; (২) মৃত্তিকাক্ষয় রোধ ; (৩) পদ্ধতি উন্নয়ন যথা গবেষণা, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার, হাল দিবার পদ্ধতি, জমির সংহতি সাধন, বিবিধ চাষ ; (৪) পার্শ্বজীবিকা (৫) বিক্রয় ব্যবস্থা ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা (৬) অর্থ সরবরাহ ও দাম সমর্থন ব্যবস্থা (price-support measure) (৭) ভূমিস্বত্ব সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার ; জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য। বস্তুতঃপক্ষে ; অনেক প্রকার ব্যবস্থা দরকার। কতকগুলি দরকার শ্রমের এককপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং কতকগুলি দরকার জমির এককপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ; আবার কতকগুলি দরকার জমি পিছু এবং শ্রম পিছু উভয় ধরণের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। মোটকথা, সামগ্রিক পদ্ধতিগত উন্নয়ন দরকার (total technological improvement)। ইহার জন্য নানাবিধ কার্য্যের দায়িত্ব লইয়া রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হইতে হইবে : (১) সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি, (২) গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসার, (৩) উন্নত চারা সৃষ্টি (৪) সরঞ্জাম, বীজ ও সার (৫) ট্র্যাক্টর (৬) ঋণ (৭) গুদাম ; শ্রেণীবিভাজন, বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন (৮) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (৯) বনরক্ষা ও মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধ (১০) সম্প্রসারণ কার্য্য, (১১) ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন—প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক আয়োজন করা হইয়াছিল। কৃষিজাত ফসলের ক্ষেত্রে আমাদের বহু ঘাটতি ছিল এবং এই ঘাটতি পুরণের জন্য বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদনের তাগ

স্থির হইয়াছিল : খাদ্যশস্য—৭৬ লক্ষ টন ; তুলা—১২ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁইট, পাট—২০ লক্ষ ৯০ হাজার গাঁইট, আখ—৭ লক্ষ টন, তৈলবীজ—৪ লক্ষ টন। এই বাড়তি উৎপাদন পাইবার উপায় রূপে পরিকল্পনা কমিশন নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছিলেন।

এই পরিকল্পনায় জলসেচ-বিদ্যুৎ ও সমাজ উন্নয়ন সহ কৃষির উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা জোর দেওয়া সঙ্গতই হইয়াছিল কারণ (১) খাদ্য উৎপাদন (২) কাঁচামাল উৎপাদন ও (৩) কৃষকশ্রেণীর আয় বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন ছিল।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ১৮ শতাংশ। তবে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ ও তুলা—এই তিনটির ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনার আশা ফলবতী হইয়াছিল কিন্তু আখ ও পাটের ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদন অনেক কম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সব থেকে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে শিল্পে তবে কৃষির খাতে যে ব্যয় করা হইবে তাহা ১ম পরিকল্পনার অপেক্ষা বেশী। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত) কৃষি উৎপাদান শতকরা ১৭·৪ ভাগ বৃদ্ধি করিবার কথা ছিল কিন্তু এই ভাগ সংশোধন কবিয়া এক্ষণে স্থির করা হইয়াছে যে কৃষি উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষিকার্য্য ঃ দুর্ভিক্ষ, খাদ্য ও রাষ্ট্র
Agriculture : Famine, Food and the State

ভারতে দুর্ভিক্ষ—Famines in India

আমাদের দেশে সাময়িক দুর্ভিক্ষ উনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক জীবনে প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সভ্য জগতের কোন অংশে জনগণ দুর্ভিক্ষের দ্বারা প্রপীড়িত হইলে নিঃসন্দেহে উহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কিন্তু আমাদের দেশে তাহাও ঘটিয়াছে। সেই কারণে এইরূপ ঘটনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থার আলোচনা প্রয়োজন হয়। কখন কখন ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণে বলা হইয়া থাকে যে আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ বলিতে খাদ্যের অভাব যতটা না বুঝায় ততটা বুঝায় টাকার অভাব। কিন্তু ১৯৪৩ সালের বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষের দ্বারা খাদ্যাভাবই বুঝাইয়া থাকে। বরং ১৯৪৩ সালে যুদ্ধপরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে মুদ্রার যোগান বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। সুতরাং দুর্ভিক্ষের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য উহার কারণ যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারতে দুর্ভিক্ষের কারণ—Causes of Famines in India

Q. Discuss the causes of famines in India. What measures would you like to adopt to prevent famines in the country? (B. A. 1949).

(১) **অর্থনৈতিক কারণ**—অর্থনৈতিক কারণ বলিতে বুঝায় জনগণের চরম দারিদ্র্য; বিভিন্ন কারণে দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। কুটির শিল্পের ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী আধুনিক শিল্পের প্রসার লাভ ঘটে নাই। কৃষিকার্য্যের প্রাচীন পদ্ধতির জন্য কৃষি উৎপাদন অত্যন্ত অল্প। উপরন্তু ভারতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রসিদ্ধ বিশ্লেষক স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত দেখাইয়াছিলেন যে দরিদ্র কৃষকদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ এতই অধিক ছিল যে কৃষকগণ রাজস্ব প্রদানের জন্য সমগ্র খাদ্যশস্য বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইত। এই সকল শস্য বৈদেশিক দায় মিটাইবার জন্য বিদেশে

চালান হইয়া যাইত। কৃষকগণ ঋণজালে আবদ্ধ হইত এবং তাহাদের ঋণের বোঝা বংশানুক্রমিক ভাবে বহন করা হইত।

যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত কারণ—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকাও আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের আর একটি কারণ। কোন বিশেষ অঞ্চলে খাদ্য শস্যের অভাব ঘটিলে, অন্য অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য দ্রুত আনয়ন করা সম্ভব হয় না।

প্রাকৃতিক কারণ—প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা অন্যতম। কৃষিভূমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত নহে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ত কোন ব্যবস্থা নাই। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির দরুণ সহজেই ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবিবেচকের ন্যায় অরণ্যসমূহের ধ্বংসও দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ—অরণ্যের সহিত যথারীতি বৃষ্টিপাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। উপরন্তু শস্যভুক বিভিন্ন প্রাণীর দ্বারা বহু কোটি টাকা মূল্যের শস্য ধ্বংস হয়।

অধিকন্তু কোন কোন সময়ে খাদ্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং তখন খাদ্য সামগ্রী জনসাধারণের মধ্যে একস্তরের লোকের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে স্বাভাবিক ভাবে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী হইত তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বাহিরে চালান হইয়া যাইত। উপরন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইত যুদ্ধজনিত অবস্থার দরুণ তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে বন্যার জন্য খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সৈন্য চলাচল ও রণসম্ভার প্রেরণে রেল বিভাগ অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় রেলযোগে ঘাট্‌তি অঞ্চলে খাদ্যশস্য আনয়নের দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় নাই। এই সময়ে ধীরে ধীরে খাদ্যেব মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বেপারীগণ এবং জনসাধারণের মধ্যে কিছু সঙ্গতিশালী ব্যক্তি খাদ্যশস্য মজুদ করিতে থাকায় কিছুকালের মধ্যে উহাদের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যুদ্ধজনিত প্রয়োজনে খাদ্যশস্যের চাহিদাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং যুদ্ধজনিত ব্যয়ের দরুণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় দামস্তর অত্যধিক উচ্চ হইয়াছিল।

প্রতিবিধানমূলক ব্যবস্থা

অবিভক্ত ভারতে দেশীয় রাজ্যসমূহবাদে, কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে তের কোটি একর। দেশীয় রাজ্যসমেত ভারত প্রজাতন্ত্রে বর্ত্তমানে কৃষিযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ নগণ্য হইবে না। এই সকল জমির উদ্ধার সাধন করিয়া উহাতে কৃষির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অতিবৃষ্টি হইতে যাহাতে শস্য নষ্ট হইয়া না যায় তাহার জন্য জল নিকাশের সুব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যাপক জল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন উপত্যকা পরিকল্পনার মাধ্যমে

ভারত সরকার এই কার্য্য সম্পাদনেরও প্রয়াস করিতেছেন। দেশের মোট কৃষিভূমির একপঞ্চমাংশে মাত্র জলসেচ ব্যবস্থা আছে। জলসেচ ব্যবস্থার অধিকতর প্রয়াস প্রয়োজন। সরকার জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; কৃষকগণ সমবায়ের ভিত্তিতেও জলসেচ ব্যবস্থার জন্য সমিতি গঠন করিলে লাভবান হইতে পারে। অরণ্য সংরক্ষণের জন্যও সরকারকে অধিকতর চেষ্টিত হইতে হইবে—সুখের বিষয় সরকার এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন। বনমহোৎসব সপ্তাহ উদ্‌যাপনই তাহার পরিচায়ক। জনসাধারণের চরম দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায়ে কৃষির উন্নতিবিধান প্রয়োজন এবং কুটিরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের প্রসার প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য উত্তম রাস্তা ও রেলপথ নির্ম্মাণ প্রয়োজন।

ভারতে খাদ্য সমস্যা—The Food Problem in India

Q. Discuss the objective of attaining self-sufficiency in food-supplies within the country. Examine the means adopted for its attainment (Agra 1951).

Examine briefly the measures adopted by the Government of India for dealing with the food problem of the country. (Cal. B. Com. 1951). Give a critical account of the measures adopted by the Government of India for dealing with the food problem of the country (Cal. B. A. 1953). Write a note on the food problem in India (Allahabad 1950).

বহুকাল অবধি ভারতে খাদ্যের অপ্রতুল ঘটিতেছিল। সেই কারণে ১৯৩০ সাল হইতেই ভারতের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যে খাদ্যশস্যের নীট আমদানী দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক সময়ে ভারতের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের দ্বারা তাহার সমগ্র অধিবাসী-সংখ্যার খাদ্যের প্রয়োজন মিটানো যাইত না। দেশ বিভাগের পর, ভারতের খাদ্যশস্যের ঘাটতি সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল কারণ খাদ্যশস্যের উদ্‌বৃত্ত অঞ্চলগুলি, যথা সিন্ধু এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অবিভক্ত ভারতের চাউল উৎপাদনের জমির শতকরা ২৬ ভাগের কিঞ্চিদধিক বর্ত্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত এবং গম উৎপাদন জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাকিস্থানভুক্ত, যদিও পাকিস্থানের লোকসংখ্যা অবিভক্ত ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ মাত্র।

সেই জন্য ভারতকে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া তাহার ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। এই বাবদ বিদেশকে বহু টাকা প্রদান

করিতে হয় এবং আমাদের সঙ্কুচিত বৈদেশিক মুদ্রা-সঙ্গতির (holding of foreign currency) উপর সেই কারণে অত্যধিক চাপ পড়ে। রাজস্বের উপরেও যে প্রভুত চাপ পড়ে তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের আমদানী করিতে হইয়াছিল ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার এবং ১৯৪৮ সালে ১৩০ কোটি টাকার। এই প্রভুত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাহির হইতে আমদানী করিয়া তবেই দেশের খাদ্য সরবরাহ করা গিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থের খাদ্যশস্য আমদানী অধিকদিন চলিতে দেওয়া সম্ভব নহে। সেই কারণে ভারতকে খাদ্যশস্যে আত্মপর্য্যাপ্ত করিবার একটি পরিকল্পনা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন—১৯৫১ সালের পরে ভারতকে যাহাতে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে না হয় তাহার আয়োজন করাই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ঐ তাগ্-তারিখ (target date) পরে ভারত সরকার ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পিছাইয়া লন। এবং ঐ তারিখের পরে খাদ্যশস্য আমদানী তিন কারণে হইতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করেন—(ক) কেন্দ্রীয় রিজার্ভ গড়িবার জন্য (খ) গুরুতর বিপর্য্যয় প্রতীকারের জন্য এবং (গ) নগদ শস্যে জমি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনে।

ভারত সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে ঐ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য এদেশে উৎপন্ন করিতে হইবে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাঁহারা কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জলসেচ ব্যবস্থা আছে এবং নিশ্চিত বারিধারা পাওয়া যায় এইরূপ ভূমির পরিমাণ হইল মোট কৃষিভূমির শতকরা ২৫ ভাগের অধিক নহে। সেইজন্য সরকারী পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে intensive cultivation বা একই জমিতে অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষির উপরে। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে যথাযোগ্য অঞ্চলগুলি হইতেই যাহাতে শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সকল অঞ্চলগুলির উপরেই অধিক প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। অবশ্য চাষযোগ্য জমি উদ্ধারেরও একটি পরিকল্পনা সরকার করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রায় সাড়ে আট কোটি একর পতিত জমি আছে যদিও ইহার মধ্যে উত্তম উর্ব্বর জমি হইবে ১ কোটি একরের মতন। ইহার মধ্য হইতে ৪০ লক্ষ একর আগাছাযুক্ত (weed infested) জমি ও ২০ লক্ষ একর নূতন জমি উদ্ধারের একটি ষষ্ঠ বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল। উদ্ধারকৃত এই সকল জমির মধ্যে যেগুলি সরকার উদ্ধার করিবেন সেগুলিতে খাদ্যশস্যই উৎপন্ন হইবে—এইগুলিতে উন্নত ধরণের বীজ ও উৎপন্ন হইতে পারে। তবে যে সকল জমি কৃষকগণই উদ্ধার করিবে—অবশ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে—সেই সকল জমিকে ১৫ বৎসরের জন্য রাজস্ব প্রদান হইতে রেহাই দেওয়া হইবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তবে এই ১৫

বৎসর গণনা করা হইবে, যে সময়ে জমিতে খাদ্যশস্য ফলানো হইবে সেই সময় হইতে। পতিত জমির উদ্ধার ব্যতীত সেচব্যবস্থার প্রসারেরও আয়োজন করা হইয়াছিল। নলকূপ বসাইবার জন্য ভারত সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে প্রায় ২৭ কোটি টাকা ঋণ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপিত থাকিবে পূর্ব্বেকার জমিতেই অধিক প্রচেষ্টা সমন্বিত কৃষির উপর (intensive cultivation)। এই ধরণের কৃষি প্রচেষ্টা করা হইবে উৎকৃষ্টতর সারের ব্যবহার, পুষ্করিণী ও খালের উন্নয়ন, কূপ নির্ম্মাণ ও পুরাতন কূপ সংস্কার, পাম্প ও টিউবওয়েল স্থাপন, উৎকৃষ্টতর বীজ সরবরাহ প্রভৃতির দ্বারা। সরকারের দ্বারা অনুমোদিত উৎকৃষ্ট কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয় খরচা কৃষক ও সরকারের মধ্যে আধাআধি ভাগ হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে এই বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৪ কোটি টাকা এবং ১৯৪৯ সালে প্রায় ৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। উপরন্তু নাইট্রোজেন সারের আমদানী বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছিল; যাহাতে খাদ্যশস্যের ফলনে ঐ সার ব্যবহৃত হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে রাসায়নিক সার কেবলমাত্র সেই সকল অঞ্চলেই এবং সেই সময়ে বিতরণ করা হইবে যে সকল অঞ্চলে এবং যে সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদন হইয়া থাকে।

সরকারের এই সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে আত্মপর্য্যাপ্ত হইবার সক্ষমতা ভারত অর্জ্জন করে নাই। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৯৪৯-৫০ সালের তুলনায় ৪০ লক্ষ টন হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে ২৩০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে আমদানী করিতে হইয়াছিল ১৫৬ কোটি টাকার খাদ্যশস্য।

১৯৫২-৫৩ সাল হইতে অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। উত্তম বৃষ্টিপাত এবং আবহাওয়ার দরুণ ১৯৫২-৫৩ সালে ২০ কোটি একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছিল (এত অধিক পরিমাণ জমিতে ইতিপূর্ব্বে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় নাই) এবং মোট উৎপাদন হইয়াছিল পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৫০ লক্ষ টন অধিক।* সেই কারণে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্য আমদানি করিতে হইয়াছিল ৭২ কোটি টাকার।

বর্ত্তমান ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে তাগ্ ধরা হইয়াছিল তাহা অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

---

* ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্যকৃষিমন্ত্রীদের কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী দ্বারা প্রদত্ত হিসাব।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। পরিকল্পনা কমিশন যে হিসাব দিয়াছেন উহাতে তাঁহারা বলেন যে ১৯৪৯-৫০ সালে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন হইয়াছিল ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উহা ১৪ শতাংশ বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছিল—৫ বৎসরে ৭৬ লক্ষ টন বাড়তি উৎপাদন হইবে ধরা হইয়াছিল; অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার শেষে বৎসরে মোট ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালেই খাদ্যশস্যের প্রকৃত উৎপাদন এই আকাঙ্খিত উৎপাদন-তাগ্ ছাড়াইয়া গিয়াছিল; ঐ বৎসরে খাদ্যশস্য* উৎপাদন হইয়াছিল ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন। ঐ বৎসর কিন্তু বিশেষ ধরণের অনুকূল বৎসর ছিল, উহা সচরাচর ঘটে না। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬½ কোটি টন উৎপাদন অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উৎপাদন তাগ্ অপেক্ষা বেশী। খাদ্যশস্য উৎপাদনের এই বৃদ্ধির দরুণ বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী হ্রাস করিতে পারা গিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব দিয়াছেন যে ১৯৫০ সালে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য আমদানী হইয়াছিল ৪৭ লক্ষ টন কিন্তু গত দুই বৎসর যাবৎ বাৎসরিক খাদ্যশস্য আমদানী হইতেছে ১০ লক্ষ টনেরও কম।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণ ১৮·৩ আউন্সে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। সেক্ষেত্রে বৎসরে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে ৭½ কোটি টন। ২য় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সেই জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বর্ত্তমান (১৯৫৫-৫৬=৬½ কোটি টন) অপেক্ষা আরও এক কোটি টন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্ত্তন এবং উহার সহিত উৎপাদনের ধরণ পরিবর্ত্তনের কথাও পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন। এদেশে আহার্য্যের মধ্যে শস্যের অনুপাত অত্যন্ত বেশী; অন্যান্য অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস নাই, আবার উহাদের যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদনও নাই। ২য় পরিকল্পনায় সেইজন্য কৃষি উৎপাদনের বৈচিত্র্য বিধানের আয়োজন করা হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যের ক্রমিক বি-নিয়ন্ত্রণ—Progressive De-control of Food

Q. Examine critically Government of India's present policy of progressive de-control with regard to food. (B. A. 1354).

যুদ্ধের সময়ে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হওয়ায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যশস্য

* খাদ্যশস্যের মধ্যে ছোলা ও ডাইল অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

সমানভাবে বণ্টিত হইবার পক্ষে বিভিন্ন বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় সরকার খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করিয়াছিলেন। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিছুটা সাফল্য অর্জ্জন করিলেও ইহাতে অনেক অসুবিধাও সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তরালে জনগণ কষ্ট ও অসুবিধা অনুভব করিতেছিল। অধিকন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হইতে উদ্ভূত,—স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে উহা নিষ্প্রয়োজন। এই সকল কারণে ১৯৪৭ সালে সরকার খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য একাধিক সামগ্রীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অপসারণের আয়োজন করেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অপসারণের এই পরীক্ষা সফল হইল না এবং পুনরায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে হইল। সরকার কিন্তু খাদ্যশস্যের উপর হইতে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সরাইয়া লইবার নীতি পরিত্যাগ করিলেন না। ক্রমিক বি-নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত সংগ্রহ ব্যবস্থা (procurement policy) চলিতে লাগিল। ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ সরকার খাদ্যদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ সরাইয়া লইলেন এবং তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে পুনরায় প্রচেষ্টা করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে পরিপুর্ণভাবে বি-নিয়ন্ত্রণ না করিয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমশঃ শিথিল করা হইবে। ঐ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আরও ঘোষণা করিলেন যে সকল রাজ্যসরকারই খাদ্যদ্রব্য বি-নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন; সুতরাং এ সম্পর্কে একটি নূতন পরিকল্পনা শুরু করা হইবে। ইহাতে অল্প কতিপয় বৃহৎ সহর এবং শিল্পাঞ্চল ব্যতীত দেশের সর্ব্বত্রই খাদ্যদ্রব্য বি-নিয়ন্ত্রিত হইবে। আন্তঃ-রাজ্য খাদ্যদ্রব্য চলাচলের উপর বাধা নিষেধ অপসারিত হইল এবং সমগ্র দেশের মধ্যে ঘাট্‌তি এবং উদ্বৃত্ত অঞ্চল সাজাইয়া কয়েকটি খাদ্য-এলাকা (Food Zone) গঠন করা হইল। রেশন এলাকা ব্যতীত, বিভিন্ন জিলার মধ্যে চাউল চলাচলের উপর নিষেধ অপসারিত হইল।

সহসা নিয়ন্ত্রণ অপসারিত না করিয়া এইরূপ ক্রমিক বি-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি দেশের পক্ষে হিতকরই হইয়াছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ছিল অথচ ইহাতে কুফলও সৃষ্টি হইয়াছিল; দুষ্প্রাপ্যতা এবং ব্যবসায়ীদিগের অসংযত লোভের জন্যই ইহার প্রয়োজন ছিল কিন্তু ইহার কুফল ফলিয়াছিল দুর্নীতি এবং তজ্জনিত জনগণের কষ্টভোগ। সহসা নিয়ন্ত্রণ অপসারণ করিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত—বিশেষ করিয়া পরিকল্পিত অর্থনীতিতে (planned economy) নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯৫৪ সালে ১৩ই এপ্রিল তারিখে খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন যে খাদ্য পরিস্থিতি যদি সন্তোষজনকই থাকিয়া যায় তাহা হইলে অবশিষ্ট নিয়ন্ত্রণও সরাইয়া লওয়া যাইবে। তবে খাদ্য-শস্যের পরিবহনই প্রধান সমস্যা।

১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিশেষভাবেই সন্তোষজনক হওয়ায় ১৯৫৪ সালের মধ্যভাগ হইতে সহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলি হইতে রেশনিং ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

_কৃষির সম্পর্কে রাষ্ট্র_—The State in relation to Agriculture

এদেশে কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহাকে দুইটি যুগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে : পরাধীনতার যুগে এবং স্বাধীনতার যুগে।

পরাধীনতার যুগে—ব্রিটিশ সরকার ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার দরুণ কৃষিকার্য্যে ঘোর অব্যবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাইয়া প্রথমেই ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু উহার পর কৃষিকার্য্যে কোন সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের কথা তাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বারংবার দুর্ভিক্ষ ঘটিতে থাকায় সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টি প্রদানে বাধ্য হন। ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি দপ্তর স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালে একজন ইনস্পেক্টর-জেনারেল অফ এগ্রিকালচার নিয়োগ করা হয়। পরে অবশ্য এই পদ উঠাইয়া দিয়া এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর-এর নিকট উহার কার্য্যভার হস্তান্তরিত করা হইল। ১৯০৩ সালে পুনরায় এই রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্ স্থাপিত হয় এবং ১৯০৮ সালে পুণায় একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক কৃষি দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জন্য ১৯০৫ সালে একটি অল-ইণ্ডিয়া বোর্ড অফ এগ্রিকালচার গঠিত হয়। ১৯২৯ সালে কৃষি গবেষণার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ স্থাপিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই কৃষকদিগের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১৮৮৩ এবং ১৮৮৪ সালে তাঁহারা দুইটি আইন পাশ করিয়া তাকাভি ঋণ নামে বিশেষ ধরণের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ঋণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ১৯০৪ সালে তাঁহারা সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হন এবং ১৯১২ সালে অন্যান্য ধরণের সমিতি গঠনে অনুমতি দেন। ১৯২১ সালের পর "কৃষি" বিষয়টি প্রাদেশিক মন্ত্রীর শাসনাধীন হওয়ায় এই সকল বিষয়ের সম্প্রসারণের কিছুটা প্রচেষ্টা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নিদারুণ খাদ্যাভাব ঘটায় সরকার খাদ্য উৎপাদনের জন্য নানাভাবে কার্য্যকরী সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে অধিক "খাদ্য ফলাও আন্দোলন" এই সময় হইতেই সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সকল কার্য্য ব্যতীত, স্বাধীনতার পূর্ব্বেই সরকার জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯৪১-৪২ সাল পর্য্যন্ত অবিভক্ত ভারতে

ব্রিটিশ এলাকায় সেচকার্যে মোট ১৪৫ কোটি টাকার অধিক মূলধনী ব্যয় (capital expenditure) হইয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলে সেচজমির পরিমাণ ছিল ৫ কোটি একরের উপর। কৃষিপণ্য বিক্রয়ে সাহায্যের জন্যও কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং প্রাদেশিক সরকারের বিপণিকরণ দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতার যুগ—ভারত স্বাধীন হইবার পরে কৃষি সামগ্রীতে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হওয়ায় এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক (রাজ্য) সরকারগুলি সুদৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে পুরাতন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয় এবং নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয়। এই বিবিধ প্রকার কার্য্যকে আমরা নিম্নভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারি :

(১) ***সমবায় ব্যবস্থা***—স্বাধীনতার যুগে রাজ্যসরকারগুলি সমবায় আন্দোলনের প্রসারের দ্বারা কৃষিকার্য্যকে কার্য্যকরী সহায়তা প্রদানেব জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এবং পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থার প্রসারের জন্য সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সমবায়ের ভিত্তিতে যাহাতে বৃহৎ পরিমাণ জমিতে একত্রিত ভাবে চাষ হয় সেই উদ্দেশ্যেও সম্প্রতি নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইযাছে এবং এখনও হইতেছে।

(২) ***তাকাভি ঋণ***—সরকার কর্ত্তৃক চাষীদিগকে যে তাকাভি ঋণ দিবার আয়োজন ছিল এক্ষণে তাহা অনেক সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। সঠিক পরিসংখ্যা না থাকিলেও তাকাভি ঋণেব পরিমাণ যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

(৩) ***গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন***—গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নের দ্বারা কৃষিকার্য্যে প্রচুব সহায়তা হয বলিয়া ঋণ ব্যবস্থাব উন্নয়নের জন্যও সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন এবং ইহার জন্য গরওয়ালা কমিটির সুপারিশ মত "গ্রাম্য ঋণের একত্রিত পরিকল্পনা" (Integrated scheme of rural credit) নামে একটি পবিকল্পনা চালু করিয়াছেন।

(৪) ***জমির সংহতি সাধন***—ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে খণ্ডিত ও অসম্বদ্ধ জমির সংহতি সাধনের জন্য সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন।

(৫) ***পতিত জমি***—পতিত জমি উদ্ধারের দ্বারা চাষের এলাকা সম্প্রসারণের জন্য সরকার চেষ্টিত হইয়াছেন। এই প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্যই করা হইয়াছে।

(৬) ***জলসেচ***—জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য সরকার বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতেছেন এবং অন্যান্য মাঝারি ও ছোট সেচ পরিকল্পনাও কার্য্যকরী করা হইতেছে।

(৭) ***ভূমিস্বত্ব***—চাষীকে জমির স্বত্ব প্রদান করিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যের উৎপাদনের একটি মান নির্দ্ধারণ করিয়া কৃষিউন্নয়নের জন্য সরকার চেষ্টিত হইতেছেন।

(৮) ***যন্ত্রীকরণ***—এদেশের কৃষিকার্য্যে যাহাতে যন্ত্র ব্যবহার সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার ট্র্যাক্টর সংগঠন স্থাপন করিয়াছেন এবং নানাবিধ উপায়ে যন্ত্রব্যবহার সম্ভব এবং জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

(৯) ***সার***—কৃষিকার্য্যে যাহাতে সার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে সরকার অধিকতর সারের যোগান দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে সিন্ধ্রিতে একটি সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ২য় পরিকল্পনায় আরও দুইটি কারখানা স্থাপিত হইবে।

(১০) ***বনায়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ***—বনায়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া পরোক্ষভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে সরকার কৃষিকার্য্যে সহায়তা প্রদানের আয়োজন করিয়াছেন।

(১১) ***জাপানী প্রথা***—জাপানী প্রথায় ধান চাষ করিলে একই জমিতে অধিক উৎপাদন হইতে পারে বলিয়া সরকার জাপানী প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য এবং উহাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন।

(১২) ***সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ***—সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যের উদ্দেশ্য হইল গ্রাম জীবনের উন্নয়ন। কৃষি উন্নতির সহিত গ্রাম জীবনের উন্নতি জড়িত থাকায় সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা।

(১৩) ***গবাদি পশুর উন্নয়ন***—গবাদি পশুর উন্নয়নের সহিত কৃষকের এবং কৃষির স্বার্থ জড়িত থাকায় এই উদ্দেশ্যে সরকারের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন কার্য্য কৃষির সহায়ক।

(১৪) ***শস্য রক্ষা***—শস্য রক্ষার জন্য "কেন্দ্রীয় পতঙ্গধ্বংসী সংগঠন" (Central Anti-locust organisation) নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হইয়াছে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগ হইল পরিকল্পনার যুগ এবং এই পরিকল্পনার যুগে সরকার কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সর্ব্ব-ব্যাপি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন

হইয়াছেন। সুতরাং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সরকারের দায়িত্বের পরিসর ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে।

সারাংশ

দুর্ভিক্ষ ও ইহার কারণ—ভারতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। এই দুর্ভিক্ষের কারণ: (১) অর্থনৈতিক—জনগণের চরম দারিদ্র্য (২) যোগাযোগের অভাব (৩) প্রাকৃতিক কারণ—বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা। ইহার প্রতি বিধানের জন্য চাষের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

ভারতের খাদ্য সমস্যা—স্বাভাবিক সময়েই ভারতকে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইত। দেশবিভাগের পর খাদ্য ঘাট্‌তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই জন্য বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া (যথা ১৯৪৮ সালে ১৩০ কোটি টাকায়) তবেই দেশের খাদ্য-প্রয়োজন মিটানো গিয়াছে। দেশকে খাদ্যশস্যে আত্মপর্য্যাপ্ত করাইবার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য সরকার একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা দুই প্রকার: intensive cultivation এবং extensive cultivation; অর্থাৎ যে জমিতে চাষ হয় সেই জমিতেই আরও বেশী চেষ্টা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং নূতন জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা। তবে প্রথমটির উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ্চ এর মধ্যে (উহা ছিল আত্মপর্য্যাপ্ত হইবার তাগ্‌ তারিখ্‌) আত্মপর্য্যাপ্ত হওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সালের পর হইতেই অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্য আমদানি হইয়াছিল ৭২ কোটি টাকার; উহার পূর্ব্বেকার কয় বৎসরের তুলনায় উহা যথেষ্ট কম। ১ম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল; ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬½ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়াছে-ইহা ১ম পরিকল্পনার তাগ্‌ অপেক্ষা বেশী, ফলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে এবং ভারত খাদ্যশস্যে আত্ম-নির্ভর হইয়া উঠিয়াছে। তবে ২য় পরিকল্পনাকালের শেষে আরও এক কোটি টন (মোট ৭½ কোটি টন) খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে, অধিকন্তু উৎকৃষ্ট ধরণের খাদ্যের চাহিদা বাড়িবে। ২য় পরিকল্পনায় সেই কারণে কৃষি উৎপাদনের আরও বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যের আয়োজন করা হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যের ক্রমিক বি-নিয়ন্ত্রণ—খাদ্যশস্যের ঘাট্‌তির সময়ে উহার ক্রয়-বিক্রয় এবং চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছিল। উহার

দ্বারা সুসম বণ্টনে সহায়তা হইলেও নানারূপ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপসারণের আয়োজন হয়। কিন্তু ইহা একসঙ্গে না করিয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকে। ১৯৫২ সাল হইতে ইহা সুরু হয় এবং ১৯৫৪ সালে শেষ হয়।

কৃষির সম্পর্কে রাষ্ট্র—পরাধীনতার যুগে সরকার কৃষির ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম কার্য্য করেন ভূমি স্বত্বের সংস্কার সাধন করিয়া। অতঃপর যাহা করা হয় তাহা এইরূপ: বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি-দপ্তর স্থাপন, ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল অফ এগ্রিকালচার নিয়োগ, এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্ স্থাপন (১৯০৫), কৃষি কলেজ স্থাপন (১৯০৮), অল ইণ্ডিয়া বোর্ড অফ এগ্রিকালচার (১৯০৫), ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ (১৯২৯); ইহা ব্যতীত, কৃষকদিগকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা (১৮৮৩, '৮৪), সমবায় আন্দোলন (১৯০৪) জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন—বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্য।

স্বাধীনতার যুগে—সরকার পুরাতন ব্যবস্থাগুলিকে আরও জোরালো করিয়া তুলিলেন এবং অনেক নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। সমবায় ব্যবস্থাকে জোরালো করা হইল, সমবায় চাষের উৎসাহ দান করা হইল, তাকাভি ঋণ বৃদ্ধি হইল, গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে, জমির সংহতিসাধন ও পতিত জমি উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনায় এবং ছোট খাটো পরিকল্পনায় জলসেচের প্রভূত বিস্তার করা হইতেছে। ভূমিস্বত্বের আমূল সংস্কার, যন্ত্রীকরণ, সার উৎপাদন ও সরবরাহ, বনায়ন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, জাপানী প্রথা প্রবর্ত্তন, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ, গবাদি পশুর উন্নয়ন ও শস্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিয়া সরকার কৃষি উপকার সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন। মোটকথা কৃষির সর্ব্ববিধ উন্নয়নের চেষ্টা করিবার পরিপূর্ণ দায়িত্ব সরকার স্বীকার করিয়াছেন।

নবম অধ্যায়

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

Community Development Projects

সমষ্টিগত গ্রাম্য প্রচেষ্টা—Collective Effort in the Villages

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য নিছক একটি পেশাই নহে, সামগ্রিক জীবন যাপন পদ্ধতির সহিত ইহা জড়িত ; কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল সামগ্রিকভাবে গ্রাম জীবনের উন্নয়ন বিধান। এ বিষয়ে গ্রামবাসীগণ যদি নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করে, সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা যদি নিজেরা গ্রাম জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা নিজদিগের বৈষয়িক জীবনের এবং কিছুটা নৈতিক জীবনেরও উন্নতি বিধান করিতে পারে। এইভাবে গ্রামবাসীদিগের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রামের বৈষয়িক জীবনের মানোন্নয়নের মধ্যেই, বর্ত্তমান দুর্ভাগ্য হইতে গ্রামগুলির পরিত্রাণের এবং কৃষিকার্য্যকে বর্ত্তমান প্রায়-অচল অবস্থা হইতে উত্তোলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি নিহিত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা কৃষি-নির্ভর এবং গ্রাম-বহুল দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিও সম্ভব হইবে। এই উদ্দেশ্যেই সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) রচিত হইয়াছে এবং কার্য্যকরী করা শুরু হইয়াছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—Community Development Projects

Q. Write note on Community Development Projects (Delhi. 1955 ; All. 1954)

Describe the main features of the Community Development Projects in India. (Cal. B. A. 1957)

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বলিতে একটি বিশেষ পর্য্যায়ের কার্য্যক্রমকেই বুঝায় ; এই কার্য্যক্রমের দ্বারা কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীগণ তাহাদের সংযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা নিজদিগের বৈষয়িক জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হয়। ইহাতে সরকার হইতেও তাহাদিগকে সহায়তা প্রদান করা

হয়। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের সমষ্টিগত আত্মনির্ভরশীলতা পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতার কার্য্য ক্ষুদ্র অঞ্চলে নিবদ্ধ করিয়া সম্পাদিত হইতে পারে। সেই কারণে সমগ্র দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এক একটি এইরূপ অঞ্চলে গ্রামবাসীদিগের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা উন্নয়নের কার্য্য সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে। এইরূপ এক একটি অঞ্চলকে সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্ররূপে অভিহিত করা হয় (Community Project Area)

তিনশত গ্রাম লইয়া এইরূপ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হয় এবং ইহাদের এলাকা ৪৬০ হইতে ৫০০ বর্গ মাইলের মধ্যে। জনসংখ্যা সাধারণত: দুইলক্ষ এবং কৃষি-ভূমির আয়তন থাকে দেড় লক্ষ একর। প্রত্যেক পরিকল্পনা কেন্দ্রে (Project Area) একজন করিয়া পরিকল্পনা কর্ম্মচারী (Project Officer) নিযুক্ত থাকেন। ইনি সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হন এবং বেসকারী অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত একটি কমিটির সাহায্যে কার্য্য সম্পাদন করেন। এই কমিটি "পরিকল্পনা পরামর্শ কমিটি" (Project Advisory Committee)।

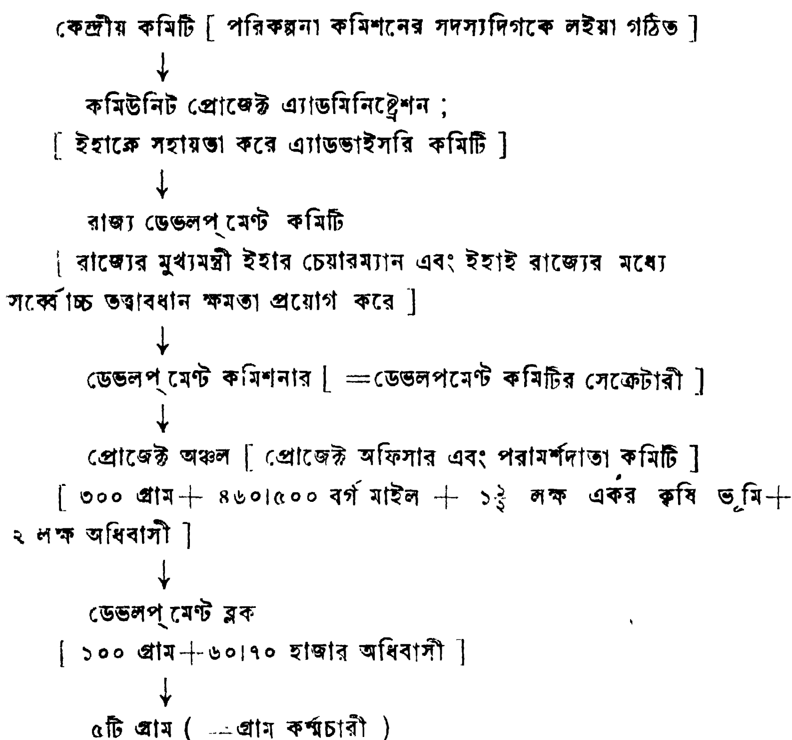
আবার সমগ্র পরিকল্পনা কেন্দ্রটিকে তিনটি ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়; এই ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলিকে ডেভলপ্‌মেণ্ট ব্লক (Development block) বলা হয়। প্রত্যেক ডেভলপ্‌মেণ্ট ব্লকে ১০০টি গ্রাম এবং ৬০ হইতে ৭০ হাজার লোক অন্তর্ভূক্ত থাকে। আবার প্রত্যেক ডেভলপ্‌মেণ্ট ব্লক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত থাকে; পাঁচটি গ্রাম লইয়া এইরূপ ক্ষুদ্র অঞ্চল গঠিত এবং এই অঞ্চলের দায়িত্ব একজন গ্রাম্য কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত।

প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একাধিক সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (Project Areas) আছে। প্রত্যেক রাজ্যের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য একজন ডেভলপ্‌মেণ্ট কমিশনার নিযুক্ত এবং একটি ডেভলপ্‌মেণ্ট কমিটি গঠিত থাকে। রাজ্যের মধ্যে পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করিবার আয়োজন তদারকের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা এই ডেভলপ্‌মেণ্ট কমিটির উপরে অর্পিত। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান এবং ডেভলপ্‌মেণ্ট কমিশনার হইলেন ইহার সেক্রেটারী।

সমগ্র ভারতের সকল রাজ্যগুলির সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য কমিউনিটি প্রোজেক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন গঠিত আছে। ইহার সহিত সংযুক্ত আছে উচ্চতর কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া গঠিত একটি পরামর্শ কমিটি (Advisory Committee)। কিন্তু ইহাও সর্ব্বোচ্চ সংস্থা নহে। সমগ্র ব্যবস্থাটির

শীর্ষদেশে আছে কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Committee)—ইহা পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) সদস্যদিগকে লইয়া গঠিত। ইহাই সকল রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে সুসমঞ্জস করিবার দায়িত্ব বহন করে।

সুতরাং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠনকে নিম্নরূপ ছকে ব্যক্ত করিতে পারা যায় :



***সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য্য*—Work of the Community Development Projects**

যে সকল বিষয় এবং ক্রিয়াকলাপের সহিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সেগুলি হইল :

(ক) কৃষিকার্য্য এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ

(খ) নূতন সমবায় সমিতি গঠন এবং প্রত্যেক পরিবারকে সমবায়ের আওতায় আনিয়া সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করা

(গ) কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

(ঘ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

(ঙ) শিক্ষার প্রসার

(চ) স্বাস্থ্যোন্নয়ন

(ছ) কারিগর এবং কৃষকদিগের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা

(জ) বাসস্থান ব্যবস্থার উন্নয়ন

(ঝ) সমাজ কল্যাণ (Social welfare) ও আমোদ-প্রমোদ।

*জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য**—National Extension Service

Q. Write note on National Extension Service (Delhi 1954)

অধিক খাদ্য ফলানো অনুসন্ধান কমিটি (The Grow-More-Food Inquiry Committee) জাতি সম্প্রসারণ সংগঠন স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য হইবে প্রত্যেক চাষীর নিকট পৌঁছায় এইরূপ গ্রাম্য জনসেবামূলক কার্য্য সম্পাদন করা এবং সমগ্রভাবে গ্রাম জীবনের সুসমঞ্জস উন্নয়ন বিধানে সহায়তা করা। এই কমিটির দ্বারা চিহ্নিত কার্য্যক্রম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে এরূপ ভাবে সংগঠন স্থাপনে সাহায্য করিবেন যাহাতে তাহাদের অধীন সমগ্র অঞ্চল দশবৎসরের মধ্যে ব্যাপক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

তদনুযায়ী "সম্প্রসারণের" নাম দিয়া উন্নয়নের আয়োজন করা হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও ইহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কালে

*সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যের মধ্যে সম্পর্ক—সমাজ উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ,—এই দুইটি কার্য্যক্রমের উদ্দেশ্য অভিন্ন। এই উদ্দেশ্য হইল গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা—সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা। ইহার জন্য গ্রামবাসীগণ নিজেরা প্রচেষ্টা করিবে, তবে এই প্রচেষ্টা যাহাতে ঠিকমত পরিচালিত হয় ও ফলপ্রদ হয় সেই উদ্দেশ্যে সরকার গ্রামবাসীদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিবেন। সম্প্রসারণের অর্থ হইল কল্যাণের সম্প্রসারণ; সরকার এই উদ্দেশ্যে কর্ম্মী সংগ্রহ করেন এবং উহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। অবশ্য সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাতেও সরকারই উদ্যোগ আয়োজন করেন; কিন্তু সমাজ উন্নয়ন হইল গাঢ় প্রচেষ্টা প্রয়োগের কার্য্য (intensive work), জাতি সম্প্রসারণ হইল ব্যাপক প্রচেষ্টার কার্য্য (extensive work)। অর্থাৎ জাতি সম্প্রসারণ এলাকায় মোটামুটি উন্নয়ন হইবে কিন্তু সমাজ উন্নয়ন এলাকায় আরও বেশী উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইবে। অতএব জাতি সম্প্রসারণ এলাকা যদি সমাজ উন্নয়নের এলাকায় পরিণত হয় তাহার অর্থ হইবে যে ঐ এলাকায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা আরও জোরালো করা হইল। জাতি সম্প্রসারণের চারিটি স্তর বিবেচনা করিলেই উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

(Plan-Period) প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার গ্রামকে এইরূপ সম্প্রসারণের আওতার ভিতর আনিবার আয়োজন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা দেশের গ্রামবাসীদিগের প্রায় এক চতুর্থাংশ এইরূপ উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট হইবে। এই "সম্প্রসারণ"এর অর্থ হইল একদল কর্ম্মী নিয়োগ করা—এই কর্ম্মীদের কার্য্য হইবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালনা করা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহ বর্ত্তমান সম্প্রসারণ কৃত্যকের (Existing Extension Services) পুনর্গঠনের জন্য, আরও কর্ম্মী সংগ্রহের জন্য এবং উহাদিগকে শিক্ষা প্রদানের জন্য, বিস্তারিত কর্ম্মসূচী রচনা করিবেন। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যকরী করিলে সকল প্রকার গ্রামোন্নয়ন কার্য্য, বিশেষ করিয়া অধিক কৃষি উৎপাদনের প্রচেষ্টা, ত্বরান্বিত হইবে।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী ১৯৫৫ সালের ২৯শে জুন তারিখে একটি বেতার ভাষণে জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যের প্রকৃতির বিস্তৃততব পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে তিনি বলেন যে এই আন্দোলনের চারিটি পর্য্যায় আছে। ***প্রথম*** হইল প্রাক্-সম্প্রসারণ পর্য্যায় (Per-extension stage) ; এই স্তরে গ্রামবাসীদিগকে জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচী রচনা করা উচিত। জনগণের সহিত পরামর্শক্রমেই এই কর্ম্মসূচী রচনা করিতে হইবে এবং জনগণ যেন ইহাকে তাহাদের নিজের কর্ম্মসূচী বলিয়াই মনে করে এবং উহার সাফল্যের জন্য নিজদিগের শ্রম ও অর্থ প্রদান করে তহার জন্য তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ***দ্বিতীয়*** স্তর হইল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পুরাপুরি জাতি সম্প্রসারণ কর্ম্মসূচী প্রবর্ত্তন করা। ইহা হইবে স্থায়ী কাঠামো। ***তৃতীয়*** স্তর হইল সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার (Community Project) মধ্য দিয়া তিন চার বৎসর যাবৎ গভীর উন্নয়নমূলক কার্য্য। ***চতুর্থ*** স্তরে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে থাকিবার পর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি পুনরায় জাতি সম্প্রসারণ এলাকায় (National Extension Block) ফিরিয়া যাইবে।

তিনি বলেন যে ১৯৫৫ সাল শেষ হইবার পূর্ব্বে ১,২০,০০০ গ্রামে জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য এবং সমাজ উন্নয়ন কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬০-৬১) সমগ্র দেশ উহার আওতার মধ্যে আসিবে। এই কর্ম্মসূচীর জন্য শিক্ষাদান ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইয়াছে।

জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যের মূলনীতিগুলির ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন যে প্রথমতঃ, গ্রাম জীবনের সকল দিকই ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং এই উদ্দেশ্যে রচিত

কর্মসূচী বিশেষ ভাবেই ব্যাপক (comprehensive) ; অবশ্য প্রয়োজন বোধে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উন্নয়ন সাধনের মূল শক্তি আসিবে জনগণের নিকট হইতে, স্বাবলম্বন হইল সকল সংস্কারের মূলে। গ্রামে গ্রামে অব্যবহৃত উত্তম গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, গ্রাম্য জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য সমবায় নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থসরবরাহ—Financing the Community Development Projects

ভারতের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারত সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হইয়াছিল। ১৯৫২ সালের "ভারত-যুক্তরাষ্ট্র টেকনিক্যাল সহযোগিতা চুক্তি" (Indo-U. S. Technical Co-operation agreement of 1952) রূপে ইহা পরিচিত। ইহার দ্বারা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার অর্দ্ধাংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার বহন করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে ; বাকী অর্দ্ধাংশ ভারত বহন করিবে।

আবার ভারত যে ব্যয়ভার বহন করিবে উহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে। বারম্বার (Recurring expenditure) ব্যয় হইবে যে অর্থ তাহার অর্দ্ধাংশ বহন করিবে রাজ্য সরকারগুলি এবং অর্দ্ধাংশ বহন করিবে কেন্দ্রীয় সরকার ; এবং এককালীন থোক ব্যয়ের (Recurring Expenditure) শতকরা ৭৫ ভাগ বহন করিবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ২৫ ভাগ বহন করিবে রাজ্য সরকারগুলি।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—মিশ্র শ্রেণী (Mixed type) এবং ভিত্তিক শ্রেণী (Basic type)। মিশ্র শ্রেণীর মধ্যে সহরাঞ্চল কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে উহা অন্তর্ভুক্ত নাই। একটি মিশ্র শ্রেণীর পরিকল্পনার জন্য তিন বৎসরের ব্যয় হইল ১১১ লক্ষ টাকা এবং একটি ভিত্তিক শ্রেণীর জন্য অনুরূপ ব্যয় হইল ৬৫ লক্ষ টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতি সম্প্রসারণ কৃত্যকের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল ১০১ কোটি টাকা।

১৯৫৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে ভারত সরকার এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যে একটি নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির দ্বারা মার্কিণ সরকার বাড়তি ২৫০টি সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য আরও ৬,৮০,০০০ ডলার প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের শেষে

এই ২৫০টি উন্নয়ন কেন্দ্র প্রবর্ত্তিত হইবে। অধিকন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যত সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে ইহাদের সকলকে মার্কিণ সরকার সরঞ্জাম (equipments), মালপত্র (supplies) এবং সহায়তা প্রদান করিবে। ইহা দেওয়া হইবে মার্কিণ সরকার পূর্ব্বে যাহা দিয়াছে তাহার উপরেও।

এই নূতন প্রতিশ্রুত অর্থ হিসাব করিলে ভারতের সমাজ উন্নয়ন কর্ম্মসূচীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ডলার। ইহা ৬.৬৫ কোটি টাকার সমান। ইহা কিন্তু এই কর্ম্মসূচীর জন্য মোট ব্যয়ের একটি সামান্য অংশ মাত্র। ভারত সরকারের মোট ব্যয় হইয়াছে ৯০ কোটি টাকা।

অগ্রগতি—Progress

Q. Write an essay on the objects and achievements of Community Projects in India (Patna, 1954). Describe the policy and progress of community development progamme of your state. Haw far have these objectives been realised? (Patna, 1956).

১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে ৫৫টি উন্নয়ন কেন্দ্র (Project Area) বাছাই করিয়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যাকরী করিতে সুরু হইয়াছিল। পরে ক্রমশঃ আরও এইরূপ পরিকল্পনা আরম্ভ করা হইয়াছিল। ১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর "জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য" আরম্ভ করা হইয়াছিল; প্রথমে ২৩৭টি উন্নয়ন কেন্দ্রে এই কার্য্য সুরু হয়।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি লক্ষ্য করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একটি "প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন অর্গানাইজেশন" নামে সংগঠন আছে। ১৯৫৪ সালের ১৯শে মে তারিখে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির কার্য্য সম্পর্কে ইহা একটি বিবরণী দাখিল করিয়াছিল। ইহাতে বলা হইয়াছিল যে এই পরিকল্পনা গ্রামবাসীদিগের মধ্যে "প্রগতিশীল ভাবধারার অনুপ্রবেশ করাইতে সক্ষম হইতেছে"। "ইহাদের সামগ্রিক ফলাফল এতই জাজ্জ্বল্যমান এবং সুস্পষ্ট যে অধিকতর উৎপাদনের উদ্দেশ্য যে সুনির্দ্দিষ্টভাবে উপলব্ধি করা হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে"। ["the over-all effect is so striking and obvious that there can be no doubt that the objective of increasing production is being steadily attained"] এই বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে গ্রামগুলিতে সঠিক হিসাব প্রাপ্তির রেকর্ড না থাকায় এই পরিকল্পনাগুলিতে জনগণের অংশ গ্রহণ দ্বারা বিনিয়োগের বৃদ্ধি কতখানি ঘটিয়াছে তাহার কোন নির্ভরযোগ্য

হিসাব রচনা করা সম্ভব নহে ; কিন্তু গ্রামের পথ, বাঁধ, সেচখাল, প্রভৃতি নির্ম্মাণের দ্বারা যে পুঁজি সঙ্গতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নগণ্য নহে। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং কল্যাণ সাধনও উল্লেখযোগ্য ভাবেই ঘটিয়াছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে শ্রম প্রদান এবং বৈষয়িক সাহায্য প্রদানের আকাঙ্খা এবং প্রস্তুতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ; পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য মোট বিনিয়োগ (investment) বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃহত্তর পরিধিতে এই সদিচ্ছাকে কার্য্যকরী করা যাইতে পারে।

পরিকল্পনা কমিশন সমাজ উন্নয়ন ও জাতি সম্প্রসারণ কর্ম্মসূচী ১৯৫৫-৫৬ সাল অবধি কতখানি রূপায়িত হইয়াছে তাহার একটি হিসাব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস হইতে এযাবৎ ১,২০০ ব্লকে কাজ সুরু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩০০টি হইল সমাজ উন্নয়নের এবং ৯০০টি জাতি সম্প্রসারণের। শেষোক্ত ৯০০টির মধ্যে আরও ৪০০টি উন্নয়ন ব্লককে সমষ্টি উন্নয়নরূপ অপেক্ষাকৃত গাঢ় উন্নয়ন প্রচেষ্টার আওতায় স্থাপন করা হইয়াছে। প্রথম পবিকল্পনাকালে সৃষ্ট ১২০০টি ব্লকের সংশ্লিষ্ট তথ্য নিম্নরূপ :

	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	মোট
উন্নয়ন ব্লক					
সমাজ উন্নয়ন	২৪৭	৫৩	...	...	৩০০
জাতি সম্প্রসারণ	...	২৫১	২৫৩	৩৯৬	৯০০
	২৪৭	৩০৪	২৫৩	৩৯৬	১,২০০
গ্রামের সংখ্যা					
সমাজ উন্নয়ন	২৫,২৬৪	৭,৬৯৩	...	...	৩২,৯৭৫
জাতি সম্প্রসারণ	...	২৫,১০০	২৫,৩০০	৩৯,৬০০	৯০,০০০
	২৫,২৬৪	৩২,৭৯৩	২৫,৩০০	৩৯,৬০০	১,২২,৯৭৫
জনসংখ্যা					
সমাজ উন্নয়ন	১কো ৬৪ল	৪০ল	...	...	২কো ৪ল
জাতি সম্প্রসারণ	...	১কো ৬৬ল	১কো ৬৭ল	...	৫কো ৯৪ল
	১কো ৬৪ল	২কো ৬ল	১কো ৬৭ল		৭কো ৯৮ল

এই তালিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে প্রথম পরিকল্পনা শেষে এই ধরণের সুসমঞ্জস উন্নয়নের কর্ম্মসূচী ৮ কোটি লোকসংখ্যা অধ্যুষিত ১,২৩,০০০ গ্রাম লইয়া গঠিত অঞ্চলে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ইহার পরেও ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জাতি সম্প্রসারণ ও সমাজ-

উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে যে বিবরণী* পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি সরকার এই পরিকল্পনাগুলির জন্য ৫৬'৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। জনগণও এই পরিকল্পনার রূপায়নে ৩২'৯৬ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে, ইহা করিয়াছে সামগ্রীতে, শ্রমে এবং নগদেও। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে ৪৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে সমাজ উন্নয়ন কার্য্যে এবং ৭ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যে। জনসাধারণ সমাজ উন্নয়ন ব্লকগুলিতে ২৬ কোটি টাকার মতন প্রদান করিয়াছে এবং প্রায় ৭ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে জাতি সম্প্রসারণ কেন্দ্রগুলিতে। সরকারী ব্যয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যেরূপ ভাবে বণ্টিত হইয়াছে তাহা হইল এইরূপ: পশুপালন ও কৃষি সম্প্রসারণ—৪২৫ লক্ষ টাকা; সেচকার্য্য—৯২৪ লক্ষ টাকা; জমি উদ্ধার—৯৩ লক্ষ টাকা; স্বাস্থ্য ও গ্রাম স্বাস্থ্য রক্ষণ—৩৬৮ লক্ষ টাকা; সমাজ শিক্ষা—২১৩ লক্ষ টাকা; যোগাযোগ—৬২৩ লক্ষ টাকা; গ্রাম্য কারুশিল্প ও হস্তশিল্প ও অন্যান্য শিল্প—১৮৩ লক্ষ টাকা; গৃহনির্ম্মাণ—৬৮ লক্ষ টাকা।

ইহা হইল টাকার অঙ্কের হিসাব। কতখানি কাজ হইয়াছে তাহার হিসাবেও অগ্রগতি বিবেচনা করা চলে। এই সময়ের মধ্যে ***কৃষির ক্ষেত্রে*** ১৪০ লক্ষ মণ সার এবং ৬১ লক্ষ মণ উন্নত ধরণের বীজ বিতরণ করা হইয়াছে এবং ২৬ লক্ষ কৃষি প্রদর্শন (agricultural demonstrations) অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৬'৬৭ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ২৮'৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে। ২'১৬ লক্ষ এবং ৫'৫৭ লক্ষ একর জমি যথাক্রমে ফল উৎপাদনে এবং শব্জী উৎপাদনে লাগানো হইয়াছে। ৩৮৩৮টি মূল গ্রাম কেন্দ্র (key village centres) স্থাপন করা হইয়াছে। ***স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে*** ৯৮১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৯৪৭টি প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১,৪৭,০০০ গ্রাম্য পায়খানা এবং ৪৭ লক্ষ গজ নর্দ্দমা নির্ম্মিত হইয়াছে, ৫৮ হাজারটি পানীয় জলের কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ৮২ হাজারটি কূপ সারাণো হইয়াছে। ***শিক্ষার ক্ষেত্রে*** ২০,০০০ নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ৭৭৯৪টি সাধারণ ধরণের বিদ্যালয়কে বনিয়াদি ধরণে (basic type) পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ৫৩ হাজারটি প্রাপ্ত-বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ লক্ষ ৫৫ হাজারটি সমষ্টি কেন্দ্র (Community centres) স্থাপিত হইয়াছে এবং ১২'৮৪ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ককে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করা হইয়াছে। এক লক্ষের উপর যুবক সঙ্ঘ, কৃষক সঙ্ঘ, মহিলা সমিতি প্রভৃতি গঠন করা হইয়াছে। ***যোগাযোগের ক্ষেত্রে*** ৭০০০ মাইল পাকা এবং ৪২,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে

* Fourth Report of the Programme Evaluation Organisation

এবং ৩০,০০০ মাইল পুর্ব্বেকার কাঁচা রাস্তা নূতন করিয়া সারাণো হইয়াছে। ***গৃহ নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে***, ৬৫,০০০ নূতন গৃহ এবং ৬১৫৪টি আদর্শ গৃহ (model house) নির্ম্মিত হইয়াছে। ***গ্রাম্য কলা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে*** ২০৪০টি প্রদর্শনী সমেত শিক্ষা কেন্দ্র (demonstration-cum-training centre) স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলিতে ৭৫,০০০ লোকে পুনরালোচনামূলক (refresher) এবং বনিয়াদী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, এই পরিকল্পনার আওতাভুক্ত গ্রাম্য অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় সমবায় ক্রিয়াকলাপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ৪১,০০০ নূতন ***সমবায়*** সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন সদস্য সংখ্যা হইয়াছে ২৩.৩ লক্ষ ব্যক্তি।

***দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী*—Programme for the Second Plan**

ভবিষ্যতের কর্ম্মসূচীরূপে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব অনুমোদন করেন, যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমগ্র দেশে জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার কর্ম্মপরিধি প্রসারিত করিতে হইবে এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের শতকরা অন্তত: ৪০ ভাগ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। উপযুক্ত পরিমাণ সঙ্গতি পাওয়া যাইলে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকগুলির শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত সমাজ-উন্নয়ন ব্লকে পরিণত করা যাইতে পারিবে। উহা করা যাইলে অতিরিক্ত ৩,৮০০টি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে কার্য্য চলিবে এবং উহার মধ্যে কমপক্ষে ১১২০টি ব্লককে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে সমাজ উন্নয়ন ব্লকে পরিণত করা হইবে। এই সকল কর্ম্মসূচীর ব্যয় ধরা যাইতে পারে ২৬৩ কোটি টাকা—উহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

পরীক্ষামূলক কর্ম্মসূচী অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে নিম্নরূপ জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য গ্রহণ করা হইবে এবং উহাদিগকে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে পরিণত করা হইবে :

উন্নয়ন ব্লকের সংখ্যা

সাল	জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য	সমষ্টি উন্নয়নে পরিণত
১৯৫৬-৫৭	৫০০	২৫০
১৯৫৭-৫৮	৬৫০	২০০
১৯৫৮-৫৯	৭৫০	২৬০
১৯৫৯-৬০	৯০০	৩০০
১৯৬০-৬১	১,০০০	৩৬০

একটি জাতি সম্প্রসারণ কার্য্যের খরচা হইতে পারে ৪ লক্ষ টাকা এবং সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের প্রত্যেকটিতে খরচা হইতে পারে ১২ লক্ষ টাকা। মোট ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে কেন্দ্রের খাতে এবং ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে রাজ্য পরিকল্পনার অংশরূপে। বিভিন্ন খাতে এই ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে নিম্নরূপ :

		কোটি টাকা
১।	কর্ম্মচারী ও সরঞ্জাম—ব্লক হেডকোয়াটারস্	৫২
২।	কৃষি	৫৫
৩।	যোগাযোগ	১৮
৪।	গ্রাম্য শিল্পকলা	৫
৫।	শিক্ষা	১২
৬।	সামাজিক শিক্ষা	১০
৭।	স্বাস্থ্য ও গ্রাম্য জনস্বাস্থ্য	২০
৮।	গৃহ নির্ম্মাণ	১৬
৯।	সমষ্টি উন্নয়ন—বিবিধ (কেন্দ্রীয়)	১২
	মোট	২০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী কার্য্যকরী করিবার সময়ে প্রত্যেক গ্রাম্য পরিবারের নিকট অংশ গ্রহণের চেতনা এবং নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। আশা করা যায় যে বিবিধ উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর মধ্য দিয়া নিম্নপ্রদত্ত বিষয়গুলিতে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ সম্ভব হইবে :

(১) সমবায় চাষ সমেত সমবায় ক্রিয়াকলাপের সম্প্রসারণ ;

(২) গ্রাম উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে দায়ী সংস্থারূপে পঞ্চায়েৎসমূহের উন্নয়ন ;

(৩) জমির সংহতি সাধন ;

(৪) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ;

(৫) গ্রামবাসীদের মধ্যে দুর্ব্বলতর অংশের সাহায্য হয় এরূপ কর্ম্মসূচী সংগঠন ;

(৬) স্ত্রীলোক এবং তরুণদের মধ্যে অধিকতর প্রচেষ্টামূলক কার্য্য ;

(৭) উপজাতি অঞ্চলে অধিকতর প্রচেষ্টামূলক কার্য্য।

সারাংশ

সমষ্টি গ্রাম প্রচেষ্টা ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—গ্রামবাসীগণ যদি নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রাম জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য সচেষ্ট হয় তাহা হইলে তাহারা বহু পরিমাণে নিজেদের নৈতিক ও বৈষয়িক জীবনের উন্নতি বিধান করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। সমগ্র দেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক একটি অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা উন্নয়নের কার্য্য সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে। ইহাই হইল সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (community project area)। ৩০০ গ্রাম, ৪৬০ হইতে ৫০০ বর্গ মাইল এলাকা, ১½ লক্ষ একর কৃষিভূমি এবং ২ লক্ষ লোক সংখ্যা লইয়া এবং সরকারের দ্বারা নিযুক্ত একজন প্রোজেক্ট অফিসারের অধীনে এই কেন্দ্র (project area) গঠিত। প্রত্যেক সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র ৩টি ডেভলাপমেণ্ট ব্লকে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজ্যের সকল সমাজ উন্নয়ন ব্যবস্থার তদারকীর জন্য একজন ডেভলাপমেণ্ট কমিশনার আছেন এবং একটি ডেভলাপমেণ্ট কমিটি গঠিত আছে। আবার সমগ্র ভারতের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা তদারকীর জন্য কমিউনিটি প্রোজেক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নামে একটি সংস্থা আছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে বিষয়গুলির উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা হয় সেগুলি হইল কৃষিকার্য্য, সমবায় সমিতি, কর্ম্মসংস্থান, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরী ও কৃষি ট্রেনিং, বাসস্থান ও সমাজ কল্যাণ।

জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য—সম্প্রসারণের নাম দিয়াও একপ্রকার উন্নয়ন ব্যবস্থার আয়োজন করা হইয়াছে। একদল কর্ম্মী নিয়োগ করা হইবে এবং ইহারা উন্নয়নের প্রচেষ্টা পরিচালনা করিবে। গ্রাম জীবনের সকল দিকই ইহার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এই কর্ম্মসূচী বিশেষ ব্যাপক। তবে ইহারও ভিত্তি হইল গ্রামবাসীদের স্বাবলম্বন এবং পদ্ধতি হইল সমবায় নীতির প্রসার। ইহার সহিত "সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার" ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জাতি সম্প্রসারণের দ্বারা সাধারণ ভাবে এবং মোটামুটি উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হয়। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা গভীরভাবে উন্নয়নমূলক কার্য্য সম্পাদিত হয়।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থসরবরাহ—সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার বহন করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং বাকী অর্দ্ধাংশ ভারত বহন করিবে। ভারতের ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ভাগাভাগি হইবে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা দুই প্রকার—মিশ্র ও ভিত্তিক। মিশ্রশ্রেণীর প্রত্যেকটির ব্যয় ৩ বৎসরে ১১১ লক্ষ টাকা এবং ভিত্তিক শ্রেণীর ৬৫ লক্ষ টাকা।

অগ্রগতি—১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর সমাজ-উন্নয়ন ও ১৯৫৩ সালের

২রা অক্টোবর জাতি সম্প্রসারণ কার্য্য শুরু হইয়াছিল। প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন কমিশন ইহার অগ্রগতি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন (১৯৫৪ সালের মে মাসে) যে ইহার দ্বারা গ্রামে যথেষ্ট পুঁজি সঙ্গতি (পথ, বাঁধ, সেচ খাল) গড়িয়া উঠিয়াছে, স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধনও (বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়) বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রামবাসীদের সদিচ্ছা এবং উৎসাহও স্পষ্ট দেখা যায়। পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ১ম পরিকল্পনার শেষে এই উন্নয়নের কর্ম্মসূচী ৮ কোটি লোক অধ্যুষিত ১,২৩,০০০ গ্রামে ব্যপ্ত হইয়াছে। আর একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস অবধি এই পরিকল্পনাগুলির জন্য সরকার ব্যয় করিয়াছেন ৫৬.৩০ কোটি টাকা, জনগণও প্রায় ৩৩ কোটি টাকার মতন প্রদান করিয়াছে—সামগ্রীতে, শ্রমে ও নগদে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ গৃহ নির্ম্মাণ, গ্রাম্য কলা ও শিল্প এবং সমবায় ক্রিয়াকলাপ—এই ক্ষেত্রগুলিতে অনেকখানি অগ্রগতি লাভ সম্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী—২য় পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী রচনায় স্থির হইয়াছে যে ১৯৫৬-৫৭, ৫৭-৫৮, ৫৮-৫৯, ৫৯-৬০ এবং ৬০-৬১ সালে যথাক্রমে ৫০০, ৬৫০, ৭৫০, ৯০০ এবং ১০০০টি জাতি সম্প্রসারণ ব্লক সৃষ্টি হইবে এবং ইহাদের মধ্যে ঐ পাঁচ বৎসরে ২৫০টি, ২০০টি, ২৬০টি ৩০০টি এবং ৩৬০টি জাতি সম্প্রসারণ ব্লককে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে পরিণত করা হইবে। এই সকল কার্য্যের জন্য মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২০০ কোটি টাকা—ইহার মধ্যে ১২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ১৮৮ কোটি টাকা রাজ্যসরকারগুলি ব্যয় করিবেন। এই কর্ম্মসূচীতে যে সকল বিষয়ে অগ্রগতি আশা করা হয় সেগুলি হইল সমবায় ক্রিয়াকলাপের সম্প্রসারণ, পঞ্চায়েৎ সমূহের উন্নয়ন, জমির সংহতি সাধন, ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি।

দশম অধ্যায়

ভূমি রাজস্ব ও ভূমি স্বত্ব
Land Revenue and Land Tenure

বিভিন্ন প্রকারের ভূমি স্বত্ব—Different Systems of Land Tenure

Q. Describe the various systems of Land Tenure prevalent in India. (B. A. 1937 ; B. Com. 1941). Examine the principal types of land tenure in India and discuss the economic bearings of each. (Cal. B. Com. 1954)

(১) **জমিদারী বন্দোবস্ত** (Zemindary Settlement)—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করা হয় এবং সেই সময়ে একবার যে রাজস্বের পরিমাণ ধার্য্য করা হইল তাহা ভবিষ্যতে আর পরিবর্ত্তন করা হইবে না বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল। সেই সময়কার খাজনা মূল্যের (rental value) শতকরা ৯০ ভাগ জমির রাজস্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং অবশিষ্টাংশ ছিল জমিদারের প্রাপ্য অংশ। জমিদার তাঁহাদের অধস্তন প্রজাদের নিকট জমি বিলি করিতে পারিতেন এবং প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা গ্রহণ করিতেন। এই খাজনা হইতে তাঁহারা সরকারকে রাজস্ব প্রদান করিতেন। জমিদারগণ জমির মালিক বলিয়া গণ্য হইলেও নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে খাজনা দিতে না পারিলে তাঁহাদিগের জমি নীলাম হইতে পারিত। উপরন্তু প্রজাদিগের কতিপয় প্রথাগত অধিকার আছে যেগুলি জমিদার ক্ষুণ্ণ করিতে পারিতেন না। প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বা তাহাদের হিতার্থে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাও সরকারের ছিল।

(২) **মালগুজারী বন্দোবস্ত** (Malguzari Settlement)—মালগুজারী বন্দোবস্ত এক প্রকারের জমিদারী বন্দোবস্ত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। মারাঠাদিগের আমলে মালগুজারগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া শাসকবর্গকে প্রদান করিতেন ; আদায়-কৃত খাজনার উপরে শতকরা হারে একটি কমিশন তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত

হইবার পর সরকার মালগুজারদিগকে জমিদাররূপে গণ্য করেন। কিন্তু মালগুজারদিগের মর্য্যাদার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে ; মালগুজারগণ রায়তদিগের নিকট হইতে কত খাজনা আদায় করিবেন তাহা সরকার স্থির করিয়া দেন। এই স্থিরীকৃত খাজনা আদায় করিয়া সরকারের নিকট উহা পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল মালগুজারদিগের কার্য্য ; এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা একটি নির্দ্দিষ্ট কমিশন পাইয়া থাকেন। উপরন্তু রায়তদিগের দ্বারা প্রদেয় খাজনা চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত নহে। কিছুকাল অন্তর খাজনার পরিমাণ পুনঃনির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশে এইরূপ মালগুজারী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

(৩) ***মহলওয়ারী বন্দোবস্ত***—(Mahalwari Settlement)—একটি মহল বলিতে বুঝায় একটি এষ্টেট,—একটি গ্রাম বা একটির অধিক গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। একটি মহলের সকল কৃষকদিগের জমির উপর মালিকানা সরকার স্বীকার করেন এবং এইরূপ মালিকানা ভোগী কৃষকদিগের নিকট হইতে সরকার যৌথভাবে কর আদায় করেন। যৌথভাবে এবং পৃথকভাবেও কৃষকগণ সরকারকে কর প্রদানের জন্য দায়ী থাকে। উত্তর প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। পাঞ্জাবেও এইরূপ বন্দোবস্ত—তবে ঐ স্থানে লম্বরদার নামে অভিহিত গ্রামের মোড়লের মারফতে অপর সকলের খাজনা আদায় করা হইয়া থাকে।

(৪) ***রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত***—রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক রায়ত তাহার জমি-খণ্ডের মালিকানা ভোগ করে। প্রত্যেক জমির উপর রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয় এবং জমির মালিক ঐ রাজস্ব সরাসরি-ভাবে সরকারকে প্রদান করে, রায়তের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া সরকারকে দিবে, এরূপ কোন মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রায়তের দ্বারা প্রদেয় খাজনা চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত থাকে না, একটি নির্দ্দিষ্ট কাল অন্তে খাজনার পুনঃনির্দ্ধারণ করা হয়। খাজনার পুনঃনির্দ্ধারণের কাল সকল অঞ্চলে সমান নহে—সাধারণতঃ ইহা ১০ হইতে ৩০ বৎসর। আসামের কতকাংশে, মধ্যপ্রদেশের কতকাংশে, মাদ্রাজে এবং বোম্বাইতে এইরূপ রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদের অবস্থা—Position of Tenants under the Permanent Settlement

Q. Examine the position of tenants under the Permanent Settlement in Bengal. (B. A. 1941)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া ঘোষণা করিলেও কৃষক বা রায়তদিগের প্রথাগত অধিকার (Customary rights)

গুলির উপর হস্তক্ষেপ হইতে জমিদারগণ বিরত থাকিবেন এইরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার সরকার রাখিয়া দিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই অধিকার প্রয়োগের দ্বারা সরকার প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে প্রজাদিগের জমির স্বত্বভোগ জমিদারের সম্পূর্ণ খেয়ালখুশীর উপর নির্ভরশীল নহে।

অবশ্য প্রজাদিগের মধ্যে একাধিক শ্রেণী আছে এবং এই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাদিগের মধ্যে অধিকারে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের নিম্ন শ্রেণী হইল কোর্ফা (under ryot); অপর কোন রায়তের নিকট হইতে ইহারা জমি লইত এবং পূর্ব্বে জমির উপর উহাদের কোনরূপ বংশানুক্রমিক স্বত্ব ছিল না এবং রায়তদিগের সহিত একরারনামা অনুসারে এবং রায়তদিগের ইচ্ছামত স্বত্ব ভোগ করিত। বর্ত্তমানে অবশ্য অন্যান্য প্রজার ন্যায়, ইহাদিগেরও বংশানুক্রমিক ভোগস্বত্ব ও জমি হস্তান্তরিত করিবার অধিকার আছে। ইহাদিগের খাজনা বৃদ্ধির হার ও সময় নির্দ্দিষ্ট।

আর এক শ্রেণীর রায়ত আছে যাহাদিগকে বলা হয় দখলী স্বত্ব শূন্য (non-occupancy ryot)। ইহাদিগেরও স্বত্ব বংশানুক্রমিক এবং হস্তান্তরযোগ্য এবং কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কারণে ইহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ (reject) করা চলে। উচ্ছেদ করিতে হইলে যথাযোগ্য নোটিশ প্রদান প্রয়োজন। যাহারা একই গ্রামের মধ্যে একাদিক্রমে ১২ বৎসর ধরিয়া কোন না কোন জমির স্বত্ব ভোগ করিয়াছে, তাহারা রায়ত স্থিতিবান (occupancy ryot)। ইহাদিগকে জমির অপব্যবহারের অভিযোগ ব্যতীত উচ্ছেদ করা সম্ভব নহে এবং ইহাদিগের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় একটি নির্দ্দিষ্ট হারে কিন্তু আদালতের সম্মতিক্রমে এবং কতিপয় সুনির্দ্দিষ্ট কারণে। যে সকল রায়ত প্রমাণ করিতে পারে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনের সময় হইতে তাহাদের খাজনা কখনও বর্দ্ধিত হয় নাই তাহারা হইল মকররী রায়ত (tenants at fixed rate)। ইহাদিগের খাজনা বৃদ্ধি দাবী করা যায় না এবং ইহাদিগকে উচ্ছেদ করাও যায় না।

চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার গুণাগুণ—Merits and Demerits of Permanent Settlement

Q. Discuss the arguments for and against the Permanent Settlement in Bengal (B. A. 1939).

Give a critical estimate of the Zamindary System in Bengal (B. Com. 1945).

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে, অল্প সময়ের ব্যবধানেই নূতন রাজস্ব নির্দ্ধারণ হইত ; প্রত্যেক বারই রাজস্বের পরিমাণে পরিবর্ত্তন করা হইত অথবা 'যে ব্যক্তি সর্ব্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবে বলিয়া স্বীকার করিত তাহাকেই জমির মালিকানা দেওয়া হইত এবং তাহাও কিছুকালের জন্য মাত্র। ইহাতে নানাবিষয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হইবার দরুণ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাঙ্গালা ও অপর দুই একটি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একাধিক সুবিধা আছে বলিয়া দাবী করা হয়। প্রথমতঃ, ইহার দ্বারা রাষ্ট্র একটি নির্দ্ধারিত রাজস্ব পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। অন্যান্য সূত্র হইতে রাষ্ট্র যে পরিমাণ রাজস্বই পান না কেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ভূমি হইতে রাষ্ট্র একটি নির্দ্ধারিত রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত থাকিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, কয়েক বৎসর অন্তর রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয় না বলিয়া জমিদারও তাঁহার অধীন কৃষকদিগের নিকট হইতে রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন না এবং কৃষকগণ নির্ভাবনায় কৃষিকার্য্যে এবং উহার উন্নতি বিধানে মনঃসংযোগ করিতে পারে। জমিদারগণও অনুভব করেন যে কৃষকদিগের ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির সহিত তাঁহাদের স্বার্থ জড়িত, কারণ কৃষির উন্নতি ও কৃষকদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিলে জমিদারগণও সেই উন্নতির সুফল ভোগ করিবেন। অতএব এই ব্যবস্থায় জমিদারগণ উন্নয়নমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে প্রণোদিত হইতে পারেন। তৃতীয়তঃ, জমিদার শ্রেণী এবং তাঁহাদের পোষ্যদিগের মধ্য হইতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচুর দান রহিয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকগণ আরও বলেন যে অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে জমির উন্নতি বিধানে কৃষকগণ নিরুৎসাহ হয়, জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কারণ, কয়েক বৎসর অন্তর জমির নূতন রাজস্ব নির্দ্ধারণ ঘটে এবং ইতিমধ্যে যদি জমির উন্নতি বিধানের দ্বারা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজস্ব বর্দ্ধিত হইবারও সম্ভাবনা থাকে।

Q. On what grounds is the abolition of Permanent Settlement desired? What would be the probable effects of its abolition on the economy of the country? (B. A. 1950) What are the principal defects of the system of Permanent Settlement? What would be the most economical method of removing these defects? (B. Com. 1951).

কিন্তু এইগুলি সত্ত্বেও, বর্ত্তমান সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিরূপ সমালোচনা করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বলা হয় যে জমিদারগণের নিকট হইতে যাহা আশা করা হইয়াছিল তাহা সফল

হয় নাই। জমির উন্নতি বিধানের দিকে জমিদারগণ মনঃসংযোগ করেন নাই। অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহরজীবন যাপনের জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন—জমির সহিত শুধু সম্পর্ক ছিল তাঁহাদিগের, অর্থ আহরণের। গ্রামে যাঁহারা থাকিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কৃষকদিগের সহিত নিজেদের স্বার্থ ভিন্ন ও পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই মতই কার্য্য করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, কালের পরিবর্ত্তনের সহিত সরকারের ক্রিয়াকলাপের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতেছে এবং উহার দরুণ ক্রমবর্দ্ধমান রাজস্বের প্রয়োজন হইতেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে, দেড়শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভূমি রাজস্বের যে পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহাই এখনও রহিয়া গিয়াছে ; ইহাতে সরকারের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। শুধু তাহাই নহে, সমাজের প্রতি ঘোর অবিচার করিতেও সরকার বাধ্য হন। কারণ ভূমি রাজস্ব হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার উপায় না থাকায় সমাজের অপরাপর শ্রেণীর উপরে অধিক পরিমাণে করভার না চাপাইয়া গত্যন্তর থাকে না। তৃতীয়তঃ, জমিদারগণ যে পরিমাণ অর্থ কৃষকদিগের নিকট হইতে আদায় করেন তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশই সরকারের নিকট দিয়া থাকেন। অবশিষ্ট যে বৃহৎ অংশ তাঁহাদের নিকট থাকিয়া যায় উহা সমাজের হিতার্থে প্রযুক্ত না হইয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ইহাতে ধন বণ্টনের অসাম্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। চতুর্থতঃ, ইহার দ্বারা শিল্পে অর্থবিনিয়োগ ব্যাহত হয়। জমি ক্রয় করিয়া জমিদার হওয়া বিশেষ লাভজনক কার্য্য বলিয়া সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ জমি ক্রয়ের জন্যই অধিক আগ্রহান্বিত হইতেন। সেই জন্য ভূমিতেই পুঁজি নিয়োগ হইত, শিল্পে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটিত না। পঞ্চমতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় বহু মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতির দরুণ জমি উন্নয়নের দায়িত্ব কোন একজনের উপর নিবদ্ধ করা চলে না। ষষ্ঠতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারাই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়াছে এরূপ ধারণা করা সম্ভব নহে, কারণ অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত আছে এরূপ কোন কোন অঞ্চলেও (যথা বোম্বাই) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

জমিদারী উঠাইয়া দিয়া কৃষকদিগের সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য সরকার অধিকতর সক্ষম ও সচেষ্ট হইতে পারিবেন, রায়ত জমির মালিকানা লাভ করিয়া জমির উন্নতি বিধানের জন্য অধিক প্রণোদিত হইবে। ইহাতে দেশে অধিক শস্য ফলিবে, সরকারের রাজস্বও ইহার দ্বারা বৃদ্ধি পাইবে। জমিদারগণ ক্ষতিপূরণের অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করিলে দেশ শিল্প-সমৃদ্ধ হইবে।

অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের গুণাগুণ—Merits and Demerits of Temporary Settlement

গুণ—অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের প্রধান গুণ হইল যে ইহাতে সরকারের সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতএব রায়তের অবস্থা উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারকে সকল সময়েই অবহিত থাকিতে হয়। রায়তের অবস্থা উন্নয়নের জন্য তাহাদের জীবনের সমস্যা সম্পর্কে যে জ্ঞান সরকারের পক্ষে থাকা বাঞ্ছনীয় সে জ্ঞান সংগ্রহেরও পরিপূর্ণ অবকাশ সরকার পাইয়া থাকেন; কারণ সরকার ও রায়তদিগের মধ্যে রায়তদিগের সমস্যা আড়াল করিয়া, কোন মধ্যস্বত্বভোগী দাঁড়াইয়া থাকে না।

দ্বিতীয়ত:, ভূমি রাজস্ব একবার নির্দ্ধারিত হইবার পরে চিরকালের জন্য অপরিবর্ত্তনযোগ্য থাকে না—কিছুকাল অন্তর রাজস্বের পুন:নির্দ্ধারণ ঘটে। অতএব সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত ভূমির মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে সরকার আনুপাতিক ভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইহাতে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, কারণ সরকার যে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবেন তাহা সমগ্র সমাজের সাধারণ কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হইবার সুযোগ পাইবে—মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকিবে না।

তৃতীয়ত:, চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থায় ভূমি স্বত্বের যে উপবিভাজন ঘটে (Subinfeudation) উহাতে জমির উন্নয়নের দায়িত্ব কাহারও উপর নিবদ্ধ করা যায় না এবং বিভিন্ন কারণে ইহা ভূমি ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি করে। অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে জমি স্বত্বের উপবিভাজন না থাকায় এই সকল জটিলতা পরিহার করা যায়।

চতুর্থত:, কোন কারণে কৃষকদিগের দুরবস্থা ঘটিলে অথবা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, সরকার প্রয়োজন মত পরিত্রাণ (relief) দিতে পারেন। উহার জন্য, জমিদারের সদিচ্ছা ও বিবেচনার মধ্য দিয়া পরিত্রাণ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করিতে হইবে না; সরকার স্বয়ং রায়তদিগের রাজস্ব হ্রাস বা আদায় স্থগিত করিতে পারিবেন।

পঞ্চমত:, কৃষিজাত ফসলের অধিক উৎপাদনের জন্য এবং কৃষিপদ্ধতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন হইল যে বিচ্ছিন্ন জমির সংহতি বিধান (consolidation) করিতে হইবে এবং বৃহদায়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া প্রয়োজন; অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে ইহা সম্ভব হয়। উপরন্তু জমির মালিকানা হইতে কৃষকের জমির প্রতি যে দরদ জাগে ও নিজের উপর যে আত্মবিশ্বাস জাগে, তাহা উন্নতির বিশেষ সহায়ক।

অপগুণ—অস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে একাধিক অপগুণও বিশ্লেষণ করা চলে :

প্রথমতঃ, ইহা দ্বারা জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ ব্যাহত হইতে পারে। কৃষকগণ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারে যে পুঁজি-বিনিয়োগের দ্বারা জমির উন্নতি বিধান করিলে এবং উহার দ্বারা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে নূতন সেটলমেণ্টের সময়ে রাজস্ব বর্দ্ধিত হইবে এবং তাহাদের কিছুই লাভ থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, সেটেলমেণ্টের সময় যখন নিকটবর্ত্তী হয় তখন কৃষকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের জমি অকর্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিতে পারে, যাহাতে রাজস্বের হার বর্দ্ধিত না হয়। ইহাতে ফসল উৎপাদনের দিক হইতে সমাজের অপকার ঘটে।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক নূতন সেটেলমেণ্টের সময়ে চাষীদিগের কিছু না কিছু হয়রানি ঘটে এবং সরকারের অর্থ ব্যয় হয়।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্দ্ধারণের নীতি—**Principles of Assessment in Ryotwari Areas**

Q. Indicate the principles of assessment in the Ryotwari areas. (B. Com. 1932 ; B. A. 1938.' 40)

দেশের বিভিন্ন এলাকায় রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ছড়াইয়া আছে কিন্তু রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মধ্যে রাজস্ব নির্দ্ধারণের নীতি সকল অঞ্চলেই সমান নহে। বোম্বাই প্রদেশে রাজস্বের হার নির্দ্ধারিত হয় সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের দ্বারা। যে খাজনা প্রকৃতপক্ষে প্রদত্ত হয় তাহাকেই ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐ খাজনা হারের যথোপযুক্ত সংশোধন সাধন করা হয়। এই বিবেচ্য অর্থনৈতিক বিষয়গুলি হইল কৃষকশ্রেণীর অবস্থা, গ্রামের পারিপার্শ্বিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সরকারের আদায়ের পরিমাণ, ফসলের বাজার দাম ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া প্রচলিত খাজনার হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়।

মধ্য প্রদেশের কতকাংশ, যুক্তপ্রদেশ (বর্ত্তমানে উত্তর প্রদেশ নামে পরিচিত) এবং পাঞ্জাবে যে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত আছে সেখানে একটি আর্থিক খাজনার (economic rent) ভিত্তিতে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করা হয়। আর্থিক খাজনার সহিত অন্যান্য কতিপয় বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক নূতন সেটেলমেণ্টের সময়ে গ্রামগুলিকে বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রেণীবিভাগ করা হয়; মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই শ্রেণী বিভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জমির

রাজস্ব স্থির করা হয়। এই রাজস্ব নির্দ্ধারণে কর্ষিত ভূমির এলাকা বৃদ্ধি, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদনের হার ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

মাদ্রাজ প্রদেশে রাজস্ব নির্দ্ধারণ ঘটে নাট উৎপাদনের উপর ভিত্তি করিয়া। বিভিন্ন শ্রেণার জমিতে উৎপন্ন ফসলের মোট দাম হিসাব করা হয় এবং উহা হইতে উৎপাদনের খরচা বাদ দিয়া "নীট উৎপাদন" বাহির করা হয়। উৎপাদন খরচার হিসাবে কৃষকের এবং কৃষকের পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির শ্রমের দাম ধরিয়া লওয়া হয়। এই নীট উৎপাদনের একটি অংশ খাজনা রূপে গৃহীত হয়।

প্রথা, প্রতিযোগিতা এবং আইন—Custom, Competition and Legislation

Q. 'Rent in India is influenced by Custom, Competition and Legislation'—Explain (B. Com. 1941, 1953.)

অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক হইতে খাজনা নির্দ্ধারিত হয় জমির মালিক এবং জমি ভাড়া লইতে ইচ্ছুক প্রজার মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা। জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় উহার বিক্রয় মূল্য হইতে উহা উৎপাদনের যে খরচা পড়িয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয়। অবশিষ্ট অংশ যাহা থাকে তাহা হইল অর্থনৈতিক খাজনা। জমিদার এই অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে যতটা সম্ভব বেশী আদায় করিবার চেষ্টা করে এবং প্রজা চেষ্টা করে ইহার মধ্যে যতটা সম্ভব কম দিবার জন্য। যাহার গরজ বেশী খাজনা তাহার পক্ষে অসুবিধাজনক হয়। এইভাবে প্রতিযোগিতার দ্বারা খাজনা নির্দ্ধারিত হয়।

আমাদের দেশে খাজনা নির্দ্ধারণে, ***প্রথা*** (Custom) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশ বহু প্রাচীন ও ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই কারণে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রেও বহু প্রথার উদ্ভব ঘটিয়াছে। প্রথা-নিষ্ঠা আমাদের দেশে বিশেষ অধিক বলিয়া ভূমি রাজস্ব নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রথা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেই কারণে বহু ক্ষেত্রেই জমিদার প্রজার নিকট হইতে যে খাজনা আদায় করেন অথবা সরকার রায়তের নিকট হইতে যে রাজস্ব গ্রহণ করেন তাহা প্রাচীন প্রথার দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবান্বিত।

কিন্তু "প্রথা হইতে প্রতিযোগিতায় পরিবর্ত্তন" (from custom to competition or "status to contract")—ইহা হইল জগতের সমস্ত দেশের আধুনিক অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের মূল প্রবণতা (fundamental tendency)। আমাদের খাজনা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা কার্য্যকরী হইয়াছে।

ভারতে কৃষিজীবির সংখ্যা অত্যধিক। জন সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত এই সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকন্তু কুটীরশিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন কারণে জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করা লাভজনক ও নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। জমির এই বর্দ্ধিত চাহিদার চাপে প্রথা বহু ক্ষেত্রেই শিথিল হইতে লাগিল এবং ভূস্বামীগণ ***প্রতিযোগিতার*** সুবিধা লইয়া উচ্চহারে খাজনা দাবী করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছিল যখন বার্ষিক বা অনুরূপ অল্পকাল অন্তর নিলাম ডাকিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাজনা যে দিবে তাহাকেই, জমির ইজারা দেওয়া হইত।

উত্তরকালে শাসক যখন নিছক শোষণ হইতে কথঞ্চিৎ শাসনে মনঃসংযোগ করিলেন তখন নগ্ন প্রতিযোগিতার হাত হইতে কৃষকদিগকে কিছু পরিমাণে রক্ষা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। খাজনা আইন এবং বিভিন্ন ভূমিস্বত্ব আইন প্রণয়ন করিয়া সরকার রায়তদিগের খাজনায় স্থায়িত্বের জন্য বিধান দিলেন। নিজ ইচ্ছামত খাজনাবৃদ্ধির সুযোগ হইতে জমিদারকে বহুপরিমাণে বঞ্চিত করা হইল—সরকারের সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে যেসকল ক্ষেত্রে সে সকল ক্ষেত্রেও, সরকারের রাজস্ব নির্দ্ধারণে কতিপয় সুস্পষ্ট নীতি গৃহীত হইয়াছে।

ভূমি রাজস্ব—খাজনা না কর? Land Revenue,—Rent or Tax?

Q. Is the land revenue a tax or rent? Give reasons for your answer. In the event of your holding that it is rent can you justify the theory of State landlordism in India which it would necessarily imply? (B. A. 1930)

Is the land revenue of India rent? (B. Com. 1930)

ভূমি রাজস্বের প্রকৃতি কি, এ সম্পর্কে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ভারতে সরকার যে ভূমি রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাকে খাজনারূপে গণ্য করিতে হইবে; আবার কেহ বা অভিমত দিলেন যে সরকার জমি হইতে খাজনা আদায় করেন না, তাঁহারা যাহা আদায় করেন তাহাকে কর বলিয়া অভিহিত করাই বিধেয়।

খাজনারূপে ভূমিরাজস্বকে গণ্য করিবার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে প্রতিবৎসর রাষ্ট্রের আয়ব্যয় অনুযায়ী করের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া সরকারের প্রয়োজনের সহিত কর সমূহকে খাপ খাওইয়া লওয়া হয়। অধিক অর্থের প্রয়োজন হইলে করের বৃদ্ধি করা হয় এবং অর্থের অধিক

প্রয়োজন না হইলে করের ভার লাঘব করা হয়। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে যখন এইরূপ করা হয় না তখন ভূমি রাজস্ব 'কর' নহে। উপরন্তু সরকার জমি-মালিকের ন্যায় কতিপয় কার্য্য সম্পাদন করেন যথা জল সেচ, জল-নিকাশ, কূপ খনন প্রভৃতি উন্নতিমূলক কার্য্যের জন্য রায়তকে ঋণ প্রদান করা। সরকার যখন মালিকের অনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করেন তখন জমি সরকারের এবং সরকার উহা হইতে খাজনা আদায় করেন—কর নহে। তদ্ভিন্ন, সরকার সমগ্র ভৌগোলিক সীমানার মালিক—অতএব জমিদারের কাছে বা রায়তের দখলে যে জমি আছে তাহারও মালিক।

যাঁহারা ভূমি রাজস্বকে **কর** বলিয়া গণ্য করেন তাঁহারা বলেন যে ভূমি রাজস্বকে প্রতিবৎসর রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করা যায় না—তাহার কারণ হইল যে ইহা জমিরূপ একটি বিশেষ জটিল এবং অনন্য-সাধারণ সামগ্রীর উপর কর। যে কোন সামগ্রীর উপর কর বসাইলে এবং সেই কর আদায় না হইলে সরকার যেরূপ সেই সামগ্রী বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন, জমিও সেইরূপ বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সরকার রায়তকে ঋণ দেওয়া প্রভৃতি যে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, তদ্দ্বারা জমির সরকারী মালিকানা প্রতিপন্ন হয় না। উহা সরকারের জনকল্যাণ সাধনের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ; সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিলে তাঁহারা কি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইবেন ? তৃতীয়তঃ, দেশের সব কিছুই রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সার্ব্বভৌমত্বের (Territorial Supremacy) মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু মালিকানা এবং সার্ব্বভৌমত্ব ভিন্ন বস্তু।

"কর অনুসন্ধান কমিটি" এবং ভূমিস্বত্ব বিশারদ বেডেন পাওয়েল উভয়েই ভারতের ভূমি রাজস্বকে কর রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অভিমতই গ্রহণযোগ্য। যুক্তির দিক হইতে বা ঐতিহাসিক প্রথার দিক হইতে, রাষ্ট্রকে ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য করা যায় না। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে রাজ্যসরকারগুলি জমিদারী স্বত্ব এবং মধ্যস্বত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন এবং রায়তের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করিতেছেন কিন্তু উহার জন্য তাঁহারা সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকারীদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতেছেন। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সরকার নিজদিগকে জমির মালিক বলিয়া গণ্য করিতেন না।

সারাংশ

বিভিন্ন প্রকারের ভূমিস্বত্ব—এদেশে বিভিন্ন ধরণের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা আছে ; উহার মধ্যে চার প্রকারের ব্যবস্থাই প্রধান। (১) ***জমিদারী***

বন্দোবস্ত—এই ব্যবস্থায় জমিদারদিগকেই জমির মালিক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যে খাজনা লওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল তাহা আর কোনদিন পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। প্রজাদের প্রথাগত অধিকার বজায় থাকিবে বলা হইয়াছিল। (২) ***মালগুজারী বন্দোবস্ত***—মালগুজারগণ রায়তদের নিকট হইতে একটি স্থিরীকৃত হারে কর আদায় করিয়া সরকারের দপ্তরে জমা করিয়া দেন এবং উহার জন্য একটি কমিশন পাইয়া থাকেন। ইহাও একপ্রকার জমিদারী বন্দোবস্ত, কারণ মালগুজারদিগকে জমিদারের মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। (৩) ***মহলওয়ারী বন্দোবস্ত***—একটি বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি মহল; এইরূপ মহলের সকল চাষী মালিকদের নিকট হইতে সরকার যৌথভাবে জমির খাজনা আদায় করেন। (৪) ***রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত***—এই বন্দোবস্তে সরকার রায়তের নিকট হইতে সরাসরিভাবে খাজনা আদায় করেন কিন্তু এই খাজনার হার স্থায়ী নহে; কিছুকাল অন্তর ইহার পুনর্নির্দ্ধারণ ঘটে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদের অবস্থা—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদিগকে জমির মালিকানা প্রদান করিলেও প্রজাদের স্বার্থরক্ষার কিছু ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। প্রজাদের মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং এই বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারেও পার্থক্য আছে। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী হইল কোর্ফা; প্রথমে ইহারা সম্পূর্ণরূপে রায়তদের অধীনে ছিল, পরে ইহাদিগকে কিছু অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। আর এক শ্রেণী হইল দখলীস্বত্বশূন্য রায়ত—ইহাদিগকে কতিপয় ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করা চলে। আর এক শ্রেণী আছে রায়তস্থিতিবান। ইহাদের উচ্ছেদ করা বা খাজনা বৃদ্ধি করা সহজ নহে। আর আছে মকরারী রায়ত; ইহাদের খাজনা বৃদ্ধি বা উচ্ছেদ সম্ভব নহে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণাগুণ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা হইল, (১) সরকার একটি নির্দ্ধারিত রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন, (২) রাজস্ব নির্দ্ধারণ সাময়িক নহে বলিয়া জমির ও কৃষির উন্নয়নে মন দেওয়া সম্ভব হইত; (৩) জমিদার শ্রেণীর দ্বারা সামাজিক উপকার হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ হইল: (১) জমিদারগণ গ্রামেও থাকেন নাই, জমির ও গ্রামের উন্নতির দিকেও দেখেন নাই, (২) সরকারের আর্থিক প্রয়োজন অনেক বাড়িয়াছে কিন্তু প্রধান আয়—অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব একরূপই থাকিয়াছে; (৩) চাষীর দ্বারা জমিদারকে প্রদেয় খাজনা এবং জমিদারের দ্বারা সরকারকে প্রদেয় খাজনা—ইহার মধ্যে অনেক পার্থক্য। সমাজ উহা হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? (৪) শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ ব্যাহত হয়; (৫) মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হইয়াছে; (৬) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব নিছক ইহার জন্যই নহে।

অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের গুণাগুণ—অস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের গুণ হইল (১) সরকারের সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা থাকে (২) জমির মূল্যবৃদ্ধির সুবিধা সমাজের পক্ষ হইতে সরকার গ্রহণ করিতে পারেন—মধ্যে মধ্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া (৩) ভূমি স্বত্বের উপবিভাজন (sub infeudation) ঘটে না (৪) প্রয়োজন বোধে কৃষকদিগের পরিত্রাণের জন্য সরকার স্বয়ং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। (৫) রায়ত জমির মালিকানা পাইলে উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ বোধ করিবে ; উহাতে জমির সংহতি সাধনও সম্ভব হইবে।

কিন্তু ইহার দোষ হইল (১) জমিতে পুঁজি বিনিয়োগে লোকে উৎসাহ পায় না (২) প্রত্যেক সেটেলমেণ্টের সময়ে ইচ্ছা করিয়া চাষ না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখা হয় (৩) চাষীদের প্রায়ই হয়রাণি হয়।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে রাজস্ব নির্দ্ধারণের নীতি—সকল রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের এলাকায় রাজস্ব নির্দ্ধারণের নীতি সমান নহে। বোম্বাই রাজ্যে প্রকৃত খাজনাকে ভিত্তি ধরিয়া এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করিয়া উহার যথোপযুক্ত সংশোধন সাধন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের কতকাংশে, উত্তর প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে একটি "আর্থিক খাজনার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্দ্ধারণ করা হয়। ইহার সহিত আরও কতিপয় বিষয় বিবেচনা করা হয়। মাদ্রাজে নীট উৎপাদনের উপর ভিত্তি করিয়া রাজস্ব নির্দ্ধারণ ঘটে। উৎপাদন খরচার মধ্যে চাষীর শ্রম ধরিয়া লওয়া হয়।

প্রথা, প্রতিযোগিতা ও আইন—জমির আয় হইতে উৎপাদন খরচা বাদ দিলে অর্থনৈতিক খাজনা বাহির হয়। ইহার মধ্যে যতটা সম্ভব জমিদার প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করে ; অত:পর পারস্পরিক দর কষাকষির দ্বারা প্রকৃত খাজনা স্থির হয়। কিন্তু আমাদের দেশে খাজনা নির্দ্ধারণ নিছক এইভাবে হয় না ; এদেশে খাজনা নির্দ্ধারণে তিনটি বিষয় ক্রিয়া করিয়াছে : (১) প্রথা—ভুমি রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা বহু প্রাচীন হওয়ায় রাজস্ব নির্দ্ধারণে প্রথার অনেক প্রভাব পড়িয়াছে। (২) প্রতিযোগিতা—কিন্তু জমির মূল্য যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তত জমির জন্য প্রতিযোগিতা বাড়িল এবং সেই অবসরে নূতন খাজনার হার স্থির হইল। (৩) আইন—সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ও খাজনার হার নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হইয়াছেন।

ভূমি রাজস্ব,—খাজনা না কর ?—আমাদের দেশের ভুমি রাজস্বকে খাজনা বলা উচিত না কর বলা উচিত, এ সম্পর্কে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। যদি ইহাকে খাজনা বলা হয় তাহা হইলে ধরিতে হয় যে এদেশে

সরকারই সমস্ত জমির মালিক এবং 'কর' বলিলে ধরিতে হয় যে জমি হইল ব্যক্তির, সরকার উহা হইতে নিছক কর সংগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'খাজনা' বলিবার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন (১) ভূমি রাজস্ব করের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, (২) মালিক করিয়া থাকে এরূপ কতিপয় কার্য্য সরকার করেন, (৩) সরকার সমগ্র ভৌগোলিক সীমানার মালিক, সুতরাং জমিরও। যাঁহারা কর বলিয়া গণ্য করিবার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, (১) কর আদায় না হইলে যেমন সামগ্রী বিক্রয় করিয়া দেওয়া যায়, জমিও সেইরূপ সরকার বিক্রয় করিয়া লইতে পারেন, (২) জমি সম্পর্কে সরকারের বিবিধ কার্য্য জনকল্যাণমূলক কার্য্যের অঙ্গ। (৩) সার্ব্বভৌমত্বের মধ্যে থাকা মানেই মালিকানা নহে। বাস্তবক্ষেত্রে ইহাকে কর বলিয়া গণ্য করাই বিধেয়।

একাদশ অধ্যায়

ভূমি সংস্কারের সমস্যা
Problems of Land Reform

ভূমি সমস্যার প্রকৃতি—The Nature of Land Problem

আমাদের দেশে ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার বিশেষত্বের দরুণ ভূমি সম্পর্কে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সমস্যাগুলিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে, যদিও মূলত: সমস্যাগুলি সরস্পরের মধ্যে জড়িত।

প্রথম সমস্যা হইল জমিদারী ব্যবস্থার সমস্যা। ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) হইতে উদ্ভূত। যতগুলি সমস্যা সমাধানের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সমস্যা ইহা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। অতীতে ইহা যত উপকারই প্রদান করিয়া থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে ইহার উপযোগিতা নিঃশেষ হইয়াছে এবং প্রগতিশীল কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহা অন্যতম অন্তরায়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার আওতায় রায়তদিগের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভূমি রাজস্ব হইতে সরকারের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়াছে, ভূমিস্বত্বের মধ্য দিয়া সরকারেব সহিত কৃষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় সমস্যা হইল উপস্বত্ব-বিভাজন (Sub-infeudation) এর সমস্যা। জমিদার জমির উপর স্থায়ী স্বত্ব লাভ করিয়া নির্দ্ধারিত খাজনায় অপর ব্যক্তিকে জমির অংশ বন্দোবস্ত দিতে লাগিল। জমিদারের নিকট হইতে যাহারা এইরূপ জমি বন্দোবস্ত লইল তাহারা আবার ঠিক অনুরূপ ভাবে অপর ব্যক্তিকে জমির বন্দোবস্ত দিল এবং নির্দ্দিষ্ট খাজনা লাভের অধিকার বজায় রাখিল। এই ভাবে জমি হইতে খাজনা আদায়ের ক্ষমতার ক্রমশ:ই উপবিভাজন ঘটিতে লাগিল। রায়ত এবং প্রজাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থে সরকার যখন আইন প্রণয়ন করিলেন, ঐ আইনের ফল তখন ঘটিল উহাদিগকে বহুপরিমাণেই জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা--শুধু জমিদারের খাজনা দিতে থাকিলেই হইল। জমিদারগণ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল রায়তগণ এবং প্রজাগণ এক্ষণে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। তাহারাও তাহাদের জমি খাজনায় বন্দোবস্ত দিতে লাগিল এবং অধস্তন স্বার্থ সৃষ্টি করিয়া ছোট খাটো জমিদার সাজিতে লাগিল। বৃহত্তম রায়তগণ

কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া খাজনা ভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল। এই ভাবে জমির উপর মধ্যবর্ত্তী স্বার্থের স্তুপ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। স্বত্বের এই উপবিভাজন শুধুই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাতেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, অস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চলেও (temporarily settled areas) এবং রায়তী বন্দোবস্ত অঞ্চলেও ইহা রহিয়াছে। সমগ্র দেশের হিসাব করিলে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ জমিই কৃষকগণ অকৃষি-শ্রেণীর নিকট হইতে জমা লইয়া চাষবাস করিয়া থাকে। ইহার দ্বারাই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে—কারণ খাজনা আদায়ের অধিকারের সহিত ভূমি-উন্নয়নের দায়িত্ব জড়িত নাই। সরকারী আইন প্রণয়নের দ্বারা প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা হইলে, জমিদারগণ খাজনা সংগ্রহ ব্যতীত আর কোন বিষয়েই নজর দিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। অথচ প্রজাদিগের পরিপূর্ণ মালিকানা স্বত্ব না থাকায় তাহারাও কোন উৎসাহ বোধ করিল না। মধ্যে পড়িয়া, কৃষি এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল।

তৃতীয় সমস্যা রূপে গণ্য করিতে পারা যায়, ক্রমশঃই কম-সংখ্যক লোকের হস্তে জমি-মালিকানা কেন্দ্রীভুত হইবার প্রবণতাকে। ইহার দ্বারা ছোট খাটো চাষীদিগের জমি মালিকানা হইতে ক্রমিক বিচ্যুতি এবং সেই কারণে উহাদের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য সুচিত হয়। অবিভক্ত বাঙ্গালা প্রদেশের ক্ষেত্রে ফ্লাউড কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন যে দু একরের কম জমি আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা হইল মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ এবং ১০ একরের অধিক জমি আছে এরূপ পরিবারের সংখ্যা হইল মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৮·৪ ভাগ। বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ ধরিয়া হিসাব করিলে, ঐ শতকরা সংখ্যা যথাক্রমে ৪১·১ এবং ১০·১ হইবে। ইশাক রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী এই কেন্দ্রীভবনের (concentration) প্রবণতা আরও অধিকরূপে প্রকটিত। কম সংখ্যক লোকের হস্তে জমির মালিকানা পুঞ্জীভুত হইবার প্রবণতা যে ভুমি সম্পর্কে সমস্যার সৃষ্টি করে তাহার কারণ হইল: (ক) ইহার সহিত কৃষক-দিগের নিকট এবং সমাজের নিকট ভূস্বামীদিগের দায়িত্ব বর্দ্ধিত হয় নাই; (খ) ইহার দ্বারা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদিগের বেকার অবস্থা বৃদ্ধি পায়, কারণ তাহাদের কর্ম্মসংস্থান নির্ভর করে অপরের চাহিদার উপর; (গ) কৃষক-শ্রেণীকে মালিকানা স্বত্বের অহঙ্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া ইহা তাহাদের উৎসাহ খর্ব্ব করে, কর্ম্মোদ্যোগ ব্যাহত করে এবং সমাজের শান্তিশৃঙ্খলার সহিত প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত নাই এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের জমির জন্য আকাঙ্খার উগ্রতা বিবেচনা করিলে, এই পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক রূপেই গণ্য করিতে পারা যাইবে।

চতুর্থ সমস্যা ভাগচাষের ব্যবস্থা—অর্থাৎ ফসলের ভাগাভাগির সর্ত্তে চাষকার্য্য

করা। অনেক জমির মালিক, এমন কি রায়তরূপে পরিচিত মালিকও, নিজে জমি চাষ না করিয়া অন্য লোককে ফসল ভাগাভাগির সর্ত্তে চাষ করিতে দেয়। যাহারা এইরূপ চাষের দায়িত্ব লহে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে বর্গাদাররূপে অভিহিত করা হয়। জমির মালিক ইহাদিগের খরচার অংশ বহন করে না, শুধুই জমির ব্যবহার করিতে দেয়—অথচ মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ গ্রহণ করে।

পঞ্চম সমস্যা হইল খণ্ডিত এবং অসম্বদ্ধ ভূমির সমস্যা—ইহার দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত জমি-মালিকানা সৃষ্টি হইয়াছে এবং কৃষি উন্নতির গুরুতর অন্তরায় রূপে ইহা ক্রিয়া করিয়াছে।

স্পষ্টই অনুধাবন করিতে পারা যায় যে এই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। এই সকল সমস্যার কি ভাবে সমাধান করা হইবে তাহার উপরে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির সম্ভাবনা বহু পরিমাণে নির্ভরশীল।

***পরিকল্পনা কমিশনের চক্ষে ভূমি সমস্যা*—Land Problem in the eyes of the Planning Commission**

ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা এবং ভূমি-সংস্কারের প্রশ্ন স্বভাবতঃই পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জমির মালিকানা এবং চাষ ব্যবস্থা যে সম্ভবতঃ জাতীয় উন্নয়নের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা—ইহা পরিকল্পনা কমিশন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই কারণেই, কিভাবে ভূমি সমস্যার সমাধান করা হইবে ইহার উপরেই যে দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গড়ন বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে—ইহা তাঁহারা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কমিশনের মতে ভূমি সম্পর্কিত নীতি এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উপার্জ্জনের (এবং সম্পদের) বৈষম্য হ্রাস হইবে, শোষণ প্রতিরোধ হইবে, উহা প্রজা এবং শ্রমিকদের কার্য্যের স্থায়িত্ব বিধান করিবে এবং গ্রামবাসীদের সকল অংশকেই সমান মর্য্যাদা এবং সুযোগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিবে।

পরিকল্পনা কমিশন ভূমি সম্পর্কিত সংস্কারের যে সকল সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন সেগুলিকে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ, পরিকল্পনা কমিশন জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের দ্বারা সরকারের সহিত চাষী মালিকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কারের (Tenancy reform) পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উহার সুপারিশ করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, তাঁহারা ব্যক্তি মালিকানায় অবস্থিত জমির উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণের পক্ষে অভিমত দিয়াছেন। ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে প্রজাদের পক্ষে মালিক

হইবার প্রশ্ন, বাড়তি জমি বিতরণের প্রশ্ন, উৎকৃষ্ট চাষের মান নির্দ্ধারণের প্রশ্ন ইত্যাদি।

জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ত বিলোপের ব্যবস্থা—Abolition Zamindari and Intermediaries

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্ব ভোগ বিলুপ্ত করিবার নীতি সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইবার পুর্ব্বেই—অর্থাৎ ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের পুর্ব্বেই—একাধিক রাজ্যে এইরূপ আইন রচিত হইয়াছিল। অ-রায়তী অঞ্চলগুলি সম্পর্কে এই রকম আইন প্রণীত হইয়াছিল বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ (অন্ধ্র অঞ্চলেও) উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং পেপসুতে। অবশ্য এই সব রাজ্যেই এই ধরণের আইন ঐ তারিখের পূর্ব্বে কার্য্যকরী করা হয় নাই। মধ্যপ্রদেশে ভূ-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের সম্পূর্ণাংশই রাজ্য সরকারের হস্তগত হইয়াছিল, হায়দ্রাবাদে সকল জায়গীর গৃহীত হইয়াছিল এবং বোম্বাই রাজ্যে অ-রায়তী স্বত্ব গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু মাদ্রাজে ভূ-সম্পত্তির প্রায় অর্দ্ধাংশ গৃহীত হইয়াছিল, পেপসুতে আংশিকভাবে বিস্বেদারি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সংশ্লিষ্ট বিধি সম্পর্কে মামলার দরুণ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে আইন কার্য্যকরী করা স্থগিত ছিল।

এ সকলই হইল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পুর্ব্বেকার কথা। প্রথম পরিকল্পনার কালে জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপ করিয়া একাধিক রাজ্যে আইন বিধিবদ্ধ হইযাছে। ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন যে হিসাব দিয়াছিলেন তাহাতে দেখা গিয়াছিল—

(ক) ঐ সময়ে কতকগুলি রাজ্যে মধ্যস্বত্বভোগ বিলোপের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে বা বহুলাংশে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই রাজ্যগুলি ছিল বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, পেপসু, সৌরাষ্ট্র, ভূপাল, বিন্ধ্যপ্রদেশ।

(খ) কতকগুলি রাজ্যে মধ্যস্বত্ব বিলুপ্তির ব্যবস্থা আংশিকভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল। এই রাজ্যগুলি ছিল: বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান।

(গ) কতকগুলি রাজ্যে জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলুপ্তির ব্যবস্থা তখনও হয় নাই বা হইলেও খুবই প্রাথমিক স্তরে ছিল। এই রাজ্যগুলি ছিল আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মহীশুর, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী।

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইবার প্রথম দিকে জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের ব্যবস্থা প্রায় সকল রাজ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে

বর্ত্তমানে মধ্যস্বত্ব বিলোপের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশের স্থায় যে সকল রাজ্যে অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সে সকল রাজ্যে মধ্যস্বত্ব বিলোপের কার্য্যে ভালই অগ্রগতি হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলে জমির নথিপত্র এবং জমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শাসনযন্ত্র ভালই ছিল। অপরপক্ষে চিরস্থায়ী এবং জায়গীরদারি বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে ভূমিসংক্রান্ত নথিপত্র এবং রাজস্ব সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থা প্রায় গোড়া হইতেই গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। তথাপি কিন্তু প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্ব বিলোপের আইন বলবৎ করা হইয়াছে।

মধ্যস্বত্ব এবং জমিদারী বিলোপের এই কার্য্যের কতিপয় সাধারণ ধাঁচ পরিকল্পনা কমিশন বিশ্লেষণ করিয়াছেন :

(১) পতিত জমি, বনাঞ্চল, আবাদী জমি প্রভৃতি যে সকল সাধারণ জমি (common land) মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকারে ছিল সেগুলি তত্ত্বাবধান (management) এবং উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে।

(২) মধ্যস্বত্বভোগীদের বাস্তু খামারের জমি (home farm lands) এবং ব্যক্তিগত চাষের জমি তাহাদের নিকটেই ছাড়িয়া রাখা রহিয়াছে এবং বাস্তু খামারের ইজারাগ্রাহকদিগকে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রজারূপে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যে অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

(৩) অধিকাংশ রাজ্যেই মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীন প্রজাদিগকে রাজ্যসরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কাধীন করা হইয়াছে; বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূরে ইহার কিছু ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

প্রজাস্বত্ব সংস্কার—Tenancy Reform

বিভিন্ন রাজ্যে প্রজাস্বত্ব সংস্কারের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রতিক কালে একাধিক রাজ্যেই প্রজাস্বত্ব সংস্কারের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। প্রজাস্বত্ব সংস্কারের প্রধান বিষয় হইল তিনটি : (১) খাজনা হ্রাস (Scaling down of rents); (২) স্বত্বের স্থায়িত্ব (Security of Tenure), এবং (৩) প্রজাদের পক্ষে জমি খরিদ করিয়া লইবার অধিকার (rights for the tenants to purchase their holdings)।

(১) ***খাজনা হ্রাস***—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন যে বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে খাজনার হার উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশের বেশী হওয়া উচিত নহে। বিভিন্ন রাজ্যে খাজনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু সকল রাজ্যে এই কার্য্য সমানভাবে অগ্রসর হয় নাই। অনেক রাজ্যেই এ সম্পর্কে আইন রচনার কাজ অনেক পিছাইয়া আছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে খাজনার হারে অনেক

পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও ইহা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ (বোম্বাই, রাজস্থান), কোথাও এক পঞ্চমাংশ (দিল্লী, আজমীঢ়, হায়দ্রাবাদ), কোথাও এক চতুর্থাংশ (উড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশ), কোথাও এক তৃতীয়াংশ (পাঞ্জাব, পেপসু), কোথাও ২০ ভাগের ৭ ভাগ। অন্ধ্র রাজ্যে খাজনা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থাই নাই।

পশ্চিমবঙ্গে নিয়ম হইয়াছে (১৯৫৪ সালের ভূমি সংস্কার আইন) যে প্রজাদিগের দ্বারা প্রদেয় নগদ খাজনা উৎপন্ন ফসলের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশের (ধানের ক্ষেত্রে) এবং এক-দশমাংশের (অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে) অধিক হইবে না। বর্গাদারের দ্বারা চাষ করাইলে মালিক যদি চাষের উপকরণ দেয় তাহা হইলে উৎপন্ন ফসল আধাআধি ভাগ হইবে, অন্যথায় বর্গাদার পাইবে ৬০ ভাগ এবং মালিক পাইবে ৪০ ভাগ।

(২) ***স্বত্বের স্থায়িত্ব বিধান***—প্রজা যাহাতে জমির স্বত্ব স্থায়ীভাবে ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একজন মালিক নিজে চাষ করিব বলিয়া কতখানি প্রজাবিলির জমি নিজ দখলে ফিরাইয়া লইতে পারে তাহার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া একাধিক রাজ্যে আইন প্রণীত হইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যে স্বত্বের স্থায়িত্ব বিধানের আয়োজন বিভিন্ন আকারে হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের দ্বারা অবলম্বিত ব্যবস্থায় অনেক পার্থক্যও দেখা যায়। মোটামুটি ভাবে পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে চারিটি পর্য্যায়ে ভাগ করিয়াছেন।

(ক) কোন কোন রাজ্যে সকল প্রজাই নিজেদের স্বত্বের পরিপুর্ণ স্থায়িত্ব পাইয়াছে। উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লী এই পর্য্যায়ের রাজ্য।

(খ) কতিপয় রাজ্যে প্রজা স্বীয় স্বত্বের আংশিক স্থায়িত্ব পাইয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে জমির মালিক একটা সীমাবদ্ধ আয়তন পর্য্যন্ত জমি ব্যক্তিগত চাষের জন্য স্বহস্তে ফিরাইয়া লইতে পারে এবং ঐরূপ ফিরাইয়া লইলে প্রজা উচ্ছেদ হইতে পারিবে। তবে এক্ষেত্রে সর্ত্ত আছে যে প্রজার নিকট একটি ন্যূনতম আয়তনের জমি রাখিয়া দিতে হইবে! এই পর্য্যায়ের রাজ্য হইল বোম্বাই, পাঞ্জাব, রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ এবং হিমাচল প্রদেশ। এই রাজ্যগুলিতে মালিক এইরূপ জমি ফিরাইয়া লইতে পারে (ইহার বেশী নহে): বোম্বাই—ভাড়া দেওয়া জমির অর্দ্ধেক তবে ৩টি আর্থিক জোতের (ecnomic holding) বেশী নহে; পাঞ্জাব—৩০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর, কিন্তু প্রজার ৫ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর থাকিবে ; রাজস্থান —একটি নির্দ্ধারিত ন্যূনতম জোত; হায়দ্রাবাদ—প্রজা ভিত্তি-জোত রাখিতে পারিবে ; হিমাচল প্রদেশ—মালিক ৫ একর ফিরাইয়া লইতে পারিবেন।

(গ) কতিপয় রাজ্যে মালিক কতখানি জমি ফিরাইয়া লইতে পারিবেন তাহার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত আছে কিন্তু প্রজার নিকট কোন ন্যূনতম আয়তনের জমি ছাড়িয়া রাখিতে হইবে বলিয়া নিয়ম নাই। পেপসু এবং কচ্ছ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যা হইল এইরূপ রাজ্য। মালিকের দ্বারা পুনর্গ্রহনযোগ্য জমির উর্দ্ধতম সীমা হইল আসামে ৩৩⅓ একর, মধ্যপ্রদেশে ৫০ একর, পেপসুতে ৩০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন, কচ্ছতে ৫০ একর এবং উড়িষ্যায় ৭ হইতে ১৪ একর।

(ঘ) অন্যান্য রাজ্যে প্রজার উচ্ছেদ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছে মাত্র অথবা প্রজাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

(৩) *প্রজাদের জমি খরিদ করিয়া লইবার অধিকার*—প্রজারা যাহাতে জমির মালিকে পরিণত হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা যেন করা হয় বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত চাষের জন্য মালিক যতখানি জমি পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবে (resumption for personal cultivation) সেই সীমার উপরে যে জমি থাকিবে তাহাতে প্রজাদের মালিকানা স্বত্ব অর্জ্জনে সহায়তা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হইবে প্রথমতঃ, প্রজাদিগকে স্বত্বের স্থায়িত্ব (security of tenure) দান করা এমন কি দখলী স্বত্ব (occupancy rights) দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, কি নীতি অনুযায়ী জমির দাম স্থির করা হইবে এবং কিভাবে প্রজা ঐ দাম প্রদান করিবে তাহা স্থির করিতে হইবে।

২য় পরিকল্পনায় কমিশন বলিয়াছেন যে প্রজাকে জমির মালিকে পরিণত করিবার কার্য্যে বিশেষ কিছু অগ্রগতি হয় নাই। শুধু উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লীতেই প্রজাদিগকে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আনা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে প্রজাদিগকে তাহার জমি কিনিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু এই সুযোগ তাহারা অর্থাভাবের দরুণ কাজে লাগাইতে পারে নাই। সুতরাং কমিশন বলিয়াছেন যে প্রজাদিগকে জমি কিনিবার সুযোগ দিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না, সকল প্রজাকে সরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আনিবার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিন প্রকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে: (ক) সরকার প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা (rent) আদায় করিবেন এবং উহা হইতে মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবেন; (খ) সরকার প্রজাদের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব (land revenue) ছাড়াও কিস্তিবন্দীতে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিবেন; অথবা (গ) সরকার প্রজাদের নিকট হইতে শুধুই ভূমি রাজস্ব (land revenue) আদায় করিবেন এবং প্রজারা সরাসরি মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণের কিস্তিবন্দী দিবে। কমিশনের মতে এইগুলির মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণ—Fixation of Ceiling of Land

Q. Argue the case for and against the fixation of a ceiling of agricultural holdings in India (Delhi 1954).

জমির মালিকানা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে ব্যক্তিগত জমির ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া উচিত। জমির ঊর্দ্ধতম সীমা বাঁধিয়া দেওয়া সম্পর্কে অনেকগুলি বিবেচনা রহিয়াছে : ***প্রথমতঃ,*** একজন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কতখানি জমির মালিক হইতে পারিবে (জমি ক্রয়ের দ্বারা) তাহার একটি উচ্চতম সীমা স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। ***দ্বিতীয়তঃ,*** একজন মালিক নিজে চাষ করিব বলিযা প্রজাবিলির জমি কতখানি ফিবাইয়া লইতে পারিবে তাহারও ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত থাকা উচিত। স্বভাবতঃ ইহা বড় মালিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ ছোট মালিকদের আর প্রজাবিলির জমি থাকিবে কতটুকু ! এইসকল বড় মালিকেরা * ব্যক্তিগত চাষের জন্য কতখানি জমি ফিরাইয়া লইতে পারিবে তাহা স্থির করিয়া নিয়া উহার উপরকার বাড়তি জমিতে প্রজারাই যাহাতে মালিক হইতে পাবে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ***তৃতীয়তঃ,*** একজন ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই যতখানি জমির মালিক হইয়া রহিয়াছে এবং যতখানি জমির মালিক থাকিবে তাহারও একটা সীমা নির্দ্ধারিত থাকিবে। ইহাও বড় মালিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কারণ স্বভাবতঃই বড় মালিকদেরই বাড়তি জমি আছে। (ছোট মালিকদের সমস্যা ঠিক বিপরীত, কি ভাবে তাহাদের ছোট ছোট জমিকে অপেক্ষাকৃত বড জমিতে পরিণত করা যায়।) এই বাড়তি জমির উপরকার জমি যাহা থাকিবে উহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে। ইহার সহিত ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন জড়িত থাকিবে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন করিয়া (land management legislation) উৎকৃষ্ট চাষের মান নির্দ্ধারণ কবিয়া দিতে হইবে (standard of efficiency in cultivation) ; ইহাতে জমির মালিকদিগের বাধ্যবাধকতা বা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত থাকিবে। বড় মালিকদের প্রত্যক্ষ চাষভুক্ত যে সকল জমির আয়তন একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরে রহিয়াছে দেখা যাইবে তাহাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হইবে।

* পরিকল্পনা কমিশন জমিব মালিকদিগকে (ক) বড মালিক এবং (খ) ছোট ও মাঝারি মালিক—এই দুইভাগে ভাগ কবিয়া জমির মালিকানা সম্পর্কে তাঁহাদের সুপারিশ প্রদান করিয়াছিলেন। বড় মালিকদের ক্ষেত্রে সমস্যা হইল বাড়তি জমি এবং চাষের একটি নির্দ্দিষ্ট মান। ছোট এবং মাঝারি মালিকদেব সমস্যা হইল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং টুকরা জমির সংহতি।

প্রথম পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন যে বড় মালিকরা হয় প্রজাদের দ্বারা চাষ করায় অথবা সরাসরি চাষ করে। প্রজাবিলির জমিতে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার ঊর্দ্ধে যাহাতে প্রজারা মালিক হইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজ চাষের জমিতে ভালো চাষের

সীমা নির্দ্ধারণের কাজ কতদূর আগাইয়াছে ?

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কতিপয় রাজ্যে ভবিষ্যৎ জমি গ্রহণের উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। উত্তর প্রদেশে এই সীমা হইল ৩০ একর, হায়দ্রাবাদে ৩টি পরিবার জোত (family holding) মধ্যভারতে ৫০ একর, সৌরাষ্ট্রে ৩টি আর্থিক জোত (economic holding), দিল্লীতে ৩০টি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর।

ঐ সময়ে কতিপয় রাজ্যে বর্ত্তমান জমি মালিকানার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এই সীমা হইল পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুদের জন্য ৫০টি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর এবং অন্যান্যদের জন্য ৩০টি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর; হায়দ্রাবাদে পরিবার জোতের ৩ হইতে ৪ $\frac{১}{২}$ গুণ; বিহারে ৫টি ব্যক্তি লইয়া গঠিত পরিবারের জন্য ৩০ একর, হিমাচল প্রদেশে চম্বল জিলায় ৩০ একর এবং অন্যান্য অংশে ১২৫৲ টাকার মতন জমি, সৌরাষ্ট্রে ৩টি আর্থিক জোত, এবং দিল্লীতে ৩টি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর। পশ্চিমবঙ্গে এই সীমা হইল মধ্যস্বত্ব ভোগীদের জন্য ৩৩ একর এবং রায়তদিগের জন্য ২৫ একর।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে ব্যক্তি মালিকানার জমির সর্ব্বোচ্চ আয়তন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য জোত এবং কৃষি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন ছিল; বর্ত্তমানে এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং ২য় পরিকল্পনাকালে সমগ্র দেশে কৃষি জোতের সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণের নীতি কার্য্যকরী করিতে হইবে। "পারিবারিক জোত" বলিতে যাহা বুঝায় তাহার তিনগুণ জমি এক একটি পরিবারের জন্য সর্ব্বোচ্চ সীমারূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে; তবে যে পরিবারের লোক সংখ্যা ৫ জনের অধিক তাহার জন্য জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা আরও বেশী হইবে, উহা পরিবার জোতের ৬গুণ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। তবে কতিপয় জমিকে সর্ব্বোচ্চ সীমার বাধ্যকতা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যথা চা, কফি ও রবারের আবাদ, ফলের বাগান, পশু পালন ও ডেয়ারী ইত্যাদি।

ন্যূনতম জোতের সমস্যা—Problem of Minimum Land Holdings

মান নির্দ্ধারিত থাকিবে। অধিকন্তু একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরকার বড় জমিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, (ক) যেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেলে মোট উৎপাদন কমিয়া যাইবে এবং (খ) যেগুলির এরূপ সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের জমিগুলি যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে গৃহীত হওয়া উচিত। অতঃপর ঐ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট জমির চাষের ব্যবস্থা করিবেন। তবে এক্ষেত্রে সমবায় সমিতিকে এবং সংশ্লিষ্ট জমিতে যাহারা কৃষি শ্রমিক ছিল তাহাদিগকে এরূপ জমিতে চাষ করিবার অধিকার প্রদান করাই সঙ্গত হইবে বলিয়াই কমিশন অভিমত দিয়াছিলেন।

Q. Write note on Economic holdings (Delhi 1955). Write note on—Agricultural holdings in India (Agra, 1955).

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত ভূমি-সমস্যার একটি অংশ—আবার ইহা চাষের সমস্যাও। চাষের সমস্যা বলিয়াই ইহা ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে পরিকল্পনা কমিশন এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশন এই সমস্যার কথা বলিবার বহু পুর্ব্ব হইতেই অর্থনীতিবিদ্‌গণ এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। অর্থনীতিবিদ্‌গণ একটি ন্যূনতম আয়তনের জমিকে আর্থিক জোত (economic holding) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং এই আর্থিক জোতের সমান জমি কৃষিকার্য্যের একক (unit of cultivation) রূপে থাকা উচিত বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যের লাভ-যোগ্যতার বিবেচনাতেই এইরূপ আর্থিক জোতের ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ যেরূপ জমি থাকিলে চাষকার্য্য লাভজনক কার্য্যে পরিণত থাকিবে —অন্ততঃ লোকসান হইবে না। জমি যদি খুব ছোট হয় তাহা হইলে না হয় সংসারের পরিপূর্ণ ভরণপোষণ, না হয় যথাযথ লাভ। তবে আর্থিক জোত বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদিগের মধ্যে নানারূপ মতদ্বৈধ আছে। অবশ্য সকলেই স্বীকার করেন যে আর্থিক জোত হইল একটি যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ তবে এই যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ বলিতে কি বুঝায় তাহা লইয়াই মতভেদ। কীটিন্‌জ অভিমত দিয়াছেন যে সেইরূপ আয়তনের জমিকেই আর্থিক জোত বলা হইবে যাহার দ্বারা একজন লোক তাহার প্রয়োজনীয় খরচা উসুল করিয়াও যুক্তিসঙ্গত স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের মত যথেষ্ট উৎপাদনের সুযোগ পাইবে। (which allows a man a chance of producing sufficient to support himself and his family in reasonable comfort after paying his necessary expenses) ডঃ ম্যান ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের ভিত্তিতে আর্থিক জোতের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন—অবশ্য সেই ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান যাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইরূপ জীবনযাত্রার মানে একটি গড় আয়তনের পরিবারকে যতখানি জমি ভরণপোষণ দিবে তাহাই ডঃ ম্যান্‌-এর মতে আর্থিক জোত ("which will provide for an average family at the minimum standard of life considered satisfactory)"। কিন্তু কীটিন্‌জ যে ক্ষেত্রে "যুক্তিসঙ্গত স্বাচ্ছন্দ্যের" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং ডাঃ ম্যান ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের কথা বলিয়াছেন ষ্ট্যানলে জেভন্‌স্ সে ক্ষেত্রে উচ্চ জীবনযাত্রার মানের ভিত্তিতে আর্থিক জোত নির্দ্ধারণের কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ আর্থিক জোতকে এরূপ হইতে হইবে যাহাতে উচ্চ জীবন-যাত্রার মানে কৃষক তাহার পরিবারের ভরণপোষণের মত নীট আয় করিতে পারিবে। আর্থিক জোতের সঠিক সংজ্ঞা লইয়া অর্থনীতিবিদ-

দিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও আর্থিক জোতের ধারণার আসল তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহার আসল তাৎপর্য্য হইল জমির একটি ন্যূনতম পরিমাণ নির্দ্ধারণ এবং ঐভাবে খণ্ড বিক্ষিপ্ত জমির সমস্যা সমাধান করা। অবশ্য এই ন্যূনতম পরিমাণ কতখানি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া যায় না; দেশের বিভিন্ন অংশে জমির গুণ এবং ফসলের প্রকৃতি অনুযায়ী এই ন্যূনতম পরিমাণ বিভিন্ন হইতে বাধ্য।

ক্ষুদ্র জোতের সমস্যা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন পরিবার জোতের (family holding) ধারণার অবতারণা করিয়াছেন। পরিবার জোত বলিতে বুঝায় কৃষিকার্য্যের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য্য করে গড় আয়তনের এইরূপ পরিবারেব জন্য হাল-একক বা কর্ম্ম-এককের সমান আয়তনের জমি—অবশ্য ইহা মাপ করা হইবে স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী এবং প্রচলিত পদ্ধতির অবস্থা অনুযায়ী। ("A family holding may be defined briefly as being equivalent according to the local conditions and under the existing conditions of technique, either to a plough unit or to a work unit for a family of average size working with such assistance as is customary in agricultural operations.") অবশ্য এই পবিবার জোতের * ধারণা পরিকল্পনা কমিশন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক চাষের জমি স্বয়ং চাষের জন্য প্রজার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইবার ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি আর্থিক জোতের ধারণার সহিত পরিবার জোতের ধারণাব কিছুটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই উদ্দেশ্য হইল জমির এরূপ একটি আয়তন সম্পর্কে ধারণা করা যাহা একটি গড় আয়তনের পরিবার কর্ত্তৃক চাষ করা সম্ভব এবং চাষ করিলে পোষায়।

পরিবার জোত ব্যতীতও পরিকল্পনা কমিশন "ভিত্তি জোতের" ** (Basic holding) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে জমির একটি ন্যূনতম আয়তনকে ভিত্তিজোত বলিয়া গণ্য করা উচিত; একটি পরিবার জোতের এক তৃতীয়াংশকে এই ভিত্তিজোত ধরা যাইতে পারে। ভিত্তিজোতের ধারণা প্রয়োগ করা হইবে, ছোটখাটো মালিকগণ কর্ত্তৃক তাহাদের জমি ফিরাইয়া লইবার ক্ষেত্রে। যে সকল মালিকের জমি ভিত্তিজোতের কম, তাহাদের নিজ চাষের জন্য প্রজার নিকট হইতে সব জমিই ফিরাইয়া লইতে দিতে হইবে। যাহাদের জমি "ভিত্তি জোত" এবং "পরিবার জোতের" মধ্যে, তাহাদিগকে প্রজাদের অর্দ্ধেক পরিমাণ জমি ফিরাইয়া লইতে অনুমতি দিতে হইবে—তবে এইরূপ ফিরাইয়া লওয়া জমি যেন ভিত্তি জোতের কম না হয়। মালিক এইভাবে

* First Five year plan, P 189

** Second Five year Plan, P 188

ফিরাইয়া লইবার দরুণ প্রজাদের নিকট যদি কোন জমি না থাকে বা প্রজার জমি যদি ভিত্তিজমির কম হইয়া যায় তাহা হইলে সরকার প্রজাদের আরও জমি সংগ্রহ করিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন।

এইগুলি ছাড়া জমির যোগ্য নূন্যতম আয়তন সম্পর্কে আরও এক প্রকারের ধারণা সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা হইল "ষ্ট্যাণ্ডার্ড জোত" (Standard holding)। পশ্চিম বঙ্গের ভূমি-সংস্কার আইনে এইরূপ ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তনের জমির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে কোন জোত যাহাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড জোতের কম হইয়া না যায় সরকার তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ ***—Zamindari Abolition in West Bengal**

১৯৫৩ সালের ৬ই মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার নিম্নকক্ষে জমিদারী উচ্ছেদের আইন উত্থাপিত হয় এবং ২৫শে নভেম্বর তারিখে উহা ঐ কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হয়। ঐ সালেরই ১লা ডিসেম্বর তারিখে উর্দ্ধকক্ষের দ্বারাও উহা অনুমোদিত হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এই আইন "জমিদারী গ্রহণ বিধি" (Estates Acquisition Act) রূপে পরিচিত।

১৯৩৮ সালে বাঙ্গালা সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে "ভূমি রাজস্ব কমিশন" গঠন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া এ সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহার সুপারিশ করিবার দায়িত্ব এই কমিশনের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। ফ্লাউড কমিশনের সংখ্যাধিক সদস্য অভিমত দিলেন যে চাষীদিগের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিয়া রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মধ্যে সরকার কৃষকদিগের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবেন। শুধু জমিদারদিগকেই নহে, সকল মধ্যস্বত্বভোগীদিগকেই জমি মালিকানা হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। ফ্লাউড কমিশন অবশ্য ইহার জন্য যথারীতি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর জমির জন্য এবং বিভিন্ন উপস্বত্বভোগীর জন্য বিভিন্ন হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া কমিশন অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন: জমির নীট আয়ের ১০ অথবা ১২ অথবা ১৫ গুণ অর্থ ক্ষতিপূরণ রূপে প্রদান করা যাইতে পারে। চাষীদের বকেয়া খাজনার অর্দ্ধেক জমিদারকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যতদিন না সরকার কর্ত্তৃক জমিদারীগ্রহণ কার্য্যকরী করা হইতেছে ততদিন অন্তবর্ত্তীকালের জন্য কৃষিগত আয়ের উপর কর ধার্য্য করা সঙ্গত হইবে বলিয়াও অভিমত প্রদত্ত হইল।

ফ্লাউড কমিশনের এই অভিমত কিন্তু নিছক সংখ্যাধিক সদস্যের—উহা সর্ব্বসম্মত নহে। কমিশনের সংখ্যাল্প সদস্যদিগের অভিমতে বাঙ্গলার কৃষিকার্য্যের অবনতির জন্য দায়ী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা নহে—উহার জন্য বিবিধ কারণ বিদ্যমান। এমতাবস্থায় জমিদারী ব্যবস্থা রহিত করা নিষ্প্রয়োজন, অধিকন্তু উহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। জমিদারী ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের সমতুল্য হইবে এবং উহার ফলাফলও হইবে সুদূরপ্রসারী। অথচ উহার দ্বারা

এই বিধি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রযোজ্য—তবে কলিকাতা সহর বাদে। ইহার বিধানি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সকল জমিদারী স্বত্ব এবং মধ্যস্বত্ব রাজ্য সরকারের দ্বারা গৃহীত হইবে। "জমিদারী স্বত্ব" এবং "মধ্যস্বত্ব" (Intermediaries)—উভয় পর্য্যায় উল্লেখের কারণ হইল যে এতদঞ্চলে বহু এরূপ ব্যক্তি আছে যাহারা ঠিক কৃষকও নহে, আবার রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের "জমিদারও" নহে—অথচ উহাদের মধ্যে থাকিয়া চিরস্থায়ী স্বত্বের সুবিধা ভোগ করে এবং ভূমি রাজস্বের অর্থাৎ খাজনার একটি বৃহদংশ গ্রহণ করে। ইহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বিশেষ—সেই কারণে ইহাদের স্বত্বও সরকার গ্রহণ করিবেন। সরকার তাঁহাদের সুবিধা অনুযায়ী অঞ্চল বাছিয়া লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুযায়ী ঐ সকল অঞ্চলের জমি সরকারী মালিকানাধীন হইবে। এইভাবে সকল জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের জমি দায়হীনভাবে (free from encumbrances) ক্রমে ক্রমে সরকারের হস্তগত হইবে। বাজার, হাট, অরণ্য, ফেরী ইত্যাদির অধিকারও সরকার গ্রহণ করিবেন। রায়ত এবং অন্যান্য প্রজাগণ যে জমি যে সর্ত্তে জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অধীনে ভোগ করিত, সেই জমি এবং সেই সর্ত্তেই তাহারা সরকারের অধীনে ভোগ করিবে। সরকার মালিকানা-অধিকার অর্থাৎ খাজনা সংগ্রহের অধিকার গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু ইহা করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল রাজ্য সরকারের সহিত চাষীদিগের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু শুধুমাত্র "জমিদার" এবং "মধ্যস্বত্বভোগী"দের জমি গ্রহণ করিলেই এই উদ্দেশ্য উপলব্ধি হইতে পারে না। এই দুই শ্রেণীর অধীনে আছে ৪ লক্ষ একর কৃষিভূমি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মোট কৃষিভূমির এলাকা হইল ১১৭ লক্ষ একর; সুতরাং ১১৩ লক্ষ একর কৃষিভূমি আছে রায়ত এবং কোর্ফাদের (under-ryot) অধীনে—যাহারা ঠিক "কৃষকের" পর্য্যায়ে পড়ে না। ইহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি আছে যাহারা নামে মাত্র রায়ত কিন্তু যাহাদের

সরকারের রাজস্ব পরিমাণে এমন কিছু বৃদ্ধি ঘটিবেনা বলিয়াই সংখ্যাগুরু সদস্যগণ মত প্রকাশ করিলেন।

পরে "বাঙ্গালা শাসন অনুসন্ধান কমিটি" (Bengal Administration Enquiry Committee) এই বিষয়টি শাসন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করেন। প্রচলিত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা দেশের ভূ-সম্পত্তি এবং জলসম্পত্তির চূড়ান্ত ব্যবহারের পথে অন্তরায় বলিয়াই তাঁহারা অভিমত প্রদান করেন। "কৃষি সংস্কার কমিটিও" (Agrarian Reform Committee) অনুরূপ অভিমত দিয়াছিলেন। স্বাধীনতার (এবং দেশবিভাগের) পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন। ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া জমিদারী স্বত্ব এবং অন্যান্য সমস্ত উপস্বত্ব নিজেরা গ্রহণ করিয়া লইবার নিমিত্ত তাঁহারা আইন প্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালে এই আইন প্রণীত হইয়াছে। তবে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা সংগ্রহ ব্যতীত জমিতে আর কোনই স্বার্থ নাই ; ইহারা জোতদার, লাটদার ইত্যাদি নামে পরিচিত এবং ইহারা অনেকেই বর্গাদারের মধ্যদিয়া জমি চাষ করে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহাদের অধিকার সরকার গ্রহণ না করিলে "রায়তে"র ছদ্মবেশে বহু জমিদার থাকিয়া যাইত। সেই কারণে এই আইনে বিধান দেওয়া হইয়াছে যে যে-সকল ব্যক্তি তাহাদের জমি বর্গাদার দিয়া চাষ করায়, অথবা স্বয়ং বা পোষ্যের মারফতে চাষ না করিয়া অপরকে বন্দোবস্ত দিয়া দেয় তাহাদের জমিও সরকারের হস্তগত হইবে।

"রায়ত"গণ অবশ্য ২৫ একর খাস জমি দখলে রাখিতে পারিবে। অন্যান্য শ্রেণীর লোকও কৃষিভূমির ২৫ একর নিজ দখলে রাখিতে পারিবে। অধিকন্তু রায়ত ও মধ্যস্বত্বভোগীরা বাস্তুজমি এবং সকল অ-কৃষিজমি (non-agricultural land) নিজ দখলে রাখিতে পারিবে—যদি অবশ্য ঐ দুই প্রকার জমির মিলিত আয়তন ২০ একরের কম হয়। পুষ্করিণীর মৎসস্থলীও (tank fisheries) মালিক দখলে রাখিতে পারিবে।

সরকারের দ্বারা ভূসম্পত্তি গ্রহণের এই ব্যবস্থায় আরও কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। বাস্তুজমি, মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার মধ্যে পাকাবাড়ী, ১৫ একরের নিচে অ-কৃষি খাস জমি, চা বাগান, মিল এবং ফ্যাক্টরীর জমি, স্থানীয় সরকারের অধীনে জমি---এইগুলি সরকার গ্রহণ করিবেন না—কিন্তু ইহাদের মালিকের সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে। মালিকগণ সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে।

সরকার যে সকল জমি গ্রহণ করিবেন তাহার জন্য মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে। কি হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে তাহার তালিকাও আইনে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাদের জমি হইতে আয় কম তাহারাই যাহাতে অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিপূরণ পায় সেইভাবেই এই তালিকা রচিত হইয়াছে। নীট আয়ের (Net Income) গুণক হিসাবে এই ক্ষতিপূরণ ধার্য্য হইয়াছে :

প্রথম ৫০০৲ টাকার নীট আয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ হইবে নীট আয়ের ২০ গুণ
পরবর্ত্তী ৫০০৲ " " " " " " " " ১৮ "
" ১০০০৲ " " " " " " " " ১৭ "
" ২০০০৲ " " " " " " " " ১২ "
" ১০০০৲ " " " " " " " " ১০ "
" ১৫,০০০ " " " " " " " " ৬ "
" ৮০,০০০ " " " " " " " " ৩ "

উহার উপর সকল নীট আয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ হইবে উহার দ্বিগুণ মাত্র।

এই ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে আংশিকভাবে নগদে এবং আংশিক ভাবে

বণ্ডে। নগদ অর্থ যে অনুপাতে প্রদত্ত হইবে সে অনুপাতে প্রাপক উপকৃত হইবে, শিল্পে নিয়োজিত হইলে শিল্পোন্নতিতেও উহা সহায়তা করিতে পারিবে, এবং বণ্ডে প্রদানের ব্যবস্থা থাকাতে সরকারের পক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সম্ভব হইয়া উঠিবে।

বাঙলা ১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল ১৯৫৫) হইতে সকল জমিদারী এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের সকল অধিকার রাজ্য সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং ১৩৬৩ সনের ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৬) সকল রায়ত এবং কোর্ফাদের সকল জমি এবং স্বত্ব সরকারের করায়ত্ত হইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপের কার্য্য শেষ হইয়াছে; এখন হইতে রাজ্য সরকারের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত "রায়ত" নামে শুধু একধরণের প্রজাই থাকিল। কোর্ফাগণও (under-ryots) রায়ত বলিয়া গণ্য হইল এবং রায়ত ও কোর্ফাগণের নিকট হইতে যাহারা জমি লইয়াছে তাহারাও রায়ত শ্রেণীভুক্ত হইল।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি আইন প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে ১৯৫৩ সালের ৫ই মে তারিখের পর সরকার কর্তৃক জমির অধিকার গ্রহণের তারিখ অবধি যে সকল জমি হস্তান্তর করা হইয়াছে এবং হইবে—সেই সকল হস্তান্তর অনুসন্ধান করা হইবে, দেখা হইবে ঐ সকল হস্তান্তর জমিদারী আইন এড়াইবার জন্য করা হইয়াছে কিনা। ১৯৫৫ সালের একটি সংশোধনী আইনের দ্বারাও ইহাতে কিছু কিছু সংশোধন যোগ করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার আইন—The West Bengal Land Reforms Act, 1955

পশ্চিমবঙ্গে "জমিদারী গ্রহণ বিধির" দ্বারা জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হইয়াছে। জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী এবং রায়ত—ইহাদের সকলেরই জমি সরকার একটি নির্দিষ্ট সীমার উপরে গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন। অবশ্য তাহার জন্য উহাদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু শুধু জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া সরকার জমির মালিকানা গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয় না, ঐ জমি সমাজের হিতার্থে যথাযথভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন। সেই জন্য জমিদারী উচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ করিবার পর পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা ভূমি সংস্কার সম্পর্কে আর একটি আইন রচনা করিয়াছেন। ইহা ভূমি সংস্কার আইন নামে পরিচিত; ১৯৫৫ সালে ইহা রাজ্য আইন সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ হয় এবং ১৯৫৬ সালের ৩০শে মার্চ্চ ইহা ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। এই আইন যে সকল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সেগুলি হইল রায়তী স্বত্ব, বর্গাদারদিগের অধিকার, রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়ম, জমির সংহতি সাধন ও সমবায় চাষ, জমি বণ্টনের নীতি,

স্বত্বলিপির (record of rights) রক্ষণ ও সংশোধন এবং সরকারী জমির ব্যবস্থাপনা।

রায়তী স্বত্ব—এই আইন চালু হইবার পর হইতে যে জমির উপর যে রায়ত অধিকার ভোগ করে সেই জমির সেই রায়ত মালিক বলিয়া গণ্য হইবে। রায়ত তাহার এই মালিকানা স্বত্ব অপরকে প্রদান করিতে পারিবে এবং এই স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে বর্ত্তাইবে। তবে জমির নিম্নভাগে যদি প্রাকৃতিক সম্পদ থাকে তাহার উপর রায়তের অধিকার থাকিবে না। একজন রায়ত কতখানি জমির মালিক হইতে পারিবে তাহার উর্দ্ধতম সীমা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই উর্দ্ধতম সীমা হইল বাস্তু (homestead) এবং ২৫ একর জমি।

চাষের জমি যাহাতে চাষের কাজে ব্যবহার হয় এবং তদ্দ্বারা সমাজের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে যে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ রায়তের জমি (বাস্তু বাদে) বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রগুলি হইল (ক) রায়ত যদি তাহার জমি কৃষিকার্য্য ব্যতীত অপর কোন কার্য্যে প্রয়োগ করে; (খ) যদি সে পর পর তিন বৎসর তাহার জমিতে ব্যক্তিগত ভাবে অর্থাৎ স্বয়ং চাষ (personal cultivation) না করিয়া থাকে; (গ) এই আইন চালু হইবার তিন বৎসরের মধ্যে অথবা কোন জমির মালিক হইবার তিন বৎসরের মধ্যে যদি সে উহা ব্যক্তিগত চাষের মধ্যে না আনিয়া থাকে; এবং (ঘ) যদি সে তাহার জমি সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক-ভাবে অপর কাহাকেও ভাড়া দিয়া থাকে। অবশ্য রায়ত বর্গাদারের দ্বারা তাহার জমি চাষ করাইতে পারিবে—সেক্ষেত্রে তাহার জমি উপরোক্ত কোন কারণ দেখাইয়া বিক্রয় করা হইবে না। রায়তের জমি এই সকল কারণে বিক্রয় করা হইলে বিক্রয়ের খরচা বাদে অবশিষ্ট টাকা রায়তকে দেওয়া হইবে।

কোন রায়ত তাহার জমি বিক্রয় করিলে রেজেষ্ট্রী তো করিতেই হইবে, অধিকন্তু ঐ জমি হস্তান্তর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে। জমি হস্তান্তরের দ্বারা (অর্থাৎ নূতন জমি কিনিয়া) কোন রায়তের মোট জমির পরিমাণ বাস্তু জমি বাদে ২৫ একরেরও বেশী হইলে বাড়তি জমি সরকার লইয়া লইতে পারিবেন। কোন রায়ত কোন জমি বিক্রয় করিলে তাহার শরিক (co-sharer) অথবা তাহার জমির সংলগ্ন জমি আছে এরূপ রায়ত দাবী করিতে পারে যে ঐ জমি তাহাকেই বিক্রয় করা হউক; উভয়েই যদি দাবী করে তাহা হইলে শরিকের দাবীই অগ্রগণ্য। সে ক্ষেত্রে যে প্রথমে জমি ক্রয় করিয়াছিল সে তাহার টাকা ফিরাইয়া পাইবে।

জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা প্রতিরোধের জন্য এই আইনে বলা হইয়াছে যে জমি ভাগাভাগির দ্বারা যাহাতে খুব ছোট ছোট অংশে পরিণত না হইতে পারে এবং ভালভাবে যাহাতে চাষ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সরকার একটি নির্দ্দিষ্ট আয়তনের জমিকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন (standard area) বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। শরিকদের মধ্যে পার্টিশনের দ্বারা কোন জমি যাহাতে এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন অপেক্ষা কমিয়া না যায় সরকার সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সরকার শরিকদের জমিগুলি এমনভাবে পাল্টাইয়া সাজাইয়া দিবেন যাহাতে কোন জোতের আয়তন ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন অপেক্ষা কম না হয়। জোত যদি এত ক্ষুদ্র হয় যে উহা ভাঙ্গিতে গেলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন থাকে না, অথবা শরিকদের ছোট ছোট জমি যদি ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন মত সাজাইয়া দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রয় করিয়া দিয়া উহার টাকা জমির মালিককে দিয়া দিবেন বা শরিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন।

ভাগ চাষ (বর্গাদারের অধিকার)—রায়ত তাহার জমি নিজে চাষ না করিয়া বর্গাদারের দ্বারা চাষ করাইতে পারে। বর্গাদারের দ্বারা চাষ হইলে ফসল জমির রায়ত ও বর্গাদারের মধ্যে আধা-আধি ভাগ হইবে— যদি রায়ত চাষের সকল উপকরণ জোগাইয়া থাকে। চাষের উপকরণ যদি বর্গাদার নিজেই দিয়া থাকে তাহা হইলে মোট ফসলের ৬০ শতাংশ বর্গাদার পাইবে এবং ৪০ শতাংশ রায়ত পাইবে। একবার বর্গাদারকে চাষ করিতে দিলে নিম্নোক্ত কারণ ব্যতীত তাহার চাষের অধিকার ফিরাইয়া লওয়া যাইবে না: (ক) বর্গাদার যদি সঙ্গত কারণ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট জমি চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া থাকে; (খ) বর্গাদার যদি নিজে চাষ না করিয়া অপরকে চাষ করিতে দিয়াছে এরূপ হয়; (গ) বর্গাদার যদি ভূমি সংস্কার আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে এরূপ হয়; অথবা (ঘ) মালিক যদি উহা নিজে চাষ করিবে বলিয়া ফিরৎ চাহে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, রাজ্য সরকারের দ্বারা নির্দ্ধারিত একটি নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বেশী জমি যদি মালিকের থাকে, তাহা হইলে মালিক বর্গাদারকে তাহার সম্পূর্ণ জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না। শুধু সেইটুকু জমি হইতেই বর্গাদারকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে যেটুকু জমি, পুর্ব্ব হইতেই তাহার (মালিকের) ব্যক্তিগত চাষে আছে এরূপ জমির সহিত যোগ করিলে উভয় মিলিয়া মালিকের মোট জমির দুই তৃতীয়াংশ হয়। অর্থাৎ কতখানি জমি মালিক ব্যক্তিগত চাষের জন্য বর্গাদারের নিকট হইতে ফিরাইয়া লইতে পারিবে তাহা নির্ভর করে মালিকের পুর্ব্ব হইতেই ব্যক্তিগত চাষের জন্য কতখানি জমি আছে তাহার

উপর। তবে মালিক যদি ব্যক্তিগত চাষের অছিলায় বর্গাদারকে উচ্ছেদ করিবার পর ২ বৎসরের মধ্যে উহাতে চাষ না করে অথবা অন্য কোন বর্গাদারকে চাষ করিতে দেয় তাহা হইলে তাহার জমি সরকার বেচিয়া দিবেন। আবার একজন বর্গাদার যে যত ইচ্ছা জমি ভাগ চাষে লইবে তাহাও সম্ভব নহে—২৫ একরের বেশী জমি সে চাষ করিতে পারিবে না।

রাজস্ব—প্রত্যেক রায়তকেই তাহার জমির জন্য খাজনা দিতে হইবে। এই খাজনা নির্দ্ধারণের কতিপয় নীতিও এই আইনে দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জমির জন্য খাজনার হার নির্দ্ধারণে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা হইবে সেগুলি হইল: (ক) মাটির প্রকৃতি এবং জমির সাধারণ উৎপাদন ক্ষমতা; (খ) একর প্রতি গড় ফসল উৎপাদন, (গ) ফসলের গড় দাম; (ঘ) ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় না এরূপ জমির বাজার দাম। তবে ধান চাষের জমির খাজনা উৎপন্ন ধানের মূল্যের এক পঞ্চমাংশের বেশী হইবে না, এবং অন্যান্য ফসলের জমির ক্ষেত্রে, খাজনা ফসলের মূল্যের এক দশমাংশের বেশী হইবে না।

জোতের সংহতি সাধন ও সমবায় চাষ সমিতি—যদি কোন অঞ্চলে রায়তদিগেব জমি টুকরা টুকরা ভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে এবং সরকাব যদি মনে করেন যে টুকরা জমিগুলিকে একত্রিত করা প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার রায়তদিগকে ক্ষতিপূরণ দিয়া এই সকল জমি গ্রহণ করিবেন। তবে সংশ্লিষ্ট মালিকদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ এইরূপ সংহতি সাধনে রাজী না হইলে সরকার উহা করিতে পারিবেন না। খণ্ড-জমিগুলিকে গ্রহণ কবিয়া সরকাব উহাদিগকে সাজাইয়া প্রত্যেকের জমি এক বন্দে পবিণত করিবেন এবং যাহাদেব নিকট হইতে এই জমি লওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে উহা প্রদান করিবেন—তবে যাহার যেটুকু জমি ছিল সে যেন সেইটুকু জমি পায় এবং পূর্ব্বেকার সমান মূল্যের এবং গুণেব জমি পায়। যদি কেহ বাড়তি মূল্যেব জমি পায় তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে বাড়তি দাম আদায় করা হইবে,—অবশ্য কিস্তিবন্দীতে।

পাশাপাশি জমি আছে এরূপ অন্ততঃ সাতজন রায়ত মিলিয়া একটি সমবায় চাষ সমিতি গঠন করিতে পারে। এইরূপ সমিতি সরকাবের নিকট সমবায় সমিতি বিধি অনুযায়ী রেজেষ্ট্রী হইতে পারিবে। সেক্ষেত্রে উহার সদস্যদের পাশাপাশি অবস্থিত সব জমি ঐ সমিতির জমি বলিয়া গণ্য হইবে। প্রত্যেক সদস্য তাহার জমির মূল্য অনুযায়ী সমিতির শেয়ার পাইবে। কিন্তু সমবায় সমিতিটি সদস্যদের জমি ব্যতীত নিজের অধিকারে কোন জমি কিনিতে পারিবে না। রাজ্যসরকারের আদেশ ব্যতীত কোন সমবায় সমিতি তাহার

কারবার গুটাইতে পারিবে না। এইরূপ সমবায় সমিতিকে সরকার কতিপয় বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে পারেন—যথা জমির খাজনা হ্রাস, প্রথম তিন বৎসর বিনা মূল্যে এবং তাহার পর সস্তা দরে বীজ ও সার যোগান, বিনামূল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞদের উপদেশ, আর্থিক সাহায্য এবং বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন।

জমি বণ্টনের নীতি সম্পর্কে এই আইনে বলা হইয়াছে যে রাজ্য সরকারের অধীনে যে সকল জমি আছে উহার বিলি ব্যবস্থা করা হইবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে যাহারা জমি পাইলে নিজেরা চাষ করিবে এবং যাহাদের জমি নাই বা দুই একরের কম জমি আছে সরকার কর্তৃক নিজেদের জমি বিলির সময়ে তাহাদিগকে ঐ জমি দেওয়া হইবে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সমবায় চাষ সমিতি গঠন করিবে তাহাদের দাবী বেশী করিয়া বিবেচনা করা হইবে—তবে এইরূপ জমি বিলির সময়ে সরকার কোন সেলামী লইবেন না।

ভূমি সংস্কারের কেন্দ্রীয় কমিটি—Central Committee of Land Reforms

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি সংস্কারের অগ্রগতি এবং সমস্যা যাহাতে অখণ্ড জাতীয় কার্য্যক্রমরূপে বিবেচিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালের মে মাসে ভারত সরকার এইরূপ সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন—ইহার নাম হইল ভূমি সংস্কারের কেন্দ্রীয় কমিটি। এই কমিটিতে আছেন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিবার সম্ভাবিত ফলাফল—Probable Effects of the Abolition of Permanent Settlement

Q. What would be the probable effects of the abolition of Permanent Settlement on the economy of the country? (Cal. B. A. 1950)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠাইয়া দিলে বিভিন্ন কারণে উহা জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক হইতে পারে :

(ক) ইহার দ্বারা সরকারের সহিত কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে এবং সরকার কৃষি সম্পর্কিত সংস্কার সাধনে অধিকতর সক্ষম হইবেন।

(খ) কৃষিকার্য্য আধুনিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করিতে হইলে—অর্থাৎ উহার যুক্তি-সিদ্ধ-পুনর্গঠন (rationalisation) করিতে হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন উহার সহায়ক হইবে।

(গ) জমির সংহতি সাধনের পথে (Consolidation of Holdings) জমিদারগণ অন্তরায়রূপে কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে উহার পথ সুগম হইবে।

(ঘ) চাষীগণ মালিকানা লাভ করিয়া উত্তম ও অধিক উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত হইবে। ইহাতে কৃষিকার্য্যে সমৃদ্ধি আসিবে।

(ঙ) জমিদারগণ ক্ষতিপূরণরূপে যে মূল্য পাইবেন তাহা তাঁহারা শিল্পে বিনিয়োগ করিবেন; উহাতে দেশ শিল্পোন্নত হইবে।

(চ) জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ক্রমশঃই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে উহার কেন্দ্রীভবন বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতি পরিহার করা যাইবে।

ভূদান যজ্ঞ—ইহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য—Bhoodan Yagna, Its Economic Significance

Q. Write note on Bhoodan (Delhi, 1954; Patna, 1955) Assess the economic significance of the Bhoodan movement and indicate how it is going to help the landless labourers of the country. (Patna 1954).

জমির জন্য চাষীর আগ্রহ সর্ব্বজনবিদিত। এই আগ্রহ একান্তই স্বাভাবিক কারণ জমি যে চাষ করে তাহার পক্ষে ঐ জমির মালিক হইবার ইচ্ছা তাহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিবে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেশে জমি-মালিকানা অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত—অল্প কতিপয় ব্যক্তি সমগ্র জাতের জমির মালিক। মালিকগণ চাষ করে না এবং চাষীগণ মালিকানা পায় না। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন যাহাতে ঘটে সেইরূপভাবে চাষীদিগকে আন্তরিক পরিশ্রমে উৎসাহিত করিবার মত অনুভূতি ক্রিয়া করে না। জমির মালিকানা স্বত্ব এরূপ অনুভূতি প্রদান করিতে পারিত। সুতরাং সমগ্র সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে চাষীদিগকে জমির মালিকানা প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু ভূমিহীনকে ভূমি প্রদান কে করিবে? কোথা হইতেই বা করিবে? রাষ্ট্র ইহা করিতে পারে বটে কিন্তু রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জমি গ্রহণ এবং ভূমিহীনকে উহা বণ্টন একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং জটিল প্রক্রিয়া। অধিকন্তু সেক্ষেত্রেও ভূমিহীন কৃষকগণ সকলেই চাষের জন্য এবং ব্যক্তিত্ব প্রতিফলনের জন্য যে জমি লাভ করিবে এইরূপ নিশ্চয়তা নাই।

এই কারণেই মহাত্মা গান্ধীর যোগ্য শিষ্য আচার্য্য বিনোভা ভাবে "ভূমি-দান যজ্ঞ" নামে একটি আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে আইন প্রণয়নের অপেক্ষা না করিয়া এবং আর্থিক লাভালাভের

কথা চিন্তা না করিয়া সকলেই অভিন্ন সামাজিক হিতের জন্য যে যে-টুকু পারে জমি দান করুক। এইরূপ দানের ভিত্তিতে জমি সংগৃহীত হইলে উহা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামে ভূমিহীন চাষীদিগকে প্রদান করা হইবে। সুতরাং ভুদান যজ্ঞের মূল কথা হইল দানের মধ্য হইতে জমি সংগ্রহ করা এবং নিঃস্ব চাষীকে উহা প্রদান করা। কিন্তু ইহার দ্বারা কি বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি খণ্ডের সৃষ্টি হইবে না এবং এই জমি খণ্ডগুলি কি খণ্ডীকরণের কুফলই বজায় রাখিবেনা? চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ইহার দ্বারা কি দেশের সত্যকার অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হইবে? সমালোচকগণ এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেও ভূদান যজ্ঞের সমর্থকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে একান্তই উৎসাহী। তাঁহারা বলেন যে ইহার দ্বারা সমগ্র দেশ এবং উহার কৃষি বিশেষ উপকৃত হইবে। ইহা সাধারণ ব্যক্তির জমির বুভুক্ষা মিটাইবে; জমির এই অতৃপ্ত বুভুক্ষা অন্য যে কোন বুভুক্ষার ন্যায়ই মানুষকে চরম কার্য্যে প্রণোদিত করে। ইহার দ্বারা অল্প-পরিধির চাষ (small scale farming) সৃষ্টি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু পারিবারিক পরিশ্রমের ভিত্তিতে পরিচালিত এইরূপ অল্প পরিধির চাষ অধিকতর সুফলপ্রসু হইতে পারে। চাষীর কার্য্য-প্রদান অপরের চাহিদার উপর নির্ভর করিবে না, নিজেদের কার্য্যের চাহিদা তাহারা নিজেরাই করিবে, সুতরাং ইহার দ্বারা কৃষি-বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। অধিকন্তু ছোট ছোট মালিক-চাষীদিগের দ্বারা চাষ করা হইলে অনেক বিষয়ে উহা বৃহৎ পরিধির চাষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে—চীনদেশে এবং জাপানে ইহার বাস্তব দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ভূদান যজ্ঞের সমর্থকগণ আরও বলেন যে কৃষকদিগের আশাভঙ্গের যে নিদারুণ পরিণতি ঘটিতে পারে তাহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। উহাদের অসন্তুষ্টির অশ্রুত গুঞ্জন বিপ্লবের কর্ণবিদারী ধ্বনিতে পরিণত হইতে পারে। ইহার প্রতিকারে বিদেশীর নিকট হইতে শিখা পদ্ধতির প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল। আমাদের নিজেদের দেশের ঐতিহ্য বিবেচনা করিতে হইবে—যেখানে গ্রামই হইল দেশের প্রাণ-কেন্দ্র, যেখানে ভূমিকে ধরিত্রীমাতা বলা হইয়া থাকে, যেখানে দরিদ্রকেই নারায়ণ রূপে গণ্য করা হয়, যেখানে ভাবপ্রবণ জনসমষ্টিকে নাড়া দিবার জন্য আইন প্রণয়ন অপেক্ষা ত্যাগের আহ্বান অধিকতর ফলপ্রদ।

ভূদান কর্ম্মীগণ ১৯৫৪ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিবেন বলিয়া ভাগ্-নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সংগৃহীত জমির আয়তন ভাগ্-সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল প্রায় ৪ লক্ষ একরের মতন। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৪০,১৪,৪৮৫ একর জমি

সংগৃহীত হইয়াছিল—এই জমিদাতাদিগের সংখ্যা হইল ৩,৪৯,১৫০। ঐ সময় পর্য্যন্ত ২১,১১,১৯৪ একর জমি বিলি করা হইয়াছিল।

সারাংশ

ভূমি সমস্যার প্রকৃতি—এদেশে ভূমি স্বত্ব সম্পর্কে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে সেগুলি মোটামুটি পাঁচ প্রকারের। প্রথম সমস্যা হইল জমিদারী। ইহার যে উপকারিতা ছিল তাহা শেষ হইয়াছে কিন্তু ইহার আওতায় রায়তদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সরকারের ক্ষতি হইয়াছে। উপস্বত্ববিভাজন হইল দ্বিতীয় সমস্যা। একজন জমি লইয়া আর একজনকে বন্দোবস্ত দেয়, সে আবার আব একজনকে বন্দোবস্ত দেয়, এইভাবে প্রত্যেকে ক্ষুদে জমিদার সাজে। প্রত্যেকে খাজনা লইতে আগাইয়া আসে কিন্তু কৃষি উন্নতিব দায়িত্ব বোধ করে না। তৃতীয়তঃ, জমির মালিকানা ক্রমশঃই কম সংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে; ইহা অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর। চতুর্থ সমস্যা হইল ভাগচাষেব ব্যবস্থা—ইহা এক ধরণের নূতন জমিদার সৃষ্টি করিয়া দিতেছে কারণ ভাগচাষ মানে অপরের পরিশ্রমে বসিয়া খাওয়া। পঞ্চমতঃ, জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা।

পরিকল্পনা কমিশনের চক্ষে ভূমি সমস্যা—ভূমিব স্বত্ব বণ্টন এবং কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নের সহিত জড়িত। সুতরাং ভূমি সমস্যা স্বভাবতঃই পরিকল্পনা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভূমি সংস্কার সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মোটামুটি চার প্রকারের: (১) জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ এবং মধ্যস্বত্ব বিলোপ করা উচিত (২) প্রজাস্বত্ব সংস্কার করিতে হইবে। (৩) জমি মালিকানার উর্দ্ধতম সীমা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত এবং ইহাব সহিত উৎকৃষ্ট চাষের মান (Standard of efficiency of cultivation) বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের ব্যবস্থা—স্বাধীনতার পরেই সরকার এদিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন এবং প্রথম পরিকল্পনা সুরু হইবার পুর্ব্বেই, কতিপয় রাজ্যে এ সম্পর্কে আইন প্রণীত হইয়াছিল—যথা বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই ইত্যাদি। তবে সকল রাজ্যেই

সংশ্লিষ্ট আইনগুলি যে কার্য্যকারী হইয়াছিল তাহা নহে। প্রথম পরিকল্পনা-কালে জমিদারী বিলোপের কার্য্যে যে অগ্রগতি হইয়াছিল তাহা এইরূপ: (ক) কতিপয় রাজ্যে এই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বা প্রায় শেষ হইয়াছিল যথা বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ইত্যাদি। (খ) কতকগুলি রাজ্যে-উহা আংশিকভাবে হইয়াছিল যথা বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান (গ) কতিপয় রাজ্যে উহা একেবারেই হয় নাই বা হইলেও খুব প্রাথমিক স্তরে ছিল যথা আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা সুরু হইবার প্রথম দিকে জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। প্রায় সকল রাজ্যেই মধ্যস্বত্ব বিলোপের আইন বলবৎ হইয়াছে। এই বিলুপ্তির কার্য্যের তিনটি সাধারণ ধাঁচ বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। (১) মধ্যস্বত্বভোগীদের সাধারণ জমি সরকার লইয়াছেন; (২) বাস্তখামার তাহাদের নিকট ছাড়িয়া রাখা হইয়াছে; (৩) তাহাদের অধীন প্রজাদের সহিত রাজ্যসরকারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

প্রজাস্বত্ব সংস্কার—প্রজাস্বত্ব সংস্কার বলিতে অনেক কিছু বুঝায়। প্রধানতঃ ইহার তিনটি অংশ আছে: (১) খাজনা হ্রাস (২) স্বত্বের স্থায়িত্ব (৩) প্রজাদের মালিকে পরিণত করা। পরিকল্পনা কমিশনের মতে খাজনার হার ফসলের $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{5}$-এর বেশী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা কোথাও এক ষষ্ঠাংশ (যথা বোম্বাই), কোথাও এক-পঞ্চমাংশ (যথা দিল্লী), কোথাও এক চতুর্থাংশ (যথা উড়িষ্যা), কোথাও এক-তৃতীয়াংশ, কোথাও উহা অপেক্ষাও বেশী। স্বত্বের স্থায়িত্ব বিধানের আয়োজন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আকার লইয়াছে। কোথাও প্রজারা স্বত্বের পরিপূর্ণ স্থায়িত্ব পাইয়াছে (যথা উত্তর প্রদেশ), কোথাও আংশিক স্থায়িত্ব পাইয়াছে (যথা বোম্বাই), কোথাও নিছক মালিকের দ্বারা পুনর্গ্রহণযোগ্য জমির উর্দ্ধতম সীমা স্থিরীকৃত হইয়াছে (যথা আসাম), অন্যান্য রাজ্যে প্রজার উচ্ছেদ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হইয়াছে মাত্র (যথা কেরল)। প্রজাদিগকে জমির মালিকে পরিণত করিবার ব্যাপারে উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লী ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বিশেষ কোন অগ্রগতি হয় নাই। কমিশনের সুপারিশ হইল যে সরকার প্রজাদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও কিস্তীবন্দীতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করিয়া মালিকদিগকে প্রদান করিলে এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্ভব হইবে।

(১) একজন ব্যক্তি তাহার যে জমি আছে তাহার উপরে আরও কতখানি জমি কিনিতে পারিবে, এবং (২) প্রজার নিকট হইতে নিজে চাষ করিব বলিয়া কতখানি জমি ছাড়াইয়া লইতে পারিবে এবং (৩) তাহার পূর্ব্ব হইতেই যে মোট জমি আছে তাহার কতখানি তাহাকে রাখিতে দেওয়া হইবে তাহার একটি

উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত থাকা উচিত বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার সহিত ভূমি ব্যবস্থাপনার আইন প্রণয়নের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। বড় মালিকরা নিজেরা চাষ করে এরূপ জমির উপরে এই আইন প্রযুক্ত হইবে। ইহার মূল কথা হইল চাষ কার্য্যের দক্ষতার একটা মান নির্দ্ধারিত থাকিবে; এই মান বজায় রাখিতে না পারিলে বাড়তি জমি কাড়িয়া লওয়া হইবে। প্রথম পরিকল্পনাকালে জমি মালিকানার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারণের কার্য্য বেশীদুর অগ্রসর হয় নাই, অল্প কয়েকটি রাজ্যে ভবিষ্যৎ জমি গ্রহণের (উত্তর প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, সৌরাষ্ট্র, দিল্লী) এবং কতিপয় রাজ্যে বর্ত্তমান জমি মালিকানার (পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, বিহার, হিমাচল প্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গ) উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই কাজ ত্বরান্বিত করা উচিত। পরিবার জোতের তিনগুণ জমিকে সাধারণতঃ এইরূপ উর্দ্ধতম সীমারূপে স্থির করা যাইতে পারে।

ক্ষুদ্র জোতের সমস্যা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত চাষের এবং ভূমি সমস্যার সমস্যা। এই সমস্যা পূর্ব্ব হইতেই অর্থনীতিবিদদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জমিকে ন্যূনতম কতখানি আয়তনের রাখিয়া দেওয়া উচিত এ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইয়াছে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ আর্থিক জোতের ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু আর্থিক জোত বলিতে কি বুঝায় এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। কীটিনজ "যুক্তিসঙ্গত স্বাচ্ছন্দ্যের" ভিত্তিতে, ডাঃ ম্যান "ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের" ভিত্তিতে এবং ষ্ট্যানলে জেভন্‌স্ "উচ্চ জীবনযাত্রার মানের" ভিত্তিতে আর্থিক জোত নির্দ্ধারণ করা উচিত বলিয়া মত দিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশন পরিবার জোত" এবং "ভিত্তি জোতের" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের "ভূমি সংস্কার আইনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড জোতের কথা বলা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ—১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের আইন পরিষদ কর্ত্তৃক এই রাজ্যের জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রণীত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী বাঙলা সালের (১৩৬২) ১লা বৈশাখ হইতে ইহা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। এই আইনে বলা হইয়াছে যে পশ্চিমবঙ্গের সকল জমিদারী স্বত্ব এবং মধ্যস্বত্ব রাজ্য সরকারের দ্বারা গৃহীত হইবে। সরকার ইহাদের মালিকানা অধিকার অর্থাৎ খাজনা সংগ্রহের অধিকার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাজ্যে অনেক লোক আছে যাহারা নামেমাত্র রায়ত, কিন্তু কাজে জমিদার। ইহাদের জমি লইবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যাহারা তাহাদের জমি বর্গাদার দিয়া চাষ করায় অথবা স্বয়ং বা পোষ্যের মারফতে চাষ না করিয়া অপরকে বন্দোবস্ত দিয়া দেয় তাহাদের জমিও সরকারের হস্তগত হইবে। রায়তগণ ২৫ একর জমি খাসে রাখিতে পারিবে, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীরাও ২৫ একর পর্য্যন্ত কৃষি

জমি এবং ২০ একর পর্য্যন্ত বাস্তুজমি ও অ-কৃষিজমি খাসে রাখিতে পারিবে। সরকার কর্ত্তৃক জমি গ্রহণের জন্য মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে; ইহা প্রদান করা হইবে জমির নীট আয় অনুযায়ী ঐ আয়ের ৩ গুণ হইতে ২০ গুণ পর্য্যন্ত।

ভূমি সংস্কার আইন—জমিদারী উচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ করিবার পর ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে একটি ভূমি সংস্কার আইন রচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা যে ব্যবস্থা হইয়াছে সেগুলি নিম্নরূপ: (১) রায়তী স্বত্ব—রায়ত তাহার জমির মালিক হইল এবং এই মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার এবং পুরুষানুক্রমে বর্ত্তাইবার অধিকার দেওয়া হইল। রায়তের উর্দ্ধতম জমির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইল বাস্তু- জমি এবং ২৫ একর অন্য জমি। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তু বাদে অন্য জমি বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন। জমি বিক্রয় করিতে গেলে সরিককে অথবা সংলগ্ন জমির মালিককে বিক্রয় করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও একটি নির্দ্দিষ্ট আয়তনের জমিকে সরকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। কোন জমিকে এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড আয়তন অপেক্ষা কমিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। (২) ভাগ চাষ—রায়তের জমি বর্গাদারের দ্বারা চাষ হইতে পাবে। রায়ত যদি চাষের উপকরণ যোগায় তাহা হইলে ফসল আধাআধি ভাগ হইবে; অন্যথায় বর্গাদার পাইবে শতকরা ৬০ ভাগ এবং রায়ত ৪০ ভাগ। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বর্গাদারের নিকট হইতে জমি ফিরাইয়া লওয়া যাইবে না। (৩) খাজনা—রায়ত মালিকরূপে গণ্য হইলেও সরকারকে খাজনা দিবে; এবং খাজনা নির্দ্ধারণের বিবেচনা জমি অনুযায়ী বিভিন্ন হইবে। তবে ধানের জমির ক্ষেত্রে খাজনার হার উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{৫}$এর এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে $\frac{১}{১০}$এর অধিক হইবে না। (৪) জোতের সংহতি সাধন ও সমবায় চাষ সমিতি—টুকরা জমিকে একত্রিত করা প্রয়োজন বোধ করিলে সরকার রায়তদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া ঐ জমি গ্রহণ কবিবেন (যদি মালিকদিগের $\frac{২}{৩}$ অংশ সম্মতি দেয়) এবং ঐগুলিকে নূতনভাবে সাজাইয়া প্রত্যেকের জমিকে এক বন্দে পরিণত করিবেন। টুকরা জমির সমস্যা সমবায় সমিতির দ্বারাও সমাধান হইতে পারে বলিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে যে পাশাপাশি জমি আছে এরূপ অন্ততঃ সাতজন রায়ত মিলিয়া সমবায় চাষ সমিতি গঠন করিতে পারে। সদস্যদের পাশাপাশি অবস্থিত জমি সমিতির জমি বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রত্যেক সদস্য তাহার জমির মূল্য অনুযায়ী সমিতির শেয়ার পাইবে। সরকার এইরূপ সমিতিকে কতিপয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবেন।

রাজ্য সরকারের অধীনে যে সকল জমি আছে ঐগুলির বিলি-ব্যবস্থা করা হইবে এবং অর্থ বিলি-ব্যবস্থার সময়ে নিজেদের জমি নষ্ট বা খুব কম জমি আছে এরূপ লোকেদের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখানো যাইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের সম্ভাবিত ফলাফল—সরকারের সহিত চাষীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, জমি সংক্রান্ত সংস্কারে সুবিধা, কৃষির যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনে সুবিধা, জমির সংহতি সাধনের অন্তরায় বিলুপ্ত হইবে, উত্তম ও অধিক চাষে সুবিধা হইবে, ক্ষতিপূরণের টাকা শিল্পে নিয়োগ হইতে পারিবে, জমির মালিকানা ছাড়াইয়া দেওয়া যাইবে।

ভূদান যজ্ঞ,—ইহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য—জমির মালিকানা পাইলে ভালো চাষের জন্য উৎসাহ আসে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ চাষীই জমির মালিক নহে, আবার অনেক চাষী আছে যাহাদের জমি থাকিলেও উহা নাম মাত্র। সমগ্র সমাজের স্বার্থে ভূমিহীন চাষীকে ভূমির স্বত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। ভূমিহীনকে এই ভূমি বণ্টন সহজ হইবে যদি জমির মালিকগণ ইচ্ছা করিয়া তাহাদের জমি দান করে। এই দান সংগ্রহের জন্য আচার্য্য বিনোবা ভাঁবে ভূদান যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির নিকট আবেদন করিয়া এবং ত্যাগের স্পৃহা জাগাইয়া ভূস্বামীদিগকে ভূমি ত্যাগ করিতে প্রণোদিত করা, ঐ ভূমি ভূমিহীনদিগকে প্রদান করা এবং ঐ ভাবে নিঃশব্দে ভূমি-ব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন সাধন করা।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমবায় আন্দোলন

The Co-operative Movement

সমবায়ের তাৎপর্য্য—Significance of Co-operation

আমাদের সামাজিক জীবনের নানাদিকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে বিচ্ছিন্ন ভাবে একজন ব্যক্তি যে কার্য্য সাধনে প্রয়াস করিলে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না, তাহা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োগ হইতে সুসম্পাদিত হওয়া সহজসাধ্য। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও ইহা সমভাবেই প্রযোজ্য। অল্প আয় বিশিষ্ট কৃষক ও শ্রমজীবিদিগের পক্ষে তাহাদিগের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বন বিশেষ উপকার দর্শায়। উৎপাদন ও ভোগ কার্য্যের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করিয়া তাহারা একাধিক কার্য্য লাভজনকভাবে সম্পন্ন করিতে পারে। পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে, উৎপাদনকারী বা ভোগকারীরূপে সাধারণ ব্যক্তি যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা করিয়া থাকে তাহাই "সমবায়". (Co-operation) নামে অভিহিত হয়। ষ্ট্রীক্‌ল্যাণ্ড বলেন "সাধু উপায় অবলম্বনের দ্বারা কোন সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিসমূহের সঙ্ঘকে সমবায় বলা হয়।"

সমবায়ের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর দুইটি বিষয় অপসারণ করে, (১) প্রতিযোগিতা এবং (২) পুঁজিপতি। কোন একটি অর্থনৈতিক ক্রিয়ায় নিযুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিলে একাধিক বিষয়ে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে তাহারা প্রত্যেকের পক্ষে ক্ষতিকর এই প্রতিযোগিতা বাদ দিয়া সকলের পক্ষে হিতকর সহযোগিতা অবলম্বন করিতে পারে। উপরন্তু পুঁজিপতি তাহাদের পুঁজির বলে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরূপে অবস্থান করিয়া সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে মুনাফা লাভ করিয়া থাকে। সমবায়ের দ্বারা সাধারণ লোকে এই মুনাফা প্রদানের বাধ্যকতা হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং পুঁজিপতিকে পরিহাস করে।

সমবায়ের মূলনীতি—Fundamental Principles of Co-operation

(১) *ঐক্য* (Unity)—অর্থনৈতিক জীবনে দুর্ব্বল কতিপয় ব্যক্তি

পরস্পরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া "একতায় বল" প্রবাদ বাক্যটির সার্থকতা উপলব্ধি করে। অল্প-আয়-বিশিষ্ট কৃষক, কারিগর বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের সহিত একতাসুত্রে বদ্ধ হইয়া মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণকে বাদ দিয়া সমবায় সমিতির মারফৎ তাহাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হয়।

(২) ***স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধতা*** (Voluntary association)—সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বাধ্যবাধকতা থাকে না; বাধ্যবাধকতার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতার মনোভাব উদ্রেক করা যায় না। সমবায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ তাহাদিগের অভিন্ন স্বার্থের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, নচেৎ সমবায় সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

(৩) ***সমষ্টিবোধ*** (Solidarity)—সমবায় সমিতির সদস্যগণ যদিও স্বার্থের প্রেরণায় সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবুও তাহাদের স্বার্থের অভিন্নতার উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক সদস্যই সকলের সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিবে কারণ উহার দ্বারাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ যথার্থভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে।

(৪) ***সান্নিধ্য*** (Proximity)—সমবেত স্বার্থ উপলব্ধির জন্য এবং ঐ উদ্দেশ্যে সম্পদে ও বিপদে সম্পূর্ণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কার্য্য করিবার জন্য সদস্যগণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য প্রত্যেক সমবায় সমিতি কোন অল্প পরিসর স্থানের কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে লইয়াই গঠিত হয়।

(৫) ***সাম্য*** (Equality)—সমবায় সমিতির ভিতরে পদমর্য্যাদা বা আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই। সকল সদস্যেরই সমান মর্য্যাদা; সমিতির পরিচালনে প্রত্যেক সদস্যই সমান অংশ গ্রহণ করে এবং সমিতি প্রত্যেক সদস্যের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষণ করে।

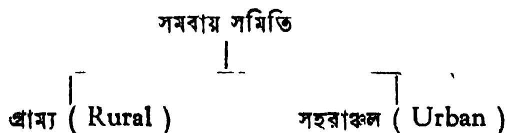
(৬) ***ব্যয় সংক্ষেপ*** (Economy)—ধনী ব্যক্তিদিগের জন্য বা বিলাসের অভাব তৃপ্তির জন্য সমবায় সমিতির স্থাপনা হয় না। দরিদ্র চাষী, কারিগর ও অন্যান্য অল্প সঙ্গতির ব্যক্তিবর্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান হইল এইরূপ সমিতির লক্ষ্য। অতএব সমিতির পরিচালনায় যতদুর সম্ভব ব্যয়-সংক্ষেপ থাকা প্রয়োজন। সমিতির পরিচালনাতেই যদি ব্যয়-বাহুল্য থাকে তাহা হইলে সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে উহা বিঘ্নস্বরূপ হইবে। উপরন্তু সমিতির মাধ্যমে ব্যয় সঙ্কোচের অভ্যাস করিয়া সদস্যগণ তাহাদিগের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যয়-সঙ্কোচের নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া লাভবান হয়।

***বিভিন্ন পর্য্যায়ের সমবায় সমিতি*—Different Types of Co-operative Societies**

জনগণের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্রিয়া একই পর্য্যায়ের নহে। সুতরাং বিভিন্ন পর্য্যায়ের অর্থনৈতিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

এই বিভিন্ন প্রকারের সমবায় সমিতিকে প্রথমত: মোটামুটি দুইটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে—গ্রাম্য (rural) এবং সহরাঞ্চল (urban)। গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা যেরূপ সমবায় সমিতি গঠিত হইতে পারে, সহর অঞ্চলের অধিবাসীরাও সেইরূপ সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে।

গ্রাম্য সমিতি (Rural Societies)—গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক, কিন্তু কৃষিজীবি নহে এরূপ ব্যক্তিও গ্রামে থাকিতে পারে যথা তাঁতী, জেলে ইত্যাদি। অতএব কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের সহায়তার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা হয়, আবার অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত গ্রামের অধিবাসীদিগের জন্যও, পৃথক পৃথক ব্যবসায় বা পেশায় সাহায্যের জন্যও, সমবায় সমিতি গঠন করা হইয়া থাকে। সুতবাং কৃষিকার্য্যের সহিত সম্পর্কিত সমবায় সমিতি আছে—এইগুলিকে বলা যাইতে পারে "কৃষি-সমিতি" (Agricultural Societies) এবং কৃষিকার্য্যের সহিত সম্পর্কিত নহে এই-রূপ গ্রাম্য সমিতিও আছে—এইগুলিকে "অ-কৃষি সমিতি" (Non-agricultural Societies) বলা যাইতে পারে। অতএব



কৃষি-সমিতি (Agricultural Societies)　　　　অ-কৃষি সমিতি (Non-Agricultural Societies)

কৃষি সমিতি (Agricultural Societies)—কৃষি সমিতি বলিতে কিন্তু মাত্র এক প্রকারেরই সমিতি বুঝায় না—কারণ কৃষকের প্রয়োজন শুধু এক প্রকারেরই নহে। তবে আমাদের দেশে কৃষকদিগের প্রধান প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে, ন্যায়সঙ্গত সুদে ঋণ গ্রহণের সুবিধার ; সেই কারণে কৃষি সমিতির অধিকাংশই হইল "ঋণদান সমিতি" (agricultural credit societies) ; কিন্তু কৃষকদের সাহায্যের জন্য ঋণদান সমিতি ব্যতীত আরও বিভিন্ন প্রকারের সমিতি আছে—এইগুলিকে "কৃষিগত অ-ঋণদান সমিতি"

(agricultural non-credit societies) পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা চলে. যথা ক্রয় সমিতি, বিক্রয় সমিতি, জলসেচ সমিতি ইত্যাদি।

কৃষি সমিতি

কৃষিগত ঋণদান সমিতি (Agricultural Credit Societies)	কৃষিগত অ-ঋণদান সমিতি (Agricultural Non-credit Societies)

অ-কৃষি সমিতি—গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা কৃষক নহে এরূপ একাধিক ব্যক্তি নিজ পেশায় সাহায্যের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে—যথা গ্রামে তাঁতী বা জেলে বা কুমোর। কৃষকদিগের ন্যায় ইহাদেরও অল্প সুদে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহাদিগের মধ্যে সমিতি গঠন হইতে পারে। এইগুলি অ-কৃষি সমিতি (কারণ এই সমিতির সদস্যগণ কৃষক নহে) কিন্তু ঋণদান সমিতি (কারণ ইহাদের উদ্দেশ্য হইল সদস্যদিগকে ঋণ প্রদান করা) ; এইগুলিকে বলা যায় "অ-কৃষি ঋণদান সমিতি" (Non-agricultural Credit Societies)। কিন্তু ঋণদান ভিন্নও অন্যান্য সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনেরও জন্য তাহারা সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে—যথা, তাঁতীরা বস্ত্র বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা জেলেরা সস্তায় জাল কিনিবার উদ্দেশ্যে। এইগুলি অ-কৃষি সমিতি এবং অ-ঋণদান সমিতি (Non-agricultural Non-credit Societies)।

অ-কৃষি সমিতি

অ-কৃষি ঋণদান সমিতি (Non-agricultural credit Societies)	অ-কৃষি অ-ঋণদান সমিতি (Non-agricultural Non-credit Societies)

সহরাঞ্চল সমিতি—সহরাঞ্চলে নিয়মিত বেতনভোগী, অথবা অল্প আয়তনের ব্যবসায়ী,—যে সকল অল্প-আয়-বিশিষ্ট লোক সহরে বাস করে—তাহারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদিগের সুবিধার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারে। এইগুলি সহরাঞ্চল সমিতি। অনেক সহরাঞ্চল সমিতি গঠিত হয় যেগুলির উদ্দেশ্য হইল সদস্যদিগকে ঋণ প্রদান করা। এইগুলি হইল "সহরাঞ্চল ঋণদান সমিতি" (Urban Credit Societies)। আবার, ঋণদান ব্যতীত অপর উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায় সমিতিও সহরাঞ্চলে থাকিতে পারে—যথা ছোট ব্যবসায়ীদিগের জন্য সস্তায় কাঁচামাল ক্রয় করা অথবা তাহাদের উৎপাদিত সামগ্রী

বিক্রয় করা।. এইগুলিকে "সহরাঞ্চল অ-ঋণদান সমিতি"র (Urban non-credit Societies) পর্য্যায়ে স্থাপন করা চলে।

সহরাঞ্চল সমিতি

সহরাঞ্চল ঋণদান সমিতি (Urban Credit Societies)

সহরাঞ্চল অ-ঋণদান সমিতি (Urban Non-credit Societies)

এক্ষণে সমগ্রভাবে সমবায় সমিতি সমূহের বিভিন্ন পর্য্যায় এইরূপে স্থাপন করা চলে :

সমবায় সমিতি

গ্রাম্য (Rural)

সহরাঞ্চল (Urban)

কৃষি সমিতি (Agricultural)

অ-কৃষি সমিতি (Non-Agricultural)

ঋণদান সমিতি (Credit Societies)

অ-ঋণদান সমিতি (Non-Credit Societies)

ঋণদান সমিতি (Credit Societies)

অ-ঋণদান সমিতি (Non-Credit Societies)

এই স্থলে একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়া প্রথমে যে সমিতিটি স্থাপন করে—যাহার উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভাবে সাহায্য করা—সেইগুলিকে বলা হয় "প্রাথমিক সমিতি" (Primary Societies)। আবার কতিপয় প্রাথমিক সমিতির সংযোগের দ্বারা উর্দ্ধতর সমিতি গঠন হয়। প্রাথমিক সমিতির উপরে এইরূপ উর্দ্ধতর সমিতি থাকিতে পারে (১) ইউনিয়ন,—গ্যারাণ্টিদাতা ইউনিয়ন বা তদারকী ইউনিয়ন ; (২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Banks)। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির উপরে একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (Provincial Co-operative Bank) গঠন হইতে পারে ; বর্ত্তমানে ইহার নাম রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। অবশ্য সকল রাজ্যেই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত নাই।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস—History of the Co-operative Movement in India

Q. Briefly trace the history of the Co-operative movement in the country (B. A. 1941, '49 ; '56).

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে, কৃষকদিগের দুরবস্থা লাঘবের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা বৈদেশিক দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিবেচনা করিবার নিমিত্ত মাদ্রাজ সরকার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ (পরে সার) ফ্রেডারিক নিকল্‌সন্‌কে ইউরোপে প্রেরণ করেন। সে সময়ে জার্ম্মাণীতে সমবায় আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল এবং মিঃ নিকল্‌সন্‌ জার্ম্মাণীতে যাইয়া তথাকার সমবায় আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তথায় "রাইফেশিন" ও "শুলজ-ডেলিজ্‌" নামক দুইব্যক্তি পৃথক রীতিতে সমবায় সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। রাইফেশিন সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন দরিদ্র কৃষকদিগের জন্য এবং শুলজ-ডেলিজ্‌ উহা স্থাপন করিয়াছিলেন অল্প সঙ্গতির ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র কারিগরদিগের জন্য। এই দুই ধরণের সমবায় সমিতির কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ নিকল্‌সন্‌ আমাদের দেশে কৃষিজীবিদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য, বিশেষ করিয়া তাহাদের ঋণগ্রস্ততা লাঘবের জন্য জার্ম্মাণীতে রাইফেশিন আদর্শে স্থাপিত সমবায় সমিতির অনুরূপ সমিতি স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। ঐ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করিবার পর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার "সমবায় ঋণদান সমিতি বিধি" (Co-operative Credit Societies Act) প্রণয়ন করেন। এই আইনের দ্বারা কেবলমাত্র প্রাথমিক ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হইল। এই আইন প্রণয়নের দুই তিন বৎসর পরেই আট শতের অধিক সমবায় সমিতি স্থাপিত হইল এবং ১৯১১-১২ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইল ৮১৭৭, ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪,০৩,৩১৮।

১৯১২ সালে ভারত সরকার আর একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন—ইহার নাম "১৯১২ সালের সমবায় সমিতি বিধি" (Co-operative Societies Act of 1912)। ইহার দ্বারা একদিকে অ-ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হইল এবং অপরদিকে প্রাথমিক সমিতির উপরে কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা হইল, যথা—ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক। ইহার পরেই ১৯১৪ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইল বারো হাজারেরও উর্দ্ধে—ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা হইল ৬০ লক্ষ এবং চল্‌তি মূলধন হইল ৫ কোটি টাকার মতন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বিধি অনুসারে সমবায়কে প্রাদেশিক শাসনের বিষয়ভুক্ত করা হইল—বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় আন্দোলনের প্রসারের জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং আইন প্রণয়ন করিতে থাকিলেন। ১৯২১-

২২ সাল হইতে ১৯২৯-৩০ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে। ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ৫৮,০০০ এবং ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার। ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন ছিল প্রায় সাড়ে ৩৬ কোটি টাকা। ১৯২৬ ও ১৯৩০ সালের মধ্যে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা দাঁড়াইল ৯৪,০০০; ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় ৩৭ লক্ষ এবং কার্য্যকরী মূলধন ছিল প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই সময়ের পরেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে মন্দা (Depression) উপস্থিত হইবার দরুণ সমবায় আন্দোলন বিশেষরূপে ব্যাহত হয়। ১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৪-৩৫ সাল—এই পাঁচ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন বিষয়ে—সমিতির সংখ্যা, সদস্যের সংখ্যা, কার্য্যকরী মূলধন ইত্যাদি—বৃদ্ধি দেখা দিলেও এই সকল বৃদ্ধির হার বিশেষ ভাবেই কমিয়া গিয়াছিল। তাহারও পরবর্ত্তী ৪ বৎসরের হিসাবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার সময় পর্য্যন্ত) সমবায় সমিতিগুলির বিভিন্ন বিষয়ে বৃদ্ধির হার অধিকতর কমিয়া গিয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঋণদান সমিতিগুলিতে দীর্ঘকাল-অনাদায়ী-ঋণের (overdue loan) পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যাহাই হউক, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে সমবায় সমিতিব সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২২ হাজার। ইহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ ৭০ হাজাব, কার্য্যকরী মূলধন ছিল একশত ছয় কোটি টাকারও অধিক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সমবায় (World War II and Co-operation)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার কিছুকাল পর হইতে ভারতেব সমবায় আন্দোলনে উহার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ঘটে। এই ফলাফলগুলির কয়েকটি ছিল বিশেষ সুফল-প্রসূ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং অব্যবহিত পরে ভারতের সমবায় আন্দোলনেব গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করা চলে :

(১) ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা তাহাদের সদস্যদিগকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। (২৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা হইতে ৫১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা)। সদস্যদিগের দ্বারা ঋণ পরিশোধের পরিমাণও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল (২৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা হইতে ৪৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা)।

(২) দীর্ঘকাল-অনাদায়ী-ঋণের (Overdue loan) পরিমাণ সমবায় ঋণদান সমিতির দৌর্ব্বল্যের প্রধানতম কারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর মধ্যে এই ঋণের পরিমাণ চৌদ্দ কোটি হইতে সাড়ে আট কোটিতে নামিয়া যায়।

অর্থাৎ বকেয়া ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(৩) ঋণদান সমিতি অপেক্ষা অ-ঋণদান সমিতিগুলির প্রসার হইয়াছিল অধিক। কৃষিসমিতিগুলি ঋণদানের সহিত সম্পর্কিত নহে এইরূপ ক্রিয়াকলাপ অধিক বর্দ্ধিত করিয়াছিল—যথা, সদস্যদিগের প্রয়োজনীয় মাল ক্রয় করা বা তাহাদের উৎপাদিত মাল বিক্রয় করা। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ সমবায় সমিতিগুলি বণ্টন কেন্দ্ররূপে কার্য্য করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে অ-ঋণদান সমিতিগুলি ১,৯২,২৬,০০০ টাকার মাল বিক্রয় এবং ১,৪৮,৫৯,০০০ টাকার মাল ক্রয় করিয়াছিল; ১৯৪৫-৪৬ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৭১,৭৮,৩১,০০০ টাকা এবং ৫৩,০৬,৪৩,০০০ টাকায় পরিণত হইয়াছিল।

(৪) ক্রেতাদিগের সমবায় সমিতি (Consumer's Co-operative Society) বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালায় এইরূপ সমিতির সংখ্যা ছিল ১৯৩৮-৩৯ সালে ৪৩, কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭২। আসাম প্রদেশে ঐ সংখ্যা ১৩ হইতে বর্দ্ধিত হইয়া দাঁড়ায় ১২৯২। অন্যান্য একাধিক প্রদেশেও এইরূপ ঘটিয়াছিল।

(৫) সমগ্রভাবে কৃষিগত সমবায় অপেক্ষা অ-কৃষিগত সমবায়ের অধিক প্রসার লাভ ঘটিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৪৫-৪৬ এই সময়ের মধ্যে কৃষিগত সমিতির (agricultural societies) সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল শতকরা সাড়ে ৩৯ ভাগ কিন্তু অ-কৃষিগত সমিতির সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল শতকরা সাড়ে ৫৩ ভাগ।

(৬) বহুমুখী সমিতির (Multipurpose Society) সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল—(অর্থাৎ যে সমিতি একাধিক কার্য্য সম্পাদন করে)। ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সমিতির সংখ্যা ছিল ২৩৩৬; ১৯৪৫-৪৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২৭৮।

বর্ত্তমানের সমবায় সমিতি—Present Co-operative Societies

নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে সমবায় সমিতিসমূহের বর্ত্তমান অবস্থা অনুধাবন করিতে পারা যাইবে:

	১৯৫৪-৫৫
সমবায় সমিতি সমূহের মোট সংখ্যা	২,১৯,২৮৮
প্রাথমিক সমিতির মোট সভ্য সংখ্যা	১,৬০,২০,৬৮১
সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধন (টাকা)	৩৯০,৫১,৬৫,৯৫৮
প্রাথমিক সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণ (,,)	১১১,১৫,১৭,৪৬৫

	১৯৫৪-৫৫
সকল প্রকার সমিতির দ্বারা অর্জিত মুনাফা (টাকা)	২,৭১,৫১,৯৪৫
রাজ্য ব্যাঙ্ক	
সংখ্যা	২৪
সভ্য সংখ্যা	৩৬,২৯৪
প্রদত্ত ঋণ (টাকা)	৫০,২৩,৮২,৪১৫
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	৪৭,৬২,৫২,৯২৭
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন	
সংখ্যা	৪৮৫
সভ্য সংখ্যা	২,৭২,০০০
প্রদত্ত ঋণ (টাকা)	৬৯,১৬,৭৮,০৩৪
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	৭৩,৬৯,৩৬,৮৪১
প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি	
সংখ্যা	১,৪৩,৩২০
সভ্য সংখ্যা	৬৫,৬৫,৪১৬
প্রদত্ত ঋণ (টাকা)	৩৫,৪৭,৬১,০২৭
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	৬২,৯২, ৯,৭২২
প্রাথমিক অ-কৃষি ঋণদান সমিতি	
সংখ্যা	৯,৩৪৮
সভ্য সংখ্যা	২৮,৪৭,৯৪৪
প্রদত্ত ঋণ (টাকা)	৬২,১১,৮৬,৫২১
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	৭৮,৩১,৬৬,৩৪৬
প্রাদেশিক (রাজ্য) অ-ঋণদান সমিতি—	
সংখ্যা	৬০
সভ্য সংখ্যা	১৫,৯০৯
প্রাপ্ত মালের মূল্য (টাকা)	৭,৪৪,৩৩,৮৩০
বিক্রীত মালের মূল্য (,,)	৭,৬৬,৫৫,৩৩৭
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	৮,৯১,০৮,৮৮০
কেন্দ্রীয় অ-ঋণদান সমিতি	
সংখ্যা	২,৫৯৯
সভ্য সংখ্যা	১৮,১১,৭৮২
প্রাপ্ত মালের মূল্য (টাকা)	৪৮,৯৭,৯২,০০৬

	১৯৫৪-৫৫
বিক্রীত মালের মূল্য (টাকা)	৫৬,৪৪,৬৬,২৭০
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	১৭,৫৫,২৪,১৯৬
প্রাথমিক কৃষি অ-ঋণদান সমিতি	
সংখ্যা	৩০,১৯৭
সভ্য সংখ্যা	২৪,৯৪,৫০৮
প্রাপ্ত মালের মূল্য (টাকা)	২৫,৮৫,৪৫,৩৯৭
বিক্রীত মালের মূল্য (,,)	২৭,০৪,৪২,২৮১
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	২০,৭২,১৪,২৭১
প্রাথমিক অ-কৃষি অ-ঋণদান সমিতি	
সংখ্যা	২৪,২৩৭
সভ্য সংখ্যা	৩১,৫০,৩৭৭
প্রাপ্ত মালেব মূল্য (টাকা)	২৯,৩৩,২৫,৫৪৯
বিক্রীত মালের মূল্য (,,)	৩১,৬৫,৫৪,৫৯৩
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	৫২,৫৪,৫৪,৬৩৪
কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক	
সংখ্যা	৯
সভ্য সংখ্যা	৬৫,৮৯৩
প্রদত্ত ঋণ (টাকা)	২,৪৩,৪৮,৫৭৬
কার্য্যকবী মূলধন (,,)	১৫,৭৮,৮১,৬৮৭
প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক	
সংখ্যা	২৯২
সভ্য সংখ্যা	২,৯০,৯৩১
প্রদত্ত ঋণ (টাকা)	১,৪৪,৭৮,৯৭৩
কার্য্যকরী মূলধন (,,)	১০,৪১,৯৭,৪২২

সমবায় ও ভারতের কৃষি—Co-operation and Indian Agriculture

Q. Examine the scope of co-operation in the field of Indian agriculture (B. A. 1932).

কৃষকদিগের ঋণগ্রস্ততা লাঘবের দ্বারা তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তই আমাদের দেশে সমবায়ের পত্তন করা হইয়াছিল। প্রথমে সমবায় সমিতি স্থাপন করা হইয়াছিল ব্যক্তিগত সুনামের উপর কৃষককে অল্প সুদে

ঋণ প্রদান করিবার জন্য,—পুরাতন ঋণ যাহাতে সে পরিশোধ করিতে পারে এবং চল্‌তি কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণও অল্প সুদে সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু অল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা চাষীর জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং উপকারী হইলেও—উহাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন নহে। কৃষকের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির জন্য বিবিধ প্রকার সমবায় সমিতি গঠন করা প্রয়োজন। কৃষককে তাহার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ সামগ্রী ক্রয় করিতে হয়—যথা বীজ, সার, চাষের যন্ত্র, এবং সাংসারিক প্রয়োজনের জন্যও বিবিধ সামগ্রী। এই সকল সামগ্রী ব্যক্তিগতভাবে খুচরা ক্রয় করিলে প্রত্যেককে অধিক দাম প্রদান করিতে হয়। এক্ষেত্রে "সমবায় ক্রয় সমিতি" (Co-operative Purchase Society) গঠন করা যাইতে পারে। এই সমিতি কৃষকদিগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাইকারী দরে ক্রয় করিবে এবং প্রত্যেককে সস্তায় উহা বিক্রয় করিতে পারিবে; কারণ মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী যে লাভ খাইত তাহা পরিহার করা যাইবে। অনুরূপভাবে "সমবায় বিক্রয় সমিতি" (Co-operative Sale Society) গঠনের দ্বারাও কৃষকগণ বিশেষ উপকৃত হইবে। বিভিন্ন কারণে, কৃষিজাত সামগ্রী বিক্রয় হইতে যে দাম পাওয়া যায় তাহার একটি মোটা অংশ ফড়ে মহাজন বা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ গ্রাস করিয়া ফেলে। সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপনের দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার বিধান কিছু পরিমাণে সম্ভব হয়। [সমবায় বিক্রয় সমিতি কৃষকের ফসল একত্রিতভাবে গুদামে রাখিতে পারে এবং যথা সময়ে যথাস্থানে ঐগুলি বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে পারে। ইতিমধ্যে কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হইলে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে যে বিক্রয় সমিতি কৃষককে তাহার গুদামজাত মালের জন্য রসিদ দিবে এবং এই রসিদের বন্ধকীতে কৃষক ঋণদান সমিতির নিকট হইতে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে; পরে ফসল বিক্রয় হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে তাহার ঋণের পরিমাণ কাটিয়া লওয়া হইবে।] যুদ্ধোত্তর কালে এই ধরণের সমবায় সমিতির বিশেষ প্রসার লাভ ঘটিয়াছে। বোম্বাই-এ তুলার ক্ষেত্রে, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে আখের ক্ষেত্রে এবং মাদ্রাজে তামাকের ক্ষেত্রে সমবায় বিক্রয় সমিতি বিশেষ অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের আখ বিক্রয় সমিতি ইহাদের মধ্যে সব থেকে বেশী উল্লেখযোগ্য। এই সমিতিগুলি আখের উৎপাদনকারীদিগকে মিল-মালিকদিগের (ইহারা আখ কিনে) জুলুম হইতে বহু পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে। কৃষকের চাষের কার্য্যে জলের গুরুত্ব কতখানি তাহার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আমাদের দেশে অনেক অঞ্চল আছে যেখানে বৃষ্টিপাত সন্তোষজনক নহে অথচ জলসেচ সমন্বিত অঞ্চলও

(Irrigated area) প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী নহে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে একজন কৃষকের পক্ষে একসঙ্গে অধিক টাকা ব্যয় করিয়া কূপ বা নলকূপ স্থাপন করিয়া বা পুষ্করিণী খনন করিয়া জলসেচ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়া উঠে না। এক্ষেত্রে "সমবায় জলসেচ সমিতি" (Co-operative Irrigation Societies) স্থাপন করিয়া কৃষকগণ জলসেচের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারে। বলদের গুণের উপরে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ বহু পরিমাণে নির্ভর করে ; সেই কারণে গো-প্রজনন সমিতির (Cattlebreeding Societies) মারফৎ কৃষকগণ বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারে। উপরন্তু বলদ আকস্মিক ভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে বা উহার মৃত্যু ঘটিলে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলি টাকা খরচা করিয়া বলদ ক্রয় করা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া উঠে না। "গো-বীমা সমিতি" (Cattle Insurance Society) স্থাপন করিয়া কৃষকগণ এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে। কৃষকদিগের স্বার্থের পক্ষে আর একটি প্রয়োজন হইল জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার (Subdivision and fragmentation of land) প্রতিকার। "সমবায় জমি সংহতি-সাধন সমিতি" (Co-operative Consolidation of Holding Society) স্থাপন করিয়া ইচ্ছামূলক ভিত্তিতে কৃষকগণ জমির সংহতি সাধনের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নয়নের নিমিত্ত "ম্যালেরিয়া নিবারক সমিতি" (Anti-malaria Society) স্থাপনের দ্বারাও কৃষকগণ উপকৃত হইবে কারণ গ্রামবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক। কৃষি-কার্য্যের উপর কৃষকের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতিফলন ঘটিবে।

বর্ত্তমানে কৃষির ক্ষেত্রে সমবায়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তাধারা আরও অনেক প্রসারিত হইয়াছে ; আরও বিভিন্ন নূতন দিক হইতে সমবায় ব্যবস্থা যাহাতে কৃষিকার্য্যের উপকার প্রদান করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। কৃষির বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং এদেশের কৃষি ব্যবস্থায় বৃহৎ পরিধির উৎপাদন সম্ভব করা যাইতে পারে যদি সমবায় চাষের (Co-operative Farming) আয়োজন করা যাইতে পারে। এই উপলব্ধি হইতে সমবায় চাষ প্রবর্ত্তনের এবং প্রসারের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করা হইতেছে (পৃষ্ঠা ১০৮ দ্রষ্টব্য) শুধু তাহাই নহে, সমবায়ের ভিত্তিতে সমগ্র গ্রামের জমির যাহাতে একত্রিতভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায় তাহার প্রয়োজনীতা এবং উপায় উদ্ভাবনের কথাও চিন্তা করা হইতেছে ; ইহাকে সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এইরূপ সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা প্রবর্ত্তনের বিশেষভাবেই সুপারিশ করা হইয়াছে (নিম্নে "সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা" দ্রষ্টব্য)।

সমবায় ও কুটীর শিল্প—Co-operation and Cottage Industries

Q. Discuss the possibilities of Co-operation in respect of our cottage industries (B. A. 1954). Describe the various ways in which Co-operation can solve the problems (of agricultural marketing) and of rural cottage industries in India. (B. Com 1952 ; B. A. 1955)

ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নের জন্ম সুসংগঠিত শিল্প সমূহের প্রসারের সহিত আমাদের কুটীরশিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। ভারতের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কুটীরশিল্পগুলিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কুটীরশিল্প সমূহের পুনরুজ্জীবনে সমবায় ব্যবস্থা বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে।

প্রথমত:, কৃষকদিগের ন্যায়, কুটীরশিল্পীদিগেরও অল্প সুদে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় করিবার জন্যই বিশেষ করিয়া এইরূপ ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কুটীরশিল্পীগণ এই ঋণ চড়া সুদে মহাজনদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং চড়া হারে সুদ প্রদান করিতেই তাহাদের আয়ের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয়িত হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণ দরিদ্র কুটীরশিল্পীদিগকে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং এই সকল কাঁচামালের দ্বারা তৈয়ারী সামগ্রী তাহারাই ক্রয় করিয়া লয় তাহাদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত দামে। এক্ষেত্রে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের দ্বারা কুটীরশিল্পীদিগকে অল্প সুদে ঋণ-প্রদানের ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগের বিশেষ সহায়তা করা হয়। ইহাতে কুটীরশিল্পের প্রসার লাভ ঘটিবে।

দ্বিতীয়ত:, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কুটীরশিল্পকে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বৃহৎ শিল্পগুলির সঙ্গতি অধিক, সেহেতু তাহারা অধিকমূল্যে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারে। উপরন্তু বৃহৎ শিল্পসমূহ একসঙ্গে অধিক পরিমাণ মাল পাইকারী দরে ক্রয় করিয়াও লাভবান হয়। কুটীরশিল্পগুলিকে এইদিক হইতে "সমবায় ক্রয় সমিতি" স্থাপন করিয়া সাহায্য করা যাইতে পারে। সমবায় ক্রয় সমিতি কুটীরশিল্পীদিগের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাইকারী দরে একসাথে অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে এবং ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীদিগের মধ্যে উহা বণ্টন করিতে পারে। ইহার দ্বারা কুটীরশিল্পীগণ ন্যায্য দরে উৎকৃষ্টগুণের কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিবে।

তৃতীয়ত:, কুটীরশিল্পীগণ তাহাদের পণ্যের বাজারের সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করিতে না পারিয়া স্থানীয় কারবারীদিগের নিকট সামগ্রী বিক্রয় করিয়া

দিতে বাধ্য হয়—দূর বাজারে ঐ সামগ্রী ক্রেতাদিগের নিকট যে দামে বিক্রয় হয় তাহা অপেক্ষা অনেক কম দামে ঐ পণ্য তাহারা বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদের আয় অল্প হয় বলিয়া তাহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। "সমবায় বিক্রয় সমিতি" স্থাপনের দ্বারা কুটীরশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী দূর বাজারে সরাসরি বিক্রয়ের আয়োজন করা যাইতে পারে। ইহাতে কুটীরশিল্পজাত সামগ্রী যে দামে ক্রেতাগণ ক্রয় করিবে, তাহার ন্যায়সঙ্গত অংশ পণ্যের উৎপাদনকারী লাভ করিতে পারিবে।

সমবায় ঋণদান সমিতি—Co-operative Credit Societies

Q. Describe the objects of the Co-operative Credit Societies in India. How far have these objects been realised in Bengal? (B. A. 1939). Describe the organisation and functions of village Co-operative Credit Society (B. Com. 1936, '39).

গ্রাম-বহুল ভারতবর্ষের চাষী এবং অল্প-আয়ের শিল্পী বা কারিগরদিগের ঋণ-গ্রস্ততার ভয়াবহ রূপ দেখিয়াই এই দেশে সর্ব্বপ্রথম সমবায় সমিতি গঠনের আয়োজন করা হইয়াছিল—সেই কারণে প্রথমে কেবলমাত্র ঋণদান সমিতিই গঠন করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অন্যান্য পর্য্যায়ের সমিতি হইয়াছে বটে, কিন্তু ঋণদান সমিতির প্রাধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঋণদান সমিতি গ্রামেও আছে—সহরাঞ্চলেও আছে, কিন্তু গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলির গুরুত্বই অধিক।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতি—আমাদের দেশে গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলি জার্ম্মাণীর রেইফিশেন (Raiffeisen) সমিতির আদর্শে গঠিত। যে কোন দশজন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোক এইরূপ একটি সমিতি গঠন করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে একই গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামের অধিবাসী হইতে হইবে। এই নিয়মটির কারণ হইল যে, এইরূপ সমিতির সদস্যদিগকে পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব পরিচিত থাকিতে হইবে। সমিতির দেনার জন্য প্রত্যেক সদস্যকে অসীম দায়বদ্ধতা (unlimited liability) বহন করিতে হয়; অর্থাৎ সমিতি যদি বাহির হইতে ঋণ করিবার পর বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দিয়াও সমিতির দায় পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম না করিলে সমবায় সমিতিগুলিকে সঙ্গতিশালী দুই-চারিজন ব্যক্তির নিকট হইতে আমানত গ্রহণের দ্বারা পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইত। উহা ব্যতীত সমিতিগুলি অপরাপর যে উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে সেগুলি হইল—সদস্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয়, সদস্যদিগের নিকট হইতে প্রবেশ ফি সংগ্রহ, সদস্যদিগের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ এবং সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ। সমিতি পরিচালনায় চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব সমিতির সদস্যের উপর

যৌথভাবে ন্যস্ত—সাধারণতঃ বাৎসরিক অধিবেশনের দ্বারা এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। বাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকে—ইহার দ্বারা সদস্যদিগের সাম্য (Equality) উপলব্ধি করা হয়।

সমিতির কার্য্য হইল মূলধন সংগ্রহ করা এবং সদস্যদিগকে ঐ মূলধন হইতে ন্যায়সঙ্গত সুদে কর্জ্জ দেওয়া। শেয়ার, প্রবেশ-ফি, আমানত ইত্যাদির দ্বারা সমিতি মূলধন সংগ্রহ করে এবং ইহা হইতে কেবলমাত্র সদস্যদিগকে ঋণ প্রদান করে। সুদের হার মহাজনের সুদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। একজন সদস্যকে যত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যাইবে তাহা সাধারণতঃ তাহার দ্বারা ক্রীত শেয়ার-মূল্যের তুলনায় স্থির করা হয়। কখন বাৎসরিক অধিবেশনে সদস্যগণ ব্যক্তিগত কর্জ্জের সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কর্জ্জ প্রদান করা হয় ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করিয়া—সম্পত্তির বন্ধকীর ভিত্তিতে নহে; তবে প্রত্যেক ঋণ-গ্রহীতার অপর দুই একজন ব্যক্তিগত জামিন থাকে। ঋণ প্রদান করা হয় সাধারণতঃ উৎপাদনশীল কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য, তবে অনুৎপাদনশীল কার্য্যের জন্যও ঋণ প্রদান না করিয়া উপায় থাকে না। সহজ কিস্তিবন্দীতে এই সকল ঋণ আদায় দেওয়া যায়। সমিতির লাভ হইতে বাৎসরিক ডিভিডেণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু লাভের এক-চতুর্থাংশ 'মজুত তহবিলে' (Reserve Fund) জমা করিতে হইবে।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতির এই উদ্দেশ্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, বলা চলে। ইহাদের মধ্যে সমবায়ের মূলনীতি সমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সমিতিগুলিকে গ্রামবাসীগণ নিছক সস্তায় ঋণ গ্রহণের প্রতিষ্ঠানরূপে দেখিয়াছে; অথচ নিছক ঋণ প্রদানের প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহাদের পরিচালনায় যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন ছিল, তাহা এই সমিতিগুলিতে ছিল না। কখন কখন ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্যের তুলনায় সদস্যদিগকে অধিক ঋণ প্রাদান করা হইত এবং উৎপাদনশীল কার্য্য অপেক্ষা অনুৎপাদনশীল কার্য্যে এই ঋণ অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইত। অনেক সময়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদিগকেই অথবা তাহাদের বন্ধুপর্য্যায়ের সদস্যদিগকে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করা হইত। এই সকল ঋণ প্রদানের এবং পরিশোধের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ছিল না। ফলে বহু অনাদায়ী ঋণ জমিয়া গিয়াছিল। বহু ক্ষেত্রে খাতাপত্রে মিথ্যা ঋণ পরিশোধ দেখান হইত—একদিকে ঋণ পরিশোধ দেখাইয়া অপরদিকে একই ব্যক্তিকে নূতন ঋণ প্রদান দেখান হইত। এই সকল কারণে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল এবং গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে ঋণদান সমিতিগুলির বকেয়া ঋণের (outstanding loan) পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ সদস্য-

দিগের নিকট হইতে পাওনা) ; ইহার মধ্যে দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের (overdueloan) পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকারও অধিক। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঋণদান সমিতিগুলির অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ সাড়ে আট কোটি টাকায় হ্রাস পাইয়াছিল।

১৯৫৪-৫৫ সালে এদেশে প্রাথমিক কৃষি সমিতি ছিল ১,৭৩,৫১৭ ; ইহার মধ্যে প্রাথমিক কৃষি-ঋণ সমিতি ছিল ১,৪৩,৩২০। ইহারা ঋণদান করিয়াছিল ৩৫,৪৭,৬১,০২৭ টাকা।

ইহার অধিকাংশই স্বল্পমেয়াদী ঋণ (short term loan)। উহার পরবর্তী বৎসরের সময় দেশের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই, তবে পরিকল্পনা কমিশন কোন কোন রাজ্যের হিসাব হইতে অনুমান করিয়াছেন যে, পরবর্তী বৎসরে কৃষি সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও কিন্তু সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি গ্রাম ঋণ ব্যবস্থায় যে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে একটি কমিটি (গরওয়ালা কমিটি) গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণী ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে কমিটি বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের কৃষক সকল সূত্র হইতে বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকা ঋণ করিয়া থাকে ; ইহার মধ্যে সমবায় সমিতিগুলি সরবরাহ করে ৩·১% ভাগ মাত্র।

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক (ইহার লক্ষ্য ও ক্রিয়া পরিসর)—Land Mortgage Bank—(Its aims and scope)

Q. Show the aim and scope of land mortgage banks in India (B. Com. 1949 ; B. A. 1940 ; '43). Give a critical account of land mortgage banks in India and indicate the sources from which they derive their funds (B. Com. 1953). Examine the utility of land mortgage in India (Delhi 1955).

সাধারণ ঋণদান সমিতিগুলির সম্পত্তি অল্প এবং ইহারা যে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে সেগুলি স্বল্প মেয়াদী (short term) ; এইরূপ অল্প সম্পত্তিশালী এবং স্বল্প মেয়াদী আমানত গ্রহণকারী ঋণদান সমিতিগুলি কৃষকদিগকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (long term loan) প্রদান করিতে পারে না। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বলিতে সেইরূপ ঋণকে বুঝায় যেগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (যথা ১৫ বা ২০ বৎসর) ধরিয়া পরিশোধ করা যাইবে—দুই এক বৎসরের মধ্যেই সেগুলি পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু কৃষকদিগের পক্ষে স্বল্প মেয়াদী ঋণ যেরূপ প্রয়োজন, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণও সেইরূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। জীবন-কৃষক-

দিগের চলতি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুবিধা থাকিলেই তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নহে। যতদিন কৃষক পুরাতন ঋণের গুরুভার হইতে মুক্ত হইতে না পারিতেছে ততদিন তাহার আর্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় অপসারিত হইতেছে না। পুরাতন ঋণ হইতে মুক্তির জন্য কৃষকের একসাথে অধিক পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন এবং এই অর্থ ঋণরূপে গ্রহণ করিলে উহা অল্প সুদে তাহাকে পাইতে হইবে এবং উহা সে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া পরিশোধ করিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বড় কথা হইল যে কৃষকের কৃষি কার্য্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নচেৎ তাহার প্রকৃত আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। কৃষিকার্য্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা কৃষকের যে আয় বর্দ্ধিত হইবে উহার মধ্যেই কৃষকের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান করিতে হইবে। জমিতে স্থায়ী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জন্য কৃষকের পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রয়োজন কারণ স্থায়ী উন্নতিমূলক কার্য্য সম্পাদন করিলে (যথা জলসেচের জন্য কূপ খনন) একসঙ্গে অনেক ব্যয় হইবে এবং কৃষক সেই পরিমাণ অর্থ ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইতে পারিবে, এক সাথে নহে। কৃষককে এই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের জন্যই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ঐ কার্য্য সম্পাদনই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের লক্ষ্য। ১৯২৮ সালে কৃষি সম্পর্কীয় রাজকীয় কমিশন (Royal Commission on Agriculture in India) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেন এবং ১৯৩০ সালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অনুসন্ধান কমিটিও (Banking Enquiry Committee, 1930) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনটি বিভিন্ন ভিত্তিতে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে—সমবায় প্রতিষ্ঠানরূপে, সাধারণ ব্যবসায়গত প্রতিষ্ঠানরূপে এবং মিশ্র প্রতিষ্ঠানরূপে, অর্থাৎ সমবায় এবং ব্যবসায়গত প্রতিষ্ঠানের সংমিশ্রণ রূপে। প্রথম পর্য্যায়টি সর্ব্বাধিক আদর্শসম্মত কিন্তু শেষ পর্য্যায়টিই হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত; কারণ বৃহৎ পরিমাণ পুঁজি এবং ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্যে আকর্ষণ করিতে না পারিলে উহারা ঠিক সফল হইবে না। প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের (State Co-operative Banks) অধীনে সংগঠিত থাকে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করে; প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলি অংশপত্র এবং ডিবেঞ্চার দ্বারাও পুঁজি সংগ্রহ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ডিবেঞ্চারগুলিতে সরকার নিশ্চয়তা (guarantee) প্রদান করেন এবং সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করিতে শুরু করিয়াছে।

আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম ১৯২০ সালে পাঞ্জাবে ঝাং নামক স্থানে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় কিন্তু জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনে যথার্থ প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৯২৯ সাল হইতে। ঐ সালে মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য উহার পূর্ব্বেই তথায় প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে বোম্বাইতে প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং উহার সহিতই প্রাদেশিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মহীশূর এবং মধ্যপ্রদেশেও জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল; আসাম এবং বাঙ্গালাদেশেও ইহাদের সংগঠন ঘটিয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে এদেশে সর্ব্বসমেত ২৯২টি প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। ইহাদের সভ্যসংখ্যা হইল ২,৯০,৯৩১ এবং কার্য্যকরী মূলধন হইল ১০,৪১,৯৭,৪২২ টাকা। ঐ সালে ইহারা সদস্যদিগকে মোট ঋণ দিয়াছে ১,৪৪,৭৮,৯৭৩ কোটি টাকা। ঐ সালের হিসাবে আমাদের দেশে নয়টি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে এবং ইহাদের সভ্যসংখ্যা হইল ৬৫,৮৯৩। ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন হইল ১৫,৭৮,৮১,৬৮৭ টাকা এবং উহাদের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হইল ২,৪৩,৪৮,৫৭৬ টাকা।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি আমাদের দেশে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। দীর্ঘকালীন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তাহারা খুব উল্লেখযোগ্য কোন অবদান দিতে পারে নাই—তাহাদের দ্বারা মোট প্রদত্ত ঋণ ৪ কোটি টাকারও কম। ইহার মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ হইল পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য—যে উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালীন ঋণ প্রদান অধিকতর কাম্য, অর্থাৎ জমির উন্নয়ন অথবা উন্নততর যন্ত্রপাতি ক্রয়, সে উদ্দেশ্যে নহে। পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কিত বিবরণীতে বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র মাদ্রাজ এবং অন্ধ্রতেই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক কিছুটা ফলপ্রদ হইয়াছে এবং বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র এবং মহীশূরে কিছু কিছু অগ্রগতি হইয়াছে। মাদ্রাজ অন্ধ্র এবং সৌরাষ্ট্রেও উৎপাদনমূলক উদ্দেশ্যে না হইয়া প্রধানতঃ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্যই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি ঋণ প্রদান করিয়াছে। ঋণ প্রদানের এই ধরণের প্রবণতা চলিতে দেওয়া উচিত নহে। সেই কারণে সম্প্রতি ভারত সরকার এই নিয়ম করিয়াছেন যে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের নিকট হইতে মোট যত পরিমাণ অর্থ পাইবেন এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ এবং ডিবেঞ্চার বাবদ প্রদান করিবেন তাহার শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ উৎপাদনমূলক কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অনুমোদিত ডিবেঞ্চারের (approved debenture) শতকরা ২০ ভাগ ক্রয় করিতে পারেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, অন্ধ্র এবং মাদ্রাজ—

এই রাজ্যগুলির জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে এই সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯ কোটি টাকার এইরূপ ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়াছেন।*

রাজ্য (প্রাদেশিক) সমবায় ব্যাঙ্ক—State (Provincial) Co-operative Banks

প্রত্যেক প্রদেশে শীর্ষ স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যাহাতে গঠন করা হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে ম্যাকলাগান কমিটি (Maclagan committee) প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক (Provincial Co-operative Banks) স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসরের পর হইতেই বিভিন্ন প্রদেশেই প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে ইহারা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (State Co-operative Banks) রূপে পরিচিত। এই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক-গুলির গঠন পদ্ধতি কিন্তু সকল রাজ্যের মধ্যেই অভিন্ন নহে। বাংলা এবং আসামে ইহারা কেবল মাত্র সমবায় সমিতির সংযোগের দ্বারা গঠিত। কিন্তু কোন কোন রাজ্যে যেমন বিহার, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ ব্যক্তি এবং সমবায় সমিতি উভয় প্রকার সদস্য লইয়াই গঠিত।

সমবায় ব্যবস্থার সংগঠনে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহারা দেশের সাধারণ টাকার বাজারের সহিত দেশের অভ্যন্তরস্থ প্রাথমিক গ্রাম্য সমিতির সংযোগ স্থাপন করে। সাধারণ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়াই তাহাদের অর্থ-সঙ্গতির আধিক্য এবং স্বল্পতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের প্রচেষ্টা করে। সাধারণতঃ এই সকল কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্য দিয়াই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতিগুলির সহিত কাজ-কারবার করিয়া থাকে; তবে আসাম এবং বোম্বাই রাজ্যে প্রাথমিক সমিতিগুলির সহিত সরাসরি কাজ-কারবার দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাকলাগান কমিটি অভিমত দিয়াছিলেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাহিরের প্রতিষ্ঠানে বাড়তি অর্থ জমা রাখা ব্যতীত প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সমবায় আন্দোলনের বাহিরের কোন কাজ-কারবারে লিপ্ত হইবে না।

ইহাদের কর্জ্জ নীতির ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে উহাদের কার্য্য কেবলমাত্র সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ নহে সেখানে ব্যক্তিগত সদস্যদিগকেও ঋণ প্রদান করা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবং প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে সুদের হারে তারতম্য করা হইয়া থাকে—কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পসুদে ঋণ পাইয়া থাকে।

---

* Report on Currency and Finance 1955-56 (Reserve Bank of India)

সাধারণতঃ এই সকল ঋণের মেয়াদ হইল এক বৎসর। বোম্বাই-তে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক দীর্ঘতম কালের জন্য ঋণ প্রদান করিয়াও থাকে; উহা প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে বাছাই করা ব্যক্তিতে বন্ধকী ঋণ প্রদান করিয়া থাকে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বাৎসরিক লাভের ২৫% রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিতে হয়।

বর্তমানে ২৪টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত আছে—ইহাদের পুঁজি হইল ৩৬ কোটি টাকা। মোটামুটি বলিতে গেলে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা ভালই বলা চলে। পুর্ব্বেকার 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির মধ্যে সমানভাবে সমবায় ব্যবস্থা প্রসারের উদ্দেশ্যে ঐ রাজ্যগুলির মধ্যেও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের বিশেষ সুপারিশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ প্রয়োজন এই কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা সমবায় ব্যবস্থাকে প্রদত্ত অর্থিক সহায়তা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইতে পারে।

সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—Co-operative Central Banks

১৯১২ সালের সমবায় সমিতি বিধি প্রণীত হইবার পর হইতেই, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে। প্রাথমিক সমিতি-গুলিকে অর্থ সরবরাহের দ্বারা সহায়তা করিবার জন্য এবং উহাদের অর্থ সঙ্গতির বাড়তি ও ঘাট্‌তির মধ্যে ভারসাম্য বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সংগঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা ব্যতীতও প্রাথমিক সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান এবং পর্য্যবেক্ষণ (supervision and inspection) করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যভুক্ত। ইহারা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কর্জ্জ প্রদান করে এবং সেই কারণেই প্রাথমিক সমিতিগুলির উপরে তত্ত্বাবধান প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ প্রমিসরি নোটের উপরে প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণ প্রদান করা হইয়া থাকে। সুদের হার সাধারণতঃ ৮% হইতে ১২%। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের বার্ষিক মুনাফার এক চতুর্থাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখিয়া দিতে হয় এবং অধিকাংশ মূল-রাষ্ট্রেই নিয়ম আছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা প্রদত্ত ডিভিডেণ্ডের হার শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইবে না। ঠিক সময়ানুযায়ী ঋণ পরিশোধ করে এইরূপ প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ রিবেট প্রদান করিয়া থাকে।

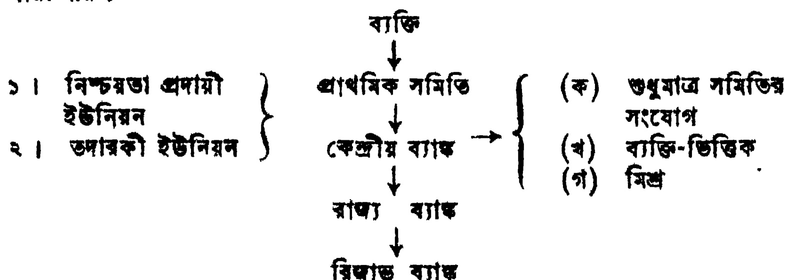
এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি তিন পর্য্যায়ের : (ক) কতিপয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে যেগুলি কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিসমূহের সংযোগের দ্বারা গঠিত। (খ) কতিপয় ব্যাঙ্ক আছে যেগুলি ব্যক্তিগত সদস্যদিগের দ্বারা গঠিত এবং প্রাথমিক সমিতি উহাতে অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহারা ব্যক্তিগত সদস্যদিগের সহিত সম-মর্য্যাদা-সম্পন্ন। (গ) কতিপয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে যেগুলিতে ব্যক্তিগত সদস্যও আছে এবং প্রাথমিক সমিতিও আছে, তবে পরিচালক সংসদে (Board of Directors) প্রাথমিক সমিতিগুলির পৃথক প্রতিনিধিত্ব এবং বিশেষ

নিয়ন্ত্রণ থাকে। এই বিভিন্ন পর্য্যায়ের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে অধিক নাই, প্রথম পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাম্য কিন্তু তৃতীয় পর্য্যায়ের ব্যাঙ্ক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত।

***ইউনিয়ন*—Unions**

সমবায় ব্যবস্থার এক পর্য্যায়ের সংগঠন হইল ইউনিয়ন (Union)। একাধিক সমিতির সংযোগেই ইউনিয়ন গঠিত হইয়া থাকে। ম্যাকলাগান কমিটির ভাষায়, "ইউনিয়ন বলিতে এরূপ একটি সংস্থা বুঝায় কেবলমাত্র প্রাথমিক সমিতিগুলিই যাহার সদস্য; একটি ইউনিয়ন গঠনকারী প্রাথমিক সমিতিগুলি প্রায় আট মাইল ব্যাসের মধ্যে অবস্থিত। ইউনিয়নের কার্য্যনীতি নির্দ্ধারণে প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতির নিজস্ব সদস্য সংখ্যার অনুপাতে ভোট-দানের ক্ষমতা থাকে।" ["A Union is a body of which the only members are primary societies within the circle of a radius averaging generally about eight miles and at the deliberations of which each member society has a number of votes proportionate to the number of its own members." Maclagan Committee] ইউনিয়ন সমূহের কার্য্য হইল (ক) প্রাথমিক সমিতিগুলিতে ঋণ প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা, এবং (খ) ঐ সমিতিগুলির কার্য্য তদারক করা। যাহারা এইরূপ তদারক করে তাহাদিগকে তদারকী ইউনিয়ন (Supervising Unions) রূপে গণ্য করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা বোম্বাইতে) ইহারা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ক্রেডিট ষ্টেটমেণ্ট রচনা করিতে সাহায্য করে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের হিসাব পরীক্ষা করে এবং সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পুনরুদ্ধারেও সাহায্য করে। কতিপয় ইউনিয়ন আছে যাহাদের কার্য্য হইল সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহের দ্বারা প্রাথমিক সমিতিগুলিকে প্রদত্ত ঋণে নিশ্চয়তা প্রদান (guarantee) করা। এই ধরণের নিশ্চয়তা প্রদায়ী ইউনিয়নগুলি বিশেষ সফল হয় নাই।

সুতরাং সমবায় সমিতি এবং ব্যাঙ্কসমূহের সংগঠন এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারা যায়:



রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সমবায় আন্দোলন—Reserve Bank and the Co-operative Movement

অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্য দিয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সমবায় আন্দোলনের কিছুটা সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধি"র ৪ নং এবং ১৭ নং ধারার অংশ-বিশেষ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যদিয়া সমবায় ব্যবস্থাকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে এই ঋণ প্রদান করে সরাসরি কর্জ্জ বা দাদন দিয়া (loans and advances) অথবা হুণ্ডি বা প্রমিসরি নোট বাট্টা করিয়া। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ধরণের কর্জ্জ দেয় অপেক্ষাকৃত কম সুদে ;—ব্যাঙ্ক রেট অপেক্ষা ১½ শতাংশ কম হারে। অবশ্য ঋণ দেওয়া হয় কতিপয় নির্দ্দিষ্ট জামিনে যথা সরকারী সিকিউরিটি বা রাজ্য ব্যাঙ্কের প্রমিসরি নোট। এই ঋণের মেয়াদ প্রথমে নয় মাস বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল, পরে উহা ১৫ মাসে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এই ধরণের ঋণ দেওয়া হয় কৃষিকার্য্যের ঋতুগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এবং কৃষিফসল বিক্রয়ে সাহায্য করিবার জন্য। এই ধরণের ঋণ **মূলতঃ স্বল্প মেয়াদী ঋণ**।

১৯৫৩ সালে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধি"র একটি সংশোধনের (Reserve Bank of India Amendment Act of 1953) দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা কিছুটা উন্নততর করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে **মাঝারি মেয়াদীর** (Medium Term Loans) ঋণ প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ; পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র অল্প মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিতে পারিত। এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে—এই নির্দ্দিষ্টকাল পনের মাসের কম এবং পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। এই সকল ঋণে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক সুদ এবং আসল সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদত্ত থাকিবে। কোন একটি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক তাহার নিজস্ব অর্থ সংস্থানের (owned funds) অধিক ঋণ পাইবে না। এইরূপ মাঝারি মেয়াদীর ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাঁচ কোটি টাকার মত সরবরাহ করিবে।

১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সংশোধনের বিধানগুলিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা করিয়াছে সাধারণতঃ তিন বৎসরের জন্য ঋণ প্রদান করা হইবে—বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘতর কালের জন্যও ঋণ দেওয়া যাইতে পারে। এই মাঝারি মেয়াদের ঋণ দেওয়া হইবে কতিপয় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তার জন্য—পতিত জমি উদ্ধার, বাঁধ নির্ম্মাণ এবং জমির অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্য্য, ছোট খাটো

সেচকার্য্য, কৃষি-সহায়ক জন্তু, যন্ত্র, যানবাহন এবং সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি। এই ঋণ প্রদান করা হইবে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা শতকরা দুভাগ কম সুদে অর্থাৎ ১২% সুদে। সাধারণতঃ যাহাতে কৃষকদিগের নিকট হইতে ৬১/৪% এর অধিক সুদ লওয়া না হয় তাহার দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

এই স্বল্প মেয়াদী ও মাঝারি মেয়াদী ঋণ ছাড়াও পরোক্ষভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রেও কিছুটা অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা করে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সমবায় ব্যবস্থাকে প্রদত্ত ঋণ প্রথম পরিকল্পনাকালে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃষিকার্য্যের মরশুমী লেনদেনের জন্য (seasonal agricultural operations) এবং ফসল বিক্রয়ের জন্ম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সস্তা সুদে (ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা ২ শতাংশ কম) রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত ঋণ ১৯৫৫-৫৬ সালে বেশ কিছুটা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ১৫টি রাজ্য ব্যাঙ্ককে ২১.২১ কোটি টাকা এই ধরণের ঋণ দেওয়া হইয়াছিল ; ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৯টি রাজ্য ব্যাঙ্ককে ২৮.১৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা সম্ভব হইয়াছে বিভিন্ন রাজ্যে সমবায়-ব্যবস্থার পুনর্গঠনে কিছুটা সাফল্যের দরুণ এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত ঋণের জন্ম রাজ্য সরকারের গ্যারাণ্টি দাঁড়াইবার প্রস্তুতির দরুণ। ইহা হইল স্বল্প মেয়াদী ঋণ (short term loan)। ১৫ মাস হইতে ৫ বৎসরের জন্ম মাঝারি মেয়াদী (medium term) ঋণও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিতে পারেন সুবিধাজনক সুদের হারে (১২ শতাংশ)। ১৯৫৪-৫৫ সালে ১.২২ কোটি টাকার এইরূপ ঋণ ৪টি রাজ্য ব্যাঙ্ককে প্রদান করা হইয়াছিল এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ৯টি রাজ্য ব্যাঙ্ককে ১.৩০ কোটি টাকার এই ধরণের ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল। দীর্ঘকালীন ঋণের ক্ষেত্রে ১৯৫৫-৫৬ সালের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দুইটি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ৯.৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়াছে।

রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন—The State and Co-operation

Q. Disscuss the part played by the state in the progress of the Co-operative movement (B. A. 1934).

আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাতেই সুরু হইয়াছিল এবং সরকারী রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থাকিয়াই ইহার প্রসার ঘটিয়াছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার যথাক্রমে ঋণদান সমিতি এবং অ-ঋণদান সমিতি (কেন্দ্রীয় সমিতি সমূহ সমেত) স্থাপনের সুযোগ

সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে "সমবায়"কে প্রদেশিক সরকারের শাসনাধীন করা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় আন্দোলনকে জাতিগঠনমূলক ব্যবস্থা গণ্য করিয়া ইহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে থাকেন। প্রত্যেক প্রদেশেই রেজিষ্ট্রার নামক সমবায় ব্যবস্থা সম্পর্কিত একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমবায় আন্দোলনের উপর সরকারী তত্বাবধান প্রাদেশিক সরকারের রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে প্রযুক্ত হইত এবং সমবায়কে একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ের মর্য্যাদা দিয়া মন্ত্রী দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে, আমাদের দেশে সরকার* নিম্নরূপ কার্য্যের দ্বারা সমবায় আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছেন :

(১) তাঁহারা নবগঠিত সমিতিকে অত্যল্প সুদে ঋণদান করিয়াছেন। সমবায় আন্দোলনের বাহিরে সরকার যে তাকাভি এবং অন্যান্য কৃষিগত ঋণ প্রদানের আয়োজন করিয়াছিলেন সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন--ইহাতে সমবায় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা অর্জ্জনে সহায়তা করা হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সমবায় ঋণদান বিধি প্রণয়নের পর তিন বৎসরের মধ্যে স্থাপিত সমিতিগুলিকে সরকার সম্পূর্ণ বিনা সুদে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

(২) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে মূলধন সংগ্রহের জন্য ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হইত, সরকার সেই সকল ডিবেঞ্চারের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে গ্যারান্টি প্রদান করিয়াছিলেন।

(৩) সমবায় আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে সরকার প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন।

(৪) সমবায় সমিতিগুলিকে ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিষ্ট্রেশন ফি প্রদানের বাধ্যকতা হইতে সরকার অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন এবং সমবায় সমিতিগুলির লাভ বা মুনাফাকেও আয়কর হইতে রেহাই দিয়াছেন।

(৫) আইনের দ্বারা সরকার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কোন একজন দেনাদার ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে তাহার সম্পত্তি হইতে অগ্রে সমবায় সমিতির ঋণ পরিশোধ করা হইবে, পরে তাহার অন্যান্য প্রাপকের (creditors) ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

(৬) প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সমবায় সমিতির প্রসারের জন্য অর্থ মঞ্জুর করিয়া থাকেন।

*এক্ষেত্রে সরকার বলিতে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, উভয়কেই বুঝাইতেছে।

(৭) সরকার সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শন (Inspection) তত্ত্বাবধান (Supervision) ও হিসাব পরীক্ষার (audit) ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

(৮) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কৃষিগত ঋণ দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল—কৃষিগত ঋণ সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দক্ষ কর্ম্মচারী সভ্য রাখিতে হইত। যে সকল প্রতিষ্ঠানকে এই কর্ম্মচারীবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক তাহাদিগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরন্তু এই দপ্তরের কার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—কৃষিগত ঋণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ সুসংবদ্ধ করা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের এবং কৃষিগত ঋণের কারবারে লিপ্ত অন্যান্য সঙ্ঘের (ইহার মধ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়) সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন করা।

মোট কথা, এদেশে সমবায় আন্দোলনের উপর সরকারের অভিভাবকত্বই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা করা হইয়া থাকে। কারণ, সমবায় আন্দোলনের মূলকথা হইল সাধারণ ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ও পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়াস। সরকার যে অনুপাতে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেন এবং বিশেষ ধরণের পক্ষপাতিত্ব প্রদান করেন সে অনুপাতে জনগণের আত্মনির্ভরশীলতার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে মনে রাখা দরকার যে আমাদের দেশে জনগণ অশিক্ষিত ও একান্তই দরিদ্র; সেক্ষেত্রে সরকারী অভিভাবকত্ব প্রায় অপরিহার্য্য। তবে দেখিতে হইবে যেন এই অভিভাবকত্ব চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় পর্য্যবসিত না থাকে এবং ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে আত্মনির্ভরশীলতা জাগরূক হয়।

সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচারের মান—Criterea of Success of Co-operative movement

Q, Estimate the measure of the success or failure of the Co-operative movement in India. (B. A. 1941, '49) Has Co-operation in India failed? Give reasons for your answer. (Delhi 1956).

সমবায় সমিতির সাফল্য বিচারের দুইটি মান নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে—সংখ্যাবাচক (Quantitative) এবং গুণবাচক (Qualitative)। আমাদের দেশে সমবায় ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল কৃষকদিগের ঋণগ্রস্ততা লাঘবের জন্য এবং ন্যায়সঙ্গত সুদে তাহাদিগকে ঋণপ্রদানের জন্য; ইহার মাধ্যমে কৃষকদিগের এবং অন্যান্য অল্প সঙ্গতিবিশিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন বিধান ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এই দিক হইতে বিচার করিলে, কতসংখ্যক সমবায় সমিতি কতসংখ্যক সদস্যের জন্য কি পরিমাণ কার্য্যকরী মূলধনের মাধ্যমে তাহাদের আর্থিক

অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টিত হইয়াছে—ইহাকে সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের মানরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে (সংখ্যাবাচক মান)। উপরন্তু অল্প-সঙ্গতি বিশিষ্ট সাধারণ ব্যক্তি কি পরিমাণে সমবায়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার দ্বারা তাহার প্রয়োজন মিটাইতে শিখিয়াছে—সাধারণ ব্যক্তির সহযোগিতার মধ্যেই আত্মনির্ভরশীলতার সন্ধান কতখানি করা হইয়াছে এবং উহার দ্বারা নিজের নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধানের জন্য সাধারণ ব্যক্তি কতখানি সচেষ্ট হইয়াছে—এই বিষয়টিকেও সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের আর একটি মানরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে (গুণবাচক মান)।

(২) ১৯৪৯-৫০ সালের হিসাবে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ১,৭৩,০০০; ইহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল এককোটি ২৬ লক্ষ এবং ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন ছিল ২৩৩ কোটি টাকা। শুধু ঋণ প্রদানের দিক হইতে দেখিলে ঐ সালে সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদিগকে ব্যক্তিগত ঋণ প্রদান করিয়াছিল প্রায় ৭০ কোটি টাকা। এই সকল সমিতির মধ্যে অধিকাংশই কৃষিগত সমিতি। কৃষিগত ***প্রাথমিক*** সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৪২,৩৯৪; ইহার মধ্যে ২৫,৮৬০ ছিল; অ-ঋণদান সমিতি (Non-credit Society) এবং অবশিষ্ট (১,১৬,৫৩৪) ছিল ঋণদান সমিতি (Credit Societies)। ১৯৫৪-৫৫ সালে কৃষিগত সমবায় সমিতির সংখ্যা হইয়াছে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার। ১৯৪৯-৫০ সাল এবং ১৯৫৪-৫৫ সাল—এই সময়ের মধ্যে সমিতিগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণ ২৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সকল সংখ্যা হইতে সমবায় আন্দোলনের সংখ্যাবাচক সাফল্য প্রমাণিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যাগুলি হইতে সমবায় সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ অভ্রান্ত ধারণা লাভ সম্ভব নহে। কারণ, প্রথমতঃ, যুদ্ধজনিত অবস্থার মধ্যে বিবিধ কারণে ৫।৬ বৎসরের ভিতরে সমবায় সমিতির সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল; ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় নিজস্ব বলিষ্ঠতার পরিচায়ক নহে। যুদ্ধের সময়ে যে অনুপাতে দেশের মোট অর্থ নৈতিক ক্রিয়া-কলাপের গতিবৃদ্ধি হইয়াছিল সেই অনুপাতে সমবায় ব্যবস্থার প্রসার লাভ ঘটে নাই। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির তুলনায় সমবায় সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধি হইয়াছিল খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে দীর্ঘকাল অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকারও উপর; বর্ত্তমানে ইহা কমিয়া গিয়াছে বটে (১৯৪৫-৪৬ সালে উহা ছিল ৮॥০ কোটি টাকা) কিন্তু তবু সময়াতিক্রান্ত অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ (overdue loans) অত্যধিক বলিতে হইবে। ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে বকেয়া ঋণের শতকরা ১৭ ভাগ হইল দীর্ঘকাল-অনাদায়ী ঋণ (overdue)। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক বৎসরে সমিতির লিকুইডেশনের সংখ্যাও

কম নহে। চতুর্থতঃ, ১৯২৬ সালের রেজিষ্ট্রারগণের কন্‌ফারেন্সে নির্দ্ধারিত একটি মান অনুযায়ী প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে তাহাদের আর্থিক কাঠামোর বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে, 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি', 'ই'—এইরূপ পাঁচটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি শ্রেণী উৎকৃষ্ট, শেষ দুইটি শ্রেণী নিকৃষ্ট এবং 'সি' শ্রেণী হইল মাঝামাঝি। ১৯৩৮-৩৯ সালের অডিট বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছিল যে সকল প্রদেশেই উৎকৃষ্ট দুইটি শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতির অনুপাত ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। যুদ্ধোত্তর কালেও দুই তিনটি প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল স্থানেই ঐ অবস্থাই থাকিয়া গিয়াছে।

সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ঋণদান সমিতিরই প্রাধান্য থাকিলেও, গ্রাম্য ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ইহারা বর্ত্তমানে যে স্থান অধিকার করে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গরওয়ালা কমিটি (১৯৫৪) হিসাব করিয়াছেন যে বৎসরে কৃষকদের মোট যে পরিমাণ কর্জ্জ প্রয়োজন হয়, সমবায় সমিতিগুলি সরবরাহ করে তাহার শতকরা ৩.১ ভাগ মাত্র।

(২) সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস যে জাগরূপ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। সমবায় আন্দোলন জনসাধারণের মধ্যে এই আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস ও স্পৃহা যদি জাগাইয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলে আমাদের দেশে সমবায় ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করিতে হইত না। সমবায় সমিতিগুলিকে সহযোগিতার শিক্ষাকেন্দ্ররূপে, পথ সন্ধানের নূতন আলোকের উৎসরূপে, গ্রহণ করা হয় নাই। ইহারা সস্তায় ঋণ গ্রহণ বা আশু কোন সুযোগ-সুবিধার কেন্দ্ররূপেই গৃহীত হইয়াছে। সাধারণ কারবারের সহিত সমবায়ের মৌলিক পার্থক্য উপলব্ধি হয় নাই।

অতএব, সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক উভয় বিচারেই, আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলনকে অসন্তোষজনক বলিতে হয়।

সমবায় আন্দোলনের অসন্তোষজনক অবস্থার কারণ—
Causes of the Unsatisfactory Condition

Q. What are the main causes of the unsatisfactory condition of the Co-operative movement ? (B. Com. 1944). What factors have been responsible for the slow progress of the movement in the country ? (B. A. 1956)

আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের এই অসাফল্যের কারণ অনেকগুলি বিষয়ের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মোটামুটি এই বিষয়গুলি নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায়:

(১) আমাদের দরিদ্র দেশে স্থাপিত সমবায় সমিতিগুলিকে যে প্রারম্ভিক

আর্থিক অসঙ্গতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল—তাহাই ঐগুলিকে বহুলাংশে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল।

(২) সমবায়ের সাফল্যের জন্য যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তাহা, গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষতার দরুণ, তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

(৩) ঐ একই কারণে সমিতি পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটিয়াছিল। সমিতির পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দক্ষতার অভাব দেখা গিয়াছিল বহুক্ষেত্রে—হিসাব রক্ষার মধ্যেও বহু গলদ ছিল।

(৪) বহু সমবায় সমিতিতে পরিচালকবৃন্দ অসাধু ও নীতি বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বেনামী কাজ-কারবার ও তহবিল তছরূপ এইগুলির অন্তর্ভুক্ত।

(৫) সদস্য নির্ব্বাচনে যথাযোগ্য বিবেচনা প্রয়োগ, সদস্যদিগের মধ্যে সমষ্টিবোধ, ঋণের আবেদন সম্পর্কে বিচক্ষণতা সহকারে পরীক্ষা, নিয়মিত পরিদর্শন এবং হিসাব পরীক্ষা—এইগুলির একান্ত অভাব ছিল।

(৬) ঋণ পরিশোধের কার্য্যে সময়ানুবর্ত্তিতা (punctuality) ছিল না। ঋণ আদায়ের জন্যও সমিতির পক্ষ হইতে যথাসময়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত না—সদস্যদিগের পক্ষ হইতেও শৈথিল্য ছিল; সেই কারণে সময়াতিক্রান্ত অনাদায়ী ঋণ স্তূপীকৃত হইয়াছিল এবং ঋণদান সমিতিগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে।

(৭) ভারতের সমবায় আন্দোলন জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধতার প্রেরণা হইতে উদ্ভূত নহে; সরকারী প্রচেষ্টায় সাধারণের উপর ইহা আরোপিত। সেই কারণে আমাদের দেশে সমবায়ের মূলভিত্তি দৃঢ় হয় নাই। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ অতিরিক্ত পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাই ইহার বলিষ্ঠ কাঠামোও তৈয়ারী হইতে পারে নাই। যে সকল কর্ম্মচারীর মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইত তাহাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব একটি গুরুতর এবং ক্ষতিকর ত্রুটি ছিল।

উন্নয়নমূলক কর্ম্মপ্রস্তাব—Suggestions for Improvement

Q. Make suggestion for improving their conditions (B. Com. 1944).

সমবায় সমিতির অবস্থা খুব সন্তোষজনক না হইলেও, চিন্তাশীল মহলে সকলেরই ধারণা যে ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা হারাইলে চলিবে না। শেষ পর্য্যন্ত সমবায় আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইবে কারণ সাধারণ লোকের জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে যে দিক দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাউক না কেন, সমবায় আন্দোলনের মধ্যে যে আদর্শ রহিয়াছে সেইখানেই গিয়া পৌঁছাইতে হইবে।

সেই কারণে সমবায় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নানারূপ কর্মপ্রস্তাব দেওয়া হইয়া থাকে :

(১) জনসাধারণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্যে সমবায়ের সাফল্যের বীজ বহুলাংশে উপ্ত রহিয়াছে। উপরন্তু সরকারের আরও অধিক প্রচারকার্য্যের মাধ্যমে সমবায়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষাপ্রাপ্ত করাইতে হইবে।

(২) সমবায় সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিতে হইবে। অডিট ও পরিদর্শন এই দুইটির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিধান করিতে হইবে, কারণ হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থার স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। সমবায় সম্পর্কিত কর্মচারীদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদানের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(৩) ঋণদান সমিতিগুলির ক্ষেত্রে যাহাতে উৎপাদনশীল কার্য্যের জন্যই চল্‌তি ঋণ প্রদান করা হয় সেইদিকে যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং একজন ব্যক্তিকে যাহাতে তাহার পরিশোধ ক্ষমতা (repaying capacity) অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয় তাহা দেখিতে হইবে। সময় অনুযায়ী সদস্যগণ যাহাতে ঋণ পরিশোধ করে, সেই দিকে সমবায় সমিতিগুলিকে বিশেষ অবহিত থাকিতে হইবে।

(৪) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য সমবায় ব্যবস্থার আওতার মধ্যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন—কারণ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুবিধা না থাকিলে বর্ত্তমান অবস্থায় স্বল্প মেয়াদী ঋণের কার্য্যকারিতা ও সার্থকতা বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

(৫) সময়াতিক্রান্ত অনাদায়ী ঋণ যেগুলি পরিশোধের আশা নাই সেগুলিকে মুছিয়া ফেলা প্রয়োজন। অন্যান্য ঋণ খাতকের পরিশোধ ক্ষমতা অনুযায়ী হ্রাস করিয়া সহজ কিস্তিবন্দিতে আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) সমিতিগুলিকে অধিক পরিমাণে রিজার্ভ ফাণ্ড গড়িয়া তুলিবার দিকে নজর রাখিতে হইবে।

(৭) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও রাজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া ইহাদিগকে নিছক অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইতে, সাধারণ তত্ত্বাবধান এবং অর্থ সরবরাহ এইরূপ উভয়বিধ কার্য্যসম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে।

(৮) অনেকের মতে, প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির ক্ষেত্রে "অসীম দায়বদ্ধতা"র (unlimited liability) স্থলে "সীমবদ্ধ দায়" প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

(৯) অনেকেই বলেন, এক উদ্দেশ্য সমিতির পরিবর্তে বহু উদ্দেশ্য সমিতি (multipurpose society) স্থাপন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ একটি সমিতি মাত্র একপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করে, ইহার পরিবর্তে এরূপ সমিতি স্থাপন করিতে হইবে যাহা একই সঙ্গে একাধিক কার্য্য সম্পাদন করিবে।

গরওয়ালা কমিটির প্রস্তাব—Suggestions of the Gorwala Committee

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা নিযুক্ত গরওয়ালা কমিটি ১৯৫৪ সালে তাঁহাদের যে বিবরণী প্রদান করিয়াছেন উহাতে সমবায় আন্দোলনের অসাফল্যই প্রকটিত হইয়াছে। সমবায় ব্যবস্থার বৃহত্তর অংশই ঋণদানের সহিত জড়িত; কিন্তু সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদিগের মোট প্রয়োজনীয় ঋণের শতকরা ৩.১ ভাগ মাত্রই সরবরাহ করিয়া থাকে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেও সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি নিতান্তই অপ্রচুর সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সমবায় সমিতির কোন বিকল্প উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা নাই বলিয়া কমিটি অভিমত দিয়াছেন এবং কৃষিঋণ সমস্যার সমাধানের জন্য সমবায় ব্যবস্থাকেই উন্নত করিতে হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কমিটি এই উদ্দেশ্যে একটি সুসংহত পরিকল্পনা (Integrated Scheme) প্রদান করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রকে উহার প্রধান অংশীদার হইতে হইবে এবং রাজ্য সমূহের মধ্যে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা আনিতে হইবে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং মোট পুঁজির শতকরা ৫১ ভাগ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের দ্বারা প্রদত্ত হইবে। রাজ্য ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের সহিত এবং বৃহত্তর প্রাথমিক সমিতিগুলির সহিত রাজ্য সরকারের অংশীদারী থাকিবে। যখনই প্রয়োজন এইরূপ অংশীদারী সম্ভব করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদত্ত হওয়া বিধেয়। এইরূপ ঋণ প্রদানের জন্য একটি জাতীয় কৃষি ঋণ তহবিল (National Agricultural Credit Fund) গঠন করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই তহবিলে প্রথমে ৫ কোটি টাকা প্রদান করিবে এবং উহার পর প্রতি বছর ঐ পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিবে। এই তহবিল হইতেই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মাঝারি মেয়াদী ঋণ এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদত্ত হইবে। সমবায় বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের উচিত সমবায় সমিতিগুলির সহিত অনুরূপ অংশীদারীতে প্রবেশ করা। উহার দ্বারা মালের গুদাম ব্যবস্থা এবং শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা উন্নত করা সম্ভব হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা—Development Plans

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত

মন্ত্রীদের এক অধিবেশনে "নিখিল ভারত গ্রাম্য ঋণ সমীক্ষার" (গরওয়ালা কমিটি) বিবরণী আলোচিত হয়। এই অধিবেশনে স্থির হয় যে রাজ্য সরকারগুলি সমবায়িক বিক্রয় ব্যবস্থা, গুদাম নির্ম্মাণ ও প্রসেসিং সম্পর্কে উন্নয়নের কর্ম্মসূচী রচনা করিবেন কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং সমবায় ঋণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্ম্মসূচী রচনা করিবেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া। এই অধিবেশনে আরও স্থির হয় যে ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রত্যেক রাজ্যে দুই তিনটি নির্দ্দিষ্ট জিলায় গ্রাম্য ঋণ সম্পর্কে একত্রিত কর্ম্মসূচী (integrated scheme) পরীক্ষামূলকভাবে কার্য্যকরী করিতে হইবে। ইহার পর রাজ্য সরকারগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য গরওয়ালা কমিটির সুপারিশ মোটামুটি গ্রথিত করিয়াই উন্নয়নের কর্ম্মসূচী রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে যে সমবায় ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ১৫০ কোটি টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ, ৫০ কোটি টাকা মাঝারি মেয়াদী ঋণ এবং ২৫ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ২য় পরিকল্পনাকালে ১০,৪০০টি বড় ঋণদান সমিতি এবং ১,৮০০টি প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি গঠন করা হইবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুদাম নির্ম্মাণ কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ৩৫০টি গুদাম নির্ম্মিত হইবে, বিক্রয় সমিতিগুলি কর্ত্তৃক ১,৫০০টি এবং বড় ঋণদান সমিতিগুলির দ্বারা ৪,০০০টি গুদাম নির্ম্মিত হইবে। এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য, সমবায় ঋণ সংস্থাগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সাহায্য প্রদান ছাড়াও, পরিকল্পনায় ৪৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য নিম্নরূপ তালিকায় প্রদর্শন করা যায়:

ঋণ—

বড় সমিতি	(সংখ্যা)	১০,৪০০
স্বল্পমেয়াদী ঋণ	(কোটি টাকা)	১৫০
মাঝারি মেয়াদী ঋণ	(,, ,,)	৫০
দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	(,, ,,)	২৫

বিপণন ও বিন্যাস-করণ

বিক্রয় সমিতি	(সংখ্যা)	১,৮০০
চিনি উৎপাদন কারখানা	(,,)	৩৫
কার্পাস পরিষ্কারের যন্ত্র	(,,)	৪৮
বিন্যাসকরণ সমিতি	(,,)	১১৮

গুদাম—

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুদাম নির্ম্মাণ কর্পোরেশনের

গুদাম	(সংখ্যা)	৬৫০
বিক্রয় সমিতির গুদাম	(,,)	১,৫০০
বৃহৎ সমিতির গুদাম	(,,)	৪,০০০

বহু উদ্দেশ্য সমিতি—Multipurpose Societies

Q. Distinguish between single purpose and multipurpose co-operative societies. Discuss the importance of multipurpose societies in our rural economy. (All. 1956).

সমবায় আন্দোলনের প্রথম হইতেই এক-উদ্দেশ্য সাধক সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে যে সকল সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ঋণ প্রদান। পরে অ-ঋণদান সমিতি, এবং প্রাথমিক সমিতির উপরে অন্যান্য সমিতি স্থাপিত হইলেও, এক একটি সমবায় সমিতি কেবলমাত্র এক একটি উদ্দেশ্য লইয়াই গঠিত থাকিত। অর্থাৎ এক উদ্দেশ্য-সাধক সমিতিই ছিল সমবায়ের সংগঠন। বর্ত্তমানে কিন্তু কেহ কেহ এক-উদ্দেশ্য সমিতির পরিবর্ত্তে বহু-উদ্দেশ্য সমিতি (multipurpose society) স্থাপন সমবায়ের উদ্দেশ্য উপলব্ধিতে অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়া থাকেন। ১৯৩৭ সালে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "কৃষি ঋণ দপ্তর" কর্ত্তৃক "গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্ক" নামে প্রকাশিত পুস্তিকায় বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল ; ইহার পর হইতে এ সম্পর্কে আলোচনা বাস্তব গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। উহার ঠিক দশ বৎসর পরে "সমবায় পরিকল্পনা কমিটি" তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণীতে বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা কমিটি বলিলেন, "এ যাবৎ সমবায় সমিতিসমূহের ক্রিয়া-কলাপ প্রধানতঃ ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ আছে। কিন্তু কৃষক জীবনের একটি মাত্র দিক ঋণ সরবরাহ স্পর্শ করিয়া থাকে। তাহার জীবনের সকল দিক সমগ্রভাবে বিবেচনা করাই হইল যথোচিত পদ্ধতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি যদি বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন করে তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইবে।" কমিটি সুপারিশ করিলেন, প্রাথমিক ঋণদান সমিতির সংস্কার ও পুনর্গঠন করিয়া ঐগুলিকে সদস্যদিগের সর্ব্বতোমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রস্থলে পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। এই সমিতিগুলি ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিবে, ফসল বিক্রয় এজেন্টরূপে কার্য্য করিবে, কৃষককে বীজ, সার, কৃষিযন্ত্র এবং সাধারণ ভোগসামগ্রী সরবরাহ করিবে, নিকটবর্ত্তী ডেয়ারীর জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্ররূপে কার্য্য করিবে, যৌথ ব্যবহারের জন্য কৃষিযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য করিবে এবং সদস্যদিগের জন্য পার্শ্বজীবিকার (subsidiary occupations) ব্যবস্থা

করিবে। পরিকল্পনা কমিটি অভিমত দিলেন যে এইরূপ বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতির প্রস্তুত হওয়া উচিত।

বহু উদ্দেশ্যমূলক সমিতি স্থাপনের পক্ষে নানারূপ সুযুক্তি প্রদান করা চলে। প্রথমতঃ, এইরূপ সমিতি বিশেষভাবেই ব্যয় সঙ্কোচমূলক হইবে। এক একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথক পৃথক সমিতি স্থাপিত হইলে উহাদের পরিচালনার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। বিভিন্ন সমিতির কার্য্যের একত্রীকরণের দ্বারা যে ব্যয় সঙ্কোচ সাধিত হইবে উহা দ্বারা গ্রাম্য সমিতিগুলি বেতন প্রদান করিয়া দক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, একটি গ্রামের মধ্যে সমিতি পরিচালনা করিতে পারে এইরূপ দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা অল্পই। সুতরাং একাধিক সমিতি গঠিত হইলে উহাদের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য পরিচালক পাওয়া সম্ভব নহে। আর যদি কতিপয় অভিন্ন ব্যক্তি পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক সমিতির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে তাহা হইলে সমিতিগুলির একত্রীকরণের দ্বারা পরিচালনার একত্রীকরণ ঘটিবে—উহাতে সময় ও উদ্যমের অপব্যয় নিবারিত হইয়া অধিকতর দক্ষ পরিচালনা ঘটিবে। তৃতীয়তঃ, বহু উদ্দেশ্য সমিতি থাকিলে সমবায়ের উদ্দেশ্য যে সদস্যদিগের সর্ব্বাঙ্গীন অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধন করা—ইহা উপলব্ধি করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজ হইবে। সমবায় সমিতির প্রতি তাহারা অধিকতর আকর্ষণ বোধ করিবে। জনগণের আনুগত্যে সমবায় ব্যবস্থা অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করিবে। চতুর্থতঃ, বহুউদ্দেশ্য সমিতি অধিকতর সঙ্গতি এবং অধিকতর দক্ষ পরিচালনা বিশিষ্ট হইলে, উহার পক্ষে সাধারণ উন্নয়নমূলক কার্য্যে যথা স্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা প্রসার ইত্যাদি অর্থব্যয় করা সম্ভব হইবে। পঞ্চমতঃ, বহু উদ্দেশ্য সমিতি থাকিলে এক ধরণের সমিতির সুকার্য্যের ফলাফল অন্য ধরণের সমিতির অনুপস্থিতির দরুণ তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যথা গ্রামে যদি কেবলমাত্র ঋণদাণ সমিতিই থাকে, তাহা হইলে উহা কৃষককে যেটুকু উপকার প্রদান করিবে, অন্য সমিতির অভাবে কৃষক সে উপকারের পরিপূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিবে না। একই সমিতি বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিলে উহাদের কার্য্যের মধ্যে যথাযোগ্য সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়।

বহু উদ্দেশ্য সমিতির বিপক্ষেও একাধিক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, একই সমিতি বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে কোন দায়িত্বই যথাযথভাবে পালন করা হইয়া উঠিবে না। সমগ্র সমবায় ব্যবস্থায় অসাফল্যের সম্ভাবনা হইবে অধিক। দ্বিতীয়তঃ, পৃথক পৃথক ভাবে সমিতি গঠন করিলে, উহাদের পরিচালনা প্রক্রিয়া সরল হইবে। উহাদের পরিচালনা পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করা সরল গ্রামবাসীদিগের পক্ষে সম্ভব হইবে। তৃতীয়তঃ, একটি সমিতি যদি অধিকতর দক্ষতা সহকারে পরিচালিত

হয় এবং অল্প সমিতি যদি দক্ষতা সহকারে পরিচালিত নাও হয় তাহা হইলেও গ্রামবাসীগণ কিছুটা উপকার লাভ করিতে পারিবে। চতুর্থতঃ, বহু উদ্দেশ্য সমিতির ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক ফলাফল থাকিবে এবং উহার জন্ত "সসীম দায়বদ্ধতা"র (limited liability) প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু সমিতির বাহির হইতে অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে এবং সদস্যদিগের ঝুঁকি হ্রাস পাইবার দরুণ, তাহাদের মধ্যে শৈথিল্য আসিতে পারে।

এই সকল ত্রুটি থাকিলেও কোন কোন মহলে বহু উদ্দেশ্য সমিতিগুলির স্বপক্ষে বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৮-৫০ সালের সমবায় আন্দোলন প্রসার সম্পর্কিত বিবরণীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলিয়াছেন: "সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পর্য্যায়ের সমবায়ীগণ এক উদ্দেশ্য সমিতির সীমাবদ্ধ উপযোগিতা সম্পর্কে ক্রমশঃই অবহিত হইতেছেন এবং গত কয়েক বৎসর যাবত ঋণদান সমিতিগুলির স্থলে বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপিত হইতেছে। একাধিক মূলরাষ্ট্র নুতন করিয়া বহু উদ্দেশ্য সমিতি সংগঠনের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে, অন্ততঃ বর্ত্তমান ঋণদান সমিতিগুলিকে প্রারম্ভ স্বরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের ভার অর্পণ করিয়া তাহাদের কার্য্যপরিসর বিস্তৃত করিতে শুরু করিয়াছে। বহু উদ্দেশ্য সমিতি সম্পর্কে ধারণা এইভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এইরূপ সমিতি ক্রমশঃই অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে এইরূপ সমিতির সংখ্যা বাঙ্গালায় ছিল ১,১৬২, বিহারে ৮৫৩, মধ্যপ্রদেশে ১৭২, যুক্তপ্রদেশে ১৮০০০, এবং বোম্বাইয়ে ৬৫৫। মাদ্রাজে ১৯৫০ সালে এইরূপ সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় এক হাজার।

সারাংশ

সমবায়ের তাৎপর্য্য ও মূলনীতি—সাধু উপায় অবলম্বনের দ্বারা কোন সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিসমূহের সম্বন্ধকে সমবায় বলা হয়। ইহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পুঁজিপতির আধিপত্য এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষতি পরিহার করে। ইহার দ্বারা তাহারা শোষণ এবং অপচয় প্রতিরোধ করে। এই সম্বন্ধতা উৎপাদনমূলক এবং ভোগকার্য্য-মূলক—উভয়প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে।

সমবায় ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একপ্রকার সংগঠন—অর্থাৎ এক ধরণের কারবার সংগঠন। কিন্তু সাধারণ কারবার সংগঠন (business organisation) ইহার মৌলিক পার্থক্য আছে, কারণ সমবায় ব্যবস্থার কতিপয় মূলনীতি আছে। এইগুলি হইল (১) ঐক্য—দুর্বল ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধতার দ্বারা শক্তি অর্জন; (২) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধতা—অভিন্ন স্বার্থের প্রেরণায় কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইবে; (৩) সমষ্টিবোধ—প্রত্যেকে সমষ্টিগত স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ থাকিবে; (৪) সান্নিধ্য—অল্প পরিসরের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি লইয়া ইহা গঠিত থাকিবে; (৫) সাম্য—সমিতির সদস্যদের মধ্যে কোন উচ্চনীচ ভেদাভেদ থাকিবে না; এবং (৬) ব্যয় সংক্ষেপ—সমবায় ব্যবস্থা অল্প সঙ্গতির লোকের কারবার, সুতরাং ইহার পরিচালনায় ব্যয় বাহুল্য থাকিবে না।

বিভিন্ন পর্য্যায়ের সমবায় সমিতি—সমবায় সমিতিগুলিকে প্রথমতঃ গ্রাম্য এবং সহরাঞ্চল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। গ্রাম্য সমিতিগুলির কতকগুলি কৃষি সংক্রান্ত (কৃষি সমিতি) এবং কতকগুলি কৃষি-সংক্রান্ত নহে (অ-কৃষি সমিতি)। কৃষি সমিতির মধ্যে ঋণ প্রদানের সমিতি আছে (ঋণদান সমিতি), আবার ঋণদান করেনা এরূপ সমিতিও আছে (অ-ঋণদান সমিতি)। অ-কৃষি সমিতির মধ্যেও অনুরূপভাবে ঋণদান সমিতি আছে আবার অ-ঋণদান সমিতি আছে।

সহরাঞ্চল সমিতিগুলিকে ঋণদান সমিতি এবং অ-ঋণদান সমিতি এই দুই-ভাগে ভাগ করা যায়।

আবার গঠন প্রণালীর দিক হইতে সর্ব্বনিম্ন স্তরে আছে প্রাথমিক সমিতি, তাহার উপরে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, মধ্যে ইউনিয়ন থাকিতে পারে, এবং একটি রাজ্যের সমস্ত সমবায় ব্যবস্থার শীর্ষ দেশে আছে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস—১৮৯৫ সালে মিঃ নিকলসনকে জার্ম্মাণীর সমবায় আন্দোলন পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাইফেসিল আদর্শে সমবায় সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন। ১৯০৪ সালে কেবলমাত্র প্রাথমিক ঋণদান সমিতি স্থাপনের আয়োজন করিয়া একটি আইন প্রণীত হয়। ১৯১১-১২ সালে নাগাদ ৮১৭৭টি এইরূপ সমিতি স্থাপিত হইয়া গেল। ১৯১২ সালের আর একটি আইনের দ্বারা প্রাথমিক সমিতির উপরকার সংগঠন এবং অ-ঋণদান সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। ১৯১৪ সাল নাগাদ প্রাথমিক সমিতির সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইল ১২ হাজারেরও উর্দ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এবং ১৯২৯-৩০ সালের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লাভ ঘটে। ১৯৩০-৩১ এবং

৩৪-৩৫ সাল দুইটির মধ্যে সম্প্রসারণের গতি কমিয়া গিয়াছিল। তাহার পর দ্বিতীয় যুদ্ধ সুরু হওয়া পর্য্যন্ত অগ্রগতি আরও মন্থর হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সমবায়—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সমবায় আন্দোলনের উপর কতকগুলি ফলাফল ঘটিয়াছিল : (১) সদস্যদিগকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছিল ; (২) বকেয়া ঋণ পরিশোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; (৩) অ-ঋণদান সমিতির প্রসার হইল ; (৪) ক্রেতাদিগের সমবায় সমিতির প্রসার হইল (৫) অ-কৃষিগত সমবায়ের অধিক প্রসার হইল (৬) বহুমুখী সমিতির সংখ্যা বাড়িল ।

বর্ত্তমানের সমবায় সমিতি—১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে এদেশে সকল প্রকার সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,১৯,২৮৮। ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন হইল ৩৯০,৫১,৬৫,৯৫৮ টাকা এবং ইহারা ১৯৫৪-৫৫ সালে ২,৭১,৫১,৯৪৫ টাকা মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছে। মোট সমিতিগুলির মধ্যে রাজ্য ব্যাঙ্ক আছে ২৪টি, (রাজ্য পুনর্গঠনের পূর্ব্বেকার হিসাব) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন আছে ৪৮৫টি, প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি আছে ১,৪৩,৩২০টি, প্রাথমিক অ-কৃষি ঋণদান সমিতি আছে ৯,৩৪৮টি, রাজ্য অ-ঋণদান সমিতি ৬০টি, কেন্দ্রীয় অ-ঋণদান সমিতি ২,৫৯৯টি, প্রাথমিক কৃষি অ-ঋণদান সমিতি ৩০,১৯৭টি, প্রাথমিক অ-কৃষি অ-ঋণদান সমিতি ২৪,২৩৭টি, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ৯টি এবং প্রাথমিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ২৯২টি।

সমবায় ও ভারতের কৃষি—ভারতের কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে সমবায়ের উপকারিতা অনেক। প্রথমতঃ, চাষীদের সহজে ঋণ প্রাপ্তির জন্যই এদেশে সমবায় সমিতির পত্তন হইয়াছিল ; ইহা অল্প সুদে ঋণ প্রদান করিয়া কৃষকের সুবিধা সৃষ্টিতে এবং চাষের উন্নতিতে প্রভুত সহায়তা করিতে পারে। ইহা ছাড়াও, সমবায় ক্রয় সমিতি কৃষকের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্তায় ক্রয় করিয়া দিতে পারে, সমবায় বিক্রয় সমিতির মারফৎ কৃষকগণ তাহাদের ফসল ন্যায্য দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারে। এই সমিতির মাধ্যমে ফসল গুদামজাত করণের ব্যবস্থা থাকিলে উহার জামিনেও চাষী ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। সমবায় জলসেচ সমিতি স্থাপনের দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা হইতে পারে। সমবায়ের ভিত্তিতে গো-প্রজনন সমিতি স্থাপিত হইতে পারে। গো-বীমা সমিতি স্থাপনের দ্বারাও দরিদ্র কৃষকগণ উপকৃত হয়। সমবায় জমি সংহতি সমিতির উপকার সহজেই অনুমেয়। "ম্যালেরিয়া নিবারক সমিতির" দ্বারাও কৃষকগণ উপকৃত হয়। তবে বর্ত্তমানে সমবায় চাষ, এমন কি সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়াও কৃষির ক্ষেত্রে এবং সমগ্রভাবে গ্রাম-জীবনে সমবায় ব্যবস্থার সম্ভাবনা উপলব্ধির কথা চিন্তা করা হইতেছে।

সমবায় ও কুটির শিল্প—এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্পের প্রসার একান্তই প্রয়োজন। কুটির শিল্পের প্রসারে সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে : প্রথমতঃ, কুটির শিল্পের কর্মীদিগকে সস্তায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি উপকার দিবে—এইরূপ ঋণপ্রাপ্তি একান্তই প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, সমবায় ক্রয় সমিতি এইরূপ শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সস্তায় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, সমবায় বিক্রয় সমিতি উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। ইহাতে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর শোষণ হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে।

সমবায় ঋণদান সমিতি—প্রথমে এদেশে সমবায় ঋণদান সমিতিই গঠন করা হইয়াছিল ; এইগুলি জার্ম্মাণীর রেইফেসিন সমিতির আদর্শে গঠিত। কম পক্ষে ১০ জন ব্যক্তি লইয়া এইরূপ সমিতি গঠিত হইতে পারে ; সদস্যদের দায় সীমাবদ্ধ। সমিতিগুলি পুঁজি সংগ্রহ করে সদস্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া, উহাদের নিকট হইতে প্রবেশ ফি ও আমানত লইয়া, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া এবং বাহিরের লোকের নিকট হইতেও আমানত লইয়া। এইভাবে সংগৃহীত মূলধন হইতে সদস্যদিগকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। সাধারণতঃ কোন বন্ধকী না রাখিয়া, তবে দুইজন সহকর্মীর জামিনে, উৎপাদনশীল কার্য্যের জন্য (কখনও কখনও অনুৎপাদনশীল কার্য্যের জন্যও) এই ঋণ প্রদত্ত হয়। সুদ আদায়ের দ্বারা সমিতির যে লাভ হয় তাহা সদস্যদের মধ্যেই বণ্টিত হয়। এই ঋণদান সমিতিগুলি বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করে নাই ; ইহাদের পরিচালনা ভাল নহে, বাজে ব্যয়ের ঋণ বেশী, অনাদায়ী ঋণ জমিয়া গিয়াছিল। গরওয়ালা কমিটির হিসাবে মোট কৃষি ঋণের শতকরা ৩·১ ভাগ মাত্র সমবায় সমিতিগুলি সরবরাহ করে।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক—কৃষকের যেমন স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রয়োজন সেইরূপ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণও প্রয়োজন। পুরাতন ঋণ এককালীন পরিশোধের জন্য এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত জমিতে স্থায়ী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করিবার জন্য দীর্ঘকালীন ঋণের প্রয়োজন হয়—যে ঋণ ১৫।২০ বৎসর ধরিয়া পরিশোধ করা যাইবে। এই ধরণের ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। গঠন পদ্ধতি অনুযায়ী ইহা তিন প্রকারের হইতে পারে—সমবায় প্রতিষ্ঠান, সাধারণ ব্যবসায়গত প্রতিষ্ঠান ও মিশ্র প্রতিষ্ঠান। ১৯২৯ সাল হইতেই এদেশে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের যথার্থ চেষ্টা শুরু হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালের হিসাবে এদেশে ২৯১টি প্রাথমিক এবং ৯টি কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে। ইহারা যথাক্রমে ঋণ দিয়াছে ১ কোটি ৪১ লক্ষ এবং ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। মোটামুটিভাবে ইহারা বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই ; মাদ্রাজ এবং

অন্ধ্রতেই জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক কিছুটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক্ষণে এই ব্যাঙ্কগুলিকে আংশিকভাবে পুঁজি সরবরাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক—ম্যাকলাগান কমিটি (১৯১৪) প্রত্যেক প্রদেশে শীর্ষস্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী প্রাদেশিক (বর্ত্তমানে, রাজ্য) সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু সকল রাজ্যে ইহাদের গঠন পদ্ধতি একই রূপ নহে; কোথাও ইহা নিছক সমবায় সমিতির সংযোগে (বাংলা) এবং কোথাও সমবায় সমিতি ও সাধারণ ব্যক্তি উভয়েরই সংযোগে (বিহার) গঠিত। এই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মধ্য দিয়া এবং কোথাও কোথাও প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সহিত সরাসরিভাবে কারবার করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের মেয়াদ এক বৎসর, তবে বোম্বাইতে দীর্ঘকালীন ঋণের ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে ২৪টি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক আছে, ইহাদের পুঁজি ৪৭২ কোটি টাকা।

সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—১৯১২ সালের পর হইতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে থাকে। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কর্জ্জ প্রদান করা এবং তত্ত্বাবধান ও পর্য্যবেক্ষণ (supervision and inspection) করা। ইহার প্রাথমিক সমিতিকে ঋণ দেয় প্রমিসরি নোট, ৮ হইতে ১২ শতাংশ সুদে। এই ব্যাঙ্ক তিন প্রকারের (ক) শুধুমাত্র প্রাথমিক সমিতির সংযোগে; (খ) ব্যক্তিগত সদস্য এবং প্রাথমিক সমিতির সংযোগে কিন্তু সমিতিকে কোন বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় না; (গ) 'খ'-এর মতন কিন্তু সমিতিকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন—প্রাথমিক সমিতির সংযোগে ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইহাদের কার্য্য হইল প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণ সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া, উহাদের কার্য্য তদারক করা এবং কখনও কখনও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রাথমিক সমিতিগুলিকে প্রদত্ত ঋণে নিশ্চয়তা প্রদান করা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সমবায় আন্দোলন—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া সমবায় ব্যবস্থাকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা করা হয় তিন প্রকারের ঋণের আকারে: (১) স্বল্প মেয়াদী ঋণ (যাহার মেয়াদ ন' মাস হইতে ১৫ মাসের মধ্যে); (২) মাঝারি মেয়াদী ঋণ (১৫ মাস হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে); এবং (৩) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া)। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করেন ব্যাঙ্ক-রেট অপেক্ষা কম সুদে এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ককে অর্থ সরবরাহ করে উহাদের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া।

রাষ্ট্র ও সমবায় আন্দোলন—রাষ্ট্রের উদ্যোগেই এদেশে সমবায় আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৯০৪ এবং ১৯১২ সালের আইনে প্রথমে ঋণদান সমিতি ও পরে অন্যান্য ধরণের সংগঠন স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক সরকারের রেজিষ্ট্রারের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান প্রযুক্ত হয়। নির্দ্দিষ্টভাবে সরকার নিম্নরূপ সহায়তা দিয়াছেন: (১) ঋণদান সমিতিগুলিকে অল্প সুদে অর্থ দিয়াছেন; (২) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চারে নিশ্চয়তা দিয়াছেন; (৩) প্রচারকার্য্য করিয়াছেন; (৪) ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিষ্ট্রেশন ফি ও আয়কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন; (৫) খাতকের উপর সমবায় সমিতির অগ্রদাবি দিয়াছেন; (৬) সমবায় সমিতির প্রসারের জন্য অর্থ মঞ্জুর করেন; (৭) পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন; (৮) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ দপ্তর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। সরকারের এই অভিভাবকত্ব কিন্তু স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

সাফল্য বিচারের মান—সমবায় আন্দোলনের সাফল্য বিচারের দুইটি মান নির্দ্ধারিত হইতে পারে: সংখ্যাবাচক ও গুণবাচক। "সংখ্যাবাচক" হইল পরিসংখ্যার হিসাব ও "গুণবাচক" হইল আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধির হিসাব। সংখ্যাবাচক হিসাবে দেখা যায় ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবে এখানে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,১৯,২৮৮; প্রাথমিক সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষের উপর; শুধু কৃষিগত ঋণদান সমিতির সংখ্যা ১,৪৩,৩২০ এবং ইহাদের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ প্রায় ৩৫½ কোটি টাকা। কিন্তু পরিসংখ্যাগত এই হিসাব প্রকৃত অবস্থার পরিচয় দেয় না। কারণ (১) যুদ্ধজনিত অবস্থায় কৃত্রিম উন্নতি হইয়াছিল; (২) অনাদায়ী বকেয়া ঋণ প্রচুর; (৩) লিকুইডেশন অনেক; (৪) নিকৃষ্ট সমিতির সংখ্যাই বেশী।

গুণবাচক মান হইল আত্মনির্ভরশীলতার অভ্যাস যতখানি জাগিয়াছে তাহার বিচার। এই বিচারেও সমবায় ব্যবস্থা উৎরাইতে পারে না।

অসন্তোষজনক অবস্থার কারণ—অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য একাধিক কারণ দায়ী:—(১) প্রাথমিক আর্থিক অসুবিধা, (২) শিক্ষার অভাবে উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, (৩) যোগ্য পরিচালকের অভাব, (৪) দুর্নীতির ও অসাধুতার প্রাবল্য, (৫) বিচক্ষণতার অভাব, নিয়মিত পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষার অভাব, (৬) সময়ানুবর্ত্তিতার অভাব, (৭) সরকারী অভিভাবকত্ব কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের দক্ষতার অভাব।

উন্নয়নমূলক কর্ম্মপ্রস্তাব—(১) সমবায়ের তাৎপর্য্য প্রচার করিতে হইবে, (২) সমবায় সমিতিগুলির তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি এবং উহার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের উন্নত শিক্ষা প্রদান প্রয়োজন, (৩) উৎপাদনশীল কার্য্যে ঋণের প্রয়োগ ও সদস্যের পরিশোধ ক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করিতে

হইবে, (৪) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রসার করিতে হইবে, (৫) অনাদায়ী ঋণের একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৬) রিজার্ভ ফাণ্ডের দিকে নজর দিতে হইবে, (৭) সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও রাজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে, (৮) "সীমাবদ্ধ দায়" প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, (৯) বহু উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপনেও উপকার হইবে।

গরওয়ালা কমিটির প্রস্তাব—সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য গরওয়ালা কমিটি "গ্রাম্য ঋণের একত্রিত পরিকল্পনা" (integrated scheme of rural credit) নামে একটি কর্ম্মপ্রস্তাব প্রদান করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হইল সমবায় ব্যবস্থার বিভিন্ন সংগঠনের স্তরে রাষ্ট্রের প্রধান অংশীদারি। রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা সম্পাদিত এইরূপ অংশীদারির সহিত আরও থাকিবে সরকারগুলির সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধিকতর সহযোগিতা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত বেশ উপযুক্ত পরিমানে অর্থ সাহায্য।

বহু উদ্দেশ্য সমিতি—বর্ত্তমানে অনেকেই বহু-উদ্দেশ্য সমিতি স্থাপনের পক্ষে অভিমত দেন। বহু-উদ্দেশ্য সমিতি বলিতে এরূপ একটি সমিতি বুঝায় যাহা একই সঙ্গে অনেকগুলি কার্য্য করে। এইরূপ সমিতির সুবিধা হইল: (১) ইহাতে খরচা কম পড়ে, (২) অনেকগুলি সমিতি চালাইবার মতন দক্ষ ব্যক্তি নাই; সুতরাং একটিই সমিতি অনেক রকম কার্য্য করে তাহাই ভালো, (৩) এইরূপ সমিতি সাধারণ ব্যক্তিকে সহজেই সমবায়ের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করাইবে; (৪) সাধারণ উন্নয়নমূলক সম্ভব হইবে, (৫) এক ধরণের সমিতির কাজ অন্য ধরণের সমিতির অভাবে ব্যর্থ হইবে না।

ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি হইলে, (১) একটি মাত্র সমিতি এত বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না; (২) অজ্ঞ গ্রামবাসীদের পক্ষে পরিচালনাপদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হইবে, (৩) পৃথক সমিতির কোনটি যদি ভালো না চলে, অন্য কোনটি হয়তো কিছুটা উপকার দিতে পারিবে, (৪) বহু-উদ্দেশ্য সমিতিতে সসীম দায়বদ্ধতা প্রয়োজন হইবে। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও বহু-উদ্দেশ্য সমিতি ক্রমশঃই জনপ্রিয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

উন্নয়ন কর্ম্মসূচী—গরওয়ালা কমিটির সুপারিশ মোটামুটি গ্রথিত করিয়াই উন্নয়নের কর্ম্মসূচী রচিত হইয়াছে। ২য় পরিকল্পনায় সমবায় ব্যবস্থার মধ্য দিয়া বিভিন্ন ঋণ দেওয়া হইবে ২২৫ কোটি টাকা, বিক্রয় ও বড় ঋণদান সমিতি স্থাপিত হইবে ৩,২০০টি, এবং ৫,৮৫০টি গুদাম (warehouse) নির্ম্মিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কুটির শিল্প

Cottage Industries

General question : Is it desirable and feasible to keep our cottage industries alive side by side with our growing large scale factories ? (B. A. 1942). Analyse the problem of small scale and cottage industries.

কুটির শিল্প—Cottage Industries

স্বল্প পরিধিতে সামগ্রী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা উৎপাদকের গৃহে অথবা গৃহের নিকটে গ্রামের অভ্যন্তরেই করা হইয়া থাকে তাহাকেই বলা হয় কুটির শিল্প। এ ক্ষেত্রে রাশী পরিমাণে পণ্য উৎপাদন হয় না—উৎপাদন ব্যবস্থা হইল স্বল্প পরিধির (small scale), অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ হয় শুধুমাত্র সেইরূপ যাহা শিল্পী তাহার নিজস্ব শ্রমে এবং পরিজনবর্গের সাহায্যে ও সামান্য ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উৎপাদন করিতে পারে। শিল্পী হইল অধিকাংশক্ষেত্রেই স্বাধীন উৎপাদক—স্বয়ং সে শিল্পের ব্যবস্থাপক, মালিক এবং শ্রমিক। কুটির শিল্পী নিজের প্রচেষ্টাতেই উৎপাদনের সকল আয়োজন করে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় বন্দোবস্ত করে। সেই পুঁজি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করে, নিজের এবং পোষ্যবর্গের সহায়তায় উৎপাদন করে এবং উহা করে নিজস্ব পরিকল্পনা মতন। কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পী কোনো মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর কারিগররূপেও কার্য্য করিতে পারে; পুঁজিপতি তাহাকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং তাহার নিকট হইতে উৎপাদিত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লয়; পরিবর্ত্তে পুঁজিপতি শিল্পীকে মজুরী প্রদান করে। তবে কুটিরশিল্প সুরু হইবার বহু পরে এইরূপ মধ্যবর্ত্তী পুঁজিপতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। শিল্পী স্বাধীন উৎপাদকই হউক অথবা পুঁজিপতির তাঁবেদারই হউক, উভয় ক্ষেত্রেই মূল বৈশিষ্ট্য একই—শিল্পী গ্রামের মধ্যে তাহার গৃহে থাকিয়াই নিজের ও পোষ্যবর্গের শ্রমে স্বল্প পরিধিতে সামগ্রী উৎপাদন করে।

কুটির শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা—Present Position of Cottage Industries

Q. Briefly describe the present position of Cottage Industries in India. (B. Com. 1939)

এক সময়ে ভারতের কুটির শিল্প বিশেষ ভাবেই উন্নত ছিল—বস্তুতঃপক্ষে ভারতে যে সকল শিল্প সামগ্রী উৎপাদন করিয়া শিল্পীগণ দেশে ও বিদেশে, বিক্রয় করিত তাহা কুটির শিল্পেই উৎপাদিত হইত এবং এই শিল্পজাত সামগ্রীই বিদেশে রপ্তানী হইয়া বহির্জগতে ভারতের শিল্প-খ্যাতি ছড়াইয়াছিল। তখন ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৪০-৫০ ভাগের উপজীবিকা ছিল শিল্প এবং শিল্প বলিতে তখন কুটির শিল্পকেই বুঝাইত। ব্রিটিশ জাতির এদেশে আগমন এবং রাজ্য প্রসারের সুরু হইতে আমাদের কুটির শিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহার একটি কারণ হইল যে ইংলণ্ডের আধুনিক যন্ত্র শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের সহিত হস্তশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই এবং আরেকটি কারণ হইল যে ইংরাজ শাসকগণ আমাদের শিল্পগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য রাজকীয় শক্তি পুরামাত্রায় ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ইহা সত্বেও আমাদের কুটির শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। বহু অসুবিধার মধ্য দিয়াও ইহা বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রেই টিকিয়া রহিয়াছে। রেশম কীট পালন ও রেশম শিল্প (মহীশুর, আসাম ও পশ্চিম বাংলায়), পশম শিল্প (মহীশুর, কাশ্মীর, অমৃতসর, মির্জাপুর, বানারস প্রভৃতি স্থানে) পিতল ও কাঁসা শিল্প (মোরাদাবাদ, বানারস ও মুর্শিদাবাদ) তুলা তাঁত শিল্প (পশ্চিমবঙ্গে, মাদ্রাজে এবং অল্প বিস্তর ভারতের সর্ব্বত্র) দড়ি প্রস্তুত, খেলনা তৈয়ারী, গুড় উৎপাদন, বেতের সামগ্রী নির্ম্মাণ, ঝুড়ি তৈয়ারী—ইত্যাদি অধিক গুরুত্বপুর্ণ এবং কম গুরুত্বপুর্ণ বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে কুটির শিল্প অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তবে দেশীয় ও বৈদেশিক যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় এই শিল্পগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাসমরের সময়ে যুদ্ধের স্বার্থে এই শিল্পগুলিকে সরকার সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কারণ বিদেশ হইতে আমদানী কমিয়া গিয়াছিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সমগ্রীর উৎপাদনে কেবলমাত্র কারখানা শিল্পগুলিই যথেষ্ট ছিল না। উপরন্তু যন্ত্রশিল্পজাত সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ জনসাধারণকেও বহু নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পর কুটির শিল্পকে পুনরায় সঙ্কটপুর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইহার কারণ কিন্তু নূতন কিছু নহে; যুদ্ধের পুর্ব্বে যে ত্রুটি ও অসুবিধার জন্য কুটির শিল্পসমূহ অনুন্নত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই একই ত্রুটি ও অসুবিধা তাহাদের এখনও রহিয়াছে।

তুলা তন্তু শিল্প—Handloom Cotton Industry

Q Examine the present position of the handloom cotton industry in India. Suggest means for its improvement. (B. A.

1935 ; 1955). What difficulties are being experienced by the handloom industry in India today ? What Steps have recently been taken by the Central and State Government to the handloom industry ? (B. Com. 1953).

আমাদের দেশে তুলা তাঁত শিল্পের এখনও বিশেষ প্রয়োজন এবং ইহার গুরুত্ব সমধিক। অবিভক্ত ভারতে এই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ এবং এই শিল্প হইতে প্রায় এক কোটি লোকের অন্ন-সংস্থান হইত। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ভারতে মোট যত বস্ত্র উৎপাদিত হইত তাহার মধ্যে শতকরা ৩৮ ভাগ উৎপাদিত হইত তাঁত শিল্পে এবং এখানে যে পরিমাণ বস্ত্র প্রতি বৎসরে ব্যবহৃত হইত তাহার মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ ছিল তাঁতে প্রস্তুত। তাঁত শিল্পে যত বস্ত্র উৎপাদিত হইত, মুদ্রার হিসাবে তাহার মূল্য ছিল ৫০ কোটি টাকার মতন। একমাত্র বাংলা প্রদেশেই মোট সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের তাঁত বস্ত্র উৎপাদিত হইত, পশ্চিম বঙ্গের রাজবলহাট ও শান্তিপুর এবং পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা ও টাঙ্গাইলে এই শিল্প বিশেষ ভাবে অবস্থিত।

অতীতে বস্ত্র উৎপাদনের একমাত্র পদ্ধতি ছিল তাঁত শিল্প—কিন্তু যন্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা বহু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু তাহাই নহে, ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে বিদেশী শাসকবৃন্দ বহু অশোভন ও অসঙ্গত কার্য্যের দ্বারা এই শিল্পের ধ্বংস সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা এবং বিদেশী শাসকের অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁত শিল্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বস্ত্রের চাহিদা বিবিধ যুদ্ধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং যন্ত্র শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ এই বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় ভারত সরকারকে বহু পরিমাণে তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং উহার উন্নতি বিধানের জন্যও চেষ্টিত হইতে হয়। যুদ্ধের আশু প্রয়োজন মিটাইবার পরেও ভারতের তাঁতশিল্প যুদ্ধ সময়ের অগ্রগতি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল কারণ যুদ্ধের পরেও যন্ত্রশিল্পে উৎপাদিত বস্ত্রের দাম বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন স্থানে ও কোন কোন সময়ে ইহা দুর্লভ হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন তাঁত শিল্পের কতিপয় সুবিধা থাকার দরুণ ভবিষ্যতে ইহাকে বজায় রাখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সুবিধাগুলি হইল :

(১) প্রত্যেক শিল্পে স্থির পুঁজি ও চল্‌তি পুঁজি (fixed capital and circulating capital) প্রয়োজন হয়। স্থির পুঁজি অপেক্ষা প্রয়োজনীয় চল্‌তি পুঁজির পরিমাণ হয় অল্প; উপরন্ত চল্‌তি পুঁজি পণ্য বিক্রয় করিয়াই উঠাইয়া লওয়া হয়। সেই কারণে শিল্পের প্রয়োজনীয় স্থির পুঁজি

সংগ্রহ করাই অধিক সমস্যার ব্যাপার। কিন্তু তাঁত বয়নকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় স্থির পুঁজি খুব অধিক নহে এবং যে সকল পুঁজি-সামগ্রী বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন তাহা দেশের মধ্যে পাওয়া যায়—উহার জন্য বৈদেশিক আমদানীর দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না।

(২) তাঁত বস্ত্র কলে উৎপাদিত বস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর টেকসই হয়। সেই কারণে দরিদ্র জনসাধারণ তাঁত বস্ত্র অধিক পরিমাণে পছন্দ করিতে পারে। উপরন্তু খুব উচ্চস্তরের বস্ত্রও তাঁত শিল্পে উৎপাদন করা সম্ভব হওয়ায় সূক্ষ্ম রুচির দাবীও ইহা মিটাইতে পারে। ধনীর পছন্দমত কারুকার্য্য খচিত বস্ত্র একমাত্র তাঁতেই উৎপাদন করা সম্ভব—যথা বেনারসী শাড়ী।

(৩) তাঁত বয়নকারী উত্তরাধিকার সূত্রে দক্ষতা অর্জ্জন করে এবং তাহার কার্য্যে পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুদিগেরও (যাহার যেরূপ সাধ্য) সাহায্য লাভ করে। পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই সে কার্য্য করে এবং মজুরীজীবি শ্রমিকের অপেক্ষা সে অধিকতর মনোযোগ এবং উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে পারে। বহুক্ষেত্রে তাঁতীর অপর কোনো উপজীবিকা থাকে যথা কৃষিকার্য্য এবং সেই কারণে শিল্পে সাময়িক মন্দা উপস্থিত হইলে তাঁতী তাহার শিল্প চির-কালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় না। ইহাতে এই শিল্পের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

বর্ত্তমান ভারতেও, তাঁতশিল্প কুটিরশিল্প সমূহের মধ্যে বৃহত্তম। ইহাতে প্রায় ৬০ লক্ষ নিপুণ শিল্পী নিযুক্ত আছে এবং পোষ্য ও কারিগর সমেত প্রায় দেড় কোটি লোক এই শিল্পের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল। বর্ত্তমান ভারতে প্রায় ২৮ লক্ষ তাঁত আছে এবং বার্ষিক উৎপাদন হয় প্রায় ১১০ কোটি গজ বিভিন্ন পর্য্যায়ের কাপড়।

তাঁতশিল্প যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন, সেগুলির অধিকাংশই সকল কুটির শিল্পের ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান—পুঁজি সংগ্রহের অসুবিধা, আধুনিক উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে অসুবিধার সন্তোষজনক বিক্রয় ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি। তবে এই শিল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট কতিপয় সমস্যার উপস্থিতিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের খরচা বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত অধিক—ইহার দরুণ তাঁত বস্ত্র এবং কলের বস্ত্রের দামে পার্থক্য ঘটে খুবই অধিক। দ্বিতীয়তঃ, এই শিল্পে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর উপস্থিতি খুবই অধিক : যথা ৮০ নং সূতার একখানি প্রমাণ শাড়ী তৈয়ারী করিতে সূতা, রং প্রভৃতি বাবদ খরচা পড়ে ৫।⁄০ আনার মত, কিন্তু উহার বাজার দাম

১৪৲। ১৫৲ টাকা। বহু সংখ্যক মুনাফা ভোগী মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর উপস্থিতিই ইহার প্রধান কারণ। তৃতীয়তঃ, পুর্ব্বে সুতাকাটা একটি বিশেষ কুটিরশিল্প ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সুতাকাটা রেওয়াজ কমিয়া গিয়াছে কারণ বহু পরিমাণ সুতা বহু অল্প সময়ে কলে উৎপাদিত হয়। ফলে, কুটিরশিল্পগুলি তাহাদের সুতার যোগানের জন্য কলগুলির উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা তাঁত শিল্প সম্প্রসারণের গুরুতর অন্তরায়; কারণ প্রয়োজনের সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ সুতা পাওয়া যায় না, কখনও ঠিক যে ধরণের সুতা প্রয়োজন ঠিক সেই ধরণের সুতা পাওয়া যায় না। ইহাতে বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ এবং গুণ উভয়েই ক্ষুণ্ণ হয়। পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা বিশেষ-ভাবেই প্রকটিত হয়, কারণ দূরস্থান হইতে এখানে সুতা আমদানী করিয়া লইতে হয় এবং ইহাতে বহনী-খরচা (cost of transporting) পড়ে অত্যধিক।

জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব স্মরণ করিয়া সরকার ইহার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন :

(১) পুনরুজ্জীবন এবং সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সমূহকে সুসমঞ্জস করিবার জন্য "নিখিল ভারত তাঁত সংসদ" (All India Handloom oard) স্থাপিত হইয়াছে।

(২) একটি "কেন্দ্রীয় বিপণি-করণ সংগঠন" (Central Marketing Organisation) স্থাপিত হইয়াছে। তাঁতীগণ সমবায়ের ভিত্তিতে যাহাতে সংগঠিত হয় তাহার জন্য ইহা চেষ্টিত হইবে এবং আভ্যন্তরীণ এবং আন্ত-রাজ্য-বিক্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সহিতও ইহার কার্য্যকলাপ জড়িত থাকিবে।

(৩) কলে উৎপাদিত বস্ত্রের উপর গজ প্রতি এক পয়সা হারে উৎপাদন শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে; ইহা হইতে সংগৃহীত অর্থ তাঁতশিল্পের সম্প্রসারণে নিয়োগ করা হইবে।

(৪) ১৯৫৩ সালের "ধুতি বিধি" দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে মিলগুলি তাহাদের পুর্ব্বেকার পাড়বিশিষ্ট ধুতি উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র উৎপাদন করিবে—যাহাতে তাঁতশিল্পের জন্য একটি সংরক্ষিত ক্ষেত্র থাকে।

(৫) তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য এবং ঋণ প্রদান করিতেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে এইরূপ অর্থযোগানের মোট পরিমাণ ছিল ২.৯৬ কোটি টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সালের জন্য ৫ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল।*

কুটির-শিল্প—ইহা কাম্য কেন? (গুরুত্ব) Cottage Industries—Why Desirable (Importance)

Q. Estimate the importance of cottage industries in the rural economy of India. (B. A. 1940).

Estimate the place of small scale and cottage industries in the economy of India. (B. A. 1951). Examine the importance of cottage and small scale industries in the industrial structure of India with special reference to the Second Five Year Plan. (B. Com. 1956). Examine the place of cottage and small scale industries in the Indian Economy? (B. A. 1956). Examine the role that a policy of successful revival and encouragement of cottage and small scale industries is likely to play in bringing about economic progress in India. (Patna 1956)

*নিচে "কারখানা শিল্প" শীর্ষক অধ্যায়ে "বস্ত্র শিক্ষা" বিষয়ের মধ্যে "কারখানা শিল্প ও তাঁতশিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যা" শীর্ষক সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

আমাদের দেশে মোট অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে বিপুল অংশই হইল গ্রামবাসী এবং ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি। কিন্তু সারা বৎসর যাবৎ নিযুক্ত থাকিবার মতন যথেষ্ট কার্য্য কৃষিকার্য্যের মধ্যে থাকে না—সেই কারণে বৎসরে অধিক কালই কৃষিজীবিকে বাধ্যতামূলকভাবে বেকার থাকিতে হয়—অথবা এরূপ কোনো কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হয়, যাহাতে তাহার শ্রমের তুলনায় যথেষ্ট উপার্জ্জন নাই। এক্ষেত্রে কৃষিজীবি কোনো কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকিলে বাড়তি উপার্জ্জন করিতে পারে এবং উপার্জ্জনহীন দিবস যাপনের হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে। সুতাকাটা, তাঁত বয়ন, ঝুড়ি তৈয়ারী, বেতের কার্য্য, গুড় উৎপাদন, তৈল নিষ্কাশন ইত্যাদি কার্য্য কৃষিজীবির পার্শ্বজীবিকা (subsidiary occupations) রূপে থাকিতে পারে।

বহুলোক কুটির শিল্পের দ্বারা প্রধানতঃ জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। সমগ্র ভারতে কেবল মাত্র তাঁত শিল্পেই নিযুক্ত লোকের সংখ্যা হইল তিন লক্ষ। পূর্ব্বে এই সংখ্যা ছিল আরও অধিক। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে কৃষিজীবি ও শিল্পজীবির সংখ্যা ছিল প্রায় সমান। ব্রিটিশ শাসনের অগ্রগতির সহিত বিভিন্ন কারণে কুটিরশিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। অথচ কারখানা শিল্প বা যন্ত্রশিল্প এরূপভাবে আজ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই যাহাতে উহা এমন অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে পারে যাহার দ্বারা জমির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব হইবে। জমির উপর অত্যধিক চাপ লাঘব করিয়া অধিক সংখ্যক লোকের জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা কুটির শিল্পের মাধ্যমে সম্ভব হয়। অবশ্য মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডের স্থায় আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে কারখানা শিল্পের প্রসার ঘটিলে, কৃষির উপর যে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে তাহা লাঘব হইবে এবং ইহাতে ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার কর্ম্মসংস্থানের উপায় হইবে। কিন্তু আমরা যতই আশাবাদী হই না কেন, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে, কারখানা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের দ্বারা কৃষির উপর চাপ লাঘব করা যে বহু সময় সাপেক্ষ ইহা স্বীকার করাই সমীচীন। কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কুটিরশিল্পের প্রসার অপেক্ষাকৃত কম সময় সাপেক্ষ।

কুটিরশিল্পীগণ তাহাদের গ্রামের মধ্যে থাকিয়াই এমন কি তাহাদের গৃহের আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াই উপজীবিকার অনুসরণ করিতে পারে; কারখানা শিল্পের শ্রমিকদিগের স্থায় দূর সহরে গিয়া বহু ব্যক্তি একত্রিতভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তাহারা বাস করিবে না। ইহাতে কুটির-শিল্পীদিগেব পক্ষে স্বাস্থ্য ও নৈতিক শুচিতা বজায় রাখিয়া উন্নত জীবন যাপন সম্ভব হয়।

শিল্পীগণ পরিবারভুক্ত শিশু ও স্ত্রীলোকদিগেরও তাহাদের সাধ্যমত কার্য্য পাইতে পারে; ইহাতে একদিকে যেরূপ উৎপাদনের খরচা কম হয় অপরদিকে সেইরূপ উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদিত হয়, কারণ ভাড়াটিয়া শ্রমিক অপেক্ষা পরিবারভুক্ত লোক অধিক যত্নের সহিত, অধিক দরদ দিয়া কার্য্য করিবে।

বৃহৎ কারখানা শিল্পে শ্রমিক মালিক মনোমালিন্যের জন্য উৎপাদনের ক্ষতি হয় বহু এবং কখনও কখনও উহাব জন্য সমগ্র সামাজিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কুটিরশিল্পের মধ্যে শ্রমিক মালিক বিরোধের দ্বারা উৎপাদনের ক্ষতি অথবা সামাজিক জীবনে বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা নাই।

দেশের অধিবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন অর্থাৎ অল্প আয়তনের উৎপাদনের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনে ব্যাপৃত থাকিলে, কেহ অতিরিক্ত ধনী এবং কেহ অতিরিক্ত দরিদ্র, এইরূপ পার্থক্যের অবকাশ থাকিবে না। ইহার দ্বারা ধন বণ্টনের সাম্যবিধান সম্ভব হইবে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ ভোগসামগ্রীর একান্ত অভাব। দেশের অভ্যন্তরে কারখানা শিল্পে যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদিত হয় উহা চাহিদার তুলনায় একান্ত অপ্রচুর। বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর নানারূপ বাস্তব বিঘ্ন রহিয়াছে। সেই কারণে কুটিরশিল্পে যে সামগ্রীই যেটুকু উৎপাদিত হয় তাহারই যথেষ্ট অর্থনৈতিক উপকারিতা রহিয়াছে।

কুটির শিল্প বাঁচাইয়া রাখার সম্ভাবনা—Possibility of keeping Cottage Industries alive

Q. Discuss the possibility of developing cottage industry in Bengal and Assam (B. Com. 1946). Discuss the conditions under

which products of handicrafts can compete with machine-made goods. Illustrate your answer from Indian industries (B. A. 1938).

অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে বৃহৎ কারখানা শিল্পের পাশে কুটিরশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখা আদৌ সম্ভব কিনা। এই সন্দেহের কারণ হইল যে বৃহৎ কারখানা শিল্পগুলি বহু পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া রাশীকৃত উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় এবং একসাথে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিবার দরুণ তাহাদের পড়তা (উৎপাদনের গড় পড়তা খরচা) হয় কম। সেহেতু কারখানা শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অল্প দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয় এবং সেক্ষেত্রে কুটির শিল্পজাত সামগ্রী ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

কিন্তু সত্যই কুটিরশিল্প কারখানা শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি না, ইহার উত্তর সন্ধানের জন্য আমাদিগকে তিনটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে : (ক) কুটিরশিল্পগুলির নিজস্ব কি ক্ষমতা আছে যাহার দরুণ ইহারা এখনও পর্য্যন্ত মুমূর্ষু অবস্থায় থাকিয়াও সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় নাই ; (খ) ইহাদের কি ত্রুটি ও অসুবিধা আছে ; (গ) এই ত্রুটি ও অসুবিধাসমূহ দূর করা সম্ভব কিনা এবং কিভাবে তাহা করা যায়।

(ক) বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াও একাধিক কুটিরশিল্প আজিও টিকিয়া আছে। ইহার কারণ হইল প্রথমতঃ কুটিরশিল্প স্বল্প পরিধির উৎপাদন ব্যবস্থা ; স্বল্প মূলধনেই ইহার কার্য্য আরম্ভ করা যায় এবং এই শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি সামগ্রী গ্রামের কর্ম্মকার ও ছুতারের দ্বারাই প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার জন্য আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয় না এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা বা ডলার দুষ্প্রাপ্যতার জালে জড়াইয়া পড়িতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কুটিরশিল্পীর দক্ষতা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত। তৃতীয়তঃ, বহু কুটিরশিল্প পার্শ্বজীবিকা (Subsidiary occupation) রূপে অনুসরণ করা হয়। চতুর্থতঃ, কুটিরশিল্পের পণ্যের বাজার গ্রাম বা নিকটস্থ সহরের মধ্যেই রহিয়াছে। পঞ্চমতঃ, কুটিরশিল্পী তাহার পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য লাভ করে এবং যখন বাহিরের লোকের সাহায্য প্রয়োজন হয় তখন গ্রামের মধ্যেই সস্তায় শ্রমিক পাওয়া সম্ভব। ষষ্ঠতঃ, বিশেষ কারুকার্য্যখচিত সামগ্রী কুটিরশিল্পেই উৎপাদন সম্ভব। সপ্তমতঃ, গ্রামে বাস করিয়া স্বাধীন শিল্পীরূপে কাজ করিবার আকাঙ্খার দ্বারা আজিও লক্ষ লক্ষ শিল্পী অনুপ্রাণিত রহিয়াছে।

Q. Analyse the problems of small scale and cottage industries in India (Delhi 1955).

(খ) কিন্তু কুটির শিল্পের যে ত্রুটি এবং অসুবিধাগুলি রহিয়াছে, সেগুলি আমাদিগকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে ; এইগুলির দরুণ দেশের অর্থনৈতিক জীবনে যতখানি উপকারিতা কুটিরশিল্পের দ্বারা সাধিত হওয়া

সম্ভব ততখানি উপকারিতা বর্ত্তমানে সাধিত হইতেছে না। প্রথমতঃ, গ্রামাঞ্চলে কারিগরগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ। শিক্ষাভাব সকলের পক্ষেই একটি গুরুতর অক্ষমতা এবং কারিগরদিগের পক্ষেও ইহা সমভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু তাহাদের পক্ষে শিক্ষাভাবের বাস্তব অসুবিধা হইল যে কারিগরগণ শিক্ষার অভাবের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া শিল্প-সংক্রান্ত প্রগতিশীল ভাবধারা গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে। অশিক্ষা হইতে যে রক্ষণশীলতার উদ্ভব ঘটে, উহা নূতন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথে বিরাট বাধা। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে বিশেষ শিল্প-শিক্ষা প্রদানের কোনোই যথাযোগ্য ব্যবস্থা নাই। বিশেষ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনের যে বিশেষ বিশেষ টেক্‌নিক্ বা শিল্প-পদ্ধতি কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে লাভজনকভাবেই প্রয়োগ করা সম্ভব—তাহা শিল্পী-দিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার কোনো ব্যবস্থা নাই। অতএব নিজেদের রক্ষণশীলতা ও অজ্ঞতার দরুণ এবং শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার দরুণ কুটির শিল্পীগণ চিরাচরিত শিল্পপদ্ধতিতেই উৎপাদন করিতে থাকে। তৃতীয়তঃ, কৃষি-জীবিদিগের ন্যায় কুটির-শিল্পজীবিদিগেরও মূলধনের অভাবের সম্মুখীন হইতে হয়; স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বহুক্ষেত্রে কৃষক ও কুটির শিল্পী একই ব্যক্তি। মূলধনের অভাবের দরুণ শিল্পীকে মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং সুদের হার অত্যধিক চড়া হইবার দরুণ শিল্পের উৎপাদন হইতে নীট লাভ হয় তাহার অতি অল্প। বহুক্ষেত্রে মূলধনের অভাবের নিমিত্ত কুটির শিল্পীকে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসাদারের (middleman) অধীন হইয়া পড়িতে হয়—ব্যবসাদার কারিগরকে দাদন (advance) দেয় এবং কারিগর তাহাকেই উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে। দাম নিরূপণে ব্যবসাদারের কথাই খাটে—কারিগর এখানে বহু পরিমাণেই অসহায়। ইহাতে শিল্পীর কারবারে লাভ হয় কম, কুটির শিল্পের লাভযোগ্যতা (profitability) সম্বন্ধে তাহাদের নৈরাশ্য আসে, স্বাধীন উৎপাদক হইবার সন্তুষ্টি হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকে। ইহা কুটির শিল্প প্রসারের পথে গুরুতর অন্তরায়। চতুর্থতঃ, কারখানা শিল্প অপেক্ষা কুটির শিল্পের সঙ্গতি অল্প সেই কারণে কারখানা শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কুটির শিল্পের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধরণের কাঁচা মাল (raw material) সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না; বিশেষ করিয়া কারখানা শিল্প একসাথে বহু পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করে বলিয়া, উহা অপেক্ষাকৃত সস্তায় কাঁচামাল ক্রয় করিতে পারে। এইদিক হইতে কুটির শিল্পকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। পঞ্চমতঃ, পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর ত্রুটী ও অসুবিধা রহিয়াছে। বর্ত্তমানে সকল সামগ্রীরই বাজার বিস্তৃত হইতেছে—কারখানা শিল্পের মাল সুদূর পল্লীতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু কুটির শিল্পের পণ্যের বাজার বিস্তৃত হইবার পথে প্রবল অন্তরায়, তাহাদের সঙ্গতি

কম বলিয়া দূর বাজারে মাল প্রেরণ করা কুটির শিল্পীদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। কোথায় তাহাদের পণ্যের উত্তম বাজার তাহা খুঁজিয়া বাহির করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না—বিস্তারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতা সাধারণকে তাহাদের পণ্যের সহিত পরিচিত করাইবার মতন আর্থিক সঙ্গতিও তাহাদের নাই; এবং পূর্ব্বেই দেখিয়াছি কিভাবে মহাজন বা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগের নিকট পণ্য বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিয়া তাহারা তাহাদের পণ্যের বাজার বাছিয়া লইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে।

Q. How do you propose to protect and promote the cottage industries in this country in the face of increasing competition from large scale factory industries? (B. A. 1944) What measures would you suggest to revive and improve them? (B. Com. 1939) How can these be made more efficient? (B. A. 1940) How would you propose to plan the future development of cottage and small scale industries? (B. A. 1951; B. Com. 1951) On what lines and in what directions should the state promote the development of small scale industries in India' (W. B. C. S. 1951) How would you propose to improve the organisation of cottage and small scale industries? (B. A. 1956) What suggesstions will you make to ensure more rapid development of these industries? (Delhi, 1955)

(গ) কুটির শিল্পের এই ত্রুটি এবং অসুবিধাসমূহ বিদূরিত করা সম্ভব এবং প্রয়োজন। এইগুলি দূর করিবার জন্য বহুমুখী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ, কুটির শিল্পের সমস্যা দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক সমস্যার সহিত গভীরভাবে জড়িত। শিক্ষাভাব সকলের পক্ষে যেরূপ কারিগর-দিগের পক্ষেও সেইরূপ একটি নিদারুণ অভিশাপ। শিক্ষার দ্বারা যে বুদ্ধির বিকাশ ও মানসিক উন্নতি সম্ভব হয়—তাহা কারিগরদিগের জীবনে সম্ভব করিতে হইবে। ইহার দ্বারা তাহাদিগকে শিল্প পদ্ধতিতে রক্ষণশীলতা পরিত্যাগ করিতে সাহায্য করা হইবে—তাহারা উন্মুক্ত মন লইয়া সহজেই নূতনত্বের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক বিজ্ঞানকে কুটিরের মধ্যেই প্রয়োগ করা বাস্তবক্ষেত্রে সহজ, সম্ভব এবং লাভজনক—তাহা গ্রামের কারিগরদিগকে বুঝাইতে হইবে। নব নব আবিষ্কৃত ছোট খাটো যন্ত্রপাতি কারিগরের গৃহে স্থাপন করা সম্ভব এবং এইগুলির সাহায্যে অল্প আয়াসে অধিক উৎপাদন সম্ভব, ইহা কারিগরদিগকে দেখাইয়া দিবার জন্য সরকারের বিশেষ বিভাগ থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার মতন সামান্য যে যন্ত্রবিদ্যা প্রয়োজন তাহা যাহাতে গ্রাম্য কারিগরদিগের পক্ষে সহজলভ্য হয় তাহার জন্য সরকারী উদ্যোগে,

প্রচেষ্টায় বা সাহায্যে কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন এবং এইরূপ এক একটি ইউনিটে একটি করিয়া শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, গ্রামাঞ্চলে যাহাতে যন্ত্রচালনশক্তি সহজলভ্য হয় সেই উদ্দেশ্যে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ, কারিগরদিগকে অল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে পুঁজি সহজলভ্য হয় এবং উহার ব্যবহারের দরুণ প্রদেয় মূল্য, অর্থাৎ সুদের হার, উৎপাদনের লাভের বৃহৎ অংশ গ্রাস করিয়া ফেলিতে না পারে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্যে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা যাইতে পারে এবং সরকারও "শিল্পে রাষ্ট্র সাহায্য বিধির" (State Aid to Industries Act) আওতায় কারিগরদিগকে পুঁজি সরবরাহ করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল যাহাতে প্রতিযোগিতামূলক দামে কুটির শিল্পীদিগের পক্ষে পাওয়া সহজ ও সম্ভব হয় তাহার নিমিত্ত কুটির শিল্পগুলির "আঞ্চলিক সঙ্ঘ" (regional boards) গঠন করিলে ভালো হয়—এই সঙ্ঘ তাহার অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কুটির শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করিবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কারিগরদিগকে সরবরাহ করিবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে "সমবায় সমিতি"ও (Co-operative Purchase Societies) স্থাপন করা যাইতে পারে। সপ্তমতঃ, বাহিরের বাজারের সহিত কুটির শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কোনো আঞ্চলিক সঙ্ঘের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং গ্রামে গ্রামে "সমবায় বিক্রয় সমিতি" (Co-operative Sale Society) স্থাপন ও প্রসার করা প্রয়োজন। ঐ সকল আঞ্চলিক সঙ্ঘের উদ্যোগে এবং সরকারী উদ্যোগে কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে —যাহাতে জনসাধারণ ইহার সহিত পরিচিত হইতে পারে। সহরে, যে স্থানে শিল্পজাত সামগ্রীর ক্রেতা রহিয়াছে, কুটির শিল্পের পক্ষ হইতে সরকারী উদ্যোগে বা সমবায়ের ভিত্তিতে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করাও প্রয়োজন। শুধু দেশের মধ্যেই নহে, দেশের বাহিরেও যাহাতে আমাদের কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর কাট্‌তি হয় সেই উদ্দেশ্যে বিদেশসমূহে ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে চেষ্টা করিতে হইবে।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাদ্বয়—Cottage and Small Industries & the Two 5-Year Plans

প্রথম পরিকল্পনায় কি হইয়াছে

গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্ম প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদিগকে যথাসম্ভব আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। বারোটি রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন

করা হইয়াছে এবং "শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বিধি" (State Aid to Industries Act) প্রয়োগের নিয়ম-কানুন আরও সহজ ও উদার করা হইয়াছে—যাহাতে ঋণ পাওয়া সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, একাধিক শিল্পের জন্য নিখিল ভারত বোর্ড (All-India Boards) গঠন করা হইয়াছে; এই শিল্পগুলি হইল, তাঁত শিল্প, খাদি ও গ্রাম শিল্প প্রভৃতি ছয়টি শিল্প। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাহায্যে এবং এই বোর্ডগুলির প্রচেষ্টায় একাধিক শিল্পে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সরকার নিজেদের প্রয়োজনীয় ষ্টোর্স-এর মধ্যে কিছু কিছু সামগ্রী শুধুমাত্র কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের নিকট হইতেই ক্রয় করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন—এমন কি বাজার অপেক্ষা একটু বেশী দাম দিয়াও। ১৯৫৪-৫৫ সালে সরকার এইভাবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী ক্রয় করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প (handicrafts) ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রদর্শনী কেন্দ্র (emporium) এবং বিক্রয় কেন্দ্র (sales depot) স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে একদিকে ক্ষুদ্র শিল্প ও অপর দিকে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে অভিন্ন উৎপাদন কর্মসূচী অনুসরণের চেষ্টা হইয়াছে। এই কর্মসূচীর মূল কথা হইল যে একটি সামগ্রীর মোট যত পরিমাণ দেশে উৎপাদিত হয় তাহার একটি নির্দিষ্ট অংশ শুধু মাত্র ক্ষুদ্র শিল্পেই উৎপাদিত হইবে এরূপ ব্যবস্থা রাখা, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের ক্ষমতা একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরে যাইতে না দেওয়া, বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের উপর সেস্ (cess) অথবা উৎপাদন শুল্ক (excise duty) আরোপ করা এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে কাঁচামাল ও সরঞ্জাম (equipments) যোগান করা ও কৌশলগত ও আর্থিক সাহায্য (technical or financial assistance) প্রদান করা। কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনাকালে এই ধরণের কোন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে— যথা তাঁতশিল্প, জুতা তৈয়ারী, দিয়াশলাই শিল্প ইত্যাদি। ষষ্ঠতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক "ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান" (Small Industries Service Institutes) নামে বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ১ম পরিকল্পনাকালে এইরূপ চারিটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সপ্তমতঃ, ছোট শিল্পের সাহায্যের জন্য "জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন" (National Small Industries Corporation) গঠিত হইয়াছে।

[***কার্ভে কমিটির বিবরণী***—পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে অধ্যাপক ডি, জি, কার্ভের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের কার্য্যক্রম স্থির করিবার দায়িত্ব ইহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কমিটি পরিকল্পনা কমিশনের নিকট তাঁহাদের বিবরণী প্রদান করিয়াছেন।

কার্ভে কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করিয়াছেন। উহার মধ্যে ২৩৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দ্বারা ব্যয়িত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ব্যয়িত হইবে ২৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির যে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রয়োজন বলিয়া কমিটি মনে করেন সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া এই শিল্পসমূহের অর্থসংস্থান, শক্তি সরবরাহ, কলাকৌশল (technique), বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কমিটি অভিমত দিয়াছেন যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন কর্ম্মসূচী কার্য্যকরী হইলে ৩০ লক্ষেরও অধিক লোকের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

কার্ভে কমিটি ক্ষুদ্র শিল্পগুলির জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছেন; নূতন পুঁজি বিনিয়োগের সময়ে সকল ক্ষেত্রেই উন্নত পুঁজি সামগ্রী সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কমিটি বলেন যে কয়েকটি অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কর্ত্তৃত্বাধীন ও বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন রহিয়াছে কিন্তু উহা ব্যতীত বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ছড়াইয়া দিয়া শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। উন্নত কর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করিলে এই বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা দেশের অর্থনীতির কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিবে না। গ্রামাঞ্চল এবং উপনগরীসমূহে স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ একান্তই প্রয়োজন। এই সকল শিল্পজাত পণ্যের পরিকল্পিত সরবরাহ এবং সুসংগঠিত বিক্রয়-ব্যবস্থার নিমিত্ত বিভিন্ন উৎপন্ন মালের জন্য ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি স্থাপনের কথাও বলিয়াছেন। অধিকন্তু কমিটির মতে, উৎপাদন নিয়োগ ও লাভের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া সময় সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কিরূপ মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সমবায় ভিত্তিতে বিক্রয় সম্ভবপর তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত। অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটি বলিয়াছেন যে প্রথম দিকে সরকারকেই ইহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে হইবে, পরে উহার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক।]

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কি করা হইবে

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও পরিকল্পনা কমিশন অভিন্ন উৎপাদন কর্ম্মসূচী চালাইয়া যাইবার পক্ষে অভিমত দিয়াছেন। ইহার দ্বারা কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের পরিপূর্ণ সহায়তা হয় না—উহার দ্বারা ছোট শিল্পকে শক্তি অর্জ্জনে সময় দেওয়া হয় মাত্র। কমিশন বলেন কুটির ও ছোট শিল্পের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা প্রয়োজন। এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। তবে শিল্প সমবায় (industrial co-operatives) স্থাপনের জন্য এবং উহাদিগকে বজায় রাখিবার ও উন্নত করিবার জন্য অনেক কিছু

প্রয়োজন। সমবায় ব্যবস্থার দ্বারা (১) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ হইতে পারে (২) উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় হইতে পারে; এবং (৩) প্রকৃত উৎপাদনেরও আয়োজন হইতে পারে। প্রথম দুইটি উদ্দেশ্যের জন্য সমবায় সমিতি গঠনের অবকাশ গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রায় সবগুলির ক্ষেত্রেই রহিয়াছে। উৎপাদন সমিতি গঠনের অবকাশ কোন কোন শিল্পে বেশী এবং কোন কোন শিল্পে কম।

পরিকল্পনা কমিশন আরও বলেন যে সরকার যদি তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ে ছোট শিল্পের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তাহা হইলে উহার দ্বারা ছোট শিল্পের সম্প্রসারণে বিশেষ উপকার প্রদান করা হইবে। বাজার সম্পর্কেও গবেষণা (marketing research) প্রয়োজন—উহার দ্বারা যে তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ হইবে তাহার ভিত্তিতে একাধিক শিল্পের উৎপাদন কর্ম্মসূচী রচনা করা যাইবে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের দ্বারাও ক্রমশ:ই অধিক সংখ্যায় ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উন্নত কৌশল অবলম্বনে প্রণোদিত হইবে।

কিন্তু ইহাদের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল ক্রয় ও ষ্টক করিবার জন্য ও উৎপাদিত পণ্য ষ্টক করিবার জন্য ঋণ প্রয়োজন; আবার কারিগরগণ যাহাতে সমবায় সমিতির শেয়ার কিনিতে পারে তাহার জন্যও ঋণ প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা যাহা আছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। কমিশন বলেন যে ইহাদের ঋণের প্রয়োজন আংশিকভাবেও মিটাইবার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশী করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক—ইহাদের সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সুসমন্বিত নীতি প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার উপরেও চল্‌তি পুঁজির প্রয়োজন থাকিবেই। এই ২০০ কোটি টাকা বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে যে ভাবে বণ্টিত হইবে তাহা হইল নিম্নরূপ:

তাঁত—৫৯·৫ কোটি, খাদি—১৬·৭ কোটি; গ্রাম শিল্প—৩৮·৮ কোটি; হস্ত-শিল্প—৯ কোটি; ছোট শিল্প—৫৫ কোটি; অন্য শিল্প—৬ কোটি; সাধারণ কার্য্যক্রম—১৫ কোটি।

এই ২০০ কোটির মধ্যে ২৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যক্রমের জন্য ব্যয় হইবে এবং ১৭৫ কোটি টাকা রাজ্যসরকারদিগের পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের প্রথমদিকে বিভিন্ন গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় চল্‌তি পুঁজির (working capital) ব্যবস্থা

সরকার করিবেন—অর্থাৎ যতদিন না সাধারণ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া চলতি পুঁজি সরবরাহের যথোচিত ব্যবস্থা হইতেছে।

বিভিন্ন প্রকারের কুটিরশিল্প, গ্রাম্যশিল্প, এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মসূচী রচনা করা হইয়াছে। এইগুলি হইল তাঁতশিল্প, সুতাবয়ন, খাদি (সুতী ও পশম) ঢেঁকি ভাঙ্গা চাউল, ঘানি, পাদুকা কুটির শিল্প, গ্রাম চর্মসংস্কার শিল্প, গুড় ও খ্যাঁসাড়ি, কুটির দিয়াশলাই শিল্প, বিভিন্ন গ্রাম শিল্প, হস্তশিল্প (handicrafts), নানারূপ ছোট শিল্প (small scale industries) রেশম শিল্প ও নারিকেল ছোবড়া শিল্প।

***ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান*—Small Industries Service Institutes**

ভারত সরকার সম্প্রতি ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যের জন্য দেশের মধ্যে চারিটি আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট্ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের নাম হইল "ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান" (Small Industries Service Institutes) ইহাদের উদ্দেশ্য হইল ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উৎপাদন প্রণালী (technique of production), কারবার ব্যবস্থাপনা (business management)এবং বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নে সাহায্য করা। প্রত্যেক ইনস্টিটিউটের জন্য একটি কর্মচারী-দলের সংগঠন হইয়াছে—কর্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের পদ্ধতিবিশারদ (technicians) এবং অবশিষ্টাংশ হইল বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শদাতা। প্রত্যেক ইনস্টিটিউট্ একটি করিয়া আদর্শ কারখানা (Model Workshop) স্থাপন করিবে এবং ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দুইটি করিয়া ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ইউনিট (Mobile Demonstration Units) থাকিবে। ইহারা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শিক্ষা প্রদান করিবে। ইনস্টিটিউট্ এই প্রকার যন্ত্রপাতি কিস্তিবন্দীতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সরবরাহ করিবে। এইগুলি হইল ইনস্টিটিউটের প্রাথমিক কার্য্য—ক্ষুদ্র শিল্প সমূহের ক্রমিক সম্প্রসারণের সহিত উহাদের কার্য্যের পরিধিও বিস্তার লাভ করিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এইরূপ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ২০টিতে বৃদ্ধি করা হইবে।

***জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন*—National Small Industries Corporation**

ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের সাহায্যের জন্য "জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন" নামে একটি বিশেষ সংস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী রূপে ইহা গঠিত হইয়াছে। ইহার অনুমোদিত পুঁজি হইল ১০ লক্ষ টাকা (authorised capital) এবং ইস্যু পুঁজি

(issued capital) হইল ২ লক্ষ টাকা। পুঁজির সম্পূর্ণ টাকাই সরকার প্রদান করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন যে উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য গঠিত হইয়াছে সেগুলি হইল নিম্নরূপ: (১) সরকারী বরাতের (orders) জন্য ইহা কনট্রাক্ট গ্রহণ করিবে এবং ঐ সামগ্রী সরবরাহের জন্য ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাব কনট্রাক্ট দিবে; (২) এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে এই বরাত্-এর প্রয়োজন অনুরূপ উৎপাদন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে ঋণ এবং শিল্প-কৌশলগত সহায়তা (technical assistance) প্রদান করিবে; (৩) ক্ষুদ্র শিল্প যাহাতে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে এই কর্পোরেশন তাহা দেখিবে এবং ঐভাবে ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে; (৪) ক্ষুদ্র শিল্পকে ইহা কিস্তিবন্দীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে।

সারাংশ

কুটির শিল্প—উৎপাদনকারীর গৃহে অথবা গৃহের নিকটেই গ্রামের অভ্যন্তরেই স্বল্প পরিধিতে সামগ্রী উৎপাদনের যে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তাহাকেই বলা হয় কুটির শিল্প। কুটিরশিল্পের কারিগর স্বাধীন উৎপাদক হইতে পারে বা পুঁজিপতির তাঁবেদারও হইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে কুটিরশিল্পী নিজেই শিল্পের ব্যবস্থাপক, মালিক এবং শ্রমিক; দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কোন পুঁজিপতি ব্যবসায়ী কাঁচামাল ও চল্‌তি মূলধন সরবরাহ করে এবং তৈয়ারী সামগ্রী লইয়া তাহাকে পারিশ্রমিক দেয়।

কুটিরশিল্পের বর্তমান অবস্থা—ভারতের কুটিরশিল্প এক সময়ে খুবই উন্নত ছিল কিন্তু বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় এবং বিদেশী শাসকের অত্যাচারে কুটিরশিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটে। কিন্তু ইহাদের গৌরবের দিন শেষ হইলেও ইহারা নিশ্চিহ্ন হয় নাই। রেশম, পশম, পিতল ও কাঁসা তুলা, তাঁত, দড়ি, খেলনা, গুড়, বেত-সামগ্রী প্রভৃতি শিল্পে কুটির উৎপাদন এখনও প্রচলিত আছে কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ইহারা কিছুটা উজ্জীবিত হইয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষে পুনরায় সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে পড়িয়াছে।

তুলাতন্ত্র শিল্প—অবিভক্ত ভারতে তাঁতশিল্পে প্রায় ২০ লক্ষ লোক নিযুক্ত থাকিত এবং ইহা হইতে অন্নসংস্থান হইত প্রায় এক কোটি লোকের। পশ্চিমবঙ্গের রাজবলহাট এবং শান্তিপুর হইল তাঁত শিল্পের কেন্দ্র।

দেশের অর্থনীতিতে তাঁতশিল্পের স্থান এককালে খুবই গৌরবের ছিল, পরে ইহার পতন হয়। যুদ্ধের দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে ইহার পুনরায় সুদিন আসিয়াছিল কিন্তু সাময়িকভাবে। কিন্তু তাঁতশিল্পের কতিপয় বিশেষ উপকারিতা থাকায় ইহার উন্নতি বিধান প্রয়োজন : (১) ইহাতে স্থির পুঁজি কম লাগে এবং পুঁজি সামগ্রী সহজ প্রাপ্য ; (২) টেঁকসই কাপড় এবং দামী সৌখিন বস্ত্রও উৎপাদিত হয় ; (৩) পারিবারিক আবেষ্টনীতে কাজ হয় এবং তাঁতীর অন্য উপজীবিকাও থাকিতে পারে।

বর্ত্তমান ভারতে ২৮ লক্ষ তাঁতে ১১০ কোটি গজ কাপড় উৎপাদিত হয়। সাধারণভাবে কুটীরশিল্পের অসুবিধা ছাড়াও তাঁতশিল্পের কতিপয় বিশেষ সমস্যাও আছে : (১) খরচা অপেক্ষাকৃত অধিক ; (২) মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর প্রাধান্য খুব বেশী ; (৩) সুতার জন্য কলের উপর নির্ভর করিতে হয়। সরকার ইহার উন্নয়নের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন : (১) তাঁত সংসদ স্থাপন, (২) কেন্দ্রীয় বিপণিকরণ সংগঠন স্থাপন (৩) কলের কাপড়ের উপর উৎপাদন শুল্ক আরোপ (৪) কলগুলির উৎপাদনের একাংশে কুটির শিল্পের জন্য রাখিয়া দেওয়া, (৫) কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক অর্থসাহায্য ও ঋণদান।

কুটিরশিল্প কাম্য কেন? বিভিন্ন দিক হইতে কুটিরশিল্পের উপকারিতা রহিয়াছে : (১) বিভিন্ন প্রকারের কুটিরশিল্প হইতে কৃষিজীবিগণ বাড়তি উপার্জ্জন করিতে পারিবে ; (২) ইহাদের মধ্য দিয়া ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার কর্ম্ম-সংস্থানের সুবিধা হইবে ; (৩) গার্হস্থ্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করিয়া স্বাস্থ্য ও নৈতিক শুচিতা বজায় রাখা যায় ; (৪) পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তি-দের কার্য্য পাওয়া যায়, সুতরাং উৎপাদন খরচা কম পড়ে ; (৫) শ্রমিক মালিক মনোমালিন্যে উৎপাদন ব্যাহত হয় না ; (৬) ধনবণ্টনের সাম্যবিধান সম্ভব হইবে (৭) ভোগসামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা নিবারিত হইবে।

কুটির শিল্প বাঁচাইয়া রাখিবার সম্ভাবনা—বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের যুগে কুটিরশিল্প বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ এই শিল্পের কতিপয় নিজস্ব ক্ষমতা আছে : (১) অল্প মূলধনে এবং সহজলভ্য পুঁজি সামগ্রীতে ইহা আরম্ভ করা যায় ; (২) দক্ষতা পুরুষানুক্রমিক (৩) পার্শ্বজীবিকারূপে অনুসৃত (৪) পণ্যের বাজার গ্রামের মধ্যেই (৫) পারিবারিক শ্রম পাওয়া যায় (৬) কারুকার্য্য খচিত সামগ্রী উৎপাদন (৭) স্বাধীন শিল্পীরূপে থাকিবার আকাঙ্খা।

কিন্তু ইহাদের ত্রুটি ও অসুবিধা দূর করিতে না পারিলে, পুরাপুরি উপকারিতা পাওয়া যাইবে না। ত্রুটি ও অসুবিধাগুলি হইল, (১) কারিকরগণ অশিক্ষিত ও অজ্ঞ (২) বিশেষ শিল্পপদ্ধতি শিক্ষার (technical training) ব্যবস্থা

নাই ; (৩) মূলধনের অভাবে মহাজনের কুক্ষিগত ; (৪) কারখানাশিল্পের প্রতিযোগিতা ; (৫) পণ্যের বাজার বিস্তৃত নহে।

এই ত্রুটি ও অসুবিধা দূর করিয়া উহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে : (১) সাধারণ শিক্ষার বিস্তারে রক্ষণশীলতা অতিক্রম করা যাইবে, (২) বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিতে হইবে, (৩) শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের দ্বারা সাধারণ যন্ত্রবিদ্যা প্রদান করিতে হইবে, (৪) গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করিতে হইবে, (৫) অল্পসুদে ঋণ, (৬) উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যবস্থা, (৭) সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপনের দ্বারা পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা, (৮) প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং দেশের বাহিরেও পণ্য বিক্রয়ের চেষ্টা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—প্রথম পরিকল্পনাকালে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি হইল : (১) রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন ও রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক অর্থ সাহায্য প্রদান ; (২) বিভিন্ন শিল্পের জন্য নিখিল বোর্ড স্থাপন, (৩) সরকার কর্তৃক কুটির শিল্পজাত পণ্যের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় ষ্টোর্স ক্রয়, (৪) প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, (৫) ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে অভিন্ন উৎপাদন কর্মসূচী প্রবর্ত্তন, (৬) "ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান" স্থাপন (৭) জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন গঠন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে অভিন্ন উৎপাদন কর্মসূচী চালাইয়া যাইতে হইবে, যতদূর সম্ভব সমবায় ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিতে হইবে (শিল্প সমবায় স্থাপনে), এই শিল্পজাত সামগ্রী ক্রয় করিয়া সরকারকে সহানুভূতি দেখাইতে হইবে, বাজার সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন, বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করিতে হইবে, ছোট শিল্পের এবং কারিগরদের ঋণের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে।

২য় পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ২৫ কোটি এবং রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক ১৭৫ কোটি—মোট ২০০ কোটি টাকা তাঁত শিল্প, খাদি শিল্প, গ্রাম শিল্প, হস্ত শিল্প, ছোট শিল্প, অন্য শিল্প এবং এতৎ সংক্রান্ত সাধারণ কার্যাক্রমে ব্যয় করা হইবে।

"ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য প্রতিষ্ঠান" ও "জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন"—ক্ষুদ্র শিল্প সাহায্য ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামে দেশের মধ্যে চারিটি আঞ্চলিক ইন্‌ষ্টিটিউট্ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন উপায়ে ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করা—উন্নত উৎপাদন প্রণালী, কারবার ব্যবস্থাপনা

এবং বিক্রয় ব্যবস্থা। ইহাদের আদর্শ কারখানা এবং প্রদর্শনী ইউনিট থাকিবে এবং ইহারা কিস্তিবন্দীতে যন্ত্র সরবরাহ করিবে। ২য় পরিকল্পনাকালে এই ইনষ্টিটিউটের সংখ্যা ২০-তে বৃদ্ধি করা হইবে।

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারের দ্বারা প্রদত্ত ২ লক্ষ টাকার পুঁজি লইয়া জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। এই কর্পোরেশন (১) কনট্রাক্ট লইয়া সাব কনট্রাক্ট দিবে, (২) ঋণ ও শিল্প-কৌশলগত সহায়তা দিবে, (৩) ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের সমন্বয় করিবে, (৪) কিস্তিবন্দীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

কারখানা শিল্প : কতিপয় প্রধান শিল্প

Industries : Chief Manufacturing Industries

বৃহৎ যন্ত্র শিল্প—Large Scale Manufacturing Industries

Q. Give an account of the chief manufacturing industries of India. (B. Com. 1940). State what you know about one large factory industry of India. (B. Com. 1938 ; B. A. 1945)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে যন্ত্রশিল্প স্থাপিত হইতে থাকে। এই সকল শিল্পের অধিকাংশই বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত হয় এবং বিদেশীদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইতে থাকে। সরকার শিল্পসমূহের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কোনই প্রয়াস করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে কয়েকটি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া যাইবার পর ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্যের গুরুতর অভাব অনুভূত হয়। ভারতবাসীর চরম দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনগুলি দ্রুত শিল্পোন্নতির সুপারিশ করিয়াছিলেন—কিন্তু সরকার দুই একটি সামান্য এবং বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ভিন্ন এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস কিছু করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের জন্য শিল্পোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তদবধি দেশী ও বিদেশী মূলধনে ভারতের মধ্যে একাধিক যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকে। অতঃপর যুদ্ধের চাপে সরকার শিল্পোন্নতির দিকে কথঞ্চিৎ মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত সামগ্রী উৎপাদনে বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে সেগুলি হইল, বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, কাগজ, রাসায়নিক, পাট-সামগ্রী, সিমেণ্ট, সাবান, কাঁচ, রং ও বার্নিশ, কৃত্রিম রেশম, চীনামাটি, পশম, লাক্ষা, রেশম, গেঞ্জি ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কতিপয় শিল্পের বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে।

পাট শিল্প—Jute Industry

Q. Write a note on the jute ludustry in Bengal, with special reference to the problems that have arisen as a result of Partition (Cal. B. A. 1948). Consider the present position and future prospects of the. jute indutsry in India (Cal. B. A. 1952). Examine the present position of the jute mill industry of Wes

Bengal with special reference to the supply of raw jute (Cal. B. Com. 1950)

১৮৫৫ সালে ভারতে প্রথম পাট কল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম দিকে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি লাভ না ঘটিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে ইহার দ্রুত উন্নতি ঘটিতে থাকে। এক সময়ে ডাণ্ডিতে অবস্থিত পাট কলগুলি অধিকাংশই পাটজাত সামগ্রী উৎপাদন করিত এবং ভারতে উৎপন্ন কাঁচাপাটের অধিক পরিমাণই বিদেশে চালান যাইত। ক্রমশঃই এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া ভারতেই অধিক সংখ্যায় কল স্থাপিত হইতে থাকে এবং কাঁচা পাট ভারত হইতে কিছু পরিমাণে রপ্তানী হইলেও, উহার অধিকাংশই ভারতস্থ কলে পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ প্রয়োজনে পাটজাত সামগ্রীর চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পাট-শিল্পে ঐ সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। পাট-জাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনের সহিত পাট চাষেরও বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে পাটই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ নগদশস্যের স্থান অধিকার করে। ১৯২৯-৩০ সালে মন্দার সময়ে কিন্তু পাট-শিল্প অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয় এবং পাট চাষে ব্যাপৃত কৃষককুলও অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পাট কলগুলি তাহাদের কার্য্যের সময় সংক্ষেপ করিতে এবং উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হয়। কৃষকগণ যাহাতে পাট উৎপাদন হ্রাস করিতে প্রণোদিত হয় সরকার তাহার জন্য প্রয়াস করেন; কাঁচাপাটের ন্যূনতম মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা চেষ্টিত হন কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালে ভারতে পাট-কলের সংখ্যা ছিল ১০৭ এবং উহাতে প্রায় ২৪ কোটি টাকার মূলধন নিয়োজিত ছিল। তবে পাট কলগুলির প্রায় সমস্তই ছিল বৈদেশিকদিগের মালিকানাধীনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থায় পাট শিল্পে অভূতপূর্ব্ব সমৃদ্ধি উপস্থিত হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশী এবং বিদেশী সরকার পাট সামগ্রীর প্রভূত চাহিদা করিলে, পাট কলগুলি তাহাদের পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়। যুদ্ধের শেষে পাট কলগুলির সংখ্যা ১১২ এ পরিণত হয়।

ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব সমধিক। অবিভক্ত ভারতের পক্ষে কাঁচাপাটের উৎপাদনে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ ছিল এবং ডাণ্ডিতে পাট কল থাকিলেও, উহাকে ভারতের কাঁচাপাট রপ্তানীর উপর নির্ভর করিতে হইত। পাটজাত সামগ্রীও ভারত হইতে রপ্তানী হইত; ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের উহা সমধিক পুষ্টি সাধন করিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাঁচা তুলা ও তুলাজাত সামগ্রীর রপ্তানী ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের; কাঁচা পাট এবং পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানী ছিল উহার নিম্নে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কাঁচাতুলা এবং তুলার

সামগ্রী রপ্তানী হইত ৪৯।৫০ কোটি টাকার মতন এবং পাট ও পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানী হইত ৩০।৩২ কোটি টাকার মতন। যুদ্ধের শেষে এই পারস্পরিক গুরুত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী-বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান উপকরণে পরিণত হয়। শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধোত্তর যুগে দুর্লভ মুদ্রা সংগ্রহের সমস্যা একটি বৃহৎ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; পাট সামগ্রীর রপ্তানী ভারতকে এই দুর্লভ মুদ্রা অর্জ্জনে বিশেষ সহায়তাও করিয়া থাকে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত হইলেও প্রায় ৬ লক্ষ ব্যক্তির কর্ম্মসংস্থানের দ্বারাও পাট শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং বর্ত্তমানে ভারতীয়গণই এই শিল্পের সংখ্যাধিক অংশীদার।

বর্ত্তমান সমস্যা

পাট শিল্পের ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের সমস্যা প্রধানতঃ, তিনটি। প্রথমতঃ; কাঁচা পাটের সমস্যা; দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতা, তৃতীয়তঃ, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ।

(১) ***কাঁচা পাটের সমস্যা***—কাঁচা পাটের সমস্যা দেশবিভাগের দ্বারাই সৃষ্ট কারণ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যায় পাট উৎপন্ন হইলেও, পূর্ব্ববঙ্গই (পূর্ব্ব পাকিস্থান) হইল পাট উৎপাদনের প্রধানতম এলাকা। অতএব পাটকলগুলি যেক্ষেত্রে ভারতে অবস্থিত, কাঁচাপাট উৎপাদনের প্রধান এলাকা সেক্ষেত্রে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। পাকিস্থানের সহিত বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় কাঁচা পাট প্রাপ্তির জন্য এরূপ একটি বিদেশের উপরে আমাদের পাট শিল্পকে নির্ভর করিতে হইয়াছে, যাহার সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অনিশ্চিত। ভারতের পাট কলগুলিতে বৎসরে ৬০।৬৫ লক্ষ গাঁইট (bale) কাঁচা পাট প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন কারণে কিছু কাঁচাপাট রপ্তানী করাও ভারতের পক্ষে প্রয়োজন হয়। সুতরাং মোট পাটের প্রয়োজন প্রায় ৯০ লক্ষ গাঁইটের মত। সুতরাং ভারতকে বাধ্য হইয়াই পাকিস্থানের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল। দেশ বিভাগের সময়ে উভয় দেশের মধ্যে একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি (Standstill Agreement) সম্পাদিত হইলেও ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসেই পাকিস্থান ভারতে তাহার পাট রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য্য করিল এবং ভারতও পাকিস্থানের সহিত বাণিজ্যকে বৈদেশিক বাণিজ্যের পর্য্যায়ে স্থাপন করিল। ফলে কাঁচাপাট সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। কিছুকাল পরে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের দ্বারা অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় কিন্তু ১৯৪৯ সালে ভারত মুদ্রামান হ্রাস করিলে এবং পাকিস্থান উহা করিতে অস্বীকৃত হইলে পাকিস্থানী পাটের দাম অত্যন্ত চড়িয়া গেল, পাকিস্থানী টাকার হিসাবে ১০০ টাকার পাট ভারতীয়

টাকার হিসাবে ১৪৪ টাকার সমান হইল। উপরন্তু এই সময়ে পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের কাঁচা পাটের ন্যূনতম দাম বাঁধিয়া দিলেন এবং এই দাম বজায় রাখিবার জন্ম নিজেরাই কাঁচাপাট ক্রয় করিতে লাগিলেন। সুতরাং ভারতের পক্ষে পাট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ম ভারত সরকার ভারতীয় পাটকল সমিতির (Indian Jute Mills Association) সহিত পরামর্শক্রমে দেশজ পাটের উর্দ্ধতম দাম বাঁধিয়া দিলেন। মিলগুলিতে কাঁচাপাট সরবরাহে রেশনিং ব্যবস্থা করিলেন এবং কাঁচা পাট রপ্তানীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিলেন।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সহিত পুনরায় বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা কাঁচাপাট আমদানীর চেষ্টা হইতে লাগিল এবং অপরদিকে দেশের মধ্যে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৯৫১, '৫২, '৫৩ এবং ১৯৫৫ সালের বাণিজ্য চুক্তিগুলির দ্বারা যথাক্রমে ১০ লক্ষ, ২৫ লক্ষ, ১৮ লক্ষ এবং ১৮ লক্ষ গাঁইট পাট আমদানীর আয়োজন করা হইয়াছিল। চুক্তি এইরূপ হইলেও প্রকৃত আমদানী কিন্তু এইরূপ হইতে পারে নাই। যথা ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্তান হইতে আমদানী হইতে পারিয়াছিল ১২ লক্ষ গাঁইট মাত্র।

দেশের মধ্যে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল যে সকল পদ্ধতির দ্বারা সেগুলি হইল পতিত জমি উদ্ধার করিয়া পাট চাষ করা, কিছুটা ধানের জমি পাটের জমিতে বদল করিয়া, কোন কোন অঞ্চলে দুইবার ফসল উৎপাদন করিয়া (double cropping), কৃত্রিম সার প্রয়োগ, চারা রক্ষা ব্যবস্থা (plant protection) ইত্যাদি। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৩ লক্ষ গাঁইট, পর বৎসর উহা প্রায় ৪৭ লক্ষ গাঁইটে পরিণত হয় কিন্তু উহার পর হইতে উৎপাদন কমিয়া যাইতে থাকে এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা ২৯ লক্ষ গাঁইটে পরিণত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪১ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়; ইহার সহিত মেস্তা উৎপাদন হইয়াছে অনুমান হয় ১১ লক্ষ ৫৯ হাজার গাঁইট পাট। ১ম পরিকল্পনায় পাট উৎপাদনের ভাগ্ ধরা হইয়াছিল ৫১ লক্ষ গাঁইট কিন্তু এই ভাগ্-মত উৎপাদন হইতে পারে নাই। সুতরাং কাঁচাপাটের সমস্যা থাকিয়া গিয়াছে—যদিও পুর্ব্বের ন্যায় অত্যুগ্রভাবে নহে। কারণ পাটজাত বস্তু তৈয়ারী বৃদ্ধি না করিবার নীতিও গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতা—বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পাট সামগ্রীর আধিপত্যই এতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাট-সামগ্রী (jute manufactures) ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ এবং দেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় ডলার উপার্জ্জনের ক্ষেত্রেও ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। সেই কারণে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে ভারতীয় পাটজাত বস্তুর প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বজায় রাখা

শুধু পাট শিল্পের-জন্যই নহে, দেশের সমগ্র অর্থনীতির জন্যই প্রয়োজনীয়। ভারত সরকার সেই কারণে দেশের অন্যান্য বস্তুর সহিত কাঁচাপাট এবং পাট সামগ্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিয়াছিলেন। পাট-সামগ্রীর উপর কিন্তু বরাবরই রপ্তানী শুল্ক আরোপিত ছিল ; ঐ রপ্তানী শুল্ক বৈদেশিক ব্যবসায়ী-দিগের উপরে পড়িত এবং সরকার উহা হইতে আয় করিতেন। কোরীয় যুদ্ধ সুরু হইলে পাটজাত সামগ্রীর আন্তর্জ্জাতিক চাহিদা অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশী বাজারে (এবং সেহেতু দেশীয় বাজারে) পাটসামগ্রীর মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইল। বহির্বাজারে পাটসামগ্রীর এই বর্দ্ধিত মূল্যের সুযোগ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে উহার উপর রপ্তানী শুল্ক টন প্রতি ১,৫০০৲ টাকা করা হইল এবং কাঁচা পাট ও পাট সামগ্রীর উপর সরকার নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেন। বহির্বাজারে পাটের উচ্চ দর কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হইল না ; ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে আমেরিকার মাল-সঞ্চয় (stock-piling) বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটের দামে পতন ঘটিতে লাগিল।

এই ঘটনা ভারতের পাটশিল্প কতখানি বহির্বাজারের উপর নির্ভরশীল তাহা দেখাইয়া দিল। বস্তুতঃপক্ষে ভারতে পাটকলগুলিতে যত পাটসামগ্রী উৎপাদিত হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৮৪ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়, শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। বৈদেশিক বাজারের উপর এই অত্যধিক নির্ভরশীলতা এই শিল্পকে প্রচুর অনিশ্চয়তা প্রদান করে।

সম্প্রতি এই অনিশ্চয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার তিনটি কারণ : (ক) পরিবর্ত্ত-সামগ্রী ব্যবহারের চেষ্টা বৈদেশিক বাজারে প্রসার লাভ করিতেছে। প্রধান পরিবর্ত্ত-সামগ্রী (substitutes) হইল কাগজের থলে এবং কাপড়ের থলে। এই শিল্পগুলি বিদেশে প্রসার লাভ করিতেছে। (খ) ইউরোপীয় দেশগুলিতে পাটের কল স্থাপিত আছে এবং ইহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করিয়া দক্ষ হইয়া উঠিতেছে। মিশর, ইরাণ, ইরাক, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন্স এবং চীনদেশেও ছোট ছোট পাটকল স্থাপিত হইয়াছে ; (গ) আন্তর্জ্জাতিক বাজারে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পাকিস্থানের আবির্ভাব ঘটিতেছে। পাকিস্থানে অতি উৎকৃষ্ট জাতের পাট জন্মায় এবং পাকিস্থানের চটকলগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করা হইতেছে।

বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পাটসামগ্রীর কাট্‌তি বজায় রাখিবার জন্য তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। (ক) রপ্তানী শুল্ক পরিবর্ত্তন—বৈদেশিক বাজারে ভারতের পাট সামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যাইতে থাকিলে ভারত সরকার পাট সামগ্রীর উপর রপ্তানী শুল্ক ক্রমশঃ কমাইতে থাকেন। অবশেষে ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্থান মুদ্রামান হ্রাস (devaluation) করিলে ভারতীয় পাট

সামগ্রীর প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য ভারত সরকার পাট সামগ্রী রপ্তানীর উপর হইতে শুল্ক প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। (খ) ভারতীয় চটকল সমিতি বিভিন্নদেশে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড) সদিচ্ছা দল (goodwill mission) পাঠাইয়া ভারতীয় পাট সামগ্রীর বিদেশে জনপ্রিয়তা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (গ) বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা (রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভেকিয়া, ইতালি এবং নরওয়ে) পাট সামগ্রীর কাটতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সমস্যা—ভারতের পাটকলগুলিতে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে তাহা অনেক পুরাতন হইয়া গিয়াছে। নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা এই সকল যন্ত্রপাতি বদলী না করিলে ব্যয় সঙ্কোচের ভিত্তিতে উৎপাদন সম্ভব হইবে। সেক্ষেত্রে পাকিস্থানের সহিত এবং ইউরোপীয় দেশগুলির আধুনিক যন্ত্র-সজ্জিত পাটশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমানে এদেশে কিছু কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি বসাইবার কার্য্য চলিতেছে।

২য় পরিকল্পনায় উন্নয়ন—১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে ১২ লক্ষ টন পাট সামগ্রী উৎপাদন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালে উৎপাদন হইয়াছে প্রায় ১১ লক্ষ টন। ২য় পরিকল্পনাতেও ১২ লক্ষ টনই উৎপাদনের তাগ্ ধরা হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োগে বর্ত্তমান কলগুলির দ্বারাই উৎপাদিত হইবে। নূতন মিল স্থাপন বা পুরাতন মিলের সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হইবে না। একমাত্র আসাম জুট মিল নামে একটি নূতন মিল স্থাপিত হইবে; ইহার জন্য ব্যয় হইবে ১'৫ কোটি টাকা। তবে আধুনিকীকরণের (modernisation) ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে।

বস্ত্র শিল্প—Cotton Industry

Q. Give a short account of the cotton textile industry of India. Discuss its present position and the urgent need for rationalisation of the industry (Patna. 1955)

ভারতে কাপড়ের কল স্থাপিত হয় সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় ১৮১৮ সালে। তবে ১৮৫১ সাল হইতেই ইহার যথার্থ প্রসার হইতে থাকে। ঐ সালে বোম্বাই প্রদেশে একটি মিল স্থাপিত হয় এবং তাহার পর হইতে অন্যান্য স্থানে (যথা আমেদাবাদ, নাগপুর, বাঙ্গালা) ঐ শিল্প স্থাপিত হইতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলন বস্ত্রশিল্পকে বিশেষভাবেই পরিপুষ্ট করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৭। বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে স্মরণীয় বিষয় হইল যে ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীয় উদ্যোগেই এই শিল্পের প্রসার লাভ

ঘটিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে বস্ত্রশিল্পের বিশেষ প্রসার লাভ ঘটে কিন্তু তাহার পরেই সস্তা জাপানী বস্ত্রের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হওয়ায় ইহার শোচনীয় অবস্থা ঘটে। ভারত সরকার ১৯২৭ সালে বস্ত্রশিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করেন। ১৯৪০ সালে ভারতে ৩৮৮টি মিল ছিল এবং উহাতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ছিল চার লক্ষ ত্রিশ হাজারের মতন; ১৯৩৯-৪০ সালে কাপড়ের কলগুলিতে মোট বস্ত্র উৎপাদন হইয়াছিল ৪০০ কোটি গজের কিছু অধিক। যুদ্ধের পরে ১৯৪৬ সালে মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১১ এবং উহাতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ৫ লক্ষের উপর। ১৯৪৫-৪৬ সালে এই সকল মিলে বস্ত্র উৎপাদন হইয়াছিল প্রায় সাড়ে ছয় শত কোটি গজ। দেশ বিভক্ত হইবার ফলে ১২টি কাপড়ের কল পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট কলগুলি পড়িয়াছিল ভারতের মধ্যে। কিন্তু দেশ-বিভাগ ভারতকে বিস্তৃত আয়তনের তুলা চাষের জমি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল; বিশেষ করিয়া লম্বা আঁশের তুলা (Long staple cotton) সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারীর জন্য অপরিহার্য্য। অথচ এইরূপ তুলা উৎপাদনের অঞ্চল পাকিস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনাকালের প্রারম্ভে আমাদের দেশে সুতাবয়ন মিল ছিল ১০৩টি এবং মিশ্র-কার্য্যের মিল (Composite mills) ছিল ২৭৫টি; ইহাদের টাকুর (spindles) এবং তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,০৯,৪২,২৪১ এবং ১,৯৪,৪১১। প্রথম পরিকল্পনার নীতি ছিল টাকু বৃদ্ধি, যাহাতে সুতা উৎপাদন হইতে পারে বেশী কিন্তু মিল তাঁতের বৃদ্ধি যথাসম্ভব হইতে না দেওয়া (যাহাতে হস্তচাঁত শিল্পের সম্প্রসারণ হয়)। যাহা হউক ১৯৫৬ সালে সুতাবয়ন মিলের এবং মিশ্র ধরণের মিলের যথাক্রমে সংখ্যা দাঁড়ায় ১২১ এবং ২৯১। প্রথম পরিকল্পনাকালে টাকু বৃদ্ধি পাইয়াছে ১,১০৪,৯৬৮টি, এবং তাঁত বৃদ্ধি পাইয়াছে ৮,৪৯০টি। ইহা প্রথম পরিকল্পনার ভাগ্ অপেক্ষাও বেশী; ইহা সম্ভব হইয়াছে কতিপয় অলাভ-জনক মিলের সম্প্রসারণের দ্বারা এবং কতিপয় নিছক সুতাবয়নকারী মিলকে মিশ্র ধরণের মিলে পরিণত করিবার দরুণ। ১৯৫৬ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ১০টি সুতাবয়নকারী এবং ১৭টি মিশ্র ধরণের মিল আছে, ইহাদের টাকুর সংখ্যা ৫,০৭,৪২৯ এবং তাঁতের সংখ্যা ৯,১১৫। সবথেকে বেশী সংখ্যক মিল আছে বোম্বাইতে—ঐস্থানে (আমেদাবাদ সমেত) সুতাবয়নকারী মিল আছে ২১টি এবং মিশ্র মিল আছে ১৫৯টি।

প্রথম পরিকল্পনাকালে মিলজাত সুতা এবং বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে মিলজাত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ৪০৭ কোটি ৬০ লক্ষ গজ, ১৯৫৫ সালে উহা ৫০৯ কোটি ৪০ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছিল। এত

বেশী উৎপাদন ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই—ইহা পরিকল্পনার তাগ্ (৪৭০ কোটি গজ) অপেক্ষাও অনেক বেশী। সূতার উৎপাদন ছিল ১৯৫১ সালে ১৩০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯৫৫ সালে উহা ১৬৩ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছিল এবং ১৯৫৫ সালে উহা ১৬৪ কোটি পাউণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। (ইহা ছাড়াও হস্ত তাঁত এবং শক্তি-তাঁতের ক্ষেত্রেও উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে)।

যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর কালে মিলজাত বস্ত্রের বিক্রয়ের উপর নানারূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপিত ছিল। ১৯৫২ সালের পর হইতে ক্রমশঃই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করা হইতে থাকে। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাস নাগাদ মিল বস্ত্রের বণ্টনের উপর এবং দামের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তবে হস্ততাঁত শিল্পের স্বার্থে মোট উৎপাদনের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ সংরক্ষিত রাখা হইল। ঐ সময়ে মিলজাত সূতার বিক্রয় এবং দামের উপরে নিয়ন্ত্রণও উঠাইয়া দেওয়া হইল।

বস্ত্রশিল্পের প্রধান সমস্যা হইল কাঁচাতুলার সমস্যা, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের সমস্যা, বাজারে প্রতিযোগিতার সমস্যা এবং একদিকে কারখানা-শিল্প ও অন্যদিকে হস্ততাঁত শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যা।

কাঁচাতুলার সমস্যা—দেশ বিভাগের দরুণ কাঁচা তুলার সমস্যা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; পাকিস্থান সৃষ্টি ভারতকে বিস্তীর্ণ আয়তনের তুলা চাষের জমি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল; বিশেষ করিয়া লম্বা আঁশের তুলা (Long staple cotton) সুক্ষ্ম বস্ত্র তৈয়ারীর জন্য অপরিহার্য্য অথচ এইরূপ তুলা উৎপাদনের অঞ্চল পাকিস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কাঁচাতুলার এই দুষ্প্রাপ্যতা বস্ত্রশিল্পের প্রধান বাধারূপে দেখা দিয়াছিল। ভারতকে সেই কারণে বৈদেশিক তুলা আমদানির উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছিল। অতএব প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তুলা চাষ বৃদ্ধির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ফলে তুলার উৎপাদন ২৯ লক্ষ ৭১ হাজার গাঁইট হইতে (১৯৫০-৫১) ৪২ লক্ষ ২৯ হাজার গাঁইটে পরিণত হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির অধিকাংশই লম্বা আঁশের তুলার ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে—এইরূপ তুলার উৎপাদন দ্বিগুণ হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি হইলেও সম্প্রসারণশীল বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। সেইজন্য বিদেশ হইতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করিতে হয়—আফ্রিকা এবং আমেরিকা হইতে এই আমদানি করা হইয়া থাকে।

যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সমস্যা—যুদ্ধের সময়ে সকল কল-কারখানার সহিত কাপড়ের কলগুলিকেও যথাসাধ্য বেশী করিয়া খাটানো হইয়াছে

কিন্তু পুরাতন কলকব্জা বদল করা হয় নাই। যুদ্ধশেষে পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন এবং নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজন অত্যন্ত প্রকটিত হইয়াছিল কিন্তু সেই অনুপাতে মিলগুলির মূলধনী-ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা ছিল এবং আছে কিনা সন্দেহ। ১৯৪৯-৫০ সালের ফিসক্যাল কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন যে প্রচলিত-দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে কেবলমাত্র বোম্বাইস্থিত মিলগুলির নূতন কলকব্জার জন্য ১০০ কোটি টাকার মত ব্যয় প্রয়োজন—যখন নাকি তাহাদের হাতে ব্যয়যোগ্য নগদের পরিমাণ ৪৫ কোটি টাকার বেশী হইবে না। ১৯৫০ সালে বয়ন শিল্পের জন্য একটি ওয়ার্কিং পার্টি নিয়োগ করা হইয়াছিল ; এই পার্টি সুপারিশ করিয়াছিল যে যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামী সামগ্রীর পুনরুজ্জীবন এবং কতিপয় কারখানাগৃহের পুনর্নির্ম্মাণের কাজ খুবই বেশী প্রয়োজন। কিন্তু মিলগুলির সংরক্ষিত তহবিল এই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যাহাই হউক ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে বড বড মিলগুলি কর্ত্তৃক যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারত সরকারের দ্বারা সংগঠিত একটি সমীক্ষা সংস্থা (survey unit) মিলগুলির আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। কাপড়ের মিলগুলির আধুনিকীকরণের কার্য্যে আর্থিক সহায্য প্রদানের দায়িত্ব "জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের" উপরেও (National Industrial Development Corporation) অর্পিত হইয়াছে। কি হারে যন্ত্র বদলী করিবার প্রয়োজন হইবে সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান চলিতেছে—ইহার দ্বারা বয়নযন্ত্র উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নের কর্ম্মসূচী রচনা করা যাইবে।

বাজারে প্রতিযোগিতার সমস্যা—ভারতে উৎপাদিত বস্ত্রের বেশ কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া এই শিল্পের পরিপোষণ করে। কিন্তু পৃথিবীর যে সকল দেশে কাঁচাতুলা উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহারা বর্ত্তমানে নিজেদের বয়নশিল্প গডিয়া তুলিতেছে। সম্প্রতি ব্রেজিল, মেক্সিকো, আর্জ্জেণ্টিনা, মিশর গ্রীস প্রভৃতি দেশে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ছাট কাপড়ের (piece goods) রপ্তানীকারক দেশরূপে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে জাপানের পুনঃ প্রবেশ ঘটিয়াছে। এদিকে পাকিস্থানও আধুনিক যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত শক্তিশালী বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতেছে। এই সকল কারণে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বাজার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইবে এবং ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবে। ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৎসরে ১০০ কোটি গজ কাপড রপ্তানীর তাগ্ ধরা হইয়াছিল কিন্তু বাস্তবে এই তাগ্ বজায় রাখা যায় নাই। ১৯৫৪-৫৫ সালে ৮১ কোটি ৩০ লক্ষ গজ কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল। রপ্তানী বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবার জন্য ভারত সরকার কোন কোন ধরণের কাপড়ের উপর রপ্তানী শুল্ক কমাইয়া দিয়াছেন এবং

কোন কোন ধরণের উপর উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য উপায়েও (যথা উৎকর্ষ মান—quality standard—নির্দ্ধারণ) রপ্তানী বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। তবে বস্ত্রশিল্পের দেশের বাজারও অনেক বিস্তৃত এবং ২য় পরিকল্পনার অগ্রগতির সহিত আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

কারখানা শিল্প ও তাঁতশিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যা— বিভিন্ন কারণে এদেশে তাঁত শিল্পকে বজায় রাখা একান্তই প্রয়োজন কিন্তু কাপড়ের কলগুলি একদিকে তাঁত শিল্পের অনুপূরক, আর একদিকে তীব্র প্রতিযোগী; মিলের সুতা তাঁতীদের প্রয়োজন কিন্তু মিলের বস্ত্র তাঁতীদের প্রতিযোগী। এমন যদি করা যাইত যে মিলগুলি কেবলমাত্র সুতা কাটিবে এবং একমাত্র তাঁতেই ঐ সুতা হইতে কাপড় বোনা হইবে তাহা হইলে তাঁতীদের অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে, কারণ মিলজাত বস্ত্রও অবশ্য প্রয়োজন। অথচ তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য কার্য্যকরী নীতি গ্রহণেরও একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরিকল্পনা কমিশন সেই জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন যে কাপড়ের কলগুলিতে তাঁত বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইবে না, টাকু বৃদ্ধির (সুতা কাটার প্রয়োজনে) অনুমতি দেওয়া হইবে এবং মোট বস্ত্র উৎপাদনের একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ তাঁত শিল্পের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে। প্রথম পরিকল্পনাকালে উৎপাদনের অভিন্ন কর্ম্মসূচীর এই নীতি (Common production programme) অনুসরণ করা হইয়াছিল। ১ম পরিকল্পনায় মিলবস্ত্রের উৎপাদন তাগ্ ধরা হইয়াছিল ৪৭০ কোটি গজ এবং তাঁত শিল্পের উৎপাদন তাগ্ ধরা হইয়াছিল ১৭০ কোটি গজ। ১৯৫২ সালে মিলবস্ত্রের উৎপাদন হইয়াছিল ৪৬০ কোটি এবং ১৯৫৩ সালে ৪৮৭ কোটি গজ; ঐ দুই বৎসরে হস্ততাঁত শিল্পে উৎপাদন হইয়াছিল ১১১ কোটি এবং ১২০ কোটি গজ। ১৯৫২ সালে একটি অর্ডিনান্স দ্বারা মিলগুলির উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহারা যেন ১৯৫১-৫২ সালে যত পরিমাণ পাড়-বিশিষ্ট ধুতি উৎপাদন করিয়াছে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র ইহার পর হইতে উৎপাদন করে। ১৯৫৩ সালে এই অর্ডিনান্সটি আইনে পরিণত করা হয় এবং ঐসালেই মিলবস্ত্রের উপর গজ প্রতি এক পয়সা করিয়া উৎপাদন শুল্ক (excise duty) আরোপ করা হয়। এই শিল্প তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫০-৫১ সালে একটি আদেশ জারী করিয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ধরণের কাপড় শুধুমাত্র তাঁত শিল্পেই উৎপাদন হইতে পারিবে বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নের কার্য্যক্রমস্বরূপ স্থির করা হইয়াছে যে এই সময়ের মধ্যে মাথাপিছু গড় কাপড়ের ব্যবহার বর্ত্তমানের ১৬গজ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৮ গজে পরিণত করা হইয়াছে এবং বৎসরে ১০০ কোটি

গজ রপ্তানী করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে মিল বস্ত্র উৎপাদিত হইবে ৫০০।৫৫০ কোটি গজ এবং তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হইবে ৩০০।৩৫০ কোটি গজ। • •

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—Iron and Steel Industry

Q. Give a brief description of the iron and steel industry of India and the steps taken by the Government of India to step up production of iron and steel in India (Patna 1955)

ভারতের আধুনিক লৌহ শিল্প সুরু হয় ১৮৭৪ সাল হইতে; ঐ সালে আসানসোলের নিকট বরাকর নামক স্থানে "বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস" স্থাপিত হয়। ১৮৭৫ সালে বারাকপুর আয়রণ কোম্পানী নামে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। পরে ইহার নামকরণ হয় "বেঙ্গল আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী"। ১৮৮৯ সালে ইহা বরাকর লৌহ কারখানাটি গ্রহণ করে। ইহার দশ বৎসর পরে এই কোম্পানী কারবারে লাভ দেখাইতে সক্ষম হয়; সেই বৎসরে লৌহের উৎপাদন ছিল ৩৫০০০ টনের মতন। কিন্তু ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত প্রসার সুরু হয় ১৯০৭ সালের পর। ঐ সালে সিংভুম জিলার সাক্চী নামক স্থানে "টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্" স্থাপিত হয়। পরে ঐ স্থানটির নাম হইয়াছে জামসেদপুর। এই স্থানে লৌহ উৎপাদন হয় ১৯১৩ সালে এবং ইস্পাত উৎপাদন হয় ১৯১৩ সালে। ইহার কিছুকাল পরেই প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হয় এবং ইহার সুযোগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করে, কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতের মধ্যে এবং বাহিরে (মধ্যপ্রাচ্য দেশসমূহের রণাঙ্গনে) বর্দ্ধিত পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত জাত সামগ্রী বিক্রয় করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৯১৮ সালে "ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানী" স্থাপিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরেই এই শিল্পকে কঠোর বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় এবং ১৯২৪ সালে ভারত সরকার এই শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করেন। সংরক্ষণের আওতার মধ্যে থাকিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছিল ১৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টন এবং ইতিমধ্যে এই সামগ্রীর রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার লাভ করে; বিদেশী ক্রেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাধিক পরিমাণ গ্রহণ করিত জাপান এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক দেশ ছিল ব্রিটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। ঐ সালে কাঁচা ইস্পাত উৎপাদন হইয়াছিল ৬ লক্ষ ৬১ হাজার টন এবং তৈরী ইস্পাত উৎপাদন হইয়াছিল ৬ লক্ষ ৮১ হাজার টন; ইতিমধ্যে ১৯৩০ সালে ভদ্রবাটিতে মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে "ষ্টীল কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল" গঠিত হয় ও ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর সহিত যুক্ত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে। যুদ্ধের 'তাগিদে এই শিল্পজাত সামগ্রীর চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধাবস্থায় বিদেশ হইতে আমদানী হ্রাস পায়। সরকারও নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থান রক্ষা করিবার জন্ত আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকার লৌহ ও ইস্পাতের দাম নিয়ন্ত্রণ করিলেও বাজারে উহার দাম অত্যধিক চড়িয়া যায়। এই সকল কারণে যুদ্ধের সময়ে এই শিল্প এরূপ উন্নতি লাভ করে যে যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই শিল্পের উপর হইতে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৫২ সালের কারখানা শিল্প গণনা (Census of manufacturing Industries) অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৩৯টি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা রহিয়াছে। এইগুলি প্রধানতঃ বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, রাজস্থান এবং আসামে অবস্থিত।* কিন্তু এইগুলির মধ্যে তিনটি কারখানাই প্রধান: (ক) টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী (জামসেদপুর); (খ) ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী (হিরাপুর ও কুলটি)—ইহার সহিত ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ষ্টীল কর্পোরেশন অফ্ বেঙ্গল (বার্ণপুর) একীভূত (amalgamated) হইয়াছে; (গ) মহীশূর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্; ইহার মালিক হইলেন মহীশূর রাজ্য সরকার।

এই শিল্পটি ভারতীয় মূলধন এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপনার দ্বারা পরিচালিত। বর্ত্তমানে এই শিল্পে প্রায় ২৫ কোটি টাকার পুঁজি নিয়োজিত আছে এবং ইহাতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। তথাপি ভারত কিন্তু ইস্পাত উৎপাদনে আত্মপর্য্যাপ্ত হইতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার প্রয়োজনীয়তা যখন একান্তভাবেই অনুভূত হইতেছে এবং উহার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়াস করা হইতেছে তখন লৌহ ও ইস্পাতের ন্যায় মৌলিক সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় উহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। বৎসরে যেস্থানে ইস্পাতের চাহিদা ২৫।৩০ লক্ষ টন, সে স্থলে ১৯৪৭ সালে উৎপাদন হইয়াছিল ৯ লক্ষ টনেরও কম। পরন্তু, যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন কারণে এই শিল্পের উৎপাদন বিশেষ ভাবেই হ্রাস পাইয়াছিল—কয়লার অভাব, যানবাহনাদির অসুবিধা, শ্রমিক ধর্ম্মঘট প্রভৃতি হইল ইহার কারণ। শ্রমিক ধর্ম্মঘটের দ্বারা ১৯৪৬-৪৭ সালে কেবলমাত্র "ষ্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল"এ ১ লক্ষ টন ইস্পাত কম উৎপাদন হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল শতকরা ৬৮ ভাগ মাত্র।

* "India—1956". P. 212

সম্প্রতি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও প্রয়োজনের তুলনায় ইহাও যথেষ্ট নহে। প্রথম পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী-গুলির সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের বিভিন্ন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছিল। টাটা কোম্পানীর উন্নয়নের লক্ষ্য ছিল বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন ক্ষমতা ৯,৩১,০০০ টনে পরিণত করা ; ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল কোম্পানীর উৎ-পাদন ক্ষমতা বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের ক্ষেত্রে ৭ লক্ষ টনে এবং অবিশুদ্ধ লৌহ পিণ্ডের ক্ষেত্রে ৪লক্ষ টনে পরিণত করা, এবং মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা তৈয়ারী ইস্পাতের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টনে পরিণত করা। ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে টাটা কোম্পানীর উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করা হইয়াছে ৩৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা, ভারতীয় লৌহ ইস্পাত কারখানার জন্য ১৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা এবং মহীশূর কারখানার জন্য ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। সম্প্রসারণের কর্ম্মসূচী রূপায়ণের প্রয়োজনীয় অর্থ ইহারা পাইয়াছে সরকারের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ হইতে, নিজেদের অবণ্টিত মুনাফা এবং ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ড্ হইতে, স্বল্প মেয়াদী ঋণ ও চল্তি মূলধন হইতে এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঋণ হইতে। সরকার সমতাবিধায়ী তহ্বিল (Equalisation Fund) হইতে "বিশেষ দাদন" (special advance) রূপে অভিহিত একপ্রকার ঋণ প্রদান করেন, ইহার জন্য সুদ দিতে হয় না ; ইহা ছাড়া সুদ-বহনী কর্জ্জও সরকার প্রদান করিয়াছেন। কোম্পানীগুলির নিজস্ব তহ্বিল হইল ডিপ্রিসিয়েশন, প্ল্যাণ্ট রিহ্যাবিলিটেশন, ডেভালেপমেণ্ট রিজার্ভ এবং অন্যান্য রিজার্ভ। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়ান আয়রণকে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার ঋণ প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা হইতে কিছু অর্থ ব্যবহৃত হয়।

চাহিদা ও উৎপাদন—প্রথম পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল যে ইস্পাতের চাহিদা ১৯৫১ সালের ২৩ লক্ষ টন হইতে ১৯৫৭ সাল নাগাদ ২৮ লক্ষ টনে পরিণত হইবে। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালের পর হইতে ইস্পাতের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় ; ঐ সালে একমাত্র রেলপথেরই চাহিদা ছিল ৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন। সঠিক হিসাব সম্ভব না হইলেও বর্ত্তমানে এদেশে ইস্পাতের চাহিদা ২৫ লক্ষ টনের কম নহে। (দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে এই চাহিদা দ্বিগুণে পরিণত হইবে।) ইহার তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছে ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন। পূর্ব্বেকার তুলনায় ইহা উৎপাদন বৃদ্ধি বটে*, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম।

*ইহার পূর্ব্বেকার কয়েকবৎসর উৎপাদন হইয়াছিল এইরূপ ; ১৯৫১-৫২—১৯ লক্ষ টন ; ১৯৫২-৫৩—১১ লক্ষ ৩০ হাজার টন ; ১৯৫৩-৫৪—১১ লক্ষ ৩ হাজার টন ; ১৯৫৪-৫৫—১২ লক্ষ ৭০ হাজার টন।

আমদানী রপ্তানী—চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে প্রচুর ফাঁক থাকিবার দরুণ বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী করিতে হইয়াছে। এই আমদানীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৪ সালে ইস্পাত আমদানী হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টন, ১৯৫৫ সালে উহা ৯ লক্ষ ৪ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। অপরিহার্য্য প্রয়োজনে (essential commitments) অল্প পরিমাণে কিছুটা অবিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড (pig iron) এবং ইস্পাত রপ্তানী করিতে হইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে রপ্তানী হইয়াছিল অবিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড—২৬০৭২ টন, লৌহ বা ইস্পাতজাত দ্রব্য—৪৩০৭ টন, এবং ভাঙ্গালৌহটুক্‌রা (scrap)—৫৬,৭২৮ টন। সাধারণতঃ, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তি (bilateral trade agreements) পালনের স্বার্থে এইরূপ রপ্তানী করা হইয়াছে।

নিম্নতম দাম ও বাজার দাম—ইস্পাতের প্রধান উৎপাদনকারীগণ কিদামে তাহাদের উৎপাদিত ইস্পাত ছাড়িবে তাহার নিম্নতম হার বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; ইহাকে retention price বলা হইয়া থাকে। আবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐ সামগ্রীর বিক্রেতাগণ কি দামে উহা বিক্রয় করিবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাখা-দাম (retention) এবং বিক্রয়দামের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সরকার সংগ্রহ করিয়া "সমতাবিধায়ী তহ্‌বিল" (Equlisation Fund) নামে একটি বিশেষ তহ্‌বিলে জমা করেন। রাখা-দাম এবং বিক্রয়দামের মধ্যে পার্থক্যসৃষ্টি করিবার প্রধান কারণ হইল যে বিদেশ হইতে আমদানী-কৃত ইস্পাতের দাম দেশীয় ইস্পাতের দাম অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং দেশীয় ইস্পাতের বিক্রয়দাম বাড়াইয়া আমদানী ইস্পাতের দামের দিকে লইয়া যাওয়া হয়, আবার সমতাবিধায়ী তহ্‌বিল হইতে অর্থ সাহায্য দিয়া আমদানী ইস্পাত দেশের মধ্যে কিছুটা কম দামে বিক্রয় করিতে পারা যায়। আবার এই তহ্‌বিল হইতে ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের অর্থ যোগানো যায়। রাখা-দাম বাড়াইবার অনুমতি দিলে উহা হইতেও ইস্পাত শিল্প নিজের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় কিছুটা অর্থ পায়। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬০ সালের মার্চ্চ মাস—এই সময়ের জন্য রাখা-দাম টন প্রতি ৩৯৩ টাকা স্থির করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন—দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য শুধু বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকা হইবে না। বেসরকারী কারখানাগুলির সম্প্রসারণ তো করা হইবেই, অধিকন্তু সরকারী উদ্যোগে কতিপয় বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিয়াও ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণ করা হইবে।

বেসরকারী অংশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৫৫ কোটি টাকার

মতন মোট বিনিয়োগ করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময় নাগাদ প্রথম ও আংশিকভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উন্নয়ন প্রচেষ্টা ফল দেখাইতে আরম্ভ করিবে। ঐ সময়ে টাটা কোম্পানী এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণের যুক্ত উৎপাদন বর্তমানের ১২ৄ লক্ষ হইতে ২৩ লক্ষ টনে পৌছাইবে। এই সম্প্রসারণের সঙ্গতি কিছুটা আসিবে ১৯৫৫ সালে নির্দ্ধারিত রাখা-দাম (retention price) হইতে। ইহা ছাড়া ইণ্ডিয়ান আয়রণ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত কর্জ কাজে লাগাইবে এবং ভারত সরকারের দ্বারা অনুমোদিত ঋণের টাকাও টানিবে। টাটা কোম্পানী বৈদেশিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাহায্য পাইবে বলিয়াও আশা করা হয়।

সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে; একটি উড়িষ্যার রাঢ়কেল্লায়, একটি মধ্যপ্রদেশের ভিলাই নামক স্থানে এবং তৃতীয়টি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। ইহাদের প্রত্যেকটি ১০ লক্ষ টন লৌহ ইঙ্গট (ingot) উৎপাদন হইতে পারিবে এবং একটিতে ফাউণ্ড্রি স্তরের অবিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড (pig iron) উৎপাদন হইতে পারিবে ৩ৄ লক্ষ টন। এই তিনটি ইস্পাত কারখানার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় হইবে ৩৫০ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জন্য ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।* সহকারী অংশের জন্য বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে ১৫ কোটি টাকার মতন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে সরকারী কারখানাগুলি হইতে ২০ লক্ষ টন তৈরী ইস্পাত পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

শর্করা শিল্প—Sugar Industry

১৯০৩ সালেই ভারতে সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতির শর্করা মিল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অবস্থায় বিদেশ হইতে শর্করা আমদানী হ্রাস পাওয়ায় এবং ঐ সময়ে শর্করা আমদানীর উপর অধিক শুল্ক আরোপিত থাকায় এই শিল্পের কিছুটা উন্নতি হইয়াছিল যদিও সমধিক নহে।

১৯৩২ সাল অবধি আমাদের চিনির প্রয়োজন অধিকাংশই জাভা এবং অন্যান্য বিদেশ হইতে আমদানীর দ্বারা মিটানো হইত। ১৯৩২ সালে এই শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। তাহার পর হইতে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর ভারত সরকার উৎপাদন শুল্ক আরোপ করিয়াছিলেন। ১৯৩১-৩২ সালে চিনির কলের সংখ্যা ছিল ৩১ এবং উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ৄ লক্ষ টনের কিছু উপর।

*Mysore Iron and Steel Works সরকারী অংশের অন্তর্ভুক্ত কারণ উহার মালিক হইলেন মহীশূর রাজ্য সরকার।

উহার চার বৎসরের মধ্যেই কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৫ এবং উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ লক্ষ টনেরও অধিক। ১৯৩৮-৩৯ সালে উৎপাদন ৬২ লক্ষ টনে পড়িয়া যায় কিন্তু পর বৎসর উহা দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চিনি শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া দেয় কিন্তু যে অনুপাতে ইহা ঘটে সেই অনুপাতে শিল্পটি উন্নত হইতে পারে নাই। চিনি উৎপাদকদিগের সিণ্ডিকেট নামে যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল উহা ক্রেতাদিগকে শোষণ করিবার জন্য যথেষ্ট সচেতন হইল এবং উৎপাদক অঞ্চলগুলির সরকার ঠিকমত পরিস্থিতি সামলাইতে পারিলেন না। সেই কারণে এক সময়ে যখন নাকি বাজারে প্রচুর পরিমাণে চিনির যোগান হওয়া উচিত ছিল তখনই দেশব্যাপী চিনির দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সরকার চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রযোগ করেন এবং উহার বরাদ্দ (Rationing) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও চিনির দাম অত্যন্ত উচ্চহারেই ছিল। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ্চ এই শিল্পের উপর হইতে সংরক্ষণ উঠাইয়া লওয়া হয়। ট্যারিফ বোর্ড এ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে সংরক্ষণের দ্বারা সরকার, শিল্প এবং চাষী—সকলের মধ্যেই একটা নিশ্চিন্ত আত্মসন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং শিল্পের উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনই চেষ্টা করা হয় নাই।

এতৎ সত্ত্বেও কিন্তু দেশের শিল্প সংগঠনের মধ্যে চিনি শিল্প যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্রশিল্প এবং পাট শিল্পের পরেই ইহার স্থান। ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাবে দেশের মধ্যে ১৬০টি চিনির কল আছে তবে ইহাদের মধ্যে চালু কল হইল ১৪৩টি। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই ১৪৩টি চিনির কলে ১৮ লক্ষ ২০ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। এই শিল্পে ৬০ কোটি টাকার পুঁজি খাটিতেছে এবং প্রায় ১ লক্ষ লোক উহা হইতে জীবিকা অর্জ্জন করে। চিনি শিল্পে ভারত এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে—পৃথিবীর আখ-চিনির শতকরা ২৬ ভাগ ভারতেই উৎপাদিত হয়। তথাপি কিন্তু এই শিল্পের অবস্থাকে সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করা যায় না। মোট উৎপাদিত আখের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র সরাসরি চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং জনপ্রতি গুড় এবং চিনির ব্যবহার ৩০ পাউণ্ড মাত্র—যেখানে প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার ১০০ পাউণ্ডও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রতিক কালে চিনির ব্যবহার বাড়িতেছে। যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর কালেও চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৯৫২ সালের শেষ দিকে এই নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হয় এবং চিনির চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়। এই বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য বাহির হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে; ১৯৫৪-৫৫ সালে

এদেশে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে।

চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, আখের চাষের প্রভূত উন্নতি প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট গুণের আখ উৎপন্ন করা প্রয়োজন এবং উৎপাদনের পরিমাণও বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, নূতন চিনির কল স্থাপন করা প্রয়োজন কিন্তু এরূপ স্থানে উহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে স্থানে উহাদের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, উপ-উৎপাদনগুলিকে (bye products) কাজে লাগাইবার জন্য যথোচিত আয়োজন এবং ইহার জন্য যথোচিত সংরক্ষণ প্রদান করাও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, উৎপাদন খরচা হ্রাস করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

এইসব দিকে কিছু কিছু প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫ লক্ষ টন চিনি উৎপাদনের তাগ্ ধরা হইয়াছিল। ১৯৫১-৫২ সালে প্রকৃত উৎপাদন প্রায় এই তাগের সমান হইয়াছিল কিন্তু পর বৎসর উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার টনে পরিণত হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে উহা আরও হ্রাস পাইয়া ১০ লক্ষ টনে পরিণত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদন হইয়াছে ১৫ লক্ষ ৯০ হাজার টন এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৮ লক্ষ ২০ হাজার টন। ১ম পরিকল্পনা কালে এই শিল্পে ১৫ কোটি টাকার মত বিনিয়োগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য হিসাব করা হইয়াছে যে ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ এদেশে মোট চিনির প্রয়োজন হইবে ২৫ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার জন্য চিনির কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানের ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার টন হইতে ২৫ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করা হইবে। এই কার্য্যে ৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন হইবে। ২য় পরিকল্পনাকালে ৩৫টি সমবায় চিনির কল স্থাপনের প্রস্তাবও অনুমোদন করা হইয়াছে।

কাগজ শিল্প—Paper Industries

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ মিশনারী ডাক্তার উইলিয়ম ক্যারী কর্তৃক ভারতে সর্ব্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছিল, তবে উহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ১৮৬৭ সালে বালিতে আর একটি কাগজের কল স্থাপিত হয় এবং কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে এবং বোম্বাইয়ে আরও কতিপয় কল স্থাপিত হয়। এই কলগুলি কাঁচামালরূপে ব্যবহার করিত পাট ও ছিন্ন বস্ত্র, পুরাতন কাগজ এবং মুঞ্জ ও সবাই ঘাস। বিদেশী কাষ্ঠ মণ্ড (wood pulp) হইতে তৈয়ারী কাগজের সহিত ইহারা প্রতিযোগিতা করিতে

পারিতেছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে বিদেশী কাগজের আমদানী বন্ধ হইবার দরুণ দেশীয় কাগজ শিল্প কিছুটা উন্নতি লাভ করে; কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পর পুনরায় তীব্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। ১৯২৫ সাল হইতে বংশ মণ্ড (bamboo-pulp) হইতে তৈয়ারী কাগজকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল, ১৯৪৭ সালে এই সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে ১৮টি কাগজের কল আছে; এইগুলি পুনা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, টিটাগড় কাঁকীনাড়া, রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। ১৯৫১ সালে ভারতে প্রায় এক লক্ষ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে কাগজ ও কাগজী বোর্ড (Paper Board) উৎপাদন ২ লক্ষ টন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রকৃত উৎপাদন ২ লক্ষ টনের মতন হইয়াছে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষার বিস্তার এবং শিল্পের উন্নতির সহিত কাগজের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে—মনে হয় বৎসরে ১০ শতাংশ করিয়া এই চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষ বৎসরে কাগজ ও কাগজী বোর্ডের চাহিদা (নিউজ-প্রিণ্ট ও ষ্ট্র-বোর্ড বাদে) ৩½ লক্ষ টন হইবে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই পরিমাণই উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে এই উৎপাদন পাইবার জন্য উৎপাদনের ক্ষমতা ৪½ লক্ষ টনে পরিণত করিতে হইবে—কারণ উৎপাদনের ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থাকিয়া যায়।

রসায়ন শিল্প—Chemical Industries

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে রসায়ন শিল্পের জন্ম হয়। বরোদা এবং বাঙ্গালাতেই এই শিল্পটি বিশেষভাবে অবস্থিত এবং এই দুই স্থানের কারখানাগুলিতে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট দুই তৃতীয়াংশ কার্য্য করে। প্রায় ২০ কোটি টাকার পুঁজি এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সরকার কয়েকটি রসায়ন উৎপাদনকে সংরক্ষণ প্রদান করিয়াছেন। রসায়ন শিল্পের মধ্যে সার উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ১৯৫৫-৫৬ সালে এ্যামোনিয়া সালফেট এবং সুপার ফসফেট উৎপাদন হইয়াছে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন। ভারী রসায়ন দ্রব্যের (Heavy chemicals) মধ্যে সালফিউরিক এ্যাসিড উৎপাদন হইয়াছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন, সোডা এ্যাশ ৮০ হাজার টন এবং কষ্টিক সোডা ৩৪ হাজার টন।

সিমেণ্ট শিল্প—Cement Industry

১৯০৪ সালে মাদ্রাজে প্রথম সিমেণ্ট শিল্প স্থাপিত হয় কিন্তু উহার প্রসার ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে। সিমেণ্ট কারখানা অধিকাংশই মধ্য ভারত ও উত্তর

ভারতে অবস্থিত। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে ২০ লক্ষ ১৬ হাজার টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হইয়াছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে, বিশেষতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সিমেণ্ট শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালের মধ্যে তিনটি নূতন কারখানা সিমেণ্ট উৎপাদন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং সাতটি পুরাতন কারখানায় আধুনিকীকরণের কার্য্যক্রম শেষ হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই শিল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫৩-৫৪ সালের শেষে ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও দুইটি নূতন কারখানা ১৯৫৫ সালের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়; ইহাদিগকে লইয়া বর্ত্তমানে ২৬টি সিমেণ্টের কারখানা আছে। সিমেণ্ট শিল্পে বার্ষিক উৎপাদন কয়েক বৎসর যাবৎ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪০ লক্ষ টনেরও কিছু অধিক সিমেণ্ট উৎপাদিত হইয়াছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৮ লক্ষ টন উৎপাদনের তাগ্‌রূপে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৪৬ লক্ষ টন।

কয়লা শিল্প—Coal Mining Industry

ভারতের খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়লা হইল প্রধানতম এবং কয়লা খনি শিল্পে ভারতের স্থান পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম। সমগ্র ভারতে প্রায় ১০০০টি কয়লা খনি আছে। কয়লা উত্তোলনের প্রধান অঞ্চল ভারতের উত্তর পূর্ব্ব দিকেই অবস্থিত; বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেই দেশের মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বের তুলনায় এই উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ। এই শিল্পের উপরে ক্রমশঃই সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে ভারতীয় কয়লা কমিটি (Indian Coal Co.nmittee) কয়লার গুণ এবং দাম নিয়ন্ত্রণ সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী ১৯২৬ সালে কোল গ্রেডিং বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে কয়লা খনি নিরাপত্তা আইন প্রণীত হয় এবং তদনুযায়ী কোল মাইন্‌স ষ্টোইং বোর্ড গঠিত হয়। সাম্প্রতিককালে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কয়লা খনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন (১৯৫২) প্রণীত হইয়াছে; ইহার উদ্দেশ্য হইল কয়লা উত্তোলন শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ।

বর্ত্তমানে কয়লা খনিগুলিতে প্রায় ৩½ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। প্রতি বৎসর ৩½ কোটি টনেরও অধিক পরিমাণ উৎপাদন হইয়া থাকে। ১৯৫০ সালে কয়লা উৎপাদন হইয়াছিল ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টন; ১৯৫৪ সালে উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টন।

[জালানীরূপে ব্যবহারের জন্য, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য, অঙ্গারীকরণের কার্য্যের (carbonication) জন্য ও অন্যান্য শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে প্রয়োজনের জন্য খনিজ উন্নয়নের তালিকায় কয়লা খনি শিল্পকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কয়লার চাহিদা ৬০০ লক্ষ টনে পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য কয়লার উৎপাদন আরও ২২০ লক্ষ টন বাড়াইতে হইবে। বর্ত্তমানে অবস্থিত খনি হইতে কিছু অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যাইলেও, অনেক নূতন এলাকায় কার্য্য সৃষ্টি করিতে হইবে। মোটামুটিভাবে স্থির করা হইয়াছে যে ১২০ লক্ষ টন বাড়তি কয়লা সরকারী প্রচেষ্টায় উত্তোলন করা হইবে এবং ১০০ লক্ষ টন বাড়তি কয়লা বেসরকারী প্রচেষ্টায় উত্তোলিত করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য ধৌত পাথুরে কয়লা (washed coking coal) প্রয়োজন হইবে ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ টন, এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হইবে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টন। মোট ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ টন পরিষ্কার ধৌত কয়লা অথবা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টন কাঁচা কয়লার প্রয়োজন। এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে ৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টন। অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার কারীদের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এই জাতীয় কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্ত্তমানের মজুত মাল সংরক্ষণের জন্য, যাহাদের পক্ষে পাথুরে কয়লার ব্যবহার অপরিহার্য্য নহে, সেইরূপ ব্যবহারকারীদের জন্য (যথা রেলওয়ে) পাথুরে কয়লার বিনিময়ে উপযুক্ত ধরণের অ-পাথুরে কয়লা সরবরাহ করিতে হইবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এইরূপ বিনিময়ের ক্রমিক (phased) কর্মসূচীর প্রস্তাব দিয়াছেন।

কয়লা পরিষ্কারকারী সমিতির বিবরণী অনুযায়ী, এবং উহার উপরে প্রদত্ত কয়লা সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন: প্রথমতঃ, দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতব কয়লা ধৌত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পিত ইস্পাত কারখানাগুলির ধৌত কয়লার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বেসরকারী কয়লাখনিগুলিকে ধৌতাগার (washeries) স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত। উহাতে না কুলাইলে, প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সরকার নিজেই ধৌতাগার স্থাপন করিবেন। তৃতীয়তঃ, এইরূপ ধৌতকরণের গড় খরচা খনিগুলিকে পোষাইয়া দিতে হইবে, কয়লার মূল্য পরিবর্ত্তন করিয়া অথবা কয়লাখনিগুলিকে অর্থ সাহায্য করিয়া।

ইতিমধ্যে তিনটি কয়লা ধৌতকরণ কেন্দ্র হইতে, টাটা লৌহ ইস্পাত কোম্পানীকে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানীকে, ধৌত কয়লা চালান দেওয়া হইতেছে। রুড়কেল্লা ও ভিলাইতে ধৌত কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য বোকারো/কারগলিতে একটি কয়লা ধৌত করণের কারখানা নির্ম্মাণ করা হইবে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সহিত আরও একটি কয়লা ধৌতকরণের কারখাণা স্থাপন করা হইবে। ইস্পাত কারখানাগুলির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আরও কয়লা ধৌতকরণের কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।]

সারাংশ

পাট শিল্প—প্রথমে কাঁচা পাট ডাণ্ডিতে রপ্তানী হইত পরে ক্রমশ: এদেশেই পাট কল স্থাপিত হইতে থাকে। প্রথম যুদ্ধের সময় এই শিল্পের সবিশেষ উন্নতি ঘটে কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালে ইহার অত্যন্ত দুরবস্থা উপস্থিত হয় এবং পাটের চাষীরাও অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চরম দুর্দ্দশার হাত হইতে এই শিল্পকে উদ্ধার করে। এদেশের অর্থনৈতিক জীবনে পাট শিল্পের গুরুত্ব খুবই বেশী। পাট ও পাটজাত সামগ্রী ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ। বর্ত্তমানে এই শিল্পের সংখ্যাধিক অংশীদার ভারতীয় এবং ইহাতে ৩ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হয়।

বর্ত্তমানে এই শিল্পের প্রধানত: তিনটি সমস্যা : প্রথম হইল কাঁচা পাটের সমস্যা। এই সমস্যা দেশ বিভাগের দ্বারা সৃষ্টি। সব প্রয়োজন মিলিয়া বৎসরে আমাদের ৯০ লক্ষ গাঁইট পাট প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পর ভারতে উৎপাদন হইতে পারিত মাত্র ১৭ লক্ষ গাঁইট। এই বাড়তি পাট সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে পাকিস্তানের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া (এই বন্দোবস্ত বজায় রাখাও খুব কষ্টকর হইয়াছে) এবং দেশের মধ্যে যথাসম্ভব পাট উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া। প্রথম পরিকল্পনায় উৎপাদনের তাগ্ ধরা হইয়াছিল ৫১লক্ষ গাঁইট কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৪১ লক্ষ গাঁইট। দ্বিতীয় সমস্যা হইল বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতা, পূর্ব্বে বৈদেশিক বাজার ভারতের একচেটিয়া ছিল। এই বৈদেশিক বাজারই ভারতীয় পাট শিল্পের প্রধান বাজার। মোট উৎপাদনের মধ্যে ৮৪ ভাগ বিদেশে যায় এবং ১৬ ভাগ দেশে থাকে। কিন্তু বিদেশী বাজারে ভারতের পাট শিল্পের এই আধিপত্য কয়েকটি বিষয়ে ক্ষুন্ন হইতেছে। বিদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি পাটের পরিবর্ত্তে কাগজের ও কাপড়ের থলে ব্যবহার করিতেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাটকল স্থাপিত হইতেছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো হইতেছে এবং পাকিস্থানে পাটকলগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পাট বস্তুর রপ্তানীর উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বিদেশে প্রচার কার্য্য চালানো হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তৃতীয় সমস্যা হইল যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সমস্যা। এই প্রচেষ্টা কিছু কিছু বর্ত্তমানে করা হইতেছে।

২য় পরিকল্পনাকালের জন্য স্থির হইয়াছে যে বর্ত্তমান পাটকলগুলির দ্বারা ১২ লক্ষ টন পাট সামগ্রী উৎপাদিত হইবে। আসাম জুট মিল ব্যতীত আর কোন নুতন মিল স্থাপিত হইবে না।

বস্ত্র শিল্প—১৮৫১ সাল হইতে এই শিল্পের প্রসার হইতে থাকে। ইহা

ভারতীয় মূলধন এবং ভারতীয় শিল্প প্রচেষ্টারই ফল। প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা এবং পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা বস্ত্র শিল্প বিশেষ সহায়তা পায়। কিন্তু পরে প্রবল প্রতিযোগিতা হইলে ১৯২৭ সালে ইহাকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৯৪০ সালে ৩৮৮টি কাপড়ের কল ছিল এবং উৎপাদন ছিল ৪০০ কোটি গজ। ১৯৪৬ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৪১১টি এবং ৬১/২ শত কোটি গজ হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার নীতি ছিল সূতা বুনিবার টাকু (Spindles) বৃদ্ধি করা কিন্তু কলগুলির তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি না করা যাহাতে হস্তচালিত তাঁতের সাহায্য হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে কিন্তু মিলজাত সূতা এবং বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে আরোপিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তবে হস্ত-তাঁত শিল্পের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন সংরক্ষিত করা হইয়াছিল। বস্ত্র শিল্পের প্রধান সমস্যা হইল চারিটি (১) কাঁচা তুলার সমস্যা— এই সমস্যা দেশ বিভাগের দ্বারাই সৃষ্ট কারণ যে ধরণের তুলার দ্বারা উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদিত হয় তাহার উৎপাদন অঞ্চল হইল পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। সুখের বিষয় বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এইরূপ তুলার উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২) যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের সমস্যা— যুদ্ধের সময় যন্ত্রপাতি খাটানো হইয়াছিল খুব বেশী কিন্তু বদ্‌লানো হইয়াছিল খুবই কম। সুতরাং এক্ষণে পুরাতন যন্ত্রপাতির বদলে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো প্রয়োজন। (৩) বাজারে প্রতিযোগিতার সমস্যা—কাঁচা তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলিতে নিজেদের বস্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতেছে এবং জাপান পুনরায় প্রতিযোগিতায় নামিতেছে সুতরাং ভারতের কাপড় রপ্তানী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। রপ্তানী শুল্কের তারতম্য করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। (৪) কারখানা শিল্প ও তাঁত শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের সমস্যা—বিভিন্ন কারণে তাঁত-শিল্প বজায় রাখা একান্তই প্রয়োজন কিন্তু কাপড়ের কলগুলি হইতে তীব্র প্রতিযোগিতা হইলে তাঁত-শিল্পের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য কাপড়ের কলগুলির সহিত তাঁত-শিল্পের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার পদ্ধতি হইল মোট উৎপাদনের একটি অংশকে তাঁত-শিল্পের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখা এবং ঐ উদ্দেশ্যে মিলগুলির উপর একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী উৎপাদন না করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া, মিল বস্ত্রের উপর উৎপাদন শুল্ক লইয়া তাত-শিল্পের জন্য উহা ব্যয় করা এবং কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ধরণের সামগ্রী একমাত্র তাঁতেই উৎপাদন হইতে পারিবে বলিয়া ব্যবস্থা করা। ২য় পরিকল্পনাকালে মিলবস্ত্র ৫১/২ শত কোটি গজ এবং তাঁত বস্ত্র ৩১/২ শত কোটি গজ উৎপাদিত হইবে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—১৮৭৪ সালে বরাকর লৌহ কারখানা এবং ১৮৭৫ সালে ব্যারাকপুর আয়রণ কোম্পানী স্থাপিত হইলেও ভারতের লৌহ ও

ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত সুরু হয় ১৯০৭ সালে টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্ স্থাপিত হইবার পর হইতে। প্রথম যুদ্ধের মধ্যে ইহার দ্রুত উন্নতি হয় এবং ১৯১৮ সালে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী নামে আর একটি কারখানা স্থাপিত হয়। যুদ্ধের পরে প্রবল প্রতিযোগিতার জন্য এই শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে এবং ১৯৩৬ সালে যথাক্রমে মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং ষ্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল গঠিত হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধে পুনরায় এই শিল্পে প্রভুত উন্নতি ঘটে। লৌহ ও ইস্পাতের দাম নিয়ন্ত্রিত হইলেও বাজারের প্রকৃত দাম নিয়ন্ত্রিত দাম অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই শিল্পের উপর সংরক্ষণ তুলিয়া দেওয়া হয়।

যুদ্ধজনিত অবস্থার মধ্যে অনেক উন্নতির সুযোগ পাইলেও এই শিল্প ভারতকে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে আত্মপর্য্যাপ্ত করিতে পারে নাই। যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্ন কারণে এই শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছিল। বর্ত্তমানের লৌহ ইস্পাত উৎপাদনের কারখানা প্রধানত: তিনটি (১) টাটা (২) ইণ্ডিয়ান এবং (৩) মহীশূর। মহীশূর আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কসের মালিক হইলেন মহীশূর রাজ্য সরকার। প্রথম পরিকল্পনাকালে এই শিল্পের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫০ সালে উৎপাদন ছিল ১০ লক্ষ ৪ হাজার টন, ১৯৫৫ সালে উহা হইয়াছে ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টন। প্রথম পরিকল্পনাকালে এই শিল্পের সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের বিভিন্ন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছিল, ইহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাইয়াছে কিছুটা নিজেদের সঙ্গতি হইতে, কিছুটা সরকারের নিকট হইতে এবং কিছুটা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে। কিন্তু ইস্পাতের চাহিদার তুলনায় (২৫ লক্ষ টন) প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে অনেক কম। সুতরাং বিদেশ হইতে প্রচুর আমদানী করিতে হইয়াছে। অপরিহার্য্য প্রয়োজনে লৌহ পিণ্ড ও সামান্য কিছু ইস্পাত রপ্তানী করা হইয়াছে। সরকার সমতাবিধায়ী তহবিল সৃষ্টি করিয়া দেশী ও বিদেশী ইস্পাতের দামের পার্থক্য কমাইবার চেষ্টা করেন এবং ইহা হইতেই এই শিল্পের উন্নতির জন্য কর্জ্জ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী কারখানাগুলির জন্য ১১৫ কোটি টাকার মতন বিনিয়োগ করা হইবে। বেসরকারী বৃহৎ কারখানা দুইটির (টাটা এবং ইণ্ডিয়ান) উৎপাদন ২৩ লক্ষ টনে পৌঁছাইবে। ইহা ছাড়া ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে রূঢ়কেল্লা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ভারত সরকার স্থাপন করিবেন। মহীশূর কারখানার জন্যও ৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সরকারী প্রচেষ্টা হইতে ২০ লক্ষ টন তৈরী ইস্পাত পাওয়া যাইবে।

শর্করা শিল্প—১৯০৩ সালে সর্ব্বপ্রথম এদেশে চিনির কল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধের সময় ইহা কিছুটা উন্নতির সুযোগ পায়। ১৯৩২

সালে সংরক্ষণ পাইবার পর এই শিল্প দ্রুত উন্নতি করিতে থাকে। ১৯৩৯-৪০ সালে প্রায় ১৩ লক্ষ টন উৎপাদন হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় চিনির দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। ইহার প্রধান কারণ উৎপাদকদিগের সমাজ-বিরোধী মনোবৃত্তি। সরকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বাধ্য হন। ১৯৫০ সালে সংরক্ষণ উঠাইয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে ১৪৩টি চালু চিনির কল আছে এবং ইহাদের উৎপাদন ১৮ লক্ষ টনেরও বেশী। চিনির চাহিদাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বাড়তি চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে চিনি আমদানী করিতে হইয়াছে। এই শিল্পের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে আখ চাষের উন্নতি, যথাযোগ্য স্থানে নূতন কল স্থাপন, উপ-উৎপাদনের যথাযোগ্য ব্যবহার এবং উৎপাদন খরচা হ্রাস এই চারিটি বিষয়ের উপর। প্রথম পরিকল্পনাকালে এই শিল্পে ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে। ২য় পরিকল্পনার শেষে চিনির প্রয়োজন ২৫ লক্ষ টন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২২½ লক্ষ টন দেশেই উৎপাদিত হইবে। ইহার জন্য ৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন হইবে।

কাগজ শিল্প—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর হইতে এদেশে কাগজের কল স্থাপিত হয়। প্রথম যুদ্ধের সময় ইহা কিছুটা উন্নতি করে, ১৯২৫ সালে এই শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়, ১৯৪৭ সালে এই সংরক্ষণ তুলিয়া দেওয়া হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে কাগজ ও কাগজী বোর্ড উৎপাদন হইয়াছে ২ লক্ষ টন।

রসায়ন শিল্প—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে রসায়ন শিল্প স্থাপিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কতকগুলি রসায়নকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়। সার উৎপাদন একটি গুরুত্বপুর্ণ রসায়ন শিল্প, ভারী রসায়ন শিল্পের মধ্যে আছে সালফিউরিক এ্যাসিড, সোডা এ্যাস এবং কস্টিক সোডা।

সিমেণ্ট শিল্প—প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই শিল্পের প্রসার ঘটিতে থাকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ইহার উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ২৬টি কারখানা আছে, ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহাতে উৎপাদন হইয়াছে ৪৬ লক্ষ টন।

কয়লা শিল্প—সমগ্র ভারতে প্রায় ১০০টি কয়লার খনি আছে। বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেই সব থেকে বেশী উৎপাদন হয়। কয়লা খনি শিল্পের নিয়ন্ত্রণ এবং সম্প্রসারণের জন্য ১৯৫২ সালে একটি আইন প্রণীত হইয়াছে। ইহার উৎপাদন বর্ত্তমানে প্রায় ৪ কোটি টন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিল্প: অনগ্রসরতা এবং ইহার প্রতিকার

Industry : Backwardness and its Remedies

ভারতীয় শিল্পের অসুবিধা—Difficulties of Indian Industries

Q. Discuss the chief difficulties of Indian industries and briefly suggest how they can be lessened or improved (B. A. 1941)

ভারতে অর্থনৈতিক পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল যে দেশের শিল্পোন্নতির যতখানি সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই তুলনায় বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে অল্প। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণে ভারত গর্ব্ববোধ করিতে পারে—ভারতের জনসংখ্যাও বিপুল ; অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিবার মতন মনুষ্যশক্তির প্রাচুর্য্য আছে। কিন্তু সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র এগারোভাগের উপজীবিকা হইল শিল্প। ভারতীয় শিল্পে এই অনগ্রসর অবস্থার জন্য একাধিক কারণ রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশে সুযোগ্য এবং পারদর্শী শিল্প ব্যবস্থাপকের একান্ত অভাব। পারদর্শী শিল্প ব্যবস্থাপকের প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য্য নির্ভর করে কোন দেশের বিশেষ সামাজিক পরিবেশের উপর। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা ব্যাপকভাবে রহিয়াছে—শিল্প-শিক্ষা বা যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের আয়োজন অতিশয় অসম্পূর্ণ, নাই বলিলে সত্যের বিশেষ অপলাপ ঘটিবে না এবং চিরাচরিত প্রথা অনুসরণের মনোবৃত্তি বা রক্ষণশীলতাই প্রবল। প্রগতিশীল ভাবধারার দিক হইতে সাধারণ ব্যক্তি একান্তই পশ্চাদপদ। সেই কারণে যে পরিবেশের মধ্যে শিল্প পারদর্শী ব্যক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়, আমাদের দেশে সেই পরিবেশের একান্ত অভাবই অনুভূত হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পে বিনিয়োগ যোগ্য পুঁজির অভাব আমাদের শিল্পোন্নতির একটি অন্তরায়। ভারতবাসীর গড়পড়তা আয় অতি অল্প ; আয়ের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান কষ্টকর বলিয়া সঞ্চয়ের অবকাশ কম। সঞ্চয় যাহা হয় তাহা জমিতে বিনিয়োগ করা হয় অথবা ঘরেই জমাইয়া রাখা হয়। জনসাধারণের শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের স্পৃহা কম ; অবশ্য বর্ত্তমানে এই অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা

লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই। তবু শিল্পোন্নত প্রগতিশীল দেশগুলির ন্যায়, ভারতে শিল্পের বিনিয়োগ স্পৃহা তত প্রসার লাভ করে নাই। উপরন্তু ঋণ গ্রহণের মারফতে শিল্পের প্রসার লাভ ঘটে, কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সেইরূপ উন্নত নহে বলিয়া ঋণ গ্রহণের ব্যাপক ও পরিপূর্ণ সুযোগ নাই। দেশীয় পুঁজির অপ্রাচুর্য্যের জন্য একাধিক শিল্প বৈদেশিক পুঁজির সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে—ইহাতে একদিক হইতে কিছু লাভ হইলেও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে একাধিক বিষয়ে বিস্তর ক্ষতি সাধনও হইয়াছে। উপরন্তু বর্ত্তমান সময়ে যদিই বা পুঁজি-অর্থ সংগৃহীত হয়, পুঁজি-সামগ্রী (capital goods) অর্থাৎ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা অতিশয় কষ্টকর কারণ এইগুলির জন্য ভারতকে বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, কারখানা চালাইবার চালন শক্তির সস্তা সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। কয়লাখনিগুলি দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত; বিভিন্নদিকে এইগুলি ছড়াইয়া থাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পের চালনশক্তি (power) সহজেই লাভ করা যাইত। উপরন্তু আমাদেব দেশের কয়লা অন্যান্য কতিপয় দেশের তুলনায় নিকৃষ্ট গুণের। বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের আয়োজন আছে খুব সীমাবদ্ধ এলাকায় এবং আমাদেব দেশে বৎসরে গড়পড়তা জনপ্রতি বিদ্যুৎশক্তি খরচা হইল ঘণ্টায় ১২ কিলওয়াট যখন নাকি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ঐ সংখ্যা হইল ১৭৭৫ কিলওয়াট এবং ইংলণ্ডে ৮৫৫ কিলওয়াট। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা বিশেষ অসন্তোষজনক। শিল্পের আর একটি চালনশক্তি হইল পেট্রলিয়ম; কিন্তু পেট্রলিয়ম আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় খুব কম এবং উহার জন্য আমাদিগকে বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

চতুর্থতঃ, শ্রমিক সম্পর্কেও আমাদের শিল্পকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ভারতের শ্রমিকগণ কর্ম্মঠ এবং দক্ষ নহে; ইহার জন্য একাধিক কারণ রহিয়াছে যথা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অভাব, কারখানা অঞ্চলে শ্রমিকদিগেব অভ্যাসগত গ্রামের মুক্ত পরিবেশের অভাব, অস্বাস্থ্যকর এবং অপ্রচুর বাসস্থান, বেতনের স্বল্পতার দরুণ দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে পারে এরূপ সামগ্রীর অভাব ইত্যাদি। উপরন্তু কারখানা শিল্পের কার্য্য স্থায়ী পেশারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা কম। ভারতীয় শ্রমিক গ্রামেই লালিত, গ্রামের আকর্ষণ তাহার মধ্যে সদাই জাগরূক থাকে, গ্রামে উপার্জ্জনের সুযোগ উপস্থিত হইলেই সে কারখানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত এবং সেইদিকেই সে চাহিয়া থাকে। উপরন্তু আমাদের দেশের সাধারণ শ্রমিকের অখ্যাতি যে তাহারা অত্যধিক কারখানা-পরিবর্ত্তন প্রিয়, সুযোগ পাইলেই কিছুকাল অন্তরই এক কারখানায় চাকুরী ছাড়িয়া অপর কারখানায় যোগদান করে। ইহাতে স্থায়ী এবং দক্ষ শ্রমিকের উদ্ভব ব্যাহত হয়।

পঞ্চমতঃ, নিকৃষ্ট ধরণের কাঁচামাল আমাদের কারখানা শিল্পের অন্যতম বিঘ্ন। কাঁচামালের নিকৃষ্টতার দরুণ উৎপাদন হয় পরিমাণে অল্প এবং গুণে নিকৃষ্ট। যথা আখের নিকৃষ্টতার দরুণ উহা হইতে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ হইবে কম। সহজেই অনুমান করা যায় যে এই বিষয়টি আরও ব্যাপক বিষয়ের সহিত জড়িত —অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নতি।

ষষ্ঠতঃ, শিল্পের প্রতি রাষ্ট্রের উপেক্ষাও আমাদের দেশে শিল্পের অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার যতটুকু হইয়াছিল তাহা বহুকাল যাবৎ রাষ্ট্রের উপেক্ষা ও অনাদরের মধ্যেই হইয়াছিল; ক্রমশঃ কিছু কিছু কার্য্য তাঁহারা করিতে সুরু করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এইগুলির মধ্যে না ছিল আন্তরিকতা, না ছিল যথাযথ কর্ত্তব্য সম্পাদনের বলিষ্ঠ মনোবৃত্তি। ভারতের পক্ষে ইহাই ছিল বৈদেশিক শাসনের অর্থনৈতিক অভিশাপ।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ভারত সরকারকে যে স্মারক লিপি প্রদান করিয়াছিলেন উহাতে বর্ত্তমানে দেশের শিল্পের বিঘ্ন স্বরূপ নিম্নরূপ বিষয়গুলির তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছিলেন :

(১) অত্যাবশ্যক কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা ও অত্যধিক মূল্য, (২) প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তির অসুবিধা; (৩) আমদানী লাইসেন্স প্রদানে বিলম্ব এবং তজ্জনিত কাঁচামাল ব্যবহারকারীদিগের অসুবিধা; (৪) দেশীয় শিল্পের উপর কি প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহা বিবেচনা না করিয়া শুধু হিসাব ব্যালান্সের বিবেচনায় আমদানী নীতি বিবেচনা করা; (৫) বিভিন্ন বিরক্তিজনক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; (৬) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস (৭) যানবাহন ব্যবস্থার আটক অবস্থা এবং উচ্চ মাশুলের হার।

এই কারণগুলি ব্যতীতও স্মারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে এখনও কেন্দ্রীয় এবং মূলরাজ্য সরকারগুলি দেশাভ্যন্তরে যে সকল সামগ্রী পাওয়া যায় নিজ-দিগের প্রয়োজনে সেই সকল সামগ্রীর বরাত্ (order) বিদেশ সমূহে প্রদান করে। এদিকে পাকিস্থানে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে এবং দেশাভ্যন্তরে দ্রব্যসমূহের উচ্চ মূল্য থাকায় আভ্যন্তরীণ চাহিদাও হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণ সমূহও বর্ত্তমানের উৎপাদন ব্যবস্থা বহু পরিমাণে ব্যাহত করিতেছে।

শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি—Measures for Increasing Industrial Production

Q. Suggest measures to increase industrial production of India. (B. Com. 1950)

(১) দেশের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন এবং উহার সহিত যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যাপক আয়োজন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশ

হইতে শিল্পপদ্ধতি বিশারদ বা টেক্‌নিশিয়ান আমদানী করা প্রয়োজন। ইহার দ্বারা একদিকে যোগ্য শিল্প পরিচালকের উদ্ভব হইবে এবং অপরদিকে দক্ষ শ্রমিক তৈয়ারী হইবে।

(২) জনসাধারণের বিনিয়োগ স্পৃহা জাগরূক করিবার জন্য এবং উহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠন প্রয়োজন। ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সুপরিচালিত হয় এবং কারবারে চলতি পুঁজি (working capital) নিয়োগ করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। স্থির পুঁজি সরবরাহের জন্য বিশেষ ধরণের শিল্প ব্যাঙ্ক (Industrial Bank) বা বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Mortgage Bank) স্থাপন বিশেষ উপকারে আসিবে। নবজাত শিল্পের শেয়ার ক্রয় করিয়া অগ্রিম পুঁজি প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য (underwriting capital) ইন-ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন গঠন শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়ক হইবে।

(৩) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—এ বিষয়ে প্রচুর অবকাশ (Scope) রহিয়াছে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের হিসাব অনুযায়ী ভারতে ৪ কোটি কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব—যে স্থলে বর্ত্তমানে উৎপাদন হয় মাত্র ৫ লক্ষ কিলোওয়াট। সস্তায় যন্ত্র-চালনশক্তি সরবরাহের দ্বারা দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হইবে।

(৪) কারখানা শিল্পগুলিতে শ্রমিক আকর্ষণের যথাযথ আয়োজন করিতে হইবে। স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, উপযুক্ত বেতন, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ইত্যাদি স্বতন্ত্র কারখানা শ্রমিক গড়িয়া দিবে এবং প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, বেতনের স্কেল ইত্যাদি থাকিলে শ্রমিকদিগের কারখানা পরিবর্ত্তনের আকাঙ্খা প্রতিরুদ্ধ হইবে।

(৫) ব্যাপক কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা অবলম্বন করিলে শিল্পে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহ করা যাইবে।

(৬) রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নতির সুনিশ্চিত দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়াছে এবং স্বাধীন ভারতের সরকার এই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

কতিপয় বাস্তব প্রস্তাব*—Some Concrete Suggestions "ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের সংস্থা সমবায়" (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) ১৯৫৪ সালের মে মাসে তাঁহাদের বিবরণীতে ভারতীয় শিল্পসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়করূপে কতিপয় বাস্তব প্রস্তাব প্রদান করিয়াছিলেন। দেশীয় শিল্পের হিতাকাঙ্খীদের পক্ষে এই

*[Q. What part can the state play in the rapid industrialisation of the country? (B. Com. 1954)] পরবর্তী অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য।

প্রস্তাবগুলি স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে যদিও দুই-একটি প্রস্তাব সম্পর্কে মতদ্বৈধ ঘটা অসম্ভব নহে। প্রস্তাবগুলি হইল :

(ক) বিদেশ হইতে আমদানীর উপর বিচার বিবেচনা করিয়া সীমাবদ্ধতা এবং/অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে শুল্ক আরোপ করা।

(খ) উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায় দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে যে ফাঁক আছে (gaps between installed capacity and actual production) তাহার কারণ অনুসন্ধান করা।

(গ) দেশীয় শিল্পকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব সরঞ্জামী সামগ্রী ক্রয়ের নীতি (Stores purchase policy) পরিবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) দেশীয় উৎপাদন গ্রহণের দ্বারা চাহিদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে শিল্পের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(ঙ) স্বদেশী শিল্প সম্পর্ক চেতনা জাগাইতে হইবে।

সারাংশ

ভারতীয় শিল্পের অসুবিধা— এদেশের শিল্প সম্প্রসারণ যতখানি হইতে পারিত ততখানি হইতে পারে নাই। ইহার জন্য একাধিক কারণ রহিয়াছে (১) যে পরিবেশের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন শিল্প পরিচালকের উদ্ভব ঘটে তাহার অভাব (২) পুঁজির পরিমাণ অল্প এবং বিনিয়োগের অভ্যাসও কম কর্জ্জ প্রদানের ভাল ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে নাই, (৩) সস্তায় যন্ত্র চালাইবার চালক শক্তির অভাব (৪) শ্রমিকগণ কিছুটা অভাবের তাড়নায় এবং কিছুটা স্বভাবের দোষে দক্ষতাহীন, (৫) কৃষির অনুন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট কাঁচা মালের অভাব, (৬) এ যাবৎ শিল্পের প্রতি রাষ্ট্রের উপেক্ষা।

ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স শিল্পের অনুন্নতির কারণ-গুলি এই বিষয়গুলির সহিত জড়িত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন— কাঁচামাল, ঋণ প্রাপ্তি, আমদানী লাইসেন্স এর অসুবিধা, ভুল আমদানী নীতি, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শ্রমিকের দক্ষতাহীনতা, যানবাহনের অব্যবস্থা এবং সরকার কর্ত্তৃক দেশের উৎপাদিত শিল্প সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় না করা।

শিল্প উন্নয়নের পদ্ধতি—(১) বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইবে (২) জনগণের বিনিয়োগ স্পৃহা জাগরূক করিতে হইবে এবং সুষ্ঠু

অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে (৩) জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক আয়োজন করিতে হইবে (৪) উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শ্রমিকের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে হইবে (৫) উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (৬) রাষ্ট্রকে শিল্পোন্নতির সুনিশ্চিৎ দায়িত্ব লইতে হইবে। ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিস এ সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব দিয়াছিলেন: (১) আমদানীর উপর সীমাবদ্ধতা (২) উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে ফাঁক পূরণ (৩) সরকারের সামগ্রী ক্রয় নীতির পরিবর্ত্তন (৪) শিল্পের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গঠন এবং (৫) স্বদেশী শিল্পের চেতনা সৃষ্টি।

ষোড়শ অধ্যায়

শিল্প ঃ রাষ্ট্রের ভূমিকা

Industry : The Role of the State

শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকতা—Desirablity of State aid to Industries

Q. Discuss the desirablity or otherwise of State aid to industries. In what different forms can State aid be given to industries in India ? (B. Com. 1945).

এক সময় ছিল যখন দেশের শিল্প সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার সাধিত হইত। বিভিন্ন উৎপাদক উপাদানগুলির অবাধ প্রতিযোগিতায় যথাসম্ভব কম খরচে যথাসম্ভব অধিক উৎপাদন হইত। সেই সময়ে অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করিতেন যে শিল্প সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক জীবনে সরকারের নিরপেক্ষতা বা উদাসীন নীতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল দেশেই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্ত্তনে এরূপ এক অবস্থা আসিয়া পড়িল যখন স্পষ্টতঃই দেখা গেল যে সরকারের পক্ষে দেশের শিল্প জীবনে হস্তক্ষেপ না করা অর্থনৈতিক প্রগতির পথে একটি গুরুতর অন্তরায়। বস্তুতঃপক্ষে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সরকার এরূপ কতিপয় কার্য্য সম্পাদন করেন যেগুলির সম্পাদনের পদ্ধতির উপরে দেশের শিল্প জীবন বহু পরিমাণে নির্ভরশীল যথা মুদ্রাপ্রচলন, করস্থাপন, শুল্কনির্দ্ধারণ, ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারের সহিত সরকারের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সাধারণের ধারণার বিবর্ত্তন হইয়াছে। জনসাধারণের আয় বৃদ্ধির দ্বারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে কৃষিগত অর্থনীতির (agricultural economy) সহিত শিল্পগত অর্থনীতির (industrial economy) সমন্বয় না করিলে যে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে না তাহা সকলেই স্বীকার করেন এবং শিল্পে রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত শিল্পগত অর্থনীতির প্রসার যে সম্ভব নহে তাহা বিশেষভাবেই প্রকটিত হইয়াছে।

[উপরে 'শিল্পোন্নয়নের উপায়' এবং পর পৃষ্ঠায় 'শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।]

শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা—Part played by State in Industrial field

Q. Discuss the part played by the State in India in regard to industry (B. Com. 1942 : B. A. 1923). In what different ways does the state assist in the development of industries in India ? (B A. 1954)

পরাধীনতার যুগ—আমাদের দেশে শিল্প সম্পর্কে রাষ্ট্র যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ছিল যেরূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক সেইরূপ একাধিক বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে নিন্দনীয়। প্রথম হইতে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ নিজদিগের স্বার্থে যথাসম্ভব ব্যবহার করা এবং ভারতকে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের বিস্তীর্ণ বাজারে পরিণত করা - ইহাই ছিল বৈদেশিক শাসকবর্গের প্রধান লক্ষ্য। অতএব অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত সরকার দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য কোনো প্রচেষ্টা তো করেন নাই বরং দেশীয় পুঁজি ও উদ্যোগে স্থাপিত শিল্পের পথে বিবিধ উপায়ে বাধা সৃষ্টি করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে ভারত সরকার সর্ব্বপ্রথম ভারতের শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে কথঞ্চিৎ সজাগ হন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'শিল্প-দপ্তর'' (Department of Industries) স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে কোনো কোনো প্রাদেশিক সরকার, যথা মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশ, প্রত্যক্ষভাবে দুই একটি শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু ১৯১০ সালে ভারত সচিব লর্ড মর্লি প্রাদেশিক সরকারসমূহের এই সকল কার্য্য অননুমোদন করিয়া পত্র দেন এবং শিল্প সম্পর্কে সরকারী কর্ত্তব্য এই বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়া দেন যে উহা কেবলমাত্র টেক্‌নিক্যাল বা শিল্প সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদানেই নিবদ্ধ থাকিবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার তাঁহাদের শিল্প নীতির পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন, কারণ ঐ সময়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একান্ত অভাব ঘটে। ১৯১৬ সালে ভারত সরকার একটি শিল্প কমিশন গঠন করেন এবং এই শিল্প কমিশন সুপারিশ করেন যে ভারত সরকারকে সুনির্দ্দিষ্ট শিল্পনীতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং গবেষণা, টেক্‌নিক্যাল এবং বৈজ্ঞানিক পরামর্শ, বাণিজ্যিক তথ্য সরবরাহ, নূতন এবং প্রদর্শনী কারখানা (demonstration factories) স্থাপন, প্রত্যক্ষ আর্থিক সাহায্য ইত্যাদির দ্বারা শিল্পসমূহকে সাহায্য করিতে হইবে। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে মিউনিশান্স বোর্ড (Munitions Board) স্থাপন করা হইয়াছিল এবং এই বোর্ড ভারতেই সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকিলেন। সকল প্রদেশেই একটি করিয়া শিল্প দপ্তর স্থাপিত হইল—ইহাদের কার্য্য তথ্য সরবরাহ করা, গবেষণা পরিচালনা করা, প্রদর্শনী

কারখানা স্থাপন করা ইত্যাদি। উপরন্তু ভারত সরকারের প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইত কিন্তু এক্ষণে (১৯২১ সালে) ভারতীয় ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হইল—ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতের মধ্য হইতেই সরকারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভারতীয় শিল্পকে উৎসাহিত করা। উপরন্তু এই সময়ে ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সুপারিশ মতন ভারত সরকার শিল্প সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেন, অবশ্য তাঁহারা "বিচারমূলক সংরক্ষণের" (Discriminating Protection) পথ অনুসরণ করেন। বিভিন্ন প্রদেশেও "শিল্পে রাষ্ট্র সাহায্য বিধি" প্রণীত হয় এবং এই বিধির আওতায় প্রাদেশিক সরকার কোন কোন শিল্পকে ঋণদান করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক সরকারের শিল্প দপ্তরগুলি অন্যান্য দুই একটি উপায়েও শিল্পে সাহায্য করিতে থাকে কিন্তু তাহাদের ক্রিয়াকলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম্য ও কুটির শিল্পগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৫ সালে একটি "শিল্প গবেষণা ব্যুরো" (Industrial Research Bureau) স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকার তাঁহাদের সরবরাহ দপ্তরের মারফৎ যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ভারতীয় শিল্পসমূহের নিকট হইতে ক্রয় করেন। সরকারের "শ্রম দপ্তর" একটি শিল্প শিক্ষাদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কার্য্যকরী করেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বৃহদায়তন শিল্প প্রসারের জন্য ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সরকার যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। কারণ শিল্প সংক্রান্ত নীতির মধ্যে সরকারের দৃঢ়তা বা স্থির চিত্ততার অভাব ছিল; আন্তরিকতারও যে অভাব ছিল না, তাহাও নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকান টেক্‌নিক্যাল মিশন যে সকল সুপারিশ করিয়াছিল, ভারত সরকার তাহাদের সবগুলি কার্য্যকরী করেন নাই; যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের শিল্পোন্নতির দ্বারা যাহাতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার নষ্ট না হয় সেই অনুভূতি সরকারের মধ্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল।

স্বাধীনতার যুগ—স্বাধীন ভারতের সরকার শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে যে পরিপূর্ণ সচেতন, তাহা বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা শিল্পোন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন সেগুলিকে মোটামুটি নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

(১) নূতন কলকারখানা বসাইবার জন্য, এবং অতিরিক্ত কাজের চাপের দরুণ পুরাতন কলকারখানায় যে সব যন্ত্রপাতির ক্ষয় ক্ষতি হইয়াছে সেগুলির পুনঃসংস্থানের জন্য, বহু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। সরকার স্থির করিয়াছেন, যে বিদেশ হইতে যে সব পণ্য আমদানী করা হইবে তন্মধ্যে খাদ্যের পরেই যন্ত্রপাতি আমদানীতে সর্ব্বাধিক সুবিধা দেওয়া হইবে। (২) সরকার কাঁচামাল ও

যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস করিয়াছেন। (৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যাপকর্ষ তহবিলে (Depreciation Fund) সরকার পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ সংস্থানের সুযোগ দিয়াছিলেন অবশ্য পাঁচ বৎসরের জন্য; নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসরের জন্য মোট মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশকে আয়কর ও সুপার টেক্স হইতে অব্যাহতি দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। (৪) পাঁচ কোটি টাকা বিলিকৃত মূলধন সহ একটি "শিল্প অর্থ বিনিয়োগ সংসদ" (Industrial Finance Corporation) ভারত সরকার গঠন করিয়া দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল বৃহৎ শিল্পগুলিকে প্রয়োজন বোধে ঋণ প্রদান করা। ছোট খাট শিল্পগুলিকে অনুরূপ সাহায্য প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে একাধিক রাজ্যেও "রাজ্য অর্থ বিনিয়োগ সংসদ" (State Financial Corporation) গঠন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া "শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন" (I.C.I.C.) স্থাপনে সরকার উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং আন্তর্জ্জাতিক ঋণদান সংস্থাতেও ভারতকে যোগদান করাইয়াছেন। (৫) গুরুত্বপুর্ণ শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়া সম্প্রসারণের সহায়তা করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের উদ্যোগে পার্লামেন্টের দ্বারা শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বিধি (Industries Development and Regulation Act of 1951) প্রণীত হইয়াছে। (৬) সরকার কতিপয় শিল্প নিজেদের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

(৭) কোম্পানীগুলির আভ্যন্তরীণ সংগঠন উন্নয়নের জন্য এবং ম্যানেজিং এজেন্টদিগের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার "কোম্পানী বিধি" রচনা করিয়াছেন। (৮) ১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের নীতি আরও উদারপন্থী করিয়াছেন। (৯) শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যোগে ও সহায়তায় এই সম্পর্কে বিশেষত্বশীল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে।

তবে স্বাধীনতার যুগে সরকারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য হইল শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি ঘোষণা করা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়া শিল্পোন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা।

জাতীয়করণের সমস্যা—Problem of Nationalisation

Q. Discuss the feasibility and desirability of nationalisation of Indian Industries at the present moment. (B. A. 1948, 1951)

সমগ্র জনসমষ্টি বা জাতির পক্ষ হইতে রাষ্ট্র যখন কোন শিল্পের মালিকানা গ্রহণ করে এবং উহাকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন ঐ শিল্পের জাতীয়করণ ঘটিয়াছে বলা হয়। ইহা তখন আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি থাকে না, ইহার কোন

ব্যক্তিগত অংশীদার থাকে না ; রাষ্ট্রই উহার সম্পূর্ণ মালিক, শিল্পের লাভ হইলে উহা রাষ্ট্রের, লোকসান হইলেও উহা রাষ্ট্রের।

জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি—(১) শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় থাকিলে একই শিল্প অনুসরণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঘটে। এই প্রতিযোগিতায় বহু শ্রম, অর্থ ও উৎসাহের অপচয় ঘটে। শুধু তাহাই নহে, প্রতিযোগীকে পরাস্ত করিবার জন্য অনেক সময়ে বহু অসঙ্গত ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে প্রতিযোগিতাজনিত এই অপচয় এবং অসঙ্গত ক্রিয়াপদ্ধতির অবকাশ থাকে না।

(২) রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে মুনাফা পাইবার কোন ব্যক্তিগত প্রলোভন ক্রিয়া করে না। সুতরাং শিল্প জাতীয়করণ হইলে উহা হইতে উৎপাদিত সামগ্রী জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত সস্তায় কিনিতে পারিবে। যদি কোন শিল্প হইতে লাভ হয় ঐ লাভ কাহারও ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত করিবার জন্য চলিয়া যাইবে না ; উহা জনসমষ্টির কার্য্যকরী কর্ত্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রের হাতে আসিবে এবং জনগণের কল্যাণেই উহা নিয়োজিত হইবে।

(৩) শিল্পের জাতীয়করণ ব্যক্তিগত মুনাফালাভের প্রবৃত্তির অবসান ঘটাইয়া সমগ্র অর্থনীতিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপকার প্রদান করে। ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় শিল্পপতিগণ সেই সামগ্রীই উৎপাদনে মনযোগী হয় যে সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় হইতে তাঁহাদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা প্রাপ্তি ঘটিবে ; জনসমষ্টির প্রয়োজন, তাহাদের কল্যাণ-অকল্যাণ, রাষ্ট্রের হিত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উৎপাদনের পিছনে চালক শক্তিরূপে ক্রিয়া করে না। শিল্পের জাতীয়করণ ঘটিলে সমগ্র জনসমষ্টি এইদিক হইতে লাভবান হইবে ; সমাজের কল্যাণ ও প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্র শিল্পোৎপাদন করিবে। উহাতে জাতীয় সঙ্গতির সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ব্যবহার ঘটিবে।

(৪) ব্যক্তিগত মালিকানায় যে শিল্প স্থাপিত হয় উহাতে শ্রমিকগণ ন্যায় সঙ্গত মজুরী এবং কার্য্যের সর্ত্তাদি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। রাষ্ট্র বা সরকার প্রত্যক্ষভাবে জনমতের চাপ অনুভব করে ; সুতরাং শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে শ্রমিকগণ ন্যায়সঙ্গত মজুরীর হার এবং কার্য্যের সর্ত্তাদি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

(৫) ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ। শিল্প যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সেস্থানে দেশের সমগ্র অর্থনীতির মধ্যে একটি সংহতি সাধিত থাকে এবং সেহেতু ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সহজ হয়।

শিল্প জাতীয়করণের এই সকল সুবিধা থাকায়, আমাদের দেশে বহু পূর্ব্ব

হইতেই শিল্প জাতীয়করণের দাবী উত্থিত হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে করাচী অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস শিল্প সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছিল, "ভিত্তিমূলক শিল্পগুলি এবং কার্য্যাদি, খনিজ সম্পদ রেলপথ, জলপথ, জাহাজ চলাচল অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থা—এইগুলি রাষ্ট্রের মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।" কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সাব কমিটি বোম্বাই পরিকল্পনা প্রণেতাগণ, এডভাইসরী প্ল্যানিং বোর্ড, এ, সাই, সি সির, ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটি- ইহারা বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পরিসরের মধ্যে শিল্প বিস্তর রাষ্ট্রের মালিকানা বা জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত দিয়াছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর শিল্পের জাতীয়করণের নীতি কার্য্যকরী করিবার যখন সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন বর্ত্তমান পরিস্থিতে,—বর্ত্তমান শিল্পগত ও অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে—শিল্প জাতীয়করণ কতদূর সঙ্গত ও সুফলপ্রসূ হইবে তাহা নূতন করিয়া বিবেচনা করার প্রয়োজন হইল।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি :—(১) আমাদের অনগ্রসর দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইল অধিক পরিমাণে পুঁজি গঠনের সমস্যা এবং শিল্পে অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগের সমস্যা। শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তাব শিল্প-পতিদিগকে নিরুৎসাহিত করে এবং সেহেতু শিল্পের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বহন করে। সুতরাং অনেকের মতে, আমাদের পুঁজি গঠন যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই উদ্দেশ্যে এখন বেশ কিছু সময়ের জন্য শিল্প জাতীয়করণের কোন সামগ্রিক নীতি গ্রহণ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য।

(২) আবশ্যক সামগ্রীর আমাদের দেশে একান্ত অভাব। মুদ্রাস্ফীতির বিকট মূর্ত্তি দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ভীতিপ্রদ পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছে। ক্রমান্বয়ে অধিক সামগ্রী উৎপাদনের দ্বারা এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। "উৎপাদন কর অথবা ধ্বংস হও" ("Produce or Perish") ইহাই আমাদের মূল মন্ত্র ; কিন্তু শিল্প জাতীয়করণের দ্বারা অধিক উৎপাদন সম্ভব হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই, বরং উহার দ্বারা উৎপাদন ব্যাহত হইবে এইরূপ সম্ভাবনা আছে।

(৩) সরকারের দ্বারা পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান যে দক্ষতা সহকারে পরি-চালিত হইবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার অভাব বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিকই হইতে পারে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কার্য্যে অবহেলা ও দুর্নীতি সর্ব্বজনবিদিত, ইহারা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ন্যায় দক্ষ ও সুপরিচালনা আনিতে পারিবে না। উপরন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ম্মচারীদিগের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি বা পদোন্নতি নির্ভর করে চাকুরীকালের দৈর্ঘ্যের উপর কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উহা নির্ভর করে

কর্ম্মদক্ষতার উপর। অতএব জাতীয়করণের দ্বারা অদক্ষ পরিচালনার দ্বারা দক্ষ পরিচালনাকে স্থানচ্যুত করা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

(৪) সত্যকার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে—যতদিন গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অভিজাততন্ত্র জনগণকে প্রবঞ্চনা করিয়া চলিবে—ততদিন শিল্প জাতীয়করণের দ্বারাও জনকল্যাণের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাওয়া বাস্তবক্ষেত্রে কতদূর সম্ভব হইবে তাহার স্থিরতা নাই। রেলপথ, টেলিফোন ইত্যাদিই কি জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত হয়, না আর্থিক লাভ লোকসানের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে হিসাব করিয়া তবেই কার্য্য হয়? ভারতের ডাক ব্যবস্থাও অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

(৫) ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ বারম্বার ঘোষণা করিয়াছেন যে সরকারের হাতে যে সঙ্গতি আছে তাহা প্রতিষ্ঠিত শিল্পক্রয়ে ব্যয় না করিয়া নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যয় করিলে মোট শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া জাতীয়করণের জন্য একদা উৎসাহী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উৎসাহ বর্ত্তমানে বহুপরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। অবশ্য জাতীয়-করণের নীতির মধ্যে একটি বিরাট আদর্শ নিহিত আছে। এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া কিছু সুখের বিষয় নয়। কিন্তু প্রধান বিবেচ্য হইল আদর্শ উপলব্ধির সহায়ক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি। সেই অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া আদর্শ উপলব্ধির জন্য সহসা ঝাঁপাইয়া পড়িলে আদর্শ উপলব্ধির সম্ভাবনাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে,—কোথাও উৎসাহ প্রদান করিয়া, কোথায়ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া, বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প স্থাপন করিয়া। ভারতের জাতীয় সরকারের নূতন শিল্প নীতি গ্রহণে ইহাই উপলব্ধি করা হইয়াছে।

সরকারের শিল্পনীতি—Government's Industrial Policy

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের নূতন নীতি ও কার্যপদ্ধতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। শিল্প সমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পদ্ধতি তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়া-ছিলেন। প্রথমত:, কতিপয় শিল্প উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে ঐগুলি সম্পর্কে তাঁহাদের পরিপূর্ণ একচেটিয়া অধিকার থাকিবে। এইগুলি হইল অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ, রেলপথ পরিবহণ ও আনবিক শক্তি। দ্বিতীয়ত:, কতিপয় শিল্প উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে এইগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট বর্ত্তমানে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে ১০ বৎসরের জন্য কার্য্য করিতে দেওয়া হইবে কিন্তু ইহাদের ক্ষেত্রে নূতন শিল্প স্থাপন করা হইবে সরকারের দায়িত্বে। ১০ বৎসর পরে

ইহাদের সম্পর্কে নূতন ভাবে বিবেচনা করা হইবে এবং সরকারী নীতি নির্দ্ধারণ করা হইবে। এই পর্য্যায়ের শিল্পসমূহ হইল, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, বিমানপোত নির্ম্মাণ, টেলিগ্রাফ ও বেতারের যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ (বেতার গ্রাহক যন্ত্রবাদে) এবং খনিজ তৈল। তৃতীয়তঃ, অন্য সকল সামগ্রীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগই ক্রিয়া করিবে তবে প্রয়োজন হইলে সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি

১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভারত সরকার পুনরায় তাঁহাদের একটি নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। নূতন শিল্পনীতির এই প্রস্তাবে শিল্প সমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং কোন্ শ্রেণীর শিল্পে রাষ্ট্র কিরূপে অংশ গ্রহণ করিবে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীতে ১৭টি শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই শিল্পগুলি হইল (১) অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং প্রতিরক্ষার সাজ সরঞ্জাম সংশ্লিষ্ট দফাসমূহ (২) আণবিক শক্তি, (৩) লৌহ ও ইস্পাত, (৪) লৌহ ও ইস্পাতের ভারী ঢালাই ও পেটাই, (৫) লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন, খনি, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মূল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্র-পাতি (৬) বড় হাইড্রলিক এবং ষ্টীম টারবাইন সহ ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র-পাতি, (৭) কয়লা ও লীগ্‌নাইট, (৮) খনিজ তৈল, (৯) আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ এবং ক্রোম জিপসাম, সালফার, স্বর্ণ এবং হীরক উত্তোলন, (১০) তামা, সীসা, দস্তা, টিন, মলিব ডেনাম, উলফার্ম্ম উত্তোলন, (১১) ১৯৫৩ সালের নির্দ্দেশিত আণবিক শক্তি সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত খনিজ দ্রব্য সমূহ, (১২) বিমান, (১৩) বিমান পরিবহন, (১৪) রেলওয়ে পরিবহন, (১৫) জাহাজ নির্ম্মাণ, (১৬) টেলিফোন ও টেলিফোনের তার, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি (বেতার বার্ত্তা গ্রহণ যন্ত্র ছাড়া), (১৭) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সরবরাহ। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই সকল শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে রাষ্ট্র। এই শিল্পগুলির নূতন কারখানা স্থাপন একমাত্র রাষ্ট্রই করিতে পারিবে। যে ক্ষেত্রে বেসরকারী কারখানা স্থাপন পূর্ব্বেই অনুমোদন করা হইয়া গিয়াছে সেক্ষেত্রে উহা স্থাপিত হইতে পারিবে। বর্ত্তমানের যেসকল বেসরকারী কারখানা রহিয়াছে সেগুলির সম্প্রসারণও হইতে পারিবে। আবার সরকার এই শিল্পের নূতন কারখানা স্থাপনের সময়ে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে বেসর-কারী শিল্প প্রচেষ্টার সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে রেলপরিবহন ও বিমান পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্ম্মাণ, এবং আণবিক শক্তি—এইগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই শিল্পগুলি হইল (১)

১৯৪৯ সালে খনিজ কনসেশন আইনের ৩নং অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট ছোট খাটো খনিজ দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, (২) এ্যালুমিনিয়াম এবং ১নং তপশীল-বহির্ভূত অন্যান্য লৌহতর ধাতু, (৩) মেসিন টুল, (৪) লৌহ ও অন্য ধাতুর মিশ্রণজাত ধাতু এবং ছোটখাটো নির্মাণ উপযোগী ইস্পাত, (৫) রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজনীয় মৌলিক ও অন্তবর্ত্তী দ্রব্য, (৬) এন্টিবায়টিকস্ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, (৭) কৃত্রিম সার, (৮) কৃত্রিম রবার, (৯) কয়লা হইতে উৎপন্ন কার্ব্বন গ্যাস, (১০) রাসায়নিক মণ্ড, (১১) সড়ক পরিবহন, (১২) সামুদ্রিক পরিবহন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত এই শিল্পগুলি ক্রমশ: রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে; রাষ্ট্র এই শ্রেণীর নূতন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হইবে, তবে এই শ্রেণীর নূতন শিল্প স্থাপনে সরকারী প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে। অর্থাৎ এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্রমশঃ বেশী করিয়া নূতন কারখানা স্থাপন করিবে, বেসরকারী শিল্পপতিগণও নূতন কারখানা স্থাপন করিতে পারিবে, হয় স্বাধীনভাবে অথবা সরকারের সহিত সহযোগিতায়।

অবশিষ্ট সকল শিল্প তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। ইহাদের সম্প্রসারণের দায়িত্ব বেসরকারী শিল্পপতিদিগকে বহন করিতে হইবে, তবে এই ধরণের কোন শিল্পও রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে স্থাপন করিতে পারিবে। সাধারণতঃ রাষ্ট্রের নীতি হইবে বেসরকারী প্রচেষ্টাতে, কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী অনুযায়ী, যাহাতে এই সকল শিল্পের উন্নয়ন ঘটে সেই উদ্দেশ্যে বেসরকারী শিল্পকে সুযোগ সুবিধা এবং উৎসাহ প্রদান করা। ইহা করা হইবে যানবাহন ব্যবস্থা, শক্তি উৎপাদন এবং অন্যান্য কার্য্যের সম্প্রসারণ ঘটাইয়া এবং যথাযথ ফিস্ক্যাল এবং অন্যান্য ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া। এই সকল শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দিবার বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠনে রাষ্ট্র সাহায্য করিবে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত শিল্প প্রচেষ্টাকে বিশেষ সাহায্য প্রদান করা হইবে। যথাযোগ্য ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পকে রাষ্ট্র আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবে—এই সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া অথবা লাভ লোকসানে অংশীদারী করিয়া। তবে বেসরকারী শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সহিত খাপ খাওয়াইতে হইবে, সুতরাং সকল বেসরকারী শিল্পের উপরেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

১৯৪৮ সালের ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির মধ্যে পার্থক্য

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির সহিত ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা মোটামুটি দুই প্রকারের। প্রথমতঃ, ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে

সরকারের একচেটিয়া দায়িত্বের মধ্যে ছিল মাত্র তিনটি শিল্প কিন্তু নূতন শিল্পনীতিতে ১৭টি শিল্পকে সরকারের একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পূর্ব্বে ৮টি শিল্প ছিল এক্ষণে ১২টি শিল্প হইয়াছে; অবশ্য পূর্ব্বেকার দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেকগুলি শিল্প এক্ষণে প্রথম শ্রেণীতে স্থাপন করা হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া রাষ্ট্রের শিল্পোদ্যোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা করা হইয়াছে দুইটি বিষয়ে বিবেচনা করিয়া: (ক) কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলির দেশের সাধারণ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্ব রহিয়াছে, অথবা যে গুলির সামরিক গুরুত্ব রহিয়াছে অথবা যেগুলি জনস্বার্থ সম্পর্কিত কার্য্য দেয় (public utility service); (খ) কতকগুলি শিল্প আছে যেগুলির ক্ষেত্রে এত বেশী অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন যাহা একমাত্র রাষ্ট্রই করিতে পারে।

১৯৪৮ সালের নীতির তুলনায় ১৯৫৬ সালের নীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নমনীয়তা। পূর্ব্বেকার নীতিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া দায়িত্বে যে সকল শিল্প স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পপতিদের সহযোগিতা বা অংশ গ্রহণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু নূতন নীতিতে প্রথম শ্রেণীতে অনেক শিল্প স্থাপন করা হইয়াছে যেগুলির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সরকারের একচেটিয়া অধিকার থাকিলেও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে সরকার বেসরকারী শিল্পপতিদের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারেন। অধিকন্তু ঐ সকল শিল্পে বর্ত্তমানে যে সকল কলকারখানা আছে সেগুলির নিজ নিজ মালিকগণ সম্প্রসারণ করাইতে পারিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের নীতিতে বলা হইয়াছিল নূতন কারখানা একমাত্র সরকারই স্থাপন করিতে পারিবেন কিন্তু ১৯৫৬ সালের নীতিতে বলা হইয়াছে যে নূতন কারখানা সরকার বেশী করিয়া বসাইবেন আবার বেসরকারী শিল্পপতিগণও বসাইতে পারিবেন। বেসরকারী শিল্পে সরকার অংশ গ্রহণ করিতেও পারিবেন। তৃতীয় পর্যায়ের শিল্পের ক্ষেত্রেও, নূতন নীতিতে বলা হইয়াছে যে সরকার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করিবেন। সুতরাং ১৯৪৮ সালের শিল্প নীতি অপেক্ষা ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে সরকারী ও বেসরকারী অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই নমনীয়তা (flexibility) নূতন নীতিকে পুরাতন নীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়াছে।

সরকারের মালিকানাধীন শিল্প—Government owned Industries

ভারত সরকার তাঁহাদিগের ঘোষিত শিল্পনীতি অনুযায়ী তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ মালিকানায় কতিপয় শিল্প স্থাপন করিয়াছেন এবং আরও কতিপয় শিল্প স্থাপনের

পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারত সরকারের দ্বারা স্থাপিত প্রধান শিল্পগুলি এইরূপ :

(১) ***সার উৎপাদন***—২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সিন্দ্রী নামক স্থানে ভারত সরকার সার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন হইল ৩০ কোটি টাকা এবং একখানি ব্যতীত অপর সকল শেয়ারেরই মালিক হইলেন ভারত সরকার। একখানি শেয়ারের মালিক হইলেন বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টার এর চেয়ারম্যান। এই কারখানায় বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট্ উৎপাদন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(২) ***হিন্দুস্থান বিমান কারখানা***—(Hindusthan Air-craft Factory)—ভারত সরকার এবং মহীশূর সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দেশরক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে এই কারখানায় বিমান নির্ম্মিত হইবে। উহা ব্যতীত এই স্থানে রেল-পথের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী কামরা নির্ম্মিত হইবে।

(৩) ***চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা*** –(Chittaranjan Locomotive Works) –মিহিজাম নামক স্থানে (ইহার নাম চিত্তরঞ্জন দেওয়া হইয়াছে) ভারত সরকার ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ইঞ্জিন উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে বৎসরে ২০ খানি ইঞ্জিন উৎপাদিত হইবে।

(৪) ***জাতীয় যন্ত্রাদি কারখানা***—(National Instruments Factory) জাতীয় যন্ত্রাদির কারখানা বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি (Precision Instruments) নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছে।

(৫) ***পেনিসিলিন কারখানা***—(Penicillin Factory) বর্ত্তমানে দুইটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় (W. H. O. and UNICEF) ভারত সরকার পেনিসিলিন উৎপাদনের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দুইটি [illegible] ডলার দিয়া সাহায্য করিবে এবং ভারত সরকার [illegible] টাকা প্রদান করিবেন।

(৬) ***কারখানার যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা*** (Machine Tools Factory) একটি সুইস প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় [illegible] নামক স্থানে এই কারখানা স্থাপনের আয়োজন করা হইয়াছে।

(৭) ***হিন্দুস্থান জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্র*** –(Hindusthan Ship Yard)—এই জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্রটি ভারত সরকার ক্রয় করিয়াছেন এবং উহার উন্নয়নে ব্যাপৃত আছেন।

(৮) ***টেলিফোন ফ্যাক্টরী***—(Telephone Factory)—"ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইনডাষ্ট্রীজ লিমিটেড" এই নামে বাঙ্গালোর নামক স্থানে টেলিফোনের

সরঞ্জাম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে রূপনারায়ণপুর নামক স্থানে টেলিফোনের তার নির্ম্মাণের জন্য একটি বিলাতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সরকার কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় যে শিল্প স্থাপিত আছে বা হইতেছে সেগুলি হইল ডিডিটি কারখানা, বেতার যন্ত্র কারখানা, ইষ্টার্ণ সিপিং করপোরেশন, তৈল সংশোধনাগার ইত্যাদি।

শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ—Development and Control of Industries

Q. Critically discuss the main provisions of the Industries (Development and Regulation) Act 1951. (B Com. 1951)

ভারত সরকার তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় শিল্প সম্প্রসারণ সম্ভব করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুযায়ী ১৯৫১ সালে তাঁহারা একটি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা "*শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি*" রূপে পরিচিত। ১৯৫২ সালের ৮ই মে তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ করা হয় তবে পরবৎসর ইহাতে কতিপয় প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধিত হয়।

এই বিধির প্রথম তালিকায় কতিপয় শিল্প নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের যথোচিত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই তালিকাভুক্ত শিল্পের সংখ্যা হইল ৪২ লক্ষ এবং উপ-বিষয় (Sub-items) *গুলি গণনা করিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০। বিমান, অস্ত্র-শস্ত্র, কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ, চিনি, বস্ত্র, সিমেণ্ট, বৈদ্যুতিক মটর, ভারী রসায়ন, যন্ত্র সরঞ্জাম (Machine Tools), কৃষি যন্ত্র, বাইসাইকেল প্রভৃতি শিল্প এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এই আইন অনুযায়ী (ক) মালিক (খ) শ্রমিক (গ) ক্রেতা এবং (ঘ) মূল-উৎপাদকদিগের (primary producers) অনধিক ৩০ জন প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ সংসদ (Central Advisory Council) গঠিত হইবে। বর্ত্তমানে ২৬জন সদস্য হইয়া (ইহাদের মধ্যে একজন,—কেন্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—হইলেন চেয়ারম্যান) এই সংসদ গঠিত হইয়াছে। ইহার কার্য্য হইল তালিকাভুক্ত শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা। এইরূপ তালিকাভুক্ত যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে,—অথবা একাধিক এইরূপ শিল্পকে একত্রিত করিয়া উহাদের ক্ষেত্রে,—কেন্দ্রীয় সরকার "উন্নয়ন পরিষদ" (Development Council) গঠন করিয়া দিতে

* এই item গুলি—৫ (এ), ১১ (এ), ১৩ (এ), ১৬ (এ), ১৭ (এ), ২৭ (এ), ৩৫ (এ) এবং ৩৬ (এ)।

পারেন। (ক) মালিক (খ) শ্রমিক (গ) ক্রেতাদিগের প্রতিনিধি এবং (ঘ) বিশেষত্বশীল শিল্পজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া এইরূপ উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদগুলির উপর একাধিক কার্য্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে —যথা উৎপাদনের তাগ্ (target of production) নির্দ্ধারণ সম্পর্কে সুপারিশ করা, উৎপাদনের কর্ম্মসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং কতদূর অগ্রগতি হইল তাহা বিবেচনা করা, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার (installed capacity) পূর্ণতর ব্যবহার সুপারিশ করা, বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করা, নিয়ন্ত্রিত সামগ্রীর বণ্টনে সাহায্য করা ইত্যাদি। বর্ত্তমানে ১০টি শিল্পের জন্য এইরূপ পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে—ভারী রসায়ন, কাগজ, চামড়া, বনস্পতি, বাইসাইকেল, ভারী বৈদ্যুতিক, হাল্কা বৈদ্যুতিক, ঔষধ, কৃত্রিম রেশম ও পশম বয়ন। কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন তালিকাভুক্ত শিল্পের উপর শতকরা ২ আনা হারে উৎপাদন শুল্ক আরোপ করিতে পারেন এবং উহা হইতে সংগৃহীত অর্থ, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিষদকে শিল্প গবেষণা, ও গুণের মানোন্নয়নে, শিল্প জ্ঞানী (technicians) সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রদান করিতে পারেন।

প্রত্যেক তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিককে তাঁহার প্রতিষ্ঠান রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। তালিকাভুক্ত শিল্পের মধ্যে যদি কোন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হয় তাহা হইলে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। পুরাতন কোন প্রতিষ্ঠান নূতন কোন সামগ্রী উৎপাদন করিতে চাহিলেও উহার জন্য তাহাকে নূতন লাইসেন্স লইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন বোধে তালিকাভুক্ত কোন শিল্প সম্পর্কে বা বিশেষ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান (investigation) পরিচালনা করিতে পারেন। বিশেষ উৎপাদন হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দিলে, গুণ হ্রাস পাইলে, মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলে অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গতি সংরক্ষণের জন্য এইরূপ অনুসন্ধান পরিচালনা করা যাইতে পারে। উহার পরে সরকার প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন—যথা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, পণ্যের বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা, ক্ষতিকর ক্রিয়াপদ্ধতি নিষেধ করা, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া অথবা উৎপাদনের মান নির্দ্ধারণ করিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করা ইত্যাদি।

কোন কোন অবস্থায় সরকার তালিকাভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজেরাই পরিচালনা করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি সরকারের নির্দ্দেশ পালনে অক্ষম হয় অথবা অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে পরিচালিত হয় তাহা হইলে সরকার এই ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার আংশিকভাবে বা পরিপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থা-

পনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন অথবা ইচ্ছামত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন।

১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ) বিধির একটি সংশোধন সাধন করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে এই সংশোধিত আইনটি প্রয়োগ করা হইতেছে। এই সংশোধনের দ্বারা আরও ৩১টি নূতন শিল্পকে শিল্পবিধির আওতার মধ্যে আনা হইল। এই শিল্পগুলি হইল ফেরো-এ্যালয়েজ্, বিশেষ ইস্পাত, লিগনাইট, টেলিভিসন যন্ত্র, বৈদ্যুতিক চুল্লী, এক্স-রে যন্ত্র, টাইপরাইটার, গণনা যন্ত্র ইত্যাদি।

সারাংশ

শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের যৌক্তিকতা—পূর্ব্বে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারার যুগে অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করিতেন যে দেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিলে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও অর্থনৈতিক দলের নিজেদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা হইবে এবং উহার দ্বারাই দ্রুতগতিতে সম্পদ উৎপাদন পাইবে ও অর্থনৈতিক জীবন উন্নত হইবে। বর্ত্তমানে কিন্তু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং উহাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের পরিধিও সম্প্রসারিত হইতেছে। শিল্পের উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য যে বিশেষ উপকার দিবে এবং প্রয়োজন তাহা ক্রমশঃই উপলব্ধি হইয়াছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা—শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে পরাধীনতার যুগে বৈদেশিক সরকার বিশেষ কিছুই করেন নাই। ১৯০৫ সালে শিল্পদপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের করণীয় হইল নিছক শিল্প-শিক্ষা প্রদানে উৎসাহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে একটি শিল্প কমিশন গঠিত হয়; এই কমিশন সরকার কর্ত্তৃক শিল্পকে নানাভাবে সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন উল্লেখ করেন। ইহার পর সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য মিউনিশ্যান্‌স্ বোর্ড এবং প্রদেশে প্রদেশে শিল্প দপ্তর স্থাপিত হইল; বেসরকারী প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ষ্টোর্স দপ্তর। যুদ্ধের পর শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার নীতি গৃহীত হইল (অবশ্য বিচারমূলক সংরক্ষণ) এবং শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বিধি প্রণীত হইল। সরকার গ্রাম্য ও কুটির শিল্পকেও সাহায্য করিতে থাকেন, শিল্প গবেষণা ব্যুরোও স্থাপিত হয়। ২য় যুদ্ধের সময়ে সরবরাহ দপ্তর প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশীয় শিল্পের নিকট হইতে ক্রয় করেন এবং শিল্প দপ্তর শিল্প শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা করেন।

স্বাধীনতার পরে, সরকার শিল্পোন্নয়নের পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লন। কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় সেগুলি হইল : যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধাদান, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানী শুল্ক হ্রাস, ডিপ্রিসিয়েশন ফাণ্ডে অধিক অর্থ সংস্থানের সুযোগ দান এবং নবগঠিত শিল্পের মোট মুনাফার একটি নির্দ্দিষ্ট অংশকে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দান, শিল্পে অর্থ সরবরাহ সমস্যার সমাধানের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপন, আই সি, আই, সি, স্থাপনে সাহায্য এবং আন্তর্জ্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশনে যোগদান, শিল্পের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, নিজেদের মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠা, নূতন ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অধিকতর উদার সংরক্ষণনীতি গ্রহণ শিল্পগত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্য, শিল্পের নীতি ঘোষণা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ।

জাতীয়করণের সমস্যা - আমাদের দেশে শিল্পের জাতীয়করণ করা উচিত কিনা এ সম্পর্কে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক মতামত দেওয়া হইয়া থাকে। স্বপক্ষে যুক্তি হইল : (১) রাষ্ট্রের হাতে শিল্প আসিলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে না, ইহাতে অনেক উদ্যম ও অর্থের অপচয় বাঁচিয়া যাইবে ; (২) রাষ্ট্র অধিক মুনাফার লোভ করিবে না, সুতরাং সস্তায় সামগ্রী পাওয়া যাইবে, (৩) জনগণের প্রয়োজন এবং কল্যাণ অনুযায়ীই সামগ্রী উৎপাদিত হইবে, (৪) শ্রমিকগণ ন্যায়সঙ্গত মজুরী পাইবে, (৫) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সহজ হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে শিল্পের সামগ্রিক জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিম্নরূপ যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। (১) জাতীয়করণের প্রস্তাব শিল্পপতিদিগকে নিরুৎসাহিত করে, সুতরাং পুঁজি গঠনে বাধা দেয়, (২) অধিক উৎপাদনই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা উৎপাদন এখনই বৃদ্ধি পাইবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই, (৩) সরকারী শিল্প যে অধিক দক্ষতা সহকারে পরিচালিত হইবে এরূপও কোন স্থিরতা নাই, (৪) রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সত্যকার গণতন্ত্র যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত হইতে পারে না (৫) সরকারের হাতে যা অর্থ আছে তাহা পুরাতন শিল্প ক্রয়ে ব্যয় না করিয়া নূতন শিল্প স্থাপনে নিয়োগ করা উচিত। মোট কথা, শিল্পের জাতীয়করণের মধ্যে যে আদর্শ আছে তাহা উপলব্ধির জন্য ধীরে ধীরে উহার সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে।

সরকারের শিল্পনীতি—১৯৪৮ সালে ভারত সরকার শিল্প সম্পর্কে তাঁহাদের একটি নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে শিল্পসমূহকে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১ম পর্য্যায়ের শিল্প সরকারের একচেটিয়া অধিকারে থাকিবে ২য় পর্য্যায়ের শিল্পের পুরাতন কারখানাগুলিকে ১০ বৎসরের

জন্য কাজ চালাইয়া যাইতে দেওয়া হইবে কিন্তু নূতন কারখানা স্থাপন একমাত্র সরকারই করিতে পারিবেন ; ৩য় পর্য্যায়ের শিল্প সাধারণ লোকেই চালাইবে তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার আর একটি নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিলেন। ইহাতেও শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইল ১৭টি শিল্প ; এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে যে সকল কারখানা আছে সেগুলি চলিতে থাকিবে এবং উহাদের সম্প্রসারণও করা যাইবে কিন্তু নূতন কারখানা স্থাপিত হইবে একমাত্র সরকারের দ্বারা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১২টি শিল্প অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই শিল্পগুলির মধ্যে সরকারও কারখানা স্থাপন করিবেন এবং সাধারণ লোকেও কারখানা স্থাপন করিতে পারিবে। তৃতীয় শ্রেণীতে অন্যান্য শিল্পগুলিকে স্থাপন করা হইয়াছে।

১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির মধ্যে পার্থক্য হইল দুইটি : (ক) পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া রাষ্ট্রের শিল্পোদ্যোগের ব্যবস্থা করা হইল ; (খ) নূতন নীতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় ; সরকারী অংশেও এক্ষণে বেসরকারী অংশের বেশী করিয়া সহযোগিতা গ্রহণ করা হইবে।

সরকারী মালিকানাধীন শিল্প—সরকারের প্রত্যক্ষ মালিকানায় যে সকল শিল্প স্থাপিত হইয়াছে সেগুলি হইল সার উৎপাদন, হিন্দুস্থান বিমান কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, জাতীয় যন্ত্রাদি কারখানা, পেনিসিলিন কারখানা, কারখানার যন্ত্র উৎপাদনের কারখানা, হিন্দুস্থান জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্র, টেলিফোন ফ্যাক্টরী ইত্যাদি।

শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ—শিল্পের যাহাতে উন্নয়ন ঘটানো যায় এবং দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী উহার নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রণীত হইয়াছে। বিমান, অস্ত্রশস্ত্র, কয়লা, লৌহ, জাহাজ, চিনি, সিমেণ্ট প্রভৃতি অনেকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোগ যোগ্য। এই শিল্পগুলির উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। এইরূপ শিল্পের প্রত্যেকটির জন্য অথবা কয়েকটির জন্য একত্রিত ভাবে উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা যাইবে। এইরূপ শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক আরোপ করিয়া ঐ অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে। এই শিল্পগুলির মধ্যে প্রত্যেক কারখানাকে রেজেষ্ট্রী হইতে হইবে, নূতন কারখানা খুলিতে গেলে লাইসেন্স লইতে হইবে। ইহাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারা যাইবে এবং অনুসন্ধানের পর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে। কখন কখনও কোন বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

শিল্প ঃ অর্থ ব্যবস্থা ও পরিচালনা

Industry : Finance and Management

শিল্পের পুঁজি বা অর্থ-বিনিয়োগ সমস্যা—Problem of Capital or Industrial Finance

Q. Discuss the financial needs of Indian industries (B A. 1941). Describe the existing system of industrial finance in India and make suggestions for its development in future (B. Com. 1941)

ভারতীয় শিল্পের অর্থ প্রয়োজন—Financial needs of Indian Industries

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দুই পর্য্যায়ের পুঁজি প্রয়োজন। শিল্পের কারখানা স্থাপনের জন্য বাড়ী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কতিপয় বিষয় প্রয়োজন যে গুলির জন্য প্রথমেই একসাথে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন হয়। ঐ সামগ্রীগুলির ব্যবহারও বহু বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে, অর্থাৎ উহাদের দরুণ যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহা কারখানায় সামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া দুই এক বৎসরের মধ্যেই তুলিয়া লওয়া সম্ভব হয় না। এই পর্য্যায়ের পুঁজিকে বলা হয় স্থির পুঁজি (fixed capital)। অপর পক্ষে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য, শ্রমিকের মজুরী প্রদানের ও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের আরও অর্থের প্রয়োজন—অর্থাৎ আর এক পর্য্যায়ের পুঁজির প্রয়োজন। এই বাবদ ব্যয় প্রতিবৎসরই হইবে এবং এক বৎসর এই ধরণের যে ব্যয় করা হইল তাহা ঐ বৎসরে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া উঠাইয়া লওয়া হইবে কারণ এই ব্যয় হইল উৎপাদনের খরচা; সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহার উৎপাদনের খরচা তুলিতেই হইবে। এই পর্য্যায়ের ব্যয়ের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তাহাকে বলা হয় চল্‌তি পুঁজি (circulating or working capital)।

অতএব শিল্পের স্থির পুঁজি এবং চল্‌তি পুঁজির জন্য অর্থের প্রয়োজন হইবে।

পুঁজি সংগ্রহের সাধারণ পদ্ধতি—Traditional Sources of obtaining Capital

Q. Discuss the various methods by which capital is raised for

Indian industries. Are these methods adequate ? (B. A. 1943 ; '46) Examine the difficulties that are experienced in the way of financing industries in India and suggest measures for overcoming them (B. Com. 1944).

আমাদের দেশের শিল্প সমূহ চিরাচরিত ভাবে যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং সূত্র হইতে তাহাদের পুঁজি সংগ্রহ করিত, সেগুলি এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের অংশ পত্র অর্থাৎ শেয়ার বিক্রয় করিয়াই প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার প্রচলিত আছে বটে কিন্তু অধিকাংশ পুঁজিই সাধারণ শেয়ার (Ordinary Shares) বিক্রয় করিয়াই সংগৃহীত হয়। ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়াও পুঁজি সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে কিন্তু একাধিক কারণে ডিবেঞ্চারগুলি যথোচিত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। ইহাতে পুঁজির মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা (chance of capital appreciation) অল্পই ; এই গুলির উপরে আইন অনুযায়ী খরচাও আছে অনেক এবং ষ্ট্যাম্প ফিও প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প বিনিয়োগকারীগণ যে পুঁজির মূল্য বৃদ্ধির আশাতেই অর্থ বিনিযোগ করে, লভ্যাংশ অর্থাৎ নিয়মিত আয় করিবার নিমিত্ত নহে, ইহাই এক্ষেত্রে একটি প্রবল অন্তরায়, এবং বিশেষ পরিতাপের বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্বল্প মেয়াদী সম্পত্তি সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণের প্রথা অনুসরণ করে। কিন্তু সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিবার মধ্যে বিশেষ ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা থাকে। ইহার কারণ শিল্পে মন্দা উপস্থিত হইলেই জনসাধারণ তাহাদের আমানত পুনরর্পন (Renew) না করিয়া উহা উঠাইয়া লয়—যখন নাকি পুঁজির স্থায়িত্ব থাকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। সুতরাং পুঁজি সংগ্রহের এই পদ্ধতি নিছক সুসময়ের সুহৃদ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তৃতীয়তঃ, ম্যানেজিং এজেন্টগণও শিল্পে পুঁজি সরবরাহের অন্যতম উপায়রূপে ক্রিয়া করিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাহাদের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আদায়কৃত পুঁজি (Paid-up capital) উহাদের স্থায়ী বা চল্‌তি খরচার পক্ষে যথেষ্ট হয় না। কখনও কখনও ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করিয়া পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে, কখনও বা কারখানার সম্প্রসারণের জন্য বা কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, দেশের বাণিজ্য-মূলক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতেও শিল্প সমূহ তাহাদের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্ক সমূহের কারবারের প্রকৃতিই

এইরূপ যে উহারা শিল্প সমূহের দীর্ঘ-কালের জন্য পুঁজি সরবরাহ করিতে পারে না। ব্যাঙ্ক-গুলি সেই কারণে কল কারখানারূপ স্থায়ী সম্পত্তি, মজুত মাল বা নির্ম্মীয়মান পণ্যের বন্ধকীতে শিল্পগুলিকে স্বল্পকালীন ঋণ চল্‌তি পুঁজিরূপে প্রদান করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইন (State Aid to Industries Act) বিধিবদ্ধ হইয়াছে; ইহার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে শিল্পে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। এই ধরণের শিল্প কিন্তু স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প। সরকারের দ্বারা সরাসরি প্রদত্ত এই ধরণের আর্থিক সাহায্য বিশেষ সুফল প্রসূ হয় নাই, কারণ ঋণ প্রদানের সময়ে বিস্তারিত এবং সেহেতু দীর্ঘায়িত ক্রিয়া পদ্ধতি ঋণ প্রাপ্তিতে বহু বিলম্ব ঘটাইত কিন্তু ঋণের অর্থ আদায়ের সময়ে সরকারী যন্ত্র দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির ন্যায় কার্য্য করিত।

শিল্পের অর্থ-ব্যবস্থা—ইহার সমস্যা কোথায়?—
Industrial Finance—Where lies the Problem?

শিল্পের অর্থ সংগ্রহের এই বিভিন্ন সূত্রের আলোচনা হইতে স্বভাবতঃই শিল্পের অর্থব্যবস্থা সমস্যা আলোচনার প্রয়োজন উত্থিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণ ব্যক্তির সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম বলিয়া পুঁজি গঠন (Capital Formation) ঘটে অত্যন্ত ধীরে এবং খুব অল্প পরিমাণে। শিল্প অর্থ বিনিয়োগের অভ্যাসও জনগণের মধ্যে জাগরূক হইয়াছে অত্যন্ত ধীরে। বর্ত্তমানে এই বিনিয়োগ স্পৃহা পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এবং যতটা কাম্য তাহার তুলনায় উহারা এখনও যথেষ্ট নহে। অধিকন্তু অংশপত্রে "অগ্র প্রতিশ্রুতি" (under-writing shares) প্রথা যথেষ্ট অনুপাতে সৃষ্টি হয় নাই, যদিও বর্ত্তমানে ইহার উদ্ভবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্র-প্রতিশ্রুতির অর্থ হইল যে কোন কোম্পানী যখন শেয়ার বিক্রয় করে তখন কোন ব্যাঙ্ক বা অর্থ সংক্রান্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ঐ অংশের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি অগ্রেই প্রদান করে। ইহার দ্বারা শেয়ার-গুলিকে সমর্থন করা হয়, এমন কি পরোক্ষভাবে নিশ্চয়তা প্রদানও (Guarantee) করা হইয়া থাকে; ইহাতে নূতন কোম্পানীর পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া পুঁজি সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে।

সাধারণ যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্কগুলি জনগণের নিকট হইতে অল্পকালের জন্যই আমানত (Deposits) পাইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের পক্ষে দীর্ঘকালের জন্য আটকাইয়া থাকিবে এই ধরণের পুঁজি শিল্পগুলিকে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। প্রগতিশীল দেশগুলিতে এই ফাঁক পুরণ করা হয় বিশেষ ধরণের শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপনের দ্বারা। আমাদের দেশে সে প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল বটে কিন্তু চরম

অসাফল্যের মধ্যেই সে প্রচেষ্টা শেষ হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই এবং আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পগুলি জনগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া পুঁজি সংগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু এই ধরণের পুঁজি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং ইহার উপর কোন ক্রমেই নির্ভর করিতে পারা যায় না। বিপদের সামান্যতম আভাসে এই পুঁজি সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতি আরও জটিলতর হইয়া পড়িবে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণ বহু ক্ষেত্রেই শিল্পকে পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে অথবা তাহাদের পুঁজি সংগ্রহের প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই কার্য্যের বিনিময়ে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ শিল্পগুলির নিকট হইতে অনেক অযৌক্তিক সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে এবং শিল্পগুলি যে সুবিধা পাইয়াছে তাহার তুলনায় অত্যধিক মূল্য দিতে হইয়াছে কিনা তাহা বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

শিল্পগুলি তাহাদের চল্‌তি পুঁজির কিছু অংশ যৌথ পুঁজি ব্যাঙ্ক অর্থাৎ বাণিজ্য-মূলক ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে পাইয়া থাকে। ছোট খাট শিল্প সমূহ দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এবং মহাজনদিগের নিকট হইতে ঋণ পাইয়া থাকে। ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু শিল্প সমূহকে তাহাদের চল্‌তি পুঁজির সম্পূর্ণ অংশ বা অধিকাংশই সরবরাহ করিতে পারে এ ধারণাও ঠিক নহে। যতটা চল্‌তি পুঁজি ইহারা সরবরাহ করে তাহার জন্য প্রদেয় সুদ কারবারের নিয়মিত লাভযোগ্যতার (Normal profitability of business) তুলনায় অত্যধিক বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। অধিকন্তু ইহারা দীর্ঘ মেয়াদী বা মাঝারি মেয়াদী ঋণ প্রদান করিতে পারে না, পারে শুধু স্বল্প মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিতে। এই ঋণও তাহারা শিল্পের শেয়ারের উপর প্রদান করে না। বাস্তব সম্পত্তির বন্ধকীতেই প্রদান করে। সুতরাং ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া এই বাস্তব সম্পত্তি সৃষ্টির অবকাশ খুবই কম; জনসাধারণের নিকট হইতে গৃহীত আমানত চল্‌তি পুঁজিরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহার বিপদ পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

সুতরাং শিল্পে অর্থ ব্যবস্থার মূল সমস্যা হইল দেশের শিল্প কাঠামোতে অর্থ সরবরাহের অপ্রাচুর্য্য, অর্থ সংগ্রহের কতিপয় উৎস সম্পর্কে নির্ভরযোগ্যতার অভাব এবং অর্থ সরবরাহের কোন কোন উৎস কর্ত্তৃক অন্যায় সুযোগ সুবিধা সংগ্রহ।

শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন—(Development of the system of industrial finance)—জনসাধারণের মধ্যে শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগ করিবার অভ্যাস আনিতে হইবে; বিনিয়োগ স্পৃহা জাগরূক এবং ঠিক পথে পরিচালিত করিবার জন্য সরকারী সহায়তায় বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন। সর্ব্বসাধারণের সঞ্চয় যখন শিল্প পরিপুষ্ট করিবার দিকে

প্রবাহিত করিতে পারা যাইবে তখনই বিনিয়োগ সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকে অগ্রসর সম্ভব হইবে। তবে সাধারণের বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ আমানতের মারফত না হইয়া শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ের মারফৎ হইতে হইবে। উপরন্তু সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সুসংগঠিত এবং সুপরিচালিত হয় তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে—এবং এই ভাবে যাহাতে তাহারা শিল্পের লাভজনকতা অনুসারে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ধার দিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। "ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি সস্তায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বল্প মেয়াদী ঋণ আগেই সরবরাহ করিয়াছে এবং এক্ষণে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ সরবরাহই একমাত্র সমস্যা—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।" (লোকনাথন্)

ভারত সরকার 'ইনডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন' গঠন করিয়াছেন। ইহা অবশ্য পুঁজি সরবরাহ সমস্যার কিছুটা সমাধান করিতে পারিবে। কিন্তু উহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের দেশে বিশেষ ধরণের শিল্প ব্যাঙ্ক বা শিল্প বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করা প্রয়োজন। এই সকল ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামগ্রী বা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া উহাকে ঋণ দিতে পারিবে। এই ব্যাঙ্কগুলি অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে শিল্প বন্ধকী ঋণপত্র (Industrial mortgage bonds) বিক্রয় করিয়া। সমগ্র দেশের জন্য একটি নিখিল ভারত শিল্প বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করা যাইতে পারে—ইহা শিল্প বন্ধকী ঋণপত্র বিক্রয় করিবে এবং এই ঋণপত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিলে জনসাধারণ এইগুলি আস্থার সহিত কিনিবে (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বলিবেন যে ঐগুলির অর্থ পরিশোধের জন্য তাঁহারা পরোক্ষভাবে দায়ী থাকিবেন)।

সম্প্রতি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত আছে। ভারত সরকার ইহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং পুঁজি প্রয়োজনের মধ্যে ফাঁক—Gap between Domestic Savings and Capital Requirement

দেশের মধ্যে যতখানি সঞ্চয় কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যতখানি পুঁজির প্রয়োজন দেখা যায় উহাদের বিশ্লেষণ করিয়া ফিসক্যাল কমিশন উহাদের মধ্যে কতখানি ফাঁক আছে তাহার একটি ধারণা দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন—যদিও এই সম্পর্কে অভ্রান্ত কোন হিসাব প্রণয়ন সম্ভব নহে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে বিভিন্ন বেসরকারী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে সেগুলি দেশের পুঁজি প্রয়োজন (Capital requirement) কতখানি বলিয়া ধরিয়াছিল ফিসক্যাল কমিশন তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন; এ সম্পর্কে তাঁহারা বলিয়াছেন যে খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রচলিত দ্রব্য মূল্য স্তরে ৩০০ কোটি টাকার মতন মূলধনীব্যয়

(Capital expenditure) প্রয়োজন। যুদ্ধ পূর্ব্বকালে যত বিনিয়োগ হইত, উহা দামস্তরের পরিবর্ত্তন ধরিয়া, প্রায় ইহার সমানই ছিল ; ঐ সময়ে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আভ্যন্তরীণ পুঁজি বিনিয়োগের সহিত প্রায় সমানই ছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে, পুঁজি গঠন (Capital formation) হ্রাস পাইযাছে।

যুদ্ধোত্তরকালে যে পুঁজি গঠন হ্রাস পাইয়াছে তাহা ঠিকই ; কিন্তু যুদ্ধপূর্ব্বকালে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের দ্বারা যে পুঁজি বিনিয়োগের সমস্ত প্রয়োজন মিটিত ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না। তখনও বৈদেশিক পুঁজির সাহায্যে বিনিয়োগ এবং আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের ব্যবধান পূরণ করিতে হইয়াছিল।

সাম্প্রতিককালে পুঁজি গঠনের প্রতিবন্ধক—Recent Checks to Capital Formation

যুদ্ধোত্তর যুগে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একাধিক কারণ বিশ্লেষণ করা যায় :

(১) শিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নির্দ্ধারিত নীতি অনেক সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে। ঠিকই হউক অথবা ভুলই হউক, শিল্পকে অনিশ্চয়তার আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে হয়। (২) অধিকতর আয়ের উপর যে অত্যধিক হারে আয় কর সংগৃহীত হয় তাহাতেও পুঁজি বিনিয়োগ বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অনেকেই মনে করিয়া থাকেন। (৩) ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের অসাধু ক্রিয়াকলাপও পুঁজি বিনিয়োগের অন্তরায়রূপে গণ্য হইয়া থাকে। (৪) ষ্টক এক্সচেঞ্জে জুয়াখেলার পদ্ধতি পুঁজি গঠনের বাধা বলিয়া অনেকেই ফিসক্যাল কমিশনের নিকট অনুযোগ করিয়াছিলেন। (৫) জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয়ের যে পুনর্বণ্টন ঘটিয়াছে তাহাতেও পুঁজি বিনিয়োগ হ্রাস পাইয়াছে। "এক্ষণে ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে ক্রয় ক্ষমতা জনগণের সেই অংশের নিকট যাইতেছে যাহারা সঞ্চয় করিতে এবং বিনিয়োগ করিতে অভ্যস্ত নহে এবং যে শ্রেণী সাধারণতঃ শিল্পে বিনিয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের প্রাপ্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ জীবনধারণের ব্যয়াধিক্য এবং অন্যান্য কারণে হ্রাস পাইয়াছে।"

শিল্প ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান—Industrial Finance Corporation

Q. Describe the main features of the Industrial Finance Corporation of India and give a brief account of its working. (B. A. 1952 ; B. Com 1952). Critically examine the functions and achievements of the Industrial Finance Corporation of India. (Cal. B. A. 1957)

শিল্প ঋণ সরবরাহে সাহায্য করিবার জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগে শিল্প ঋণ

সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বা ইনডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স করর্পোরেশন যে গঠিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

গঠন পদ্ধতি—এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা—৫০০০৲ টাকা মূল্যের ২০ হাজারখানি শেয়ারে ইহা বিভক্ত। প্রথমে ইহার অর্দ্ধেক শেয়ার—মোট ৫ কোটি টাকা মূল্যের ১০ হাজারখানি শেয়ার—ইস্যু করা হইয়াছে। কর্পোরেশন যখন উপযুক্ত বিবেচনা করিবে তখন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া অবশিষ্ট শেয়ার ইস্যু করিতে পারিবে। জনসাধারণ এই সকল শেয়ার ক্রয় করিতে পারে না—এই শেয়ার ক্রয় করিতে পারে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং সরকার। প্রথম প্রচারিত শেয়ারের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যেকেই এক কোটি টাকার শেয়ার কিনিবে। সিডিউল ব্যাঙ্কগুলি কিনিবে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার, বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগ ট্রাষ্ট ও অন্যান্য অর্থ বিনিয়োগ মিলিয়া ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার, এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনিতে পারিবে। কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের হস্তে যাহাতে অধিক শেয়ার কেন্দ্রীভূত না হয় সেই উদ্দেশ্যে নিয়ম করা হইয়াছে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোন একটি প্রতিষ্ঠান ঐ শ্রেণীর জন্য যত পরিমাণ শেয়ার নির্দ্ধারিত আছে তাহার শতকরা ১০ ভাগের অধিক ক্রয় করিতে পারিবে না। এই সকল শেয়ারের উপর একটি ন্যূনতম হারে ডিভিডেণ্ড প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গ্যারান্টি প্রদান করেন।

কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব একটি বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরস বা পরিচালক সংসদের উপর অর্পিত। তবে ইহার ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে সরকারের নিকট হইতে নীতি-নির্দ্ধারণ সম্পর্কিত যে সকল নির্দ্দেশ ইহা লাভ করিবে, উহা যথাযথ পালন করিতে পরিচালক সংসদ বাধ্য থাকিবে। যাহাদিগকে লইয়া পরিচালক সংসদ গঠিত থাকিবে তাহারা হইল (১) কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা মনোনীত তিনজন ডাইরেক্টর (২) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা মনোনীত তিনজন ডাইরেক্টর (৩) কর্পোরেশনের অংশীদার যে সকল সিডিউল ব্যাঙ্ক আছে তাহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত দুইজন (৪) কর্পোরেশনের অংশীদার সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা নির্ব্বাচিত দুইজন এবং (৫) ইহারা বাদে অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের দুইজন। একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থাকিবেন ; কেন্দ্রীয় সরকারই ইঁহাকে নিয়োগ করিবেন, প্রথমবারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে এবং তাহার পর হইতে কর্পোরেশনেরই পরিচালক সংসদের সহিত পরামর্শক্রমে।

ক্রিয়াকলাপ—কর্পোরেশন শিল্পে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন পর্য্যায়ের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। প্রথমতঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের নিকট

হইতে যে ঋণ গ্রহণ করে সেই ঋণের পরিশোধ সম্পর্কে ইহা গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারে। এই ঋণ ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য হইতে হইবে। কি শর্তে এবং কি পারিশ্রমিকে কর্পোরেশন এইরূপ গ্যারিন্টি প্রদান করিবে তাহা কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রচলিত শেয়ার, বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে ইহা অগ্রপ্রতিশ্রুতি প্রদান করিবে (underwrite) পারে। তৃতীয়তঃ, ঐ সকল কার্য্যের জন্য কর্পোরেশন চুক্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত কমিশন লইতে পারে। চতুর্থতঃ, অগ্রপ্রতিশ্রুতির বাধ্যকতা পালনের জন্য যে ষ্টক্, শেয়ার, বণ্ড বা ডিবেঞ্চার ইহার হাতে আসিবে তাহা স্বীয় সম্পত্তির অংশ হিসাবে ইহা রাখিয়া দিতে পারিবে, তবে এইগুলি যতশীঘ্র সম্ভব (৭ বৎসরের মধ্যে অবশ্যই) বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে পঞ্চমতঃ, ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বা দাদন দিতে পারিবে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতেও পারিবে। তবে এই ঋণ বা ডিবেঞ্চার পরিশোধের মেয়াদ ২৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য হইবে না। কর্পোরেশন যে ঋণ প্রদান করিবে উহার জন্য সিকিউরিটি, ষ্টক্, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ধাতু, স্থাবর-অস্থাবর অন্য কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইবে। কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেশন কত পরিমাণ ঋণ দিতে পারে তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কর্পোরেশন নিজের চলতি পুঁজি সংগ্রহের জন্য সুদ প্রদায়ী বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে পারিবে। কর্পোরেশনের সামগ্রিক দায় (liability) উহার আদায়ী মূলধন (Paidup Capital) ও রিজার্ভ-এর মিলিত পরিমাণের পাঁচ গুণের অধিক হইতে পারিবে না। শুধুমাত্র ইহার বিক্রীত বণ্ড ও ডিবেঞ্চারই উহার সামগ্রিক দায় নহে, উহার সামগ্রিক দায়ের মধ্যে উহার দ্বারা প্রদত্ত গ্যারান্টি এবং অগ্রপ্রতিশ্রুতি (underwriting) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। জনসাধারণের নিকট হইতে কর্পোরেশন আমানত গ্রহণ করিতেও পারিবে তবে পাঁচ বৎসরের কম সময়ের জন্য এবং দশ কোটি টাকার অধিক আমানত গ্রহণ করা হইবে না।

কর্পোরেশনের ঋণ প্রদানের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। ইহা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে ঋণ প্রদান করিতেও পারে এবং সেই উদ্দেশ্য ইহা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে বৈদেশিক মুদ্রা কর্জ্জ করিতে পারে, অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি লইয়া। সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐ ঋণ হয় বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা সমপরিমাণ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা স্বরূপ তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার সম্মুখম্ চেট্টী বলিয়াছিলেন "এইরূপ বিধান প্রয়োজন এই কারণে যে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে

ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিদেশে পুঁজি প্রয়োজন হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থার যে অসুবিধা এখনও কিছুকাল চলিবে তাহার মধ্যে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুঁজি সামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা দুরূহ হইবে। ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত এই ধরণের একটি কর্পোরেশন হয়তো এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।"

সংশোধন—১৯৫২ সালের ৫ই ডিসেম্বর পার্লিয়ামেণ্ট "ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন বিধির" একটি সংশোধন সাধন করিয়াছেন। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে উহা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কার্য্যকলাপ বিস্তৃত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উহাকে আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করা। এই সংশোধনের দ্বারা ভারত সরকার এই কর্পোরেশনের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণকে গ্যারাণ্টি প্রদান করিতে পারিবেন এবং ঐ ক্ষেত্রে বিনিময় হার জনিত কোন লোকসান হইলে উহা পূরণ করিবেন। এই সংশোধন বিধির দ্বারা ফিনান্স কর্পোরেশনে বিশেষত্বশীলজ্ঞান বিশিষ্ট দক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; ইহার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনাগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হয় এবং খাতক-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির (debtor industries) ক্রিয়াকলাপ যাহাতে যথাযথ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। প্রয়োজন বোধে, অর্থাৎ সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত না হইলে, ঋণগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ফিনান্স কর্পোরেশন স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতে গৃহীত ডাইরেক্টরদিগের সংখ্যা এই সংশোধনের দ্বারা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের সহিত ফিনান্স কর্পোরেশনের সম্পর্ক স্থাপনের আয়োজন করা হইয়াছে—ইহার দ্বারা সমগ্র ফিনান্স কর্পোরেশনের উপর ভারত সরকারের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের সুবিধা হইবে।

কর্ম্মপরিচয়—১৯৫৬ সালের ৩০ জুন যে একটি বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সময়ের মধ্যে ফিনান্স কর্পোরেশনের কর্ম্মতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে (১লা জুলাই হইতে ৩০শে জুন) এই কর্পোরেশন ৮৬টি ঋণের আবেদন পাইয়াছিল এবং এই দরখাস্তগুলিতে ২৭·৭০ কোটি টাকার ঋণ প্রার্থিত হইয়াছিল। উহার পূর্ব্ব বৎসরে দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ৪৬ এবং প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ ছিল ১১·২৭ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪৪টি দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছিল এবং ১৫·১৩ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল। প্রথম হইতে ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন অবধি কর্পোরেশন মোট ৪৩·২১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে শিল্পের জন্য যত পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা এইরূপ : খাদ্য তৈয়ারী শিল্প—

১১'৬৯ কোটি টাকা ; বস্ত্রবয়ন—৬'৬০ কোটি ; কাগজ ও কাগজী দ্রব্য—৪'২১কোটি ; কৃত্রিম তন্তু—১'১০ কোটি ; রবার সামগ্রী—১৫'৫০ লক্ষ ; ভিত্তিক শিল্প রসায়ন (সার সমেত) —৫'৩৬ কোটি ; বনস্পতি, প্রাণীজ তৈল এবং চর্ব্বি—৬'৫০ লক্ষ ; বিবিধ রসায়ন দ্রব্য—৪১ ২৫ লক্ষ , কাঁচ ও কাঁচদ্রব্য—১'১০ ; মৃৎশিল্প, চিনা-মাটির বাসন —৩৯'৫০ লক্ষ ; সিমেণ্ট—৩'৫০ কোটি ; লৌহেতর ধাতু শিল্প— ১'১৭ কোটি ; ধাতুজাত সামগ্রী (যন্ত্র বাদে)—১'৬৮ কোটি ; যন্ত্র (বৈদ্যুতিক যন্ত্র বাদে) —১'০৮ কোটি ; বৈদ্যুতিক যন্ত্র—১'৫৬ কোটি ; রেল রাস্তার সরঞ্জাম নির্ম্মাণ—৫০ লক্ষ ; মোটরযান ও আনুষঙ্গিক—১'৩৭ কোটি ; বাইসাইকেল—৫০'৫০ লক্ষ ; বিবিধ কারখানা শিল্প—৪২'৮০ লক্ষ ; বৈদ্যুতিক আলো ও শক্তি—৪২'৭৫ লক্ষ ।

কেবলমাত্র ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাব ধরিলে চিনি শিল্প (উপরে খাদ্য শিল্পের মধ্যে ধরা হইয়াছে) এবং বস্ত্র বয়ন শিল্প সবথেকে বেশী ঋণ পাইয়াছে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ঘটনা হইল বোম্বাই, মহীশূর, আসাম ও পাঞ্জাবে সমবায় চিনির কারখানাগুলিকে ঋণ প্রদান করা। ১৯৫৫-৫৬ সালে এইরূপ সমবায় সমিতিগুলিকে ৫'৫০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। সরকার এ সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমবায় চিনি কারখানাগুলিকে প্রদত্ত ঋণে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন। কর্পোরেশনের কর্ম্মপরিচালনার মধ্যে একটি সুখের বিষয় হইল ঋণের টাকা এবং সুদের টাকার সন্তোষজনক আদায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে আসল বাবদ ইহার ফিরৎ পাইবার কথা ছিল ২'২৫ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে ফিরৎ আসে নাই ৫৬ লক্ষ টাকা মাত্র। ৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আসলের টাকা শোধ দিতে পারে নাই—ইহাদের মধ্যে সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস লইয়াই বেশী অসুবিধা হইয়াছিল। অন্যথায় অনাদায়ের পরিমাণ আরও কম হইত। ঐ সময়ে কর্পোরেশনের সুদ প্রাপ্য হইয়াছিল ২'৮১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সুদ আদায় হইয়াছিল ২'৭৩ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে অনাদায়ের অনুপাত ৬'৪ শতাংশ মাত্র। ইহা সন্তোষজনকই বলিতে হইবে। ঐ বৎসরের জন্য ফিনান্স কর্পোরেশন ৩২'৬৮ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছে ; উহা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা ৮ লক্ষ টাকা বেশী। উহার মধ্যে ১০'১৮ লক্ষ টাকা কর প্রদানের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, সুতরাং কর্পোরেশনের নীট মুনাফা থাকে ২২'৫০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সমস্ত টাকাটাই খারাপ ও সন্দেহজনক ঋণের দায় মিটাইবার জন্য রিজার্ভে সরাইয়া রাখা হইয়াছে, কারণ সোদপুর গ্লাস ওয়ার্কস লইয়া কর্পোরেশনের অনেক লোকসান হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ফিনান্স কর্পোরেশনকে মুনাফা অর্জ্জন করা সত্ত্বেও নিজের শেয়ারের উপর নিশ্চয়তাপ্রদত্ত ডিভিডেণ্ড দিবার জন্য সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য চাহিতে হইয়াছে।

সাম্প্রতিক সংশোধন

১৯৫৫ সালে "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড্ ষ্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনস্ এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট" ("Industrial and State Financial Corporations Amendment Act, 1955") নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ইহা ১৯৫৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে চালু হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন সম্পর্কে ব্যবস্থা হইয়াছে যে উহার বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের একজিকিউটিভ কমিটির পরিবর্ত্তে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে। পূর্ব্বে একজন অবৈতনিক চেয়ারম্যান ছিলেন এবং একজন সর্ব্বসময়ের জন্য বেতনভোগী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন ; এক্ষণে একজন বেতনভোগী চেয়ারম্যান থাকিবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন জেনারেল ম্যানেজার থাকিবেন বলিয়া ব্যবস্থা হইয়াছে। অধিকন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে এই কর্পোরেশন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইহার নিকট গচ্ছিত বন্ধকী-সামগ্রী ইহা পাট্টা দিতে পারিবে। তদ্ভিন্ন কর্পোরেশন অগ্রপ্রতিশ্রুতি (underwriting) দিবার কারণে যে ষ্টক, শেয়ার, বণ্ড্ বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে তাহা সাত বৎসরের বেশী ধরিয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া তাহা পারিবে। পণ্য উৎপাদনের জন্য বা বিক্রয়যোগ্যকরণের (Processing) জন্য গঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন সুরু করিবার পূর্ব্বে এই কর্পোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে পারে বলিয়াও বিধান দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনের উপকার

এই পরিবর্ত্তনগুলির দ্বারা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের কর্ম্মদক্ষতা অর্থাৎ শিল্পগুলিকে উপকার প্রদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। বেতনভোগী চেয়ারম্যান থাকিলে দক্ষ অর্থবিশেষজ্ঞকে চেয়ারম্যানরূপে পাওয়া যাইতে পারে এবং এমন একজন ব্যক্তিকে চেয়ারম্যানরূপে পাওয়া যাইতে পারে যিনি কোন চলতি কারবারের সহিত লিপ্ত থাকিয়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবেন না। ইহাতে কর্পোরেশনের কার্য্য পক্ষপাতশূন্য হইবে। সেই কারণেই এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের অনুসন্ধান কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু কর্পোরেশন যদি বেশী সংখ্যক শিল্পকে সাহায্য করিতে চাহে তাহা হইলে উহার আর্থিক সঙ্গতি যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকারের নিকট হইতে ঋণ করিবার এবং বন্ধকী সামগ্রী পাট্টা দিবার ক্ষমতা পাইয়া এক্ষণে কর্পোরেশনের পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। সরকারও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন (১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাব)। কিন্তু ফিনান্স কর্পোরেশনের ন্যায় একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া ইহা করা সরকারের পক্ষে

লাভজনক ও নিরাপদ হইবে। ফিনান্স কর্পোরেশন যদি সরকারের নিকট ঋণ করে এবং ঐ ঋণ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করে—তাহা হইলে সরকার ও ফিনান্স কর্পোরেশন উভয়েরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সাত বৎসরের বেশী সময়ের জন্য ফিনান্স কর্পোরেশন ষ্টক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ধরিয়া রাখিতে পারে (অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া) বলিয়া যে বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কর্পোরেশনের কার্য্য অনেক প্রসারক্ষম (elastic) এবং সুফলপ্রদ (effective) করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। আরও কিছুকাল শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ধরিয়া রাখিয়া যদি একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা রাখিতে বাধা কি? অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই কার্য্যের গুণাগুণ বা ফলাফল স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেও শিল্প প্রতিষ্ঠান ঋণ পাইতে পারে—ইহাও কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পকে প্রভূত উপকার দিবে। কোন নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কর্ম্মসূচী যদি অর্থনৈতিক বিচারে সুষ্ঠু ও সঙ্গত হয় তাহা হইলে প্রথম হইতেই, অর্থাৎ উৎপাদনের পূর্ব্বেই, তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলে উহা দ্বারা শিল্পোন্নয়নে সাহায্যই করা হইবে।

তথাপি কোন্ ত্রুটি থাকিয়া গেল—

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, ফিনান্স কর্পোরেশনের কার্য্যকে ফলপ্রদ করিতে হইলে আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন। **প্রথমতঃ,** কর্পোরেশন যে ঋণ মঞ্জুর করে সেই ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রদান করিতে এত সময় কেন লাগে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ঋণ নিছক মঞ্জুর করা হইলে উহার দ্বারা কোন উপকার হয় না, ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের হস্তগত হইলে তবেই উহার উপকার হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন অবধি ৪৩'২১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত অর্থ হস্তান্তরিত হইয়াছে ১৬'৭৩ কোটি টাকা। উহা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতির ত্রুটি এবং কর্ম্মদক্ষতার অভাবের পরিচয় দেয়। **দ্বিতীয়তঃ,** কর্পোরেশনের কার্য্যের মধ্যে আরও নমনীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগণ সরাসরি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়াছেন, ফিনান্স কর্পোরেশনের অপেক্ষা অনেক কম সুদে এবং অনেক সহজ বন্ধকীতে। সুতরাং ফিনান্স কর্পোরেশনকে ঋণ প্রদানের শর্ত্তাবলীর কঠোরতা প্রয়োজন বোধে শিথিল করিবার অধিকার দেওয়া উচিত—অবশ্য খারাপ ঋণ যাহাতে সৃষ্টি না হয় তাহার দিকেও নজর দিতে হইবে। আরও একটি বিষয় হইল প্রয়োজনের তুলনায় কর্পোরেশনের কম সঙ্গতি। ফিনান্স কর্পোরেশন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করুক ইহা চাহিলে উহার সঙ্গতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বিহার এবং ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যগুলি ফিনান্স কর্পোরেশনের নিকট হইতে সব থেকে বেশী পরিমাণ ঋণ পাইয়াছে। কম ঋণ পাইয়াছে আসাম, মধ্যভারত, দিল্লী এবং মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত শিল্পগুলি। মোট ৪৩.২১ কোটি টাকা মঞ্জুরকৃত ঋণের মধ্যে একা বোম্বাই পাইয়াছে ১৩.৩০ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে ৫ কোটি টাকার কিছু বেশী, মাদ্রাজ পাইয়াছে ৪.৭৮ কোটি, বিহার ৩.১৯ কোটি এবং ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ৩.১৮ কোটি টাকা; অর্থাৎ এই পাঁচটি রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশনের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের তিন চতুর্থাংশ পাইয়াছে। দেশের অন্য সমস্ত অঞ্চল মিলিয়া এক চতুর্থাংশ পাইয়াছে। ফিনান্স কর্পোরেশনকে নিছক একটি সাধারণ ঋণ প্রদায়ী সংস্থারূপে দেখিলে ঋণ প্রদানের এই আঞ্চলিক বৈষম্যে দোষের কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না; কারণ যে অঞ্চলে বেশী শিল্প গড়িয়া উঠে, সেই অঞ্চলে বেশী ঋণ পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ফিনান্স কর্পোরেশনের আইনগত সত্তা যাহাই হউক না কেন, ইহা একটি জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অনুন্নত অংশে শিল্পোন্নতি সহজ করিবার কার্য্যে ইহার কিছুটা দায়িত্ব রহিয়াছে। সুখের বিষয় যে যে-রাজ্যগুলি ফিনান্স কর্পোরেশনের নিকট হইতে পুর্ব্বে বেশী ঋণ পায় নাই, সম্প্রতি কর্পোরেশন তাহাদের প্রতি অধিক দৃষ্টি প্রদান করিতেছেন।

চতুর্থতঃ, ফিনান্স কর্পোরেশনকে বিভিন্ন উপায়ে শিল্পে অর্থ সরবরাহের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সরাসরি ঋণ প্রদান ছাড়াও, ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে পারে, শেয়ার ক্রয়ের অগ্রপ্রতিশ্রুতি দিতে পারে অথবা অপরের দ্বারা প্রদত্ত ঋণে ইহা নিশ্চয়তা দিতে পারে। কিন্তু ফিনান্স কর্পোরেশন এই পদ্ধতিগুলির কোনটিই এযাবৎ অবলম্বন করে নাই।

উন্নয়নের কর্ম্মপ্রস্তাব—Suggestions for Improvement

(১) ফিনান্স কর্পোরেশনের রিজার্ভ বৃদ্ধি করিবার উপায় বা পদ্ধতির সন্ধান করিতে হইবে—যাহাতে দেশের শিল্পোন্নয়নে ইহা আরও অধিক কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

(২) পরিচালক সংস্থার (Board of Directors) কোন সদস্যের কোন ঋণ-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে স্বার্থ থাকিবে না।

(৩) কোন কোম্পানীর ঝুঁকি-পুঁজিতে (risk capital) বিনিয়োগ করিবার ক্ষমতা ইহার থাকা উচিত।

(৪) মুখ আটকের সকল কারণ অপসারিত করা উচিত—যাহাতে যে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার পুর্ণ অংশ যথা সময়ে কর্জ্জপ্রার্থীর নিকট পৌঁছায়।

(৫) ফিনান্স কর্পোরেশনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার প্রস্তাবও কোন কোন মহলে

করা হইয়াছে। যাহাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাব করা হইয়াছে।

রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা-State Financial Corporations

Q. Explain the functions and objectives of State Finance Corporations as established in different States of India (Cal. B. A. 1956)

শিল্পে অর্থ সরবরাহ সংস্থা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সাহায্য করিতে পারে, ক্ষুদ্র আয়তনের শিল্প এবং কুটির শিল্পকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করা ইহার পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই কারণে পার্লামেণ্ট ১৯৫২ সালে "রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা বিধি" (State Financial Corporation Act) নামে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা রাজ্য সরকারগুলিকে তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে অর্থ সরবরাহ সংস্থা স্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গেও এইরূপ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরাজ্যের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আয়তনের শিল্প সমূহের অসুবিধা বিশ্লেষণের জন্য ডক্টর এন, এন, লাহার সভাপতিত্বে একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটিও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যাহারা দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না সেইরূপ শিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য "পশ্চিমবঙ্গ অর্থ সরবরাহ সংস্থা" নামে বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। ১৯৫২ সালে পার্লামেণ্টের বিধি প্রণীত হইবার পরে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হন এবং ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখ হইতে "রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা" চালু হয়।

এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) হইল ২ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up Capital) ১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে রাজ্য সরকার দিয়াছেন ৩০ লক্ষ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০ লক্ষ এবং ৪০ লক্ষ টাকার পুঁজি দিতে পারিবে শিডিউল ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। জনসাধারণের নিকট হইতে ১০ লক্ষ টাকা পুঁজি সংগৃহীত হইবে। কর্পোরেশনের শেয়ার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদত্ত (guaranteed); এই নিশ্চয়তা শুধু আসল সম্পর্কেই নহে, ডিভিডেণ্ড্ সম্পর্কেও। ১৯৫৪ সালে ১লা জুলাইয়ের পরবর্ত্তীকালের জন্য বাৎসরিক শতকরা ৩৲ টাকা হারে ন্যূনতম ডিভিডেণ্ড্ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদত্ত আছে। তবে শতকরা ৫৲ টাকা হারের অধিক ডিভিডেণ্ড্ কখনই প্রদত্ত হইবে না। এই সংস্থা মেয়াদী আমানত (Fixed Deposits) গ্রহণ করিতে পারে তবে উহা অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্য হইতে হইবে। ইহা অর্থ সংগ্রহের জন্য বণ্ড-কাগজও বিক্রয় করিতে পারে। উহার দ্বারা সংগৃহীত

অর্থের পরিমাণ উহার আদায়ী পুঁজি (paid-up capital) এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের মিলিত পরিমাণের পাঁচ গুণের অধিক হইবে না। ইহার অংশপত্র এবং বণ্ড কাগজগুলিতেও রাজ্য সরকার নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন—এই নিশ্চয়তা (guarantee) থাকিবে আসল পরিশোধের উপর এবং সুদ প্রদানের উপর।

রাজ্য কর্পোরেশন একাধিক পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র শিল্প সমূহকে সাহায্য প্রদান করিতে পারে। প্রথমতঃ, ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে; এইরূপ ঋণ ২০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্য কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে এই ঋণের উপরেও কর্পোরেশন নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই কর্পোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশপত্র, বণ্ড এবং ডিবেঞ্চারে অগ্রপ্রতিশ্রুতি (underwrite) প্রদান করিতে পারিবে। কর্পোরেশন কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে যে ঋণ প্রদান করিবে তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান-কে ১০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ প্রদান করা হইবে না; এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের আদায়ী পুঁজির (Paid-up Capital) ১০ শতাংশ যদি ১০ লক্ষ টাকার কম হয় তাহা হইলে ঐ কম পরিমাণ অর্থ পর্য্যন্ত কর্পোরেশন ঐ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারিবে।

এই কর্পোরেশন একটি পরিচালক সংসদের দ্বারা (Board of Directors) পরিচালিত হয়। ইহা দশজন ব্যক্তি লইয়া গঠিত। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন চেয়ারম্যান এবং আর একজন হইলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। পরিচালক সংসদের সকল সভ্যই রাজ্য সরকারের দ্বারা মনোনীত; কেবল একজন সদস্য ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের দ্বারা মনোনীত।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল রাজ্যে অনুরূপ "অর্থ সরবরাহ সংস্থা" স্থাপিত হইয়াছে সেগুলি হইল অন্ধ্র, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান এবং মধ্যভারত*।

কর্ম্মপরিচয়—১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ নাগাদ ১২টি রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন গঠিত ছিল। ইহারা ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩,০২,৭৯,০০০৲ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছিল কিন্তু প্রকৃত ঋণের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছিল ১,৫৪,০২,০০০৲ টাকা। একমাত্র মধ্যভারত কর্পোরেশন ছাড়া অন্য সকল রাজ্য কর্পোরেশন ১৯৫৫-৫৬ সালে কিছু কিছু লাভ দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল। কর্ম্মপরি-চালনায় সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষতা দেখাইয়াছে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য কর্পোরেশন; ইহার পর দক্ষতার তালিকায় স্থান দেওয়া যাইতে পারে বোম্বাই, সৌরাষ্ট্র, এবং পাঞ্জাবকে। পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেওয়া এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি

* ১৯৫৭ সালের মে মাস হইতে উড়িষ্যা রাজ্য ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে।

পাইতেছে। কিন্তু হায়দ্রাবাদ কর্পোরেশন এ বিষয়ে একটু পিছাইয়া পড়িয়াছে ; উহার কারণ বলা হইয়াছে যে ক্ষুদ্র শিল্প-বোর্ড (Small Scale Industries Board) আরও সুবিধাজনক সর্ত্তে ধার দিতে সুরু করায় রাজ্য-ফিনান্স কর্পোরেশনের নিকটে কম ঋণের অনুরোধ আসিয়াছে। অন্ধ্র কর্পোরেশনও এইরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে কারণ তথাকার রাজ্যসরকারের শিল্প দপ্তর "শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বিধির" (State Aid to Industries Act) আওতায় শিল্প সমূহকে সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছেন।

এই কর্পোরেশনগুলির কর্ম্মপরিচালনা সম্পর্কে একটি বিরূপ সমালোচনা হইল ইহারা মাঝারি এবং ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহকেই সাহায্য দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বড় শিল্পগুলিকে ঋণ দিবার জন্য অনেক বড় বড় ঋণ সরবরাহী সংস্থা গঠিত হইয়াছে (যথা I. F. C. ; I. C. I. C. ; N. I. D. C.) ; কিন্তু রাজ্য কর্পোরেশনগুলি ছোট শিল্পকে অবহেলা করিয়া বেশীর ভাগ ঋণ অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পগুলিকেই দিতেছে যথা বস্ত্রশিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, আবাদ (plantations) ইত্যাদি। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই কর্পোরেশনগুলি তাহাদের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধির দিকে এখনও যাইতে পারে নাই।

শুধু তাহাই নহে, রাজ্য কর্পোরেশনগুলির কর্ম্মপরিচালনার খরচাও আয়ের তুলনায় অনেক বেশী। বিহার ও অন্ধ্র কর্পোরেশনের কর্ম্মপরিচালনার ব্যয় হইল উহাদের সাকুল্য মুনাফার (Gross Profits) যথাক্রমে ৫৯'১ এবং ৬৮'১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের ঐ অনুপাতে হইল ২৮'৯ শতাংশ। সর্ব্বাপেক্ষা কম হইল ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন কর্পোরেশনের—১২'১ শতাংশ। সকল রাজ্য কর্পোরেশনের উচিত যথাসম্ভব ব্যয় কমাইয়া ফেলা।

প্রস্তাবিত পুনরর্থ সরবরাহী কর্পোরেশন—The Propose Re-Finance Corporation of India

সম্প্রতি ভারত সরকার মাঝারি আয়তনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ সরবরাহের সুবিধার জন্য একটি পুনরর্থসরবরাহী কর্পোরেশন (Re-Finance Corporation) গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন। এই কর্পোরেশনটি একটি পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত হইবে। ইহার প্রাথমিক পুঁজি হইবে ১২'৫ কোটি টাকা— সাধারণ শেয়ারের দ্বারা এই পুঁজি তোলা হইবে। প্রাথমিক এই শেয়ার পুঁজি নিম্নলিখিত সংস্থাগুলির নিকট হইতে গৃহীত হইবে :

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—৫ কোটি ; ষ্টেট ব্যাঙ্ক—২'৫ কোটি ; জীবন বীমা-কর্পোরেশন—২'৫ কোটি ; অন্যান্য ব্যাঙ্ক ২'৫ কোটি। অন্যান্য যে সকল ব্যাঙ্ককে এই ব্যবস্থায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে সেগুলি হইল

(ষ্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়া) সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, মার্কাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, দেনা ব্যাঙ্ক এবং হায়দ্রাবাদ ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক।

ভারত সরকার আমেরিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন কোন সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ২৬ কোটি টাকা কর্পোরেশনকে ঋণ হিসাবে প্রদান করিবেন ; এই ঋণের অর্থ ৩০ বৎসরে পরিশোধ্য। সুতরাং প্রথম হইতেই কর্পোরেশন ৩৮.৫ কোটি টাকার মত মূলধন লইয়া কার্য্য সুরু করিবে। এই কর্পোরেশনের দ্বারা প্রদেয় ঋণের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যই উহার নামের মধ্যে প্রতিফলিত হইতেছে। ইহা শিল্পগুলিকে সরাসরি ঋণ দিবে না। ইহা ঋণ দিবে যোগদানকারী ব্যাঙ্কগুলির মারফৎ। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিবে এবং সেই ঋণের টাকা এই কর্পোরেশন ব্যাঙ্কগুলিকে দিবে। যে ব্যাঙ্ক ঋণ দিবে উহা ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের কর্জ্জ-যোগ্যতা (credit-worthiness) যাচাই করিবে এবং ঋণের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বহন করিবে। ঋণ দেওয়া হইবে মাঝারি আয়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে—মূলতঃ ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলিকে, ঋণের মেয়াদ হইবে তিন হইতে সাত বৎসরের মত।

শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন—Industrial Credit and Investment Corporation

ভারতের শিল্প সমূহকে এখনও অনেকখানি অগ্রসর হইতে হইবে, বিশেষ করিয়া পরিকল্পনার আওতায় শিল্পের দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপিত হইলেও ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় উহা যথেষ্ট নহে। আবার শুধু দেশে সংগৃহীত পুঁজিই যথেষ্ট নহে, বৈদেশিক পুঁজিও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী সূত্র হইতে পুঁজি সংগ্রহ করিয়া দেশের শিল্পে উহা সরবরাহ করিবার নিমিত্ত বিশেষ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। এই সম্পর্কে ভারত সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) এবং কতিপয় মার্কিণী পুঁজিপতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার বৈদেশিক সাহায্য খাতে যে মাল দিয়াছিল তাহারও সুযোগ গ্রহণ করা হয়। ফলে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে "শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন লিমিটেড" (Industrial Credit and Investment Corporation Ltd) নামে একটি বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সালের ৫ই জানুয়ারী বোম্বাইতে ইহা রেজেষ্ট্রি হইয়াছে।

এই কর্পোরেশনের শেয়ার পুঁজি হইল ৫ কোটি টাকা। এই শেয়ার ক্রয়

করিবে ভারত, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কিছু অংশ জনসাধারণকে ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইবে। ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীগুলি দুই কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, এক কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে যুক্তরাজ্যের কতিপয় ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান (ইষ্টার্ণ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক, কমনওয়েলথ ডেভলেপমেণ্ট ফিনান্স কোম্পানী লিমিটেড ইত্যাদি) এবং ৫০ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বীমা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান (যথা ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা, রকফেলার ব্রাদার্স, ওলিন ম্যাথিসন কেমিক্যাল কর্পোরেশন এবং ওয়েষ্টিংহাউস ইলেকট্রিক ইণ্টারন্যাশানাল কর্পোরেশন ইত্যাদি)। অবশিষ্ট দেড় কোটি টাকার শেয়ার দেশের মধ্যেই জনসাধারণকে ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) এই কর্পোরেশনকে এক কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতকে যে ইস্পাত প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সম্মতিক্রমে এই কর্পোরেশনকে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করিয়াছেন। পনের বৎসর পরে বার্ষিক কিস্তিবন্দীতে কর্পোরেশন এই ঋণ পরিশোধ করিবে। কর্পোরেশন তাহার পুঁজি, বিনা-সুদী আমানত এবং নিজের রিজার্ভ—ইহাদের একত্রিক পরিমাণের তিনগুণ অধিক পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব একটি বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। এগারোজন ডাইরেক্টর লইয়া এই বোর্ড গঠিত। এগারোজনের মধ্যে সাতজন হইলেন ভারতীয় অংশীদারদের প্রতিনিধি, দুইজন হইলেন ব্রিটিশ, একজন আমেরিকান, এবং আর একজন হইলেন ভারত সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি। ভারত সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ যতদিন না শোধ হইতেছে ততদিন ভারত সরকার কর্তৃক একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার থাকিবে। এই কর্পোরেশন যদি ভারত সরকারের ঋণ পরিশোধে গাফিলতি করে, অথবা অবিবেচকের মত বিনিয়োগ করিয়া নিজের পুঁজি বিপদ-গ্রস্ত করিয়া ফেলে তাহা হইলে ভারত সরকার উহার কারবার গুটাইয়া ফেলাইবার দরখাস্ত করিতে পারেন।

এই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হইল, বে-সরকারী অংশের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা দান করা। এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হইবে শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে সরাসরি ঋণ প্রদান করিয়া অথবা মুনাফা ভাগাভাগির সর্ত্তে ঋণ দিয়া। এই কর্পোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে এবং উহাদের শেয়ার বিক্রয়ে অগ্রপ্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারিবে। বিদেশ হইতে শিল্প

বিশেষজ্ঞ সংগ্রহের ব্যাপারেও ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য করিবে। কর্পোরেশন অবশ্য শিল্প পরিচালনায় কোন আধিপত্য বিশিষ্ট অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইবে না। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় আশা করা গিয়াছে যে বৈদেশিক পুঁজিপতিগণ ভারতের শিল্পোন্নয়নে অধিকতর কার্য্যকরী অংশ গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইবে।

কার্য্যবিবরণী—এই কর্পোরেশন আড়াই বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ২৮টি বে-সরকারী শিল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনায় ইহা ৮ কোটি টাকার মতন অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছে। এই সকল শিল্প হইল কাগজ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রসায়ন, বস্ত্রশিল্পের সরঞ্জাম, চিনি পরিশুদ্ধকরণ (refining), ধাতু আকরিক এবং সুতা বয়ন। ১৯৫৬ সালে এই কর্পোরেশন ৩৭ লক্ষ টাকা নীট লাভ করিয়াছে। ইহা হইতে ১৫ লক্ষ টাকা সরকারকে আয়কর দেওয়া হইয়াছে এবং ৫ লক্ষ টাকা সাধারণ রিজার্ভে রাখা হইয়াছে। (গত বৎসরও সাধারণ রিজার্ভে ৫ লক্ষ টাকা রাখা হইয়াছিল বলিয়া, রিজার্ভের পরিমাণ এক্ষণে ১০ লক্ষ টাকা)। অংশীদারদিগকে শতকরা ৩½ টাকা হারে আয়কর মুক্ত ডিভিডেণ্ড প্রদান করা হইল।

সমালোচনা—ব্যবসায়মহল এবং অর্থনীতিবিদ্‌গণ আই, সি, আই, সি'র এই সময়ের কার্য্যকলাপ অবলোকন করিয়া উহার বিরুদ্ধে কতিপয় সমালোচনা করিয়াছেন। **প্রথমতঃ,** বলা হইয়াছে যে এই কর্পোরেশন ঋণ প্রদানের এবং বিনিয়োগের কার্য্যে অত্যন্ত মন্থরগতি এবং অত্যন্ত বেশী সাবধানী। ইহাতে প্রয়োজনের সময়ে কাজ হয় না। **দ্বিতীয়তঃ,** শিল্পপতিগণ অভিযোগ করিয়াছেন যে শিল্প সম্প্রসারণের যে সকল পরিকল্পনার জন্য ইহার নিকট অর্থ সাহায্য চাওয়া হয় সেগুলি এই কর্পোরেশন বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনেক সময় লয়। **তৃতীয়তঃ,** এই কর্পোরেশন বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছিল কিন্তু অদ্যাপি এই মূল্যবান ঋণ কাজে লাগাইতে পারে নাই।

সম্প্রতি আই, সি, আই, সি'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (২২শে এপ্রিল ১৯৫৭) উহার চেয়ারম্যান শ্রীরামস্বামী মুদালিয়ার এই সমালোচনাগুলির উল্লেখ করিয়া উহার উত্তরে কর্পোরেশনের এ সম্পর্কে কি বক্তব্য আছে তাহাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কিছুই-না-থাকা অবস্থা হইতে যখন এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হয় তখন সুসংগঠিত হইতে এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। এই কর্পোরেশন নিছক বন্ধকী লইয়া ধার দিবার প্রতিষ্ঠান নহে, ইহা শেয়ারে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রপ্রতিশ্রুতি দিয়াছে এবং বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে। এই ধরণের কার্য্য

করিতে গেলে অনেক বিচার-বিবেচনা করিয়া আগাইতে হয়, সেই জন্য ইহাতে সময় লাগে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা দেয় সেগুলি এই কর্পোরেশনের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এবং বোর্ডের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা দরকার। ইহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করিলে চলিবে না। তৃতীয়তঃ, আই, সি, আই, সি'র বরাবরই ইচ্ছা যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবহার করা হউক; বরং বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে এই ঋণের অর্থ ব্যবহার হইয়া গেলে পুনরায় ঋণ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কথা হইল যে শিল্পপতিগণ যতদিন তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই পাইতে পারিতেন ততদিন তাঁহারা বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। অতএব বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার কোন আবেদনই আসে নাই। এখন অবশ্য বৈদেশিক মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতা ঘটিতেছে—সুতরাং অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; সুতরাং এক্ষণে শিল্পপতিগণ বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিবার জন্য আই, সি, আই, সি'র নিকট অনুসন্ধান করিতেছেন।

আন্তর্জ্জাতিক ঋণদান সংস্থা—International Finance Corporation

ভারতীয় শিল্প সমূহের পক্ষে ঋণ সংগ্রহের, তথা বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির, আর একটি উপায় সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য ইহা একা ভারতের জন্যই হয় নাই, বিভিন্ন অনুন্নত অঞ্চলের সুবিধার্থেই ইহা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার নাম আন্তর্জ্জাতিক ঋণদান সংস্থা (International Finance Corporation)। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে—ভারত ইহাদের অন্যতম। ১৯৫৫ সালের ১১শে অক্টোবর ভারত এই প্রতিষ্ঠানের সনদে স্বাক্ষর করিয়াছে। যে সকল রাষ্ট্র বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সদস্য সেই সকল রাষ্ট্র এই ঋণদান সংস্থার সদস্য হইতে পারে। ইহার অনুমোদিত মূলধন (Authorised Capital) হইল ১০ কোটি ডলার; বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মূলধন প্রদান করিবে, বিশ্বব্যাঙ্কে তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত মূলধনের অনুপাতে। প্রতিটি ১০০০ ডলার মূল্যের ১ লক্ষ শেয়ারে এই মূলধন বিভক্ত।

বিশ্বব্যাঙ্কের সহিত ইহার কিছুটা সম্পর্ক থাকিলেও, ইহা বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি সংস্থা। ইহার সম্পত্তি (Assets) সম্পূর্ণ পৃথক ভাবেই রাখা হইবে এবং বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ইহা ঋণগ্রহণ করিবে না।

এই সংস্থার কার্য্য হইবে সদস্য রাষ্ট্রগুলির বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঋণ প্রদান করা। যে সকল ক্ষেত্রে ন্যায় সঙ্গত শর্ত্তে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি পাওয়া যাইবে না, সেই সকল ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের স্বার্থে, বেসরকারী শিল্প প্রচেষ্টা স্থাপন, উন্নয়ন বা সম্প্রসারণের জন্য ইহা কর্জ্জ প্রদান করিবে—ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের কোন নিশ্চয়তা প্রদান (guarantee) প্রয়োজন হইবে না। ঋণ প্রদান ব্যতীতও ইহা অন্য প্রকার বিনিয়োগ করিতে পারিবে। ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি ক্রয় করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে উহার মুনাফার অংশীদার হইতে পারিবে; অবশ্য এইরূপ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান

পরিচালনার দায়িত্ব ইহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠানই নহে, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং কৃষিপ্রতিষ্ঠানকেও ইহা সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে। বিশেষজ্ঞ (technical experts) এবং অন্যান্য বিনিয়োগকারী সংগ্রহেও ইহা শিল্পকে সাহায্য করিবে। কোন একটি দেশের লোকে অন্য দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইলে এই কর্পোরেশন উহাকে স্থানীয় অংশীদার এবং পুঁজি সংগ্রহে সাহায্য করিবে।

ত্রিশটি রাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করিলে এবং ৭½ কোটি ডলার পুঁজি সংগৃহীত হইলে ইহা কার্য্য সুরু করিবে এইরূপ কথা ছিল। এক্ষণে এই শর্ত্ত পূরণ হইয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত (জুন ১৯৫৭) ৪৭টি রাষ্ট্র ইহার সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের দ্বারা প্রদত্ত পুঁজি-চাঁদার পরিমাণ হইল ৯ কোটি ডলার। ভারত হইতে চাঁদা (পুঁজি) গিয়াছে ৪৪৩১,০০০ ডলার অর্থাৎ ২ কোটি ১০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। ইহা এই সংস্থার অনুমোদিত পুঁজির শতকরা ৪.৪৩ ভাগ। আন্তর্জ্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশন উহার কার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলে (এবং সংস্থাটি যদি সুপরিচালিত হয় তাহা হইলে) ভারতের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উপকার প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বেসরকারী শিল্পে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে শ্রফ কমিটি—
Shroff Committee and Industrial finance

বেসরকারী শিল্পে অর্থসরবরাহ ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য ভারত সরকার একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন (Committee on Finance for the Private Sector), উহার চেয়ারম্যানের নামানুসারে "শ্রফ কমিটি" নামে উহা সাধারণতঃ পরিচিত। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে এই কমিটি সরকারের নিকট তাঁহাদের বিবরণী দাখিল করেন।

কমিটি বলেন যে সাম্প্রতিককালে নূতন পুঁজিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি দেখা যাইলেও, যতটা আশা করা হইয়াছিল উহা ততটা নহে; পরিকল্পিত তাগে (planned target) পৌঁছাইতে হইলে, বাৎসরিক পুঁজি বিনিয়োগ ১৯৫১-৫৩ সালের তুলনায় দ্বিগুণ করিবার প্রয়োজন ছিল। কল কব্জার আধুনিকীকরণ এবং বদলীকরণের (modernisation and replacement) ক্ষেত্রে, পরিকল্পনা কালের অবশিষ্ট সময়ে অনেকখানি ফাঁক পূরণের প্রয়োজনও কমিটি উল্লেখ করিয়াছিলেন। সঞ্চয় এবং তরল সঙ্গতির যোগানের বর্ত্তমান প্রবণতা যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে বেসরকারী অংশে শিল্প সম্প্রসারণের উহাই হইবে অন্যতম প্রধান বাধা। শিল্পে অধিকতর বেসরকারী বিনিয়োগ সম্ভব করিবার জন্য কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে যে-সকল শিল্পে বৃহৎ পরিমাণ বিনিয়োগ ফলপ্রসূ হইতে অনেক সময় লাগে সে সকল শিল্পকে জাতীয়করণের হাত হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার কর্ত্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

দীর্ঘকালীন কর্জ্জ প্রদান সম্পর্কে কমিটি বলেন যে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ শিল্প

প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিয়া এবং উহার বন্ধকীতে কর্জ্জ প্রদান করিয়া দীর্ঘকালীন ঋণ প্রদানের ((long term finance) ক্ষেত্রে কিছুটা অংশ গ্রহণ করিতেছে। কমিটি বেসরকারী শিল্পে দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের এই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সম্প্রসারণের পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠানের (যথা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন) সিকিউরিটিতে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারে। ব্যাঙ্কসমূহ পরোক্ষভাবেও শিল্পে দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে যদি বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি বীমাকোম্পানী সমূহের সহযোগে Consortium বা Syndicate রূপ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে ;- ইহার কার্য্য হইবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং ডিবেঞ্চারে অগ্রপ্রতিশ্রুতি (underwriting) প্রদান করা এবং বিনিয়োগ করা।*

শ্রফ কমিটি অন্যান্য যে সকল নির্দ্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন সেগুলি হইল : (১) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য এবং জনগণের আস্থা বর্দ্ধিত করিবার জন্য, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতির অনুকরণে আমাদের দেশেও ব্যাঙ্ক আমানত বীমা করিবার (insurance of bank deposits) প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত ; (২) শিডিউল ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্প্রসারিত করিতে এবং নূতন শাখা স্থাপন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে সহায়তা প্রদানের কোন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা বিধেয়। (৩) দীর্ঘকালীন ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে পুনর্বাটার (re-discounting facilities) সুযোগ প্রদান করা উচিত। (৪) ব্যাঙ্কসমূহের ব্যয়ের কাঠামো (বিশেষ করিয়া মজুরী এবং বেতন সম্পর্কে) সুপরিকল্পিত করিবার উপায় ও পদ্ধতি সন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন উচিত (৫) ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির সম্পর্কে, সুষ্ঠুভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসা পরিচালনার মান, পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া স্থির করা উচিত ; (৬) মুদ্রা প্রেরণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আরও উদার পন্থী করা বিধেয় ; (৭) শ্রফদিগকে এবং দেশীয় ব্যাঙ্কারদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সম্পর্কিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে ; (৮) ফিনান্স কর্পোরেশন শিল্পকে যে ঋণ প্রদান করিবে উহাতে ব্যাঙ্কগুলির অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সিডিউল ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী যে দীর্ঘকালীন ঋণ দিবে, তহাতে উহা নিশ্চয়তা প্রদান করিবে ; (৯) বীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে তাহাদের অর্থ অধিকতর পরিমাণে শিল্পে বিনিয়োগ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে বীমা আইনের যথাযথ সংশোধন সাধন করিতে হইবে ; (১০) কারবারের

* এইরূপ Consortium বা Syndicate গঠন করা যাহাতে সম্ভব হয়. কি করিলে উহা কার্য্যকরী রূপ লইতে পারে সে সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট সুপারিশ করিবার দায়িত্ব দিয়া ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছেন।

চলতি পুঁজি যাহাতে অধিক আটক হইয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক মাল-যোগানকারীদিগকে কর্জপত্র (letters of credit) প্রদান করা উচিত ; (১১) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিশেষ ধরণের উন্নয়ন কর্পোরেশন (Development Corporation) গঠন করিতে হইবে ; (১২) সুসংগঠিত ইস্যু হাউস (Issue House) স্থাপন কবিতে হইবে ; (১৩) শিল্প সমূহকে টেকনিক্যাল এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সহায়তা প্রদানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপন করিতে হইবে।

ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক পুঁজির সমস্যা—Problem of Foreign Capital in Indian Industries

Q. Give the merits and defects of foreign capital in India. (B. Com. 1938, '42, ; B. A. 1937, '39. '40). Discuss the economic effects of employment of foreign capital in India. (B. Com. 1954).

আমাদের দেশে সঞ্চয় ছিল কম এবং যাহা ছিল তাহা শিল্পে নিয়োগের জন্য আগাইয়া আসে নাই। অন্যান্য দেশে যেরূপ সুসংগঠিত ব্যবসায়গত ব্যাঙ্ক (well organised commercial bank) গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইরূপ আমাদেব দেশে গড়িয়া উঠিতে বহু সময় লাগিয়াছে। উপরন্তু আধুনিক যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান এবং শিল্প প্রচেষ্টা ছিল খুবই অল্প ; যাহা ছিল তাহা সুনিশ্চিত লাভজনক কতিপয় শিল্পের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই তুলনায় বিদেশীদের শিল্প জ্ঞান, বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি এবং উদ্যোগ প্রতিভা ছিল প্রচুর। সেইজন্য একাধিক মূল্যবান শিল্প বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত এবং বৈদেশিক প্রচেষ্টায় পরিচালিত হইয়াছে। পাট, রবার, চা, কফি, কয়লা, স্বর্ণ, কাগজ, যানবাহন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত শিল্প বৈদেশিক মূলধনে স্থাপিত। কিছু কিছু কাপড়ের কল এবং পশম কলও বিদেশীদের মালিকানাভুক্ত। এই সকল শিল্পের লাভ বৈদেশিক শিল্পপতিগণের নিকট চলিয়া যায়।

বৈদেশিক পুঁজির উপকারিতা

(১) যে সময়ে ভারতীয়দিগের আধুনিক শিল্প সম্পর্কে কোন জ্ঞান জন্মে নাই সেই সময়ে বৈদেশিক পুঁজিপতিগণ তাঁহাদের আধুনিক শিল্প জ্ঞান লইয়া ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা শিল্প সুরু করিয়া ভারতকে শিল্পোন্নত দেশ করিবার ভিত্তি স্থাপন করেন।

(২) নূতন শিল্প ব্যবস্থায় যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন ছিল তাহা শিল্প সমৃদ্ধ দেশের অধিবাসীরূপে বৈদেশিকগণের আয়ত্তের মধ্যে ছিল ; ঐ বিপুল পরিমাণ পুঁজি সেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের যুগে

ভারতবাসীর আয়ত্তাধীন ছিল না। বৈদেশিকগণ তাঁহাদের বিপুল পরিমাণ পুঁজি নূতন ধরণের শিল্প প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া ভারতবাসীর সম্মুখে দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরেন।

(৩) নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় যে সকল ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছিল এবং বাস্তবক্ষেত্রে যে সকল লোকসান সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বৈদেশিক পুঁজির উপর দিয়াই গিয়াছিল। বৈদেশিক পুঁজি শিল্প প্রচেষ্টার দুর্গম পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। ইহাদের দৃষ্টান্তে ভারতীয় পুঁজির সাহায্যে কতিপয় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(৪) বৈদেশিক পুঁজি ভারতে শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করিয়া অধিক লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে।

বৈদেশিক পুঁজির অপগুণ

(১) বৈদেশিক পুঁজিপতি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে কোনো দরদ অনুভব করে নাই—জাতির ভবিষ্যতের দিক হইতে এইগুলিকে যে সংরক্ষণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে মোটেই সচেতন হয় নাই। ফলে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশী পুঁজিপতিদিগের স্বার্থের জন্য যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হইয়াছে—অমূল্য সম্পদের বহু অপচয় ঘটিয়াছে।

(২) বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবাসীকে শিল্প শিক্ষা প্রদানে অকান্তই অনিচ্ছুক। প্রতিষ্ঠিত শিল্পে শিক্ষানবিশীর মধ্য দিয়াই একটি জাতির মধ্যে শিল্পপদ্ধতিবিশারদ শ্রেণী তৈয়ারী হয়—কিন্তু আমাদের দেশে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয়দিগের মধ্যে শিল্পপদ্ধতিবিশারদ গড়িয়া তুলিতে এবং সেই কারণে ভারতীয় শিক্ষানবীশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

(৩) ভারতবাসী কেবলমাত্র নিম্নস্তরের চাকুরী লাভ করিয়াছে—ডাইরেক্টরের পদে এবং দায়িত্বপূর্ণ অন্যান্য পদগুলিতে কেবলমাত্র বিদেশীদিগকেই গ্রহণ করা হইত। ভারতবর্ষে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার ছিল না।

(৪) ধনী ও প্রভাবশালী বৈদেশিক পুঁজিপতিগণ ভারতের রাজনৈতিক জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতেন। ইঁহারা জাতীয় আশা আকাঙ্খার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলতার মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিতেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইতেন।

বৈদেশিক পুঁজি ও বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি—
Foreign Capital in the Present Situation

Q. Discuss the place of foreign capital in the economic development of India. (B. A. 1953) Examine the case for encouraging the flow of foreign capital into India in recent years. (B.A. 1957).

যুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করিয়া, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে আমাদের দেশে বৈদেশিক পুঁজির সমস্যা নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয় সরকার বৈদেশিক পুঁজিকে সহজেই দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেন কিন্তু ঐরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার অগ্রসর হন নাই। তথাপি একাধিক বৈদেশিক পুঁজিপতি তাঁহাদের সম্পত্তি ভারতীয়গণের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া এদেশে তাঁহাদের ব্যবসার অবসান ঘটাইয়াছেন। এক্ষণে শিল্পে নিয়োজিত মোট পুঁজির অধিকাংশই ভারতীয়দিগেরই মালিকানাধীনে। শিল্পে অর্থবিনিয়োগের অনিচ্ছা ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে অতিক্রান্ত হইতেছে। তবুও কিন্তু সন্তোষজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল না। কারণ বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের যে পরিমাণ শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে—তাহা বিপুল। আশু প্রয়োজনে অর্থাৎ নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা নিবারণের জন্য এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনে অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনের স্থায়ী ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, আমাদের শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা আরও ত্বরান্বিত করিতে হইবে। দেশাভ্যন্তরেই যত পরিমাণ পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ হইতে পারে তাহা কিন্তু এই ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বিশেষ করিয়া একাধিক বিশেষ ব্যয়বহুল পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে—এইগুলিকে সফল করিবার জন্যও বহু পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই সকল কারণেই বৈদেশিক পুঁজির প্রশ্ন এক্ষণে নূতনভাবে বিবেচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

ফিস্‌ক্যাল কমিশনের অভিমত

১৯৪৯-৫০ সালের ফিস্‌ক্যাল কমিশন এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ন্যূনতম হিসাবেও, বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্যস্তরে আমাদের দেশে বৎসরে ৩৩০ কোটি টাকা পুঁজি-ব্যয় (capital expenditure) করা প্রয়োজন; কিন্তু বাৎসরিক পুঁজি সঞ্চয় (capital formation) আমাদের তদ্রূপ নহে; বরং যুদ্ধোত্তর যুগে পুঁজি সঞ্চয় হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং দেশের আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুঁজির মধ্যে বহু ব্যবধান। বৈদেশিক পুঁজির প্রয়োজন সেই কারণে স্পষ্টই অনুধাবন করিতে পারা যায়। ফিস্‌ক্যাল কমিশন আরও বলেন: "ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির নিমিত্ত পুঁজি-সামগ্রী ও সরঞ্জামাদির উপর বিপুল পরিমাণ ব্যয় হইবে; এই সকল সামগ্রী ও সরঞ্জামের অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ইহাদের মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমান ভারতের মূল্য-প্রদান ব্যালান্সের (Balance of Payments) যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমদানী সংগ্রহ করিবার একমাত্র উপায় হইবে ষ্টার্লিং উদ্বৃত্তের (sterling balance) ন্যায়

সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ টানিয়া লওয়া অথবা বিদেশ হইতে পুঁজি সংগ্রহ করা। ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত কিন্তু মাত্র সীমাবদ্ধ পরিমাণেই ডলারে পরিবর্তন করিতে পারা যায়, সুতরাং একমাত্র বিদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া ডলার অঞ্চল হইতে, ঋণ সংগ্রহ করিয়া ভারত তাহার আমদানীর মূল্য প্রদান সমস্যার সমাধান করিতে পারে। অধিকন্তু যথাযথ বিচার করিয়া পুঁজি আমদানী করিলে আরও একাধিক সুফল লাভ করিতে পারা যাইবে। শিল্প পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান (Technical know-how), শিল্প গবেষণার ফলাফল, শিল্প কৌশলবিদ পরিচালকদিগকে আরও শিল্প-শিক্ষাদানের সুযোগসুবিধা প্রভৃতি বিষয় যে পরিমাণে বৈদেশিক পুঁজির সহিত আসিবে সেই অনুপাতে বৈদেশিক পুঁজির স্বপক্ষে আর্থিক যুক্তি আরও জোরালো হইয়া উঠে।"

ফিস্‌ক্যাল কমিশন অবশ্য কখন বৈদেশিক পুঁজি গ্রহণ করা বিধেয় এ সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমত প্রদান করিয়াছেন। (১) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কার্যকরী করা হইতেছে এরূপ পরিকল্পনা যেগুলি বৈদেশিক যন্ত্রপাতি ও শিল্প সহায়তার উপর নির্ভরশীল এবং (২) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত যে সকল নূতন ধরণের শিল্প স্থাপিত হইবে অথচ যেগুলির জন্য পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা সহজলভ্য হইবে না—ইহাদের ক্ষেত্রেই বৈদেশিক পুঁজি গ্রহণ করা বিধেয়। অধিকন্তু, যে সকল সামগ্রীর চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অত্যন্ত কম অথচ সংশ্লিষ্ট শিল্প দ্রুত প্রসার লাভে সক্ষম নহে, সেক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক পুঁজি আহ্বান করিতে পারেন।

বৈদেশিক পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি—Government Policy regarding Foreign Capital

Q. Give a critical account of Government of India's policy regarding foreign capital in India (B. A 1960)

অনুরূপ বিবেচনাতেই ভারত সরকার বৈদেশিক পুঁজির আমদানী প্রতিরোধে অগ্রসর হন নাই, বরং এদেশে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য বিদেশী পুঁজিপতিদিগকে আহ্বান জানানো হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী বৈদেশিক পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই নীতির মূল বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) সরকারের শিল্পনীতির কাঠামোর মধ্যে বিদেশী মালিকের শিল্প এবং দেশীয় মালিকের শিল্পের প্রতি সমান ব্যবহার করা হইবে (২) ব্যবসায় হইতে লব্ধ মুনাফা বিদেশে প্রেরণ করা চলিবে। পুঁজি তুলিয়া লইয়া বিদেশে চালান করিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে বটে তবে সে প্রতিবন্ধক সাধারণ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের (Foreign Exchange Control) প্রতিবন্ধক মাত্র। (৩) কোন বিদেশী

মালিকের শিল্প যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় তাহা হইলে উহার জন্য যথাযোগ্য ক্ষতি-পূরণ প্রদান করা হইবে। ঐ ক্ষতিপূরণ ভারতের বাহিরে লইয়া যাওয়া যাইবে। (৪) বিদেশী শিল্পের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু ভারতীয়ের হস্তে থাকিবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক অংশ (Shares) থাকিবে ভারতীয়দিগের হস্তে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় প্রয়োজন বোধে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিক হস্তে থাকিতে পারে। (৫) বিদেশী পুঁজির দ্বারা পুষ্ট শিল্পে ভারতীয়দিগকে শিল্প-দক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে তাহারা বিদেশী বিশেষজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিতে পারে। সরকারের এই নীতির মধ্যে বৈদেশিক পুঁজিপতিকে বিভিন্ন প্রকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈদেশিক পুঁজিপতিদিগের মনে যে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা দুরীভূত করিবার জন্য এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদানের প্রয়োজন ছিল। আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান পুঁজির প্রয়োজন এক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচ্য। কোন বিদেশী এদেশে অর্থ খাটাইতে আসিলে, উহা সে করিবে নিজের মুনাফার লোভে—উহার দ্বারা এদেশের কোন উপকার সাধিত হইলে উহা হইবে নৈমিত্তিক (incidental) মাত্র; বার্ষিক মুনাফা বিদেশে প্রেরণের সুযোগ প্রদান করা সঙ্গতই হইয়াছে—ঐ সুযোগ না দিলে বৈদেশিক পুঁজি আগাইয়া আসিবে না। জাতীয়করণ সম্পর্কে দেশীয় পুঁজিপতিরাই বিচলিত, সুতরাং এ সম্পর্কে বিদেশী পুঁজিপতিকে নিশ্চয়তা প্রদান না করিলে বিদেশী পুঁজির সহায়তা পাওয়া সম্ভব নহে। অপর পক্ষে আবার পুঁজির অভাবে চাপে পড়িয়াও—বৈদেশিক পুঁজিপতিদিগকে এদেশের শিল্পের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতে দেওয়া সরকারের পক্ষে বিজ্ঞজনোচিত কার্য হইত না; এদিক হইতে বিবেচনা করিলে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক পুঁজি খাটিলেও, উহার সংখ্যাধিক শেয়ার ভারতীয়দিগের হাতে থাকিবে, এই সর্ত্ত আরোপ করা সমীচীনই হইয়াছে। তবে পরিবর্ত্তনশীল অর্থনীতির মধ্যে কোন অটুট নীতি দেওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং জাতীয় স্বার্থে ইহার ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া বাস্তব পরিস্থিতিই স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম করিতে দেওয়া হইবে সেদিকে বেশ সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিদেশী বিশেষজ্ঞের স্থান গ্রহণের জন্য দেশীয় বিশেষজ্ঞ গড়িয়া তুলিতে হইবে বলিয়া সরকার যে সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন—উহাতেও দেশের সঠিক প্রয়োজন উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক এইরূপ প্রতিশ্রুতিদান সত্ত্বেও, বৈদেশিক পুঁজিপতিদের নিকট হইতে, বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের নিকট হইতে, বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটি মোটামুটি হিসাব

করিয়াছিলেন যে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ব্যক্তিগত পুঁজিপতির নিকট হইতে বৈদেশিক পুঁজি আসিয়াছে ১৩০ কোটি টাকা ; ইহারও প্রায় দুই পঞ্চমাংশ হইল এদেশে অর্জিত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ। সুতরাং নূতন পুঁজি খুব বিশেষ আসে নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বৈদেশিক পুঁজি আকর্ষণের জন্য ধরা বাঁধা সর্ত্তের, প্রয়োজন অনুযায়ী, ব্যতিক্রম না করিলে সুফল পাওয়া সম্ভব নহে। সম্প্রতি ভারত সরকার বিদেশী কোম্পানীকে এদেশে তৈল শোধনাগার স্থাপনে উৎসাহ দিবার জন্য উহাদিগকে বিশেষ ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ; যথা, বিদেশীদের হাতে মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা ক্ষমতার অধিকাংশই থাকিবে, ভারতীয় কোম্পানী বিধি এবং ভারতীয় শিল্প বিধির কতিপয় সর্ত্ত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং ২৫ বৎসরের মধ্যে জাতীয়করণ হইবে না।

এইরূপ উদার সর্ত্ত প্রদান অবশ্য ভারত সরকারের ঘোষিত নীতির বিরোধী নহে, কারণ জাতীয় প্রয়োজন বোধে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তের তারতম্য করিবার কথা এই নীতির মধ্যেই ছিল।

বৈদেশিক পুঁজির পরিমাণ ও উৎস—Amount and Sources of Foreign Capital

Q. What are the sources from which foreign capital may be obtained for the country? (B. A. 1953).

১৯৪৮ সালে আমাদের দেশে কতপরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার একটি হিসাব প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই হিসাবে এদেশে মোট বৈদেশিক পুঁজির পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা ; ইহার মধ্যে দীর্ঘকালীন ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হইল ৫১৯ কোটি টাকা। এই দীর্ঘকালীন ব্যবসায়িক বিনিয়োগের শতকরা ৮৩ ভাগ—অর্থাৎ ৪৩১ কোটি টাকার ক্ষেত্রে পুঁজির মালিকানার সহিত ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণও জড়িত ছিল।

উহার পরবর্ত্তীকালে বৎসরে যে পরিমাণ পুঁজি ভারতে আসিয়াছে তাহা হইল এইরূপ : ১৯৪৯ সালে ৬·৩৫ কোটি টাকা, ১৯৫০ সালে ২·৫৭ কোটি টাকা এবং ১৯৫১ সালে ৯·৯৬ কোটি টাকা।

তবে সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক পুঁজির একটি নূতন প্রবণতা দেখা গিয়াছে ; উহা হইল শুধু শিল্পে নিবদ্ধ না থাকিয়া বাণিজ্যেও (trade) অংশ গ্রহণ করা। দেশের স্বার্থে কিন্তু বৈদেশিক পুঁজির বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন নহে, হিতকরও নহে।*

* "There was a time when trading was largely left in the hands of Indian interests and this new feature was naturally very disconcerting to the Government. It the trading field, capital required was not so great, nor was

যুদ্ধপূর্ব্বকালে বৈদেশিক পুঁজি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদিগের নিকট হইতেই সংগৃহীত হইত। ইহারা অধিকাংশই ছিল যুক্তরাজ্যের অধিবাসী; ইহারা পুঁজি প্রদান করিত সরকারের মধ্য দিয়া (যথা রেলওয়ে এ্যান্নুয়িটি ক্রয়) অথবা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিত (যথা চটকলের অথবা চা-বাগানের)। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজিপতিরা ম্যানেজিং এজেন্সি স্থাপন করিয়া এদেশে বৈদেশিক পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে। এইরূপ ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও বৈদেশিক পুঁজি খাটাইতেছে।

যুদ্ধোত্তর এবং স্বাধীনতার যুগে (বিশেষ ভাবে পরিকল্পনার যুগে) বৈদেশিক পুঁজি প্রাপ্তির উৎসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক পুঁজির ব্যক্তিগত যোগানদারের স্থলে প্রতিষ্ঠানগত (institutional) যোগানদারের উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা হইল বৈদেশিক সরকার, বিদেশের আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান (Semi-public bodies) এবং আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে প্রভৃতি রাষ্ট্রের সরকারগণ পুঁজি প্রদান করিয়াছেন। রকফেলার এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক W H O এবং U N. I C E পুঁজি প্রদান করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুঁজি দান হিসাবে এবং কোন কোন পুঁজি ঋণ হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা—Managing Agency System

Q What is managing agency? Discuss its merits and defects (B Com 1940, '43, 45, 47, '51)

আমাদের দেশে আধুনিক শিল্প পত্তনের সময় হইতেই ম্যানেজিং এজেন্সির উদ্ভব হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্ট বলিতে একটি কারবারী প্রতিষ্ঠান বুঝায়। সাধারণতঃ দুইচারজন ব্যক্তির অংশীদারীর (partnership) দ্বারা এইরূপ কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইহা অপর শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুঁজি সরবরাহ করে এবং তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করে। যথা কোন কাপড়ের মিল স্থাপিত হইলে উহার উদ্যোক্তা পরিচালকবর্গ কোন ম্যানেজিং এজেন্টের নিকট হইতে পুঁজির কিছু অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং মিলের পরিচালনার ভার কার্য্যতঃ ম্যানেজিং এজেন্টের উপর অর্পণ করিতে পারেন। মিলের পরিচালকবর্গ নামেই উহার পরিচালক থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার সকল তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার কার্য্য

technical ability of a high order needed The Government would naturally feel that under these circumstances they ought to be left to indigenous enterprise and initiative The Government would like to see a contraction rather than an expansion of non-Indian concerns engaged in trading, pure and simple" —Hon'ble Sri T. T. Krishnamachari speaking before Associated Chamber of Commerce in December, 1952

ম্যানেজিং এজেণ্টই করিয়া থাকেন। ম্যানেজিং এজেণ্ট উহার দরুণ কোনো নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন। কখনও কখনও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গের মধ্যে উহার ম্যানেজিং এজেণ্টের প্রতিনিধিত্ব থাকে। একটি ম্যানেজিং এজেণ্ট এইভাবে একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারে,—একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিতে একই শিল্পের একাধিক প্রতিষ্ঠানই বুঝায় না, বিভিন্ন শিল্পের প্রতিষ্ঠানই বুঝাইতে পারে। একটি ম্যানেজিং এজেণ্ট এইভাবে একই সঙ্গে কাপড়ের কল, চিনির কল, চায়ের বাগান প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক থাকিতে পারে; কিন্তু উহা যে ঐ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক তাহা নহে।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দ্বারা সাধিত উপকার

Q. "Although in the initial stages the Managing Agency system played an important role in the development of industries in India, it has several drawbacks." Discuss (B. A. 1953). How far it is necessary to do away with the system of managing agency in this country? (B. Com. 1955).

(১) যখন শিল্পে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির পরিমাণ একান্তই অপ্রচুর ছিল এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ভালরূপে গড়িয়া উঠে নাই, তখন ম্যানেজিং এজেণ্টগণ শিল্পে পুঁজি সরবরাহ করিয়া শিল্পোন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) একটি ম্যানেজিং এজেন্সির কারবার একাধিক পরস্পরের সম্পর্কিত এবং পরস্পর অনুপূরক শিল্প প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকায় শিল্প-সংযোগের বিবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ সম্ভব হইয়াছিল।

(৩) ম্যানেজিং এজেণ্ট শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইত। সেইজন্য ইহার দ্বারা পরিচালিত শিল্প ঠিক কারবারী নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে পারে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া উহার মালিকগণ কোন ম্যানেজিং এজেণ্টের হস্তে উহার পরিচালনভার অর্পণ করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা উহার সুযোগ্য ও যথাযথ পরিচালনা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(৪) ঝুঁকিবহুল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে ম্যানেজিং এজেণ্টগণ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং এইভাবে নূতন শিল্পের পত্তন হইয়াছে,—এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

(৫) এখনও সাধারণ ব্যবসায়গত ব্যাঙ্কগুলি (Commercial Bank) কোন মিল কোম্পানীকে ঋণ দানের সময়ে শুধু ঐ কোম্পানীর স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হয় না—উহার উপরেও তাহারা কোনো ম্যানেজিং এজেণ্টের গ্যারাণ্টি বা নিশ্চয়তা

প্রদান চাহে। শুধু ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেই নহে, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয়ও অনেক ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টর নামের উপর নির্ভর করে।

(৬) ম্যানেজিং এজেন্টগণ একাধিক শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। যে প্রভূত পরিমাণ মূলধন ম্যানেজিং এজেন্টদিগকে হারাইতে হইয়াছে উহার দ্বারাই, বিপদের সময়ে ম্যানেজিং এজেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কত সাহায্য করিয়াছে তাহা প্রমাণিত হয়। মন্দার সময়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ম্যানেজিং এজেন্টগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার দ্বারা সাধিত অপকার

(১) এই পদ্ধতি থাকার দরুণ কোন কোম্পানী তাহার পুঁজি সংগ্রহের নিজস্ব পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে শিখে না—পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থার দিক হইতে এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থার দিক হইতে, উহা ম্যানেজিং এজেন্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে ম্যানেজিং এজেন্টের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিলে উহার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত কোন কোম্পানীর নিজস্ব আর্থিক অবস্থা খারাপ হইবার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও, তাহাকে উহার ফলভোগ করিতে হয়।

(২) ম্যানেজিং এজেন্ট একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময়ে তাহারা একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য প্রতিষ্ঠানে নিজ ইচ্ছামত কর্জ্জ দেয় বা বিনিয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে পরিচালিত না হইলে, প্রথম প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ বিনাদোষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

(৩) ম্যানেজিং এজেন্ট একসঙ্গে অত্যধিক সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার গ্রহণ করিতে পারে এবং অত্যধিক ভারে ধ্বসিয়া যাইতে পারে; ইহাতে একাধিক সঙ্গতিশালী কোম্পানীও ধ্বংস হইবে।

(৪) এই প্রথায় একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি সঙ্ঘের হাতে এই কারণে তুলিয়া দেওয়া হয় যে তাঁহারা ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক সাহায্য দিতে সক্ষম; তাঁহারা যে উহার পরিচালনার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য—মূলতঃ এই বিবেচনা করিয়া উহা করা হয় না। ফলে শিল্প দক্ষতাকে গৌণ স্থান দেওয়া হয়।

(৫) ম্যানেজিং এজেন্ট কারবারগুলি উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত; অতএব উত্তরাধিকার সূত্রে যাহারা এজেন্সির মধ্যে প্রবেশলাভ করে তাহারা যোগ্য ব্যবসায়ী হইবে এরূপ কোনই নিশ্চয়তা নাই। ইহা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বিপজ্জনক।

(৬) ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীর মালিক নহে, পরিচালক মাত্র। এক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের লাভ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অশোভন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে।

(৭) কখনও কখনও ম্যানেজিং এজেণ্টের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে গুজব রটিলে, উহার দ্বারা এজেণ্টের তত্ত্বাবধানের মধ্যে অবস্থিত কোম্পানীর শেয়ারে স্পেকুলেশন সুরু হইয়া যায়। অথচ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে

কিন্তু এই সকল অপগুণ সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা সহসা পরিত্যাগ করা সমীচীন হইবে না। প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে বজায় রাখিলে অর্থনৈতিক উপকার সাধিত হইতে পারে। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় কোম্পানী বিধির (Indian Companies Act of 1936) দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বিবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, যথা এক কোম্পানীর অর্থ আর এক কোম্পানীকে ধার দেওয়া যাইবে না; ব্যাঙ্কিং বা বীমা কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেণ্ট থাকিবে না, ম্যানেজিং এজেণ্টের কার্যকাল থাকিবে ২০ বৎসর, অবশ্য পুনর্নিয়োগ হইতে পারে, কোম্পানীর বাৎসরিক নীট মুনাফার উপর এজেণ্টের পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হইবে; প্রতারণা বা বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টকে অপসারণ করা যাইবে, ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার অধীন কারবারের অনুরূপ বা উহার সহিত প্রতিযোগী কোন কারবারে লিপ্ত হইতে পারিবে না, ডিরেক্টরবর্গের তিনচতুর্থাংশের সম্মতি ব্যতিরেকে ম্যানেজিং এজেণ্ট ক্রয় বিক্রয় বা মাল সরবরাহের জন্য চুক্তি করিতে পারিবে না।

১৯৫১ সালে কোম্পানী বিধির (Indian Companies Act) পুনরায় যে সংশোধন সাধিত হয় উহাতে ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের সম্পর্কে কতিপয় বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্থলে ম্যানেজিং এজেন্সির মালিকানার পরিবর্ত্তনে উহার অধীন কোম্পানীর স্বার্থহানি হইতে পারে বলিয়া সরকার মনে করেন সেক্ষেত্রে সরকারকে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। কোন ম্যানেজিং এজেণ্টের পারিশ্রমিকের হার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অথবা ১৯৫১ সালের ২১ শে জুলাই তারিখের পর কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট নিয়োগ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব্ব সম্মতি প্রয়োজন। অধিকন্তু, এই সংশোধনের দ্বারা ম্যানেজিং এজেণ্ট ও কোম্পানীর মধ্যে চুক্তি পর্য্যালোচনা করিবার ক্ষমতা আদালতকে প্রদান করা হইয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সি ও ১৯৫৫ সালের কোম্পানী বিধি—
Managing Agency and Indian Companies Act of 1955

কোম্পানী সমূহের সাধারণ অবস্থা এবং কোম্পানী বিধির কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া উহার উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য ভারত সরকার কোম্পানী বিধি কমিটি নামে একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালের ১০ই মার্চ এই কমিটি তাঁহাদের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থার বহু ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এখনও বর্ত্তমান শিল্প-সংগঠনের মধ্যে ইহার উপযোগিতা রহিয়াছে বলিয়া কমিটি অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন। তবে এই ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করিবার প্রয়োজনের উপর তাঁহারা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কিভাবে কোন্‌দিকে এই সকল ত্রুটি দূর করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে উপকারী ব্যবস্থায় পরিণত করা যায় তাহার সুপারিশ করিয়াছিলেন।

কোম্পানী বিধি কমিটির সুপারিশ সমূহ ভারত সরকার বিশেষ ভাবেই বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে বজায় রাখিয়াও উহাকে যাহাতে দুর্নীতি ও দোষ ত্রুটিমুক্ত করিতে পারা যায় উহার জন্য তাঁহারা চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার ভারতীয় কোম্পানী বিধির ব্যাপক সংশোধন সাধনে অগ্রসর হন এবং সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে একটি সুদীর্ঘ বিল উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে ইহা যুক্ত সিলেক্ট কমিটির আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া সংশোধিত আকারে বাহির হইয়া আসে এবং পার্লামেণ্টের দ্বারা অনুমোদিত হয়। ইহাতে ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের কর্ম্মপ্রণালী, দায়, অধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে যে সকল বিধান প্রদত্ত হইয়াছে সেগুলি নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে :

(১) ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং শেয়ারহোল্ডারদিগের প্রতিনিধি লইয়া স্বাধীন পরিচালক সংসদ গঠিত হইবে এবং উহাতে শেয়ারহোল্ডারদিগের উপর ম্যানেজিং এজেণ্ট আধিপত্য করিবে না। ম্যানেজিং এজেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত ডাইরেক্টরের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিবে। ডাইরেক্টরের সংখ্যা ৫ জন বা অধিক হইলে, ম্যানেজিং এজেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হইতে পারিবে ২ জন, ৫ জনের কম হইলে নিযুক্ত হইতে পারিবে ১ জন মাত্র।

(২) কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনাভার ম্যানেজিং এজেণ্টের উপর থাকিলে ম্যানেজিং এজেণ্টের উপর ডাইরেক্টরদিগের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকিতে হইবে।

(৩) ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার গঠনপ্রণালীতে পরিবর্ত্তন সাধন করিলে ঐ পরিবর্ত্তনে ছয় মাসের মধ্যে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ম্যানেজিং এজেণ্ট কোন কোম্পানী পরিচালনার কার্য্য হস্তান্তরিত

করিলে উহাতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সাধারণ অধিবেশনে (general meeting) প্রদত্ত অনুমোদন থাকিতে হইবে ; উহা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারাও অনুমোদিত হইতে হইবে ।

(৫) সাধারণতঃ নীট মুনাফার ১১ শতাংশের অধিক পারিশ্রমিক ম্যানেজিং এজেণ্ট পাইবে না। মুনাফা যদি যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে কোম্পানী একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ম্যানেজিং এজেণ্টের পারিশ্রমিকরূপে অনুমোদন করিয়া দিবে। তবে উহা বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকার অধিক হইবে না।

(৬) ম্যানেজিং এজেণ্ট রূপে কার্য্য করিতেছে এরূপ কোন ব্যক্তিগত কোম্পানী অপর কোন ম্যানেজিং এজেণ্টের অধীন থাকিবে না।

(৭) ম্যানেজিং এজেণ্ট পৃথকভাবে কোন অফিস ভাতা পাইবে না তবে খরচা করিলে উহা পাইবে।

(৮) কোন কোম্পানীর দ্বারা তাহার ম্যানেজিং এজেণ্টকে, বা একই ম্যানেজিং এজেণ্টের অধীন অন্য কোন কোম্পানীকে ঋণ প্রদানের উপর এবং একটি কোম্পানীর দ্বারা একই দলের অন্য এক কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে।

(৯) ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার ব্যবস্থাপনাধীন কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতা ঘটে এরূপ কোন কারবারে সাধারণতঃ লিপ্ত হইবে না।

(১০) ম্যানেজিং এজেণ্ট তাহার অধীন কোম্পানীর দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়-এজেণ্ট রূপে কার্য্য করিবে না, ভারতের বাহিরে উহা করিতে পারে।

(১১) ভারতের মধ্যে অথবা বাহিরে ম্যানেজিং এজেণ্ট কোন কোম্পানীর তরফে কোন সামগ্রী ক্রয় করিলে উহার নিমিত্ত সে যে ব্যয় করিয়াছে তাহা কোম্পানীর নিকট হইতে পাইবে। বিদেশ হইতে এরূপ ক্রয় করিলে উহার নিমিত্ত ব্যয় ম্যানেজিং এজেণ্ট পাইবে, কোম্পানী উহা বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা মঞ্জুর করিলে।

(১২) কোম্পানীর সহিত ম্যানেজিং এজেণ্টের প্রত্যেক চুক্তিই কোম্পানীর বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা অনুমোদিত হইতে হইবে।

(১৩) কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট প্রথমে ১৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতে পারিবে, পরে ১০ বৎসর করিয়া পুনর্নিয়োগ ঘটিতে পারে। পূর্ব্বের নিয়োগ-কাল শেষ হইবার পূর্ব্বে ২ বৎসরের মধ্যে পুনর্নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(১৪) এখন যাহারা ম্যানেজিং এজেণ্ট আছে ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে উহাদের সকলের কার্য্যকাল শেষ হইল বলিয়া ধরা হইবে—

যদি নূতন আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যে তাহাদের পুনর্নিয়োগ না ঘটে। প্রত্যেক পুনর্নিয়োগে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(১৫) কেন্দ্রীয় সরকার কোন বিশেষ শিল্প বা কারবারের উল্লেখ করিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন যে উহার ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিবে না।

(১৬) কেহই একই সঙ্গে ১০টির অধিক কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট থাকিবে না। কাহারও অধীনে ১০টির অধিক কোম্পানী থাকিলে কোন্ ১০টি সে রাখিতে পারিবে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার বলিয়া দিবেন।

সারাংশ

শিল্পের অর্থ প্রয়োজন—শিল্পের দুই প্রকার পুঁজি প্রয়োজন : একটি হইল স্থির পুঁজি, অপরটি চল্‌তি পুঁজি। স্থির পুঁজি ক্রয় করিবার জন্য এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয় কিন্তু উহা অল্প কালের মধ্যে এক সঙ্গে পরিশোধ করা সম্ভব নহে, দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে পরিশোধ্য। চল্‌তি পুঁজি প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া প্রয়োজন হইবে, সুতরাং ইহা ব্যয় করিবার প্রয়োজনীয় অর্থ প্রতি বৎসরই উসুল করা হইবে আবার প্রতি বৎসরই নিয়োগ করা হইবে।

পুঁজি সংগ্রহের সাধারণ পদ্ধতি—আমাদের দেশে মোটামুটি পাঁচ উপায়ে সাধারণ ভাবে পুঁজি সংগ্রহ করা হইয়া থাকে : (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ করে ডিবেঞ্চার বিক্রয় আছে তবে খুব জনপ্রিয় নহে। (২) কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা হয়, ইহাতে কিন্তু অপরের কিছু অনিশ্চয়তা আছে। (৩) ম্যানেজিং এজেণ্টদিগকেও শিল্পের পুঁজি সরবরাহ করিতে দেখা গিয়াছে। (৪) সাধারণ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ প্রদান করে তবে উহা স্বল্প মেয়াদী। (৫) বিভিন্ন রাজ্যে শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের আওতায় সরকার ঋণ প্রদান করেন; এই সূত্র হইতে সাধারণতঃ ছোট শিল্পগুলি কর্জ পাইয়া থাকে।

শিল্পের অর্থ ব্যবস্থা—ইহার সমস্যা কোথায়—এদেশে সাধারণ লোকের সঞ্চয় ক্ষমতা কম। সঞ্চয়ের ক্ষমতা যাহাও বা আছে শিল্পে বিনিয়োগের স্পৃহা সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে নাই। কোম্পানীর শেয়ারে অগ্র প্রতিশ্রুতি দিবার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। সাধারণ ব্যাঙ্কগুলি লোকেদের নিকট হইতে অল্প কালের জন্য আমানত পায় সুতরাং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘকালের জন্য ঋণ দিতে পারে না। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করা নিরাপদ নহে, কারণ

শিল্পের বিপদের সময়ে লোকে তাহাদের আমানত উঠাইয়া লইতে পারে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ অনেক সময়ে পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে বটে কিন্তু বিনিময়ে অনেক অযৌক্তিক সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের দ্বারা প্রদত্ত ঋণের সুদ কারবারের লাভ যোগ্যতার তুলনায় অধিক ; আবার এই ঋণ তাহারা প্রদান করে বাস্তব সম্পত্তির বন্ধকীতে। সুতরাং ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ঋণ হইতে সম্পত্তি সৃষ্টির অবকাশ কম। সুতরাং অর্থ সরবরাহের অপ্রাচুর্য্য প্রধান সমস্যা।

শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন—জনসাধারণের সঞ্চয় শিল্পে বিনিয়োগের দিকে প্রবাহিত করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। এই বিনিয়োগ শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আকার গ্রহণ করাইতে হইবে। শিল্পের লাভযোগ্যতা অনুসারে কম সুদে ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে ঋণ দিতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। সম্প্রতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ সরবরাহ সহজ করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ ধরণে অর্থ-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দেওয়া হইয়াছে : ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, ষ্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন। আন্তর্জ্জাতিক ফিনান্সকর্পোরেশনেও ভারতকে যোগদান করানো হইয়াছে। পুনরর্থসরবরাহী কর্পোরেশন স্থাপনেরও আয়োজন করা হইতেছে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে—তবে ইহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শিল্পের উন্নয়ন, নিছক অর্থ সরবরাহ নহে।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও পুঁজি প্রয়োজনের মধ্যে ফাঁক—দেশের মধ্যে প্রকৃত সঞ্চয় এবং পুঁজির প্রয়োজনের মধ্যে অনেক ফাঁকে আছে। ফিসক্যাল কমিশন খুব কম করিয়াও ৩৩০ কোটি টাকা মূলধনী ব্যয় প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়াছেন। যুদ্ধপূর্ব্ব কালে পুঁজি গঠন এইরূপই ছিল, কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালে পুঁজি গঠন হ্রাস পাইয়াছে।

পুঁজি গঠনের প্রতিবন্ধক—পুঁজি বিনিয়োগ হ্রাসের একাধিক কারণ দেখিতে পাওয়া যায় ; (১) জাতীয়করণ নীতি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি ; (২) উচ্চস্তরের আয়ের উপর চড়া হারে আয় কর (৩) ম্যানেজিং এজেন্টদিগের অসাধু ক্রিয়াকলাপ ; (৪) ষ্টক এক্সচেঞ্জের স্পেক্যুলেশন্, (৫) জনগণের মধ্যে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টন।

Q Describe the measures that have been taken in the last ten years to improve the organisation for the supply long term finance for Indian industries. (Cal. B. Com. 1957)

শিল্প ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান—ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের (স্থাপিত ১৯৪৮) অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা, তবে প্রথমে পাঁচ কোটি টাকার শেয়ার ছাড়া হইয়াছে। এই ৫ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে

এই ভাবে : কেন্দ্রীয় সরকার—১ কোটি ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—১ কোটি ; শিডিউল ব্যাঙ্ক—১½ কোটি ; বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য অর্থ প্রতিষ্ঠান—১½ কোটি ; সমবায় ব্যাঙ্ক —½ কোটি। কেন্দ্রীয় সরকার এই শেয়ারে ন্যূনতম ডিভিডেণ্ডের নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন। এই কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব ১২ জন পরিচালক লইয়া গঠিত একটি পরিচালক বোর্ডের উপর অর্পিত আছে। একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আছেন।

এই কর্পোরেশনের কার্য্য হইল : (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বারা গৃহীত ঋণে নিশ্চয়তা প্রদান : শেয়ার, বণ্ড্ বা ডিবেঞ্চারে অগ্র-প্রতিশ্রুতি দান ; (৩) কার্য্যের বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ (৪) অগ্র প্রতিশ্রুতির দ্বারা ক্রীত ষ্টক, শেয়ার, বণ্ড বা ডিবেঞ্চার যত শীঘ্র সম্ভব বিক্রয় করিয়া দিবে, (৫) ২৫ বৎসরের অনধিক মেয়াদে শিল্পকে ঋণ দিতে পারিবে বা ডিবেঞ্চার কিনিতে পারিবে। ঋণের জন্য সিকিউরিটি, ধাতু বা সম্পত্তি বন্ধক লইতে পারিবে।

সুদবাহী বণ্ড্ ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া এই কর্পোরেশন চল্‌তি পুঁজি সংগ্রহ করিতে পারিবে ; ইহার সামগ্রিক দায় নিজের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভের মিলিত পরিমাণের পাঁচ গুণের অধিক হইবে না। জনসাধারণের নিকট হইতে ইহা আমানতও গ্রহণ করিতে পারিবে। কর্পোরেশন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদান করিতে পারিবে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানটি বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা দেশী মুদ্রায় উহা পরিশোধ করিতে পারিবে।

সংশোধন—১৯৫২ সালে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন বিধির সংশোধন করা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা ব্যবস্থা হইয়াছিল যে ভারত সরকার কর্পোরেশনের বৈদেশিক ঋণকে গ্যারাণ্টি দিবেন ও বিনিময়হার জনিত লোকসান পূরণ করিবেন। ইহার দ্বারা বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগের এবং ঋণ গ্রস্ত প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন কর্ত্তৃক গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে গৃহীত ডাইরেক্টরদের সংখ্যা বর্দ্ধিত এবং অডিটর-জেনারেল সহিত কর্পোরেশনের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

কর্ম্মপরিচয়—১৯৫৫-৫৬ সালে ২৭·৭০ কোটি টাকা ঋণ চাহিয়া ৮৬ টি ঋণের আবেদন আসিয়াছিল ; ইহার মধ্যে ১৫·১৩ কোটি টাকার ৪৪টি আবেদন মঞ্জুর হইয়াছিল। প্রথম হইতে ধরিলে ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন অবধি মোট ৪৩·২১ কোটি টাকা ঋণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নানা প্রকার শিল্প আছে,—চিনি, বস্ত্র, কাগজ, রবার, রসায়ন ইত্যাদি। ১৯৫৫-৫৬ সালে কর্পোরেশন ৩২·৬৮ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও নিশ্চয়তা প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড্ দিবার জন্য সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক সংশোধন—১৯৫৫ সালে এই কর্পোরেশন সংক্রান্ত আইনে

কিছু সংশোধন করা হইয়াছে : এক্সিকিউটিভ কমিটির পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে, বেতনভোগী চেয়ারম্যান ও জেনারেল ম্যানেজার থাকিবেন, ইহা সরকারের নিকট হইতে ঋণ লইতে ও বন্ধকী সামগ্রী পাট্টা দিতে পারিবে, অগ্র-প্রতিশ্রুতির দরুণ ষ্টক, শেয়ার ডিবেঞ্চার ৭ বৎসরের বেশীও রাখিতে পারিবে প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি সংশোধনে দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনের উপকার—এই পরিবর্ত্তনে কর্পোরেশনের কার্য্য-দক্ষতা বাড়িবে, কারণ (ক) নিরপেক্ষ যোগ্য চেয়ারম্যান পাওয়া যাইবে, (খ) ইহার আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ থাকিবে (গ) ৭ বৎসরের বেশী সময় ষ্টক শেয়ার ইত্যাদি ধরিয়া রাখিবার দরুণ ইহার কার্য্য প্রসারক্ষম হইবে।

তথাপি কোন্ ত্রুটি থাকিয়া গেল—(১) মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ প্রদান করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়; (২) অন্য সূত্র হইতে আরও সহজে কম সুদে ঋণ পাওয়া যায় সুতরাং কর্পোরেশনের কার্য্য আরও নমনীয় করিতে হইবে; (৩) নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের শিল্পকেই বেশী ঋণ দেওয়া হয়, ইহা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নহে, (৪) ডিবেঞ্চার ক্রয়, অগ্রপ্রতিশ্রুতি ইত্যাদিগুলি কর্পোরেশন ক্ষমতা থাকিলেও এযাবৎ করে নাই। সুতরাং ইহার পরিপূর্ণ উপকার পাওয়া যায় নাই।

উন্নয়নের কর্ম্মপ্রস্তাব বিজার্ভ বৃদ্ধি করিতে হইবে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট পরিচালক থাকিবে না, নূতন পুঁজিতে বিনিয়োগ থাকা উচিত, ঋণের অর্থ যথাসময়ে শিল্পের নিকট পৌঁছিতে হইবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা—১৯৫২ সালে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক "রাজ্য অর্থ সরবরাহ সংস্থা বিল" প্রণীত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা রাজ্যগুলিতে রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি আদায়ী মূলধন ১ কোটি (রাজ্য সরকার—৩০ লক্ষ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—২০ লক্ষ, শিডিউল ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি—৪০ লক্ষ, এবং জনসাধারণ—১০ লক্ষ)। ইহার শেয়ারে রাজ্য সরকারের গ্যারাণ্টি আছে এবং ন্যূনতম (৩) ও ঊর্দ্ধতম (৫) ডিভিডেণ্ড হার বাধা আছে। ইহা মেয়াদী আমানত লইতে এবং বণ্ড বিক্রয় করিতে পারে। ইহা ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবে; বিভিন্ন উপায়ে ইহা করিতে পারে; (১) ২০ বৎসরে পরিশোধ্য ঋণ প্রদান; (২) অন্যের নিকট হইতে গৃহীত ঋণে নিশ্চয়তা দান (৩) অগ্রপ্রতিশ্রুতি দান। চেয়ারম্যান ও

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সমেত ১০ জন সদস্য লইয়া গঠিত পরিচালক বোর্ডের উপর ইহার পরিচালনাভার ন্যস্ত।

কর্ম্মপরিচয়—১৯৫৫-৫৬ সালে ১২টি রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছিল কিন্তু প্রকৃত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। প্রায় সকল রাজ্য কর্পোরেশনই কিছু কিছু লাভ দেখাইয়াছে এবং কর্ম্মপরিচালনায় সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতা দেখাইয়াছে ত্রিবাঙ্কুর। হায়দ্রাবাদ এবং অন্ধ্র কর্পোরেশন যথাক্রমে "ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড" এবং "শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বিধির" প্রতিযোগিতায় অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে।

সাধারণভাবে রাজ্য কর্পোরেশনগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল যে ইহারা ছোট শিল্পকে অবহেলা করিয়া অপেক্ষাকৃত বড় শিল্পকেই ঋণ দিয়াছে। ইহার পরিচালনার ব্যয়ও আয়ের তুলনায় বেশী।

প্রস্তাবিত পুনরর্থ সরবরাহী কর্পোরেশন—পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীরূপে এইরূপ কর্পোরেশন গঠনের আয়োজন করা হইতেছে। ইহার প্রাথমিক পুঁজি হইবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, বীমা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১২.৫ কোটি টাকা। ভারত সরকার ২৬ কোটি টাকা ঋণ দিবেন। ইহা শিল্পগুলিকে সরাসরি ঋণ দিবে না, যে সকল ব্যাঙ্ক ইহাতে যোগদান করিবে তাহারাই ইহার নিকট হইতে ঋণ পাইবে; ব্যাঙ্কগুলি এই ঋণ শিল্পকে দিবে।

শিল্প ঋণ এবং বিনিয়োগ কর্পোরেশন—ভারত সরকার, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং মার্কিণ পুঁজিপতিদের সহযোগে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে এই কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছিল। ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী (২ কোটি), যুক্তরাজ্যের ব্যাঙ্ক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (১ কোটি), মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ও কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান (½ কোটি) ও দেশের মধ্যে জনসাধারণ (½ কোটি)—ইহাদের দ্বারা প্রদত্ত ৫ কোটি টাকার পুঁজি লইয়া আই, সি, আই, সি, গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১ কোটি এবং ভারত সরকারের নিকট হইতে ৭½ কোটি টাকা ইহা ঋণ পাইয়াছে। ১১ জন ডাইরেক্টর লইয়া গঠিত একটি বোর্ডের উপর ইহার পরিচালনাভার অর্পিত (ভারতীয় ৭, ব্রিটিশ ২, মার্কিণ ১, ভারত সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি ১)।

কার্য্যবিবরণী—গত আড়াই বৎসরে ইহা ২৮টি বেসরকারী শিল্পে ৮ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছে। ১৯৫৬ সালে ইহা ৩৭ লক্ষ টাকা নীট লাভ করিয়াছে।

সমালোচনা—ইহার কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে কতিপয় সমালোচনা

উঠিয়াছে : (১) অত্যন্ত মন্থরগতি এবং সাবধানীতে বাড়াবাড়ি ; (২) পরিকল্পনা বিবেচনায় সময় অপচয় ; (৩) বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ কাজে লাগানো হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ এই সমালোচনাগুলির উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

আন্তর্জ্জাতিক ঋণদান সংস্থা—পৃথিবীর সকল অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদেয় ১০ কোটি ডলার মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বে-সরকারী শিল্প প্রচেষ্টায় ঋণ এবং অন্যান্য উপায়ে (সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট হইতে কোন গ্যারান্টি ব্যতিরেকেই) ইহা অর্থ সাহায্য দিবে ; বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান এবং কৃষি প্রতিষ্ঠানেও দিতে পারিবে। ভারত এই সংস্থায় চাঁদা দিয়াছে ৪৪ লক্ষ ৩১ হাজার ডলার (প্রায় ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা)। ৭½ কোটি ডলার ন্যূনতম পুঁজি সংগৃহীত হইলে ইহা কার্য্য করিবে কথা ছিল ; বর্ত্তমানে (জুন ১৯৫৭) ৯ কোটি ডলার সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে।

বেসরকারী শিল্পে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে শ্রফ কমিটি—বেসরকারী শিল্পে অর্থ সরবরাহ সম্পর্কে পর্য্যালোচনার জন্য নিযুক্ত শ্রফ কমিটি ১৯৫৪ সালে তাঁহাদের বিবরণীতে কলকব্জার আধুনিকীকরণ এবং বদলীকরণের জন্য ১ম পরিকল্পনা কালের শেষ দিকে অনেক খানি ফাঁক পূরণের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়াছিলেন। কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে বৃহৎ পরিমাণ বিনিয়োগের সুফল পাইতে যে সকল শিল্পের দেরী হয় সেগুলির নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত জাতীয়করণ হইতে অব্যাহতি ঘোষণা করিলে উহাতে বিনিয়োগ বেশী হইবে। এই কমিটি ব্যাঙ্কসমূহ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিল্প ঋণ সরবরাহের পক্ষপাতী। কমিটির অন্যান্য সুপারিশ হইল ; (১) ব্যাঙ্ক আমানতের বীমা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন, (২) শিডিউল ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপনে এবং কার্য্যসম্পাদনে সাহায্য, (৩) পুণর্বাট্টার (re-discount) আরও সুযোগ প্রদান, (৪) ব্যাঙ্ক সমূহের ব্যয়ের কাঠামোর সুপরিকল্পনা, (৫) ব্যাঙ্ক পরিচালনার উন্নয়ন, (৬) মুদ্রা প্রেরণের অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান, (৭) দেশীয় ব্যাঙ্কারদিগের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি।

ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক পুঁজি সমস্যা—আমাদের দেশে শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগের মত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্পৃহা ছিল না। সেই জন্য এদেশে বৈদেশিক পুঁজির আধিপত্য ঘটিয়াছিল। ***উপকারিতা***—(১) বৈদেশিক পুঁজি-পতিগণ আধুনিক শিল্প জ্ঞান লইয়া আসিয়াছিল, (২) নূতন শিল্প ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ পুঁজি এদেশের লোকের ছিল না, (৩) প্রাথমিক ঝুঁকি ও লোকসান বিদেশীদের উপর দিয়াই হইয়া গিয়াছিল, (৪) লোকের কর্ম্মসংস্থান ও জাতীয় ধনভাণ্ডার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ***অপকারিতা***—(১) বিদেশীগণ

এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছে, (২) ইহারা এদেশের লোককে শিল্প শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক ছিল, (৩) শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতবাসীকে নিয়োগ করা হইত না (৪) বৈদেশিক পুঁজিপতিগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ আরও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করিয়া লইত।

বৈদেশিক পুঁজি ও বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি--স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এদেশে বৈদেশিক পুঁজির সমস্যা নূতন রূপ লইয়াছে। আমরা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগে বিদেশী পুঁজি বিতাড়িত করি নাই, যদিও কিছু কিছু পুঁজি চলিয়া গিয়াছিল। আমাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দেশীয় পুঁজিই যথেষ্ট নহে, ব্যাপক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বিরাট পরিমাণ পুঁজি প্রয়োজন। সেই কারণে বৈদেশিক পুঁজির প্রশ্ন নূতন ভাবে বিবেচনা করা হয়।

ফিস্‌ক্যাল কমিশন বলিয়াছেন যে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে বহু পরিমাণ সামগ্রী ও সরঞ্জাম আমদানী করা প্রয়োজন। ইহাদের মূল্য প্রদানের একমাত্র সঙ্গত পদ্ধতি হইবে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ—বিশেষ করিয়া ডলার অঞ্চল হইতে। বিদেশী পুঁজির সহিত শিল্প পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান, শিল্প গবেষণার ফলাফল প্রভৃতি বিষয়গুলিও বিদেশ হইতে আসিবে। তবে দুইটি ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি গ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে : (১) বিদেশী যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং (২) পুঁজি ও ব্যবস্থাপনা সহজলভ্য নহে এরূপ নূতন ধরণের ব্যক্তিগত শিল্প।

বৈদেশিক পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি—১৯৪৯ সালে ভারত সরকার বৈদেশিক পুঁজি সম্পর্কে তাঁহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা বলিলেন, দেশী ও বিদেশী মালিকের মধ্যে পক্ষপাত করা হইবে না কারবারের লাভ বিদেশে লইয়া যাওয়া চলিবে, বিদেশীর শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, সংখ্যাধিক শেয়ার ও নিয়ন্ত্রণ ভারতীয়দের হাতে থাকিতে হইবে (বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীর হাতে থাকিতে পারে) এবং বিদেশী পুঁজির স্থাপিত শিল্পে ভারতীয়দিগকে শিল্প-শিক্ষা দিতে হইবে। সরকারের এই নীতির দ্বারা বৈদেশিক পুঁজিকে এদেশে আসিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে অথচ উহার উপর দেশের স্বার্থে ন্যায়সঙ্গত শর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে।

বৈদেশিক পুঁজির পরিমাণ ও উৎস--রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪৮ সালের একটি হিসাব করিয়াছিলেন। এই হিসাবে বৈদেশিক পুঁজির পরিমাণ ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা। উহার পর তিন বৎসরে প্রায় ১৯ কোটি টাকা আসিয়াছে। সম্প্রতি বাণিজ্যেও বৈদেশিক পুঁজি নিয়োজিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৈদেশিক পুঁজির প্রধান উৎস ছিল ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী (প্রধানতঃ যুক্তরাজ্যের)। স্বাধীনতার পরে নানারূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া বৈদেশিক পুঁজি আসিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা—দুই চারিজন ব্যক্তি অংশীদারির ভিত্তিতে কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠন করে কিন্তু ইহার কারবার হইল অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ভার গ্রহণ করা। অপরের ব্যবসা পরিচালনা করে এরূপ কারবারীকে ম্যানেজিং এজেণ্ট বলা হয়। কখনও কখনও ইহা সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুঁজি সরবরাহও করিয়া থাকে। একটি ম্যানেজিং এজেণ্ট একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার লইতে পারে।

ম্যানেজিং এজেন্সির উপকার—(১) পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে, (২) শিল্প সংযোগের সুবিধা ঘটাইয়াছে, (৩) অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা শিল্প পরিচালনা সম্ভব করিয়াছে, (৪) নূতন ঝুঁকি বহুল শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে, (৫) শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত ঋণে গ্যারান্টি দিয়াছে, (৬) বিপদের সময়ে শিল্পকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সির অপকার—(১) পুঁজি সংগ্রহের দিক হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং এজেণ্টের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে, (২) ম্যানেজিং এজেণ্ট একটি শিল্পের অর্থ অপর শিল্পে কর্জ্জ দেয় বা বিনিয়োগ করে, (৩) এক সঙ্গে অনেকগুলি শিল্পের ভার লইয়া নিজেও ধ্বংস হয়, শিল্পকেও ধ্বংস করে, (৪) নিছক পুঁজির জোরে, দক্ষতার ভিত্তিতে নহে, এজেন্সি অধিকার পায়, (৫) উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং যোগ্যতার নিশ্চয়তা নাই, (৬) নিজেদের লাভের জন্য অপ-পদ্ধতি অবলম্বন করে, (৭) ম্যানেজিং এজেণ্ট সম্পর্কে গুজব রটিলে উহার পরিচালনাধীন কোম্পানীর ক্ষতি হয়।

১৯৩৬ এবং ১৯৫১ সালের ভারতীয় কোম্পানী বিধি সংশোধনের দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সির অপকার ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য কয়েকটি নূতন নিয়ম সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

ম্যানেজিং এজেন্সি ও ১৯৫৫ সালের কোম্পানী বিধি—ভারতীয় কোম্পানী বিধির ব্যাপক সংস্কার সাধনের জন্য ১৯৫৫ সালে একটি নূতন কোম্পানী বিধি রচিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত করিবার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টদিগের ক্ষমতা এবং অধিকারে অনেকগুলি পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। (১) ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধি লইয়া স্বাধীন পরিচালক সংসদ গঠন করা হইবে। ম্যানেজিং এজেণ্টদের পক্ষ হইতে নিযুক্ত ডাইরেক্টরদের সংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইল; (২) ম্যাঃ এঃ-দের উপর ডাইরেক্টরদের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে; (৩) ম্যাঃ এঃ-এর গঠন প্রণালীতে পরিবর্ত্তন সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ; (৪) কোম্পানীর পরিচালনা অধিকার হস্তান্তরিত করিতে হইলে কোম্পানীর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন থাকিতে হইবে; (৫) ম্যাঃ এঃ-এর পারিশ্রমিক

১১ শতাংশের বেশী হইবে না; (৬) ম্যাঃ এঃ কারবার ম্যাঃ এঃ-এর অধীনে হইবে না, (৭) ম্যাঃ এঃ পৃথকভাবে কোন আফিস ভাতা পাইবে না;, (৮) পৃথক অফিস ভাতা পাইবে না; (৯) ম্যাঃ এঃ-এর অধীন কোম্পানী কর্তৃক ঋণ প্রদান বা শেয়ার ক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে; (১০) ম্যাঃ এঃ প্রতিযোগী কারবারে নামিবে না; (১১) বিক্রয় এজেণ্ট রূপে কার্য্য করিবে না; (১২) সামগ্রী ক্রয়ের ব্যয় পাইবে মাত্র; (১৩) ম্যাঃ এঃ ও কোম্পানীর চুক্তি অনুমোদিত হইতে হইবে। (১৪) প্রথমে ১৫ বৎসর, পরে ১০ বৎসরের জন্য নিয়োগ; (১৫) ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট সকল ম্যানেজিং এজেণ্টের কার্য্যকাল শেষ হইবে; (১৬) কোন বিশেষ কারবারে ম্যাঃ এঃ থাকিবে না বলা যাইবে; (১৭) একই ম্যাঃ এঃ ১০টির অধিক কোম্পানী লইবে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিল্প ঃ সংরক্ষণ নীতি

Industry : Policy of Protection

***শিল্প সংরক্ষণের নীতি*—Policy of Protection of Industries**

সংরক্ষণ কি ?—সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় বিদেশে উৎপাদিত সামগ্রীর প্রতিযোগিতা হইতে স্বদেশে উৎপাদিত সামগ্রীকে রক্ষা করা। অনেক সময়ে কোন একটি সামগ্রী দেশে উৎপাদিত হইতে যে খরচা পড়ে বিদেশে তাহা অপেক্ষা সস্তায় উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকিলে বিদেশী সামগ্রীই বিক্রয় হইবে, দেশে প্রস্তুত সামগ্রী বিক্রয় হইবে না ; দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। তখন উহাকে অবাধ প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়।

Q. In what different forms can protection be given to industries ? (B. Com. 1941).

সংরক্ষণের পদ্ধতি কি ?—দেশীয় শিল্পকে দুইটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে :

(১) বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যের উপর উচ্চহারে আমদানীশুল্ক বসাইলে বিদেশীপণ্যের দাম দেশের বাজারে চড়িয়া যাইতে বাধ্য হইবে এবং সেক্ষেত্রে উহা দেশীয় পণ্য অপেক্ষা সস্তায় বিক্রয় হইতে পারিবে না। অতএব আমদানীশুল্ক ধার্য্য দ্বারা দেশীয় শিল্পের উপর সংরক্ষণ প্রদান করা যায়। ইহাতে অবশ্য ভোগকারীরূপে সাধারণ ব্যক্তিকে অধিক মূল্য প্রদান করিতে হয় কারণ আমদানীশুল্ক না থাকিলে সে অপেক্ষাকৃত কম দামে বিদেশী সামগ্রী ক্রয় করিয়া ভোগ করিতে পারিত।

(২) দেশে উৎপাদিত সামগ্রীর উপর "বাউন্টি" (Bounty) বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াও সংরক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্যবস্থা থাকে যে সংরক্ষণযোগ্য কোন সামগ্রী একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণে উৎপাদন করিবে সেই অনুপাতে সরকার হইতে তাহাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইবে। ইহার দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার উৎপাদিত সামগ্রী অপেক্ষাকৃত

কম দামে বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহাতে করপ্রদানকারীরূপে সাধারণ ব্যক্তিকে স্বার্থত্যাগ করিতে হয় কারণ এইরূপ বাউন্টি প্রদান করা হয় রাজস্ব, হইতে এবং অধিক রাজস্বের জন্য সরকারকে অধিক পরিমাণে কর আদায় করিতে হইবে।

সংরক্ষণ কেন বা সংরক্ষণের ভিত্তি—আমাদের দেশে একাধিক কারণে শিল্প সংরক্ষণের নীতি গ্রহণের দাবী করা হইয়াছে।

(১) ***জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা***—(National Self Sufficiency) আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যেরূপ অস্থির তাহাতে কখন কোন্ সামগ্রীর আমদানী বন্ধ হইয়া যায় তাহার স্থিরতা নাই। সেই কারণে যে সামগ্রী জাতীয় জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা যাহাতে দেশেই উৎপাদন হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আপাততঃ অসুবিধা সত্বেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধ উপকরণ উৎপাদনে জাতিকে অবশ্যই আত্ম-নির্ভরশীল হইতে হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

(২) ***শিল্পে বৈচিত্র্যবিধান*** (Diversification of Industries) জাতীয় ধন ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য,—জনসাধারণের গড়পড়তা আয় বৃদ্ধির জন্য,—দুই একটি শিল্পের উপর নির্ভর না করিয়া বিভিন্ন শিল্পের সুসমঞ্জস প্রসার প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে যে শিল্পের প্রসার প্রয়োজন অথচ যাহা বিদেশী প্রতিযোগিতায় ব্যাহত তাহাকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৩) ***শিশুশিল্প রক্ষার প্রয়োজনীয়তা*** (Infant Industries) —দেশের মধ্যে বহু শিল্প থাকিতে পারে যেগুলি প্রথমেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হইলে ধ্বংস হইয়া যাইবে কিন্তু যেগুলিকে প্রথমাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করিলে উত্তরকালে তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারিবে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। এই শিল্পগুলির সম্মুখে সম্ভাবনা রহিয়াছে কিন্তু প্রথম অবস্থায় শিশুর ন্যায় ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন; ভবিষ্যতে তাহারা পূর্ণ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

বিচারমূলক সংরক্ষণ --Discriminating Protection

Q. What is discriminating protection? Discuss the effects of the application of the policy of discriminating protection on the important industries of India. (B. A. 1940; B. Com. 1942, '43, '45, '47).

আমাদের দেশে ১৯২১ সালে, ভারতীয় শিল্পকে কি ভাবে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে সেই সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি ফিস্‌ক্যাল কমিশন

গঠন করা হইয়াছিল। এই কমিশন ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। ইহার অর্থ হইল যে নির্বিচারে সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না—সংরক্ষণ প্রার্থী শিল্পগুলির মধ্যে বাছাই করিয়া এবং সংরক্ষণ যাহাদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রদ হইবে তাহা বিচার বিবেচনা করিয়া, তবেই সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে। সংরক্ষণ প্রদান করিলেই জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিবে, হয় সংরক্ষিত শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীর ক্রেতারূপে অথবা সরকারকে কর প্রদাতারূপে। অতএব যে শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং যাহার পক্ষে সংরক্ষণ সত্যই উপকারে আসিবে—শুধু সেই শিল্পগুলিকে বাছাই করিয়া সংরক্ষণ দেওয়া হইবে। ইহার প্রমাণের জন্য সংরক্ষণ প্রার্থী শিল্পকে তিনটি সর্ত্ত পূরণ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, শিল্পটিকে এরূপ হইতে হইবে যাহার কতিপয় প্রাকৃতিক সুবিধা আছে—যথা পর্য্যাপ্ত কাঁচামালের সরবরাহ, সস্তায় চালনশক্তি পাইবার সুবিধা, যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের সরবরাহ এবং দেশের মধ্যেই উৎপাদিত সামগ্রীর বিস্তৃত বাজার। এইগুলি থাকিলে বুঝা যাইবে যে শিল্পটির সম্মুখে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে—উহা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পটিকে এরূপ হইতে হইবে যাহা সংরক্ষণ না পাইলে নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রসার লাভ করিতে পারিবেই না; অথবা দেশের স্বার্থের দিক হইতে যত তাড়াতাড়ি তাহার প্রসার লাভ বাঞ্ছনীয় তত তাড়াতাড়ি তাহার প্রসার সংরক্ষণ ব্যতীত সম্ভব হইবে না।

তৃতীয়তঃ, শিল্পটিকে এরূপ হইতে হইবে যাহা ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ব্যতীতই বিশ্বের প্রতিযোগিতায় সম্মুখীন হইতে পারিবে।

ফিস্‌ক্যাল কমিশন এ সম্পর্কে আরও সুপারিশ করিয়াছিলেন যে যে-সকল শিল্পে ক্রমিক আয় বৃদ্ধির নিয়ম (Law of Increasing Return) ক্রিয়া করে এবং যে সকল শিল্প অদূর ভবিষ্যতে তাহার সামগ্রীর দেশের মধ্যে সমগ্র পরিমাণ চাহিদা মিটাইতে পারিবে সেইগুলিকেও সাধারণতঃ সংরক্ষণের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরন্তু বিদেশ হইতে ডাম্প সামগ্রীর, অথবা বিদেশের বাউন্টির দ্বারা পরিপুষ্ট সামগ্রীর প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করিবার জন্যও সংরক্ষণ দেওয়া যাইতে পারিবে।

ঐ সকল সর্ত্তের ভিত্তিতে কোন্ সামগ্রীর সংরক্ষণ প্রয়োজন তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য একটি "শুল্ক-সংসদ" (Tariff Board) গঠনের সুপারিশ ফিস্‌ক্যাল কমিশন করিয়াছিলেন। ভারত সরকার ফিস্‌ক্যাল কমিশনের

সুপারিশ মত বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে "শুল্ক-সংসদ" গঠন করা হইয়াছিল।

বিচারমূলক সংরক্ষণ ও কতিপয় শিল্প

Q. Take any protected industry and show how far the policy has been successful. (B. A. 1936).

Q. Discuss the effects of the policy of Discriminating Protection on the industrial development of India. What changes, if any, would you suggest in the fiscal policy of the country? (B Com 1951).

(১) ***রসায়ন শিল্প*** (Chemical Industries)—১৯২৮ সালে রসায়ন শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদানের প্রশ্ন শুল্ক-সংসদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। ১৯৩১ সালে দুই বৎসরের জন্য কয়েকটি রসায়ন সামগ্রীর উপর সংরক্ষণ প্রদান করা হয়—ঐ সকল সামগ্রীর আমদানীর উপর স্পেসিফিক্ ডিউটি বা নির্দ্দিষ্ট শুল্ক ধার্য্য করিয়া। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারত সরকার অন্তর্ব্বর্ত্তী শুল্ক সংসদের পরামর্শক্রমে ৭টি রসায়ন শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করিয়াছিলেন। রসায়ন শিল্পে সংরক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নীতির মধ্যে সাহসিকতা ও আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

(২) ***কাগজ শিল্প*** (Paper Industry)—১৯২৫ সালে কাগজ শিল্পের উপর সংরক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল—প্রথমে সাত বৎসরের জন্য। ১৯৩২ সালে সংরক্ষণ শুল্কের মেয়াদ বর্দ্ধিত করা হয় কারণ শুল্ক সংসদ লক্ষ্য করেন যে বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুতের শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে এবং কলগুলিতে উৎপাদনের খরচা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। উপরন্তু ঐ সময়ে আমদানীকৃত কাষ্ঠমণ্ডের (Wood pulp) উপর প্রতি টনে ৪৫৲ টাকা হিসাবে শুল্ক আরোপিত হইল—যাহাতে দেশের মধ্যে বংশমণ্ডেরও ব্যবহার উৎসাহিত হয়। ১৯৩৯ সালে সংরক্ষণের মেয়াদ বর্দ্ধিত করা হয়। ১৯৪৫ সালে ১লা এপ্রিল হইতে সংরক্ষণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতে ১৮টি কাগজের কল আছে এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৩৭,৩০০ টন কাগজ ও বোর্ড উৎপাদন হইয়াছে।

(৩) ***দিয়াশলাই শিল্প*** (Match Industry)—১৯২৮ সালে দিয়াশলাই শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয়—প্রতি গ্রোস বাক্সের উপর ১৷৹ আনা হারে আমদানী শুল্ক আরোপ করিয়া। অবশ্য সংরক্ষণের আওতায় একটি বিদেশী দিয়াশলাই কোম্পানী সব থেকে বেশী লাভবান হইয়াছিল—তবে সংরক্ষণের মধ্যে বাহির হইতে দিয়াশলাই আমদানী বহু পরিমাণে কমিয়া যায়।

(৪) ***লৌহ ও ইস্পাত শিল্প*** (Iron and Steel Industry)—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং এই শিল্পের উপরেই সর্ব্বপ্রথম সংরক্ষণ প্রদান করা হইয়াছিল। শুল্ক সংসদ এই শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের বিবরণীতে বলেন যে এই শিল্পটি ফিস্‌ক্যাল কমিশনের দ্বারা নির্দ্ধারিত সকল সর্ত্তগুলিই পূরণ করে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতে অন্যান্য যে কোন দেশের ন্যায়ই সস্তায় সর্ব্বপ্রকার ইস্পাত উৎপাদন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৪২ সালে এই শিল্পের উপর সর্ব্বপ্রথম সংরক্ষণ দেওয়া হয়, অবশ্য ব্রিটেনে উৎপাদিত ইস্পাতের উপরে অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছিল। সংরক্ষণের আওতায় এই শিল্পের খুব দ্রুত প্রসার লাভ ঘটিয়াছে এবং ১৯৪৭ সালে সংরক্ষণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৫) ***তুলা তন্তু শিল্প*** (Cotton Textile Industry)—তুলা তন্তু শিল্প নূতন না হইলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন কারণে উহাকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়—এই কারণগুলির মধ্যে জাপানের প্রতিযোগিতা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৭ সালে প্রথম এই শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়। পরে সংরক্ষণের মেয়াদ বর্দ্ধিত করা হয় এবং শুল্কের হার পরিবর্ত্তন করা হয়। সংরক্ষণের দ্বারা এই শিল্পটিও বিশেষ উপকৃত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ইহার সংরক্ষণ রহিত করা হয়।

Q. Examine the effect of the policy of protection on the sugar industry of India. (B. Com. 1939)

(৬) ***চিনি শিল্প*** (Sugar Industry)—১৯৩১ সালে চিনি শিল্প সংরক্ষণ সুবিধালাভ করে। ঐ সাল পর্য্যন্ত ভারতে গড় পড়তা ১৬ কোটি টাকা মূল্যের চিনি আমদানী হইত এবং সেই সময়ে এখানে ৩০টি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছিল। সংরক্ষণের সুবিধা পাইবার পর চিনির কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৬টি হইয়াছে এবং এই শিল্পে বর্ত্তমানে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা আছে। বলা হইয়া থাকে যে অন্যান্য দেশে শর্করা শিল্প ৩০।৪০ বৎসরে যে উন্নতি করিয়াছে তাহা ভারতে সম্ভব হইয়াছিল সংরক্ষণের পরে মাত্র ৫।৬ বৎসরের মধ্যে। ১৯৩৭ সালে শুল্ক সংসদ বলিয়াছিলেন, "ইহা বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না যে বিচারমূলক সংরক্ষণের দ্বারা ভারতের চিনি শিল্পে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। প্রধানতঃ চিনির আমদানীর উপর নির্ভরশীল দেশ হইতে ভারত এক্ষণে জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ চিনি উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হইয়াছে—এবং উহার উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্ত যদি নাও হয় অন্ততঃ তাহার সমান।" শুল্ক সংসদের অভিমতে ঐ সময়ে ভারতে চিনির দাম কিউবা, বা জাভা

বা ব্রেজিল অপেক্ষাও সস্তা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে চিনি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে এবং উহার দামও খুব বৃদ্ধি পায় এবং সরকার চিনির উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হন। ১৯৫০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চিনির উপর সংরক্ষণ প্রদান করা ছিল।

[To what extent has the policy of discriminating protection been successful? Would you advocate a change in this policy? (B. A. 1950).]

ঐ সকল শিল্পের পর্য্যালোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি সম্পূর্ণ নিস্ফল হয় নাই। তবে বিশেষ কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে বিচারমূলক সংরক্ষণ যে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে, যথা রসায়ন শিল্প এবং দিয়াশলাই শিল্প। চিনিশিল্প সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে তবে সংরক্ষণের আওতায় এই শিল্পের যে বিশেষ প্রসার হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমানে প্রসারপ্রাপ্ত শিল্পগুলির উপর হইতে সংরক্ষণ অপসারণ প্রয়োজন এবং অনগ্রসর শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

***বিচারমূলক সংরক্ষণের ত্রুটি*---Defects of Discriminating Protection**

যে পর্য্যায়ের বিচারমূলক সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হইয়াছিল উহা মূলতঃ নানা ত্রুটিবহুল ছিল। কি কি বিষয় থাকিলে শিল্পের স্বাভাবিক সুবিধা আছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে তাহার উদাহরণ স্বরূপ প্রথম ফিস্‌ক্যাল কমিশন যে দুই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সংরক্ষণ প্রদানের সময়ে উহার উপরেই সর্ব্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইত ; ফলে একাধিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ লাভের উপযুক্ত শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় নাই। উপরন্তু যে সকল স্বাভাবিক সুবিধার কথা বলা হইয়াছে উহাদের সবগুলিই যদি কোন বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে উহাকে সংরক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনই থাকে অল্প। অধিকন্তু দ্বিতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন (১৯৫০) প্রথম ফিস্‌ক্যাল কমিশনের দ্বারা নির্দ্ধারিত সংরক্ষণ নীতির যে সমালোচনা করিয়াছেন উহাতে বিচারমূলক সংরক্ষণের মৌলিক দৌর্ব্বল্য সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন "দেশের সর্ব্বাঙ্গীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের অস্ত্র হিসাবে সংরক্ষণকে বিবেচনা করা হয় নাই ; বিশেষ কোন শিল্প আবেদন জানাইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার উপায় রূপেই সংরক্ষণকে গণ্য করা হইয়াছে। ইহাতে কিছুটা একদিক-চাপা উন্নয়ন ঘটিয়াছে মাত্র। এইরূপ পন্থায় ভিত্তিমূলক ও মৌলিক শিল্পের সম্প্রসারণ করা সম্ভব ছিল না। সহায়ক বা অনুরূপ শিল্প (allied industries)

স্থাপনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা না করিয়া বিচ্ছিন্ন শিল্প-গুলিকে সংরক্ষণ প্রদানের দ্বারা জন সমষ্টির মোট বোঝা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াই সম্ভব।" ["Protection was not visualised as an instrument of general economic development but was viewed as a means of enabling particular industries to withstand foreign competition, when they applied for protection. This resulted in a some-what lop sided development. With such an approach, it was not possible for basic and key industries to develop. It is also likely that the protection of isolated industries without a positive effort being made at the same time to provide facilities for the establishment of allied industries added to the total burden on the community," Fiscal Commission's Report (1949-50)]

এই নীতি কার্য্যকরী করিবার সময়ে মোটামুটি তিনটি ত্রুটি বিশেষভাবেই প্রকটিত হইয়াছিল : প্রথমতঃ, কোন শিল্প সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিলে উহা টেরিফ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে অহেতুক বিলম্ব ঘটিত ; দ্বিতীয়তঃ, টেরিফ বোর্ড ঐ শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধানে অত্যধিক দীর্ঘ সময় গ্রহণ করিতেন ; তৃতীয়তঃ, টেরিফ বোর্ডের সুপারিশের উপর সরকার তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনেক সময় গ্রহণ করিতেন।

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর শুল্ক নীতি—War and Post War Tariff Policy

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের প্রয়োজনেই আমদানীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হইয়াছিল—সুতরাং ঐ সময়ে শিল্প সংরক্ষণ প্রশ্নের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। যে সকল শিল্প সংরক্ষণ ভোগ করিতেছিল, একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়া উহাদের সংরক্ষণ বজায় রাখা হইল। শুধু আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্যই নহে, যুদ্ধ প্রয়োজনে বর্দ্ধিত চাহিদার দরুণ নূতন শিল্প সম্প্রসারণের সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা গিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ভারতের তদানীন্তন বাণিজ্য সচিব যুদ্ধকালে স্থাপিত শিল্পগুলি সুসংগঠিত হইলে উহাদিগকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই নীতির অনুসরণে ১৯৪৫ সালে সংরক্ষণকামী শিল্পসমূহের দাবী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি টেরিফ বোর্ড গঠন করা হইল। এই সময়ে কোন শিল্প সংরক্ষণ অথবা অপর কোন সরকারী সহায়তা পাইতে পারে কিনা তাহা বিচারের জন্য নিম্নরূপ সূত্র নির্দ্ধারিত হইল : (১) শিল্পটি সঠিক ব্যবসায়ী নীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হইতেছে কিনা, (২) শিল্পটির স্বাভাবিক বা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং উহার প্রকৃত এবং সম্ভাব্য খরচা বিবেচনায় মনে হইতে হইবে যে উহা যুক্তিসঙ্গত

সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা রাষ্ট্রসহায়তা ব্যতিরেকেই সাফল্যজনকভাবে চলিবার অবস্থায় উন্নীত হইবে ; অথবা শিল্পটি এরূপ পর্য্যায়ের যাহাকে জাতীয় স্বার্থেই সংরক্ষণ প্রদান প্রয়োজন এবং জনসাধারণের পক্ষে উহার দরুণ ব্যয় যেন অত্যধিক না হয়। এই সর্ত্তসমূহ পুরণ হয় কিনা তাহা টেরিফ বোর্ড দেখিবেন এবং কি পরিমাণে ও কত দিনের জন্য (তিন বৎসরেব অধিক নহে) সংরক্ষণ আরোপ করা হইবে তাহা সুপারিশ করিবেন।

১৯৪৫ সালে নির্দ্ধারিত সংরক্ষণের এই সর্ত্তগুলি পুর্ব্বেকার টেরিফ বোর্ড সমূহ যে সর্ত্তাদি বিবেচনা করিত (অর্থাৎ বিচারমূলক সংবক্ষণের সর্ত্তাদি)—তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল। কাবণ নূতন টেরিফ বোর্ডেকে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে প্রযোজনীয় বলিয়া বিবেচিত শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার সুপারিশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

নূতন ফিস্‌ক্যাল কমিশন ও তাঁহাদের সুপারিশ—Fiscal mmission of 1949-50 and its Recommendations

Q. Explain the principles enunciated by the Indian Fiscal Commission of 1949-50 for granting protection to Indian Industries. (B A. 1951, B. Com. 1952). "The Indian Fiscal Commission of 1949-50 approached their task from a new angle of vision and laid down new principles of protection" Elucidate the statement. (B. A. 1953). Explain the scheme of protection as formulated by the Indian Fiscal Commission of 1949-50. (Cal. B. A. 1955) Discuss the principles of the protectionist policy adopted in India after 1949-50 (B. A. 1957)

এযাবৎ যে সংরক্ষণের নীতি অনুসৃত হইতেছিল তাহা সামগ্রিক ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এবং নূতন নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি সুপারিশ করিবার জন্য ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার একটি নূতন ফিস্‌ক্যাল কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। শ্রী ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি এবং ইহাতে আরও ৭জন সদস্য ছিলেন। ১৯৫০ সালের মে মাসে ফিস্‌ক্যাল কমিশন তাঁহাদের পর্য্যালোচনা ও সুপারিশ সমন্বিত বিবরণী সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

নূতন ফিস্‌ক্যাল কমিশন তাঁহাদের বিবরণীতে বলিয়াছেন, যে শুল্ক সংরক্ষণকে কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়রূপেই মূলতঃ গণ্য করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সকল পদ্ধতি রাষ্ট্র কার্য্যকরী করিবে উহাদের অন্যতম রূপে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনার সহিত শিল্প সংরক্ষণকে সম্পর্কিত করিতে হইবে ; অন্যথায়

সংরক্ষণ বোঝার অসম বণ্টন হইবে এবং শিল্প সমূহের অসমন্বিত সম্প্রসারণ (unco-ordinated growth) ঘটিবে।

কমিশন সংরক্ষণ নীতির সুপারিশ কালে বলিলেন, অনুমোদিত পরিকল্পনার মধ্যে যে সকল শিল্প অন্তভু্ক্ত হইবে সেগুলিকে তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিতে পারা যায়: (ক) যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্প (খ) ভিত্তিমূলক ও মূল শিল্প (গ) অন্যান্য শিল্প।

(ক) এই পর্য্যায়ের শিল্পের জন্য কমিশন সুপারিশ করিলেন এই সকল শিল্প (যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্প) প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালনা করিতে জাতির পক্ষে যে ব্যয়ই হউক না কেন, জাতীয় প্রয়োজনে উহা করিতেই হইবে। ইহাদিগকে যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সংরক্ষণও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

(খ) ভিত্তিমূলক ও মূল শিল্পগুলি সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং উহারা যে জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত—উহাই হইবে উহাদের উন্নয়নের জন্য প্রদেয় সংরক্ষণ বা অপর কোন সহায়তা প্রদানের প্রধান যুক্তি। ইহাদের ক্ষেত্রে শুল্ক-নির্দ্ধারক কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্ধারিত করিবেন কি ধরণের কি পরিমাণে সংরক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। কি সর্ত্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহাও তাঁহারা স্থির করিয়া দিবেন এবং এই সর্ত্তগুলি সংশ্লিষ্ট শিল্প পালন করিতেছে কিনা, তাহাও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে দেখিবেন।

(গ) অন্যান্য শিল্প সমূহের মধ্যে আবার তিনটি ভাগ করিতে পারা যায়—(১) যে শিল্পের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকার (priority) প্রদত্ত আছে (২) যে শিল্পগুলি পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভিত্তিমূলক শিল্পের সহায়ক এবং (৩) অপরাপর শিল্পসমূহ। এই সকল শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে কিনা তাহা বিচারের জন্য এইরূপ মান নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত:

"শিল্পটির অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং উহার প্রকৃত ও সম্ভাব্য উৎপাদন খরচা বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে উহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যেই সংরক্ষণ বা সহায়তা ব্যতিরেকেই সাফল্যজনকভাবে চলিবার মত যথেষ্ট উন্নত হইবে।

এবং/অথবা

শিল্পটি এরূপ জাতীয় স্বার্থে যাহাকে সংরক্ষণ বা সহায়তা প্রদান প্রয়োজন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা বিবেচনায় যাহাকে এইরূপ সংরক্ষণ বা সহায়তা প্রদান করিলে, জনসাধারণের উপর তজ্জনিত ব্যয়ভার অত্যধিক হইবে না।

ফিস্ক্যাল কমিশন আরও বলিলেন, যে সকল শিল্প অনুমোদিত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদিগকে সংরক্ষণ প্রদান করা হইবে কিনা তাহা, উপরে প্রদত্ত মান অনুযায়ী টেরিফ বোর্ড বিচার করিবেন এবং সরকারের নিকট তাঁহাদের সুপারিশ প্রদান করিবেন।

যে ক্ষেত্রে কোন অনুমোদিত পরিকল্পনা থাকিবে না সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা থাকিবে এইরূপ : (১) যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্প সমূহকে জাতীয় স্বার্থের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হইবে—উহার জন্য ব্যয় যাহাই হউক না কেন ; (২) অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে, উপরে প্রদত্ত (গ)—পর্য্যায়ভুক্ত অন্যান্য শিল্প সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মান (criteria) প্রয়োগ করা হইবে।

ফিস্ক্যাল কমিশন সংরক্ষণের মূল নীতি নির্দ্ধারণ ব্যতীতও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কতিপয় অন্যান্য প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া ঐ সম্পর্কে তাঁহাদিগের অভিমত প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট শিল্প যদি অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয় তাহা হইলে দেশের মধ্যেই উহার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাপ্তব্যতা অবশ্য পূরণীয় সর্ত্তরূপে গণ্য করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন শিল্পের দেশীয় বাজার বৃহৎ না হয় কিন্তু বৃহৎ বৈদেশিক বাজার থাকে তাহা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট শিল্পের আপেক্ষিক সুবিধা (comparative advantage) রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ উহার দ্বারাও বৃহৎ পরিধির উৎপাদন সম্ভব হইবে এবং উৎপাদনের খরচ আনুপাতিক ভাবে কম হইবে। তৃতীয়তঃ, যদিও সাধারণতঃ সংরক্ষিত শিল্পের পক্ষে ভবিষ্যতে সমগ্র দেশীয় চাহিদা মিটাইবার সক্ষমতা অর্জ্জন প্রয়োজন তথাপি সংরক্ষণ প্রদানের জন্য উহাই অবশ্য পূরণীয় সর্ত্তরূপে বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। চতুর্থতঃ, অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল বা সরঞ্জাম উৎপাদন করে এরূপ শিল্পকে সংরক্ষণের অসুবিধার প্রশ্ন ফিস্ক্যাল কমিশন উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এ সম্পর্কে সর্ব্বথা প্রয়োগযোগ্য কোন সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। পৃথকভাবে প্রত্যেক ঘটনা বিবেচনা করিতে হইবে। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে যে সকল শিল্প সংরক্ষিত শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী ব্যবহার করে তাহারা নিজেরাও যদি সংরক্ষিত হয় তাহা হইলে উহাদিগকে আরও কিছুটা ক্ষতিপূরণমূলক সংরক্ষণ (compensatory protection) প্রদান করা যাইতে পারে। উহারা যদি নিজেরাই সংরক্ষিত না হয় তাহা হইলে অবশ্য এই ব্যবস্থা করা যাইবে না। এক সমাধান হইতে পারে, অন্য শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল বা সরঞ্জাম উৎপাদন করে যে সকল শিল্প উহাদিগকে অর্থ সাহায্যের দ্বারা সংরক্ষণ প্রদান

করা—আমদানী শুল্ক স্থাপনের দ্বারা নহে। পঞ্চমতঃ, ফিস্ক্যাল কমিশন সম্পূর্ণ, নূতন বা নিছক পরিকল্পিত শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত কিনা এ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এইরূপ শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করিবার বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধা আছে বটে তবে একাধিক ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজনও আছে। যে সকল শিল্পের প্রাথমিক পুঁজি ব্যয় (capital outlay) অত্যধিক অথচ যাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংগঠিত বৈদেশিক শিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন সেই সকল শিল্পে কারবার স্থাপনের পুর্ব্বেই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে।

ট্যারিফ কমিশন—Tariff Commission

নূতন ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণের দাবী পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৫১ সালে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হইয়াছে। এই সংস্থার নাম ট্যারিফ কমিশন (Tariff Commission)। পুর্ব্বে যে শিল্প সংরক্ষণ চাহিত তাহার দাবী পরীক্ষার জন্য একটি অস্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড গঠন করা হইত; এক্ষণে ট্যারিফ বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহার স্থলেই ট্যারিফ কমিশনকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই নূতন সংরক্ষণ নির্দ্ধারক সংস্থা শুধুই যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাই নহে, অধিকন্তু উহার ক্ষমতাও পুর্ব্বেকার ট্যারিফ বোর্ড অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক করা হইয়াছে। সরকার নির্দ্দেশ প্রদান করিলে তবেই ট্যারিফ বোর্ড কোন শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারিত কিন্তু ট্যারিফ কমিশনকে বহু ক্ষেত্রেই স্বীয় উদ্যোগেই অনুসন্ধান সুরু করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। শুধু প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের দাবীও নহে, সংরক্ষণ পাইলে যাহা গড়িয়া উঠিতে পারে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের দাবীও বিবেচনা করিবার অধিকার ট্যারিফ কমিশন লাভ করিয়াছে। এ সম্পর্কে নূতন ফিস্ক্যাল কমিশন যে সুপারিশ প্রদান করিয়াছিলেন (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এরূপ শিল্পকেও সংরক্ষণ প্রদান) ভারত সরকার তাহারই বাস্তব রূপ প্রদান করিয়াছেন। স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত সংরক্ষণ নীতির সমন্বয় সাধন করা ট্যারিফ কমিশনের পক্ষে সম্ভব হইবে। সংরক্ষণ প্রদানের অনুসন্ধান ব্যতীতও ট্যারিফ কমিশনের অন্যান্য কার্য্যগুলি হইল ডাম্পিং সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সংরক্ষিত শিল্পের দ্বারা সংরক্ষণের অপব্যবহার বিবেচনা করা, সাধারণ দামস্তর এবং জীবন যাত্রার ব্যয়ের উপর সংরক্ষণের প্রতিক্রিয়া পর্য্যালোচনা করা, কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের উপর কোন শুল্ক সুযোগের (Tariff concession) ফলাফল বিবেচনা করা ইত্যাদি। অধিকন্তু ট্যারিফ

কমিশন মধ্যে মধ্যে সংরক্ষিত কোন শিল্পের উপরে বিশেষ সর্ত্ত আরোপিত থাকিলে উহা পালিত হইতেছে কিনা তাহাও দেখিবেন।

ট্যারিফ কমিশনের সদস্য সংখ্যা অনধিক পাঁচ জন। ইহাদের মধ্যে একজন থাকিবেন চেয়ারম্যান; বর্ত্তমানে শ্রী এম্, ডি, ভাট এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত আছেন।

সারাংশ

শিল্প সংরক্ষণের নীতি—বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা হইতে দেশে উৎপাদিত সামগ্রীকে রক্ষা করিয়া দেশের শিল্পকে সাহায্য করার নাম সংরক্ষণ। ইহা দুই উপায়ে করা যায়: (১) বিদেশ হইতে আমদানী করা পণ্যের উপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া এবং (২) দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অনুযায়ী অর্থ-সাহায্য দিয়া।

প্রধানতঃ তিনটি কারণে দেশের শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয়: (১) নিজের দেশের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকা উচিত; (২) দুই একটি শিল্পের উপর নির্ভর না করিয়া বিভিন্ন শিল্পের সুসমঞ্জস প্রসার প্রয়োজন, (৩) নবজাত শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে ভবিষ্যতে উহা শক্তিশালী শিল্পে পরিণত হইবে।

বিচারমূলক সংক্ষরণ—ভারতীয় শিল্পকে কি অবস্থায় সংরক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য ১৯২১ সালে একটি ফিস্‌ক্যাল কমিশন গঠন করা হইয়াছিল। এই কমিশন অভিমত দিয়াছিলেন যে যে-শিল্পই সংরক্ষণ চাহিবে উহাকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না। যে শিল্পের ক্ষেত্রে তিনটি সর্ত্ত পুরিত হইবে উহাই সংরক্ষণ পাইবে: (১) উহার কতিপয় প্রাকৃতিক সুবিধা থাকিতে হইবে, (২) সংরক্ষণ না পাইলে উন্নত হইতে পারিবে না, (৩) ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ব্যতীতই প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

সংরক্ষণ প্রদানের এই পদ্ধতিকে বিচারমূলক সংরক্ষণ বলা হয়। ভারত সরকার এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী একাধিক শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই শিল্পগুলির মধ্যে রসায়ন, কাগজ, দিয়াশলাই, লৌহ ও ইস্পাত, তুলা এবং চিনি শিল্পই প্রধান।

বিচারমুলক সংরক্ষণের ত্রুটি—বিচারমূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি দেখা গেল। স্বাভাবিক সুবিধার দৃষ্টান্তের উপরেই সর্ব্বাধিক জোর

দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সংরক্ষণের উপযুক্ত শিল্প উহা পায় নাই। অধিকন্তু এই স্বাভাবিক সুবিধাগুলি আছে অথচ সংরক্ষণের প্রয়োজনও আছে ইহা প্রমাণ করা খুব কষ্টকর ছিল। সব থেকে বড় ত্রুটি ছিল, সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি রূপে ইহাকে ব্যবহার করা হয় নাই। নীতি হিসাবে এই ত্রুটি ছাড়া ইহাকে কার্য্যকরী করিতেও একাধিক ত্রুটি দেখা গিয়াছিল।

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর শুল্ক নীতি—যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহারা সংরক্ষণ ভোগ করিতেছিল তাহাদের সংরক্ষণ চলিতে থাকিল। ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন যুদ্ধের মধ্যে স্থাপিত শিল্প যদি ভালভাবে সংগঠিত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের পরে তাহাদিগকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালে সংরক্ষণ দিবার নূতন সূত্র নির্দ্ধারিত হইল: প্রথমতঃ, শিল্পটির পরিচালনা ভাল কিনা, দ্বিতীয়তঃ, শিল্পটির স্বাভাবিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা এবং প্রকৃত ও সম্ভাব্য খরচ বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে যে উহার ভবিষ্যতে নিজেই দাঁড়াইবার ক্ষমতা হইবে কিনা।

নূতন ফিস্‌ক্যাল কমিশন ও তাঁহাদের সুপারিশ—স্বাধীনতার পরে শিল্প সংরক্ষণের প্রশ্ন সমগ্রভাবে বিবেচনা করিবার জন্য এবং নূতন নীতি নির্দ্ধারণের জন্য একটি ফিস্‌ক্যাল কমিশন গঠন করা হইয়াছিল (১৯৪৯)। এই ফিস্‌ক্যাল কমিশন বলিলেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক পরিকল্পনার সহিত শিল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্পর্ক থাকিতে হইবে। তাঁহারা পরিকল্পিত উন্নয়ন হইবে বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং অনুমোদিত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন: (১) যুদ্ধসংক্রান্ত (২) ভিত্তিমূলক এবং (৩) অন্যান্য। প্রথম পর্য্যায়ের শিল্পকে সংরক্ষণ দিতেই হইবে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শিল্প সংরক্ষণের জন্য আবেদন করিলে সাধারণতঃ উহা দেওয়া হইবে। তৃতীয় পর্য্যায়ের শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে কিনা তাহা স্থির করা হইবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং উহার প্রকৃত বা সম্ভাব্য উৎপাদনে খরচা বিবেচনা করিয়া। এইগুলি বিবেচনা করিয়া যদি মনে হয় যে শিল্পটি ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ছাড়াই দাঁড়াইতে পারিবে তাহা হইলে উহাকে সংরক্ষণ দেওয়া যাইবে। অথবা জাতীয় স্বার্থে যদি উহাকে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন মনে হয় তাহা হইলেও দেওয়া যাইতে পারে।

ফিস্‌ক্যাল কমিশন সংরক্ষণ সম্পর্কে আরও কতিপয় অভিমত প্রদান করিলেন: (১) কাঁচামাল দেশের মধ্যেই আছে কিনা তাহার উপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত নহে; (২) বৈদেশিক বাজারকেও আপেক্ষিক সুবিধা বলিয়া

ধরিতে হইবে ; (৩) সমগ্র দেশীয় চাহিদা মিটাইবে এইরূপ সর্ত্ত প্রয়োজন নাই ; (৪) যে শিল্প সংরক্ষিত শিল্পের মাল নিজের কাঁচামালরূপে ব্যবহার করে তাহাকে সংরক্ষণ দিবার জটিলতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন ; (৫) কোন কোন অবস্থায় কাজ আরম্ভ করে নাই বা সবে আরম্ভ করিয়াছে এরূপ শিল্পকেও সংরক্ষণ দেওয়া হইবে ।

ট্যারিফ কমিশন—সংরক্ষণের দাবী পরীক্ষা করিবার জন্য ১৯৫১ সালে ৫ জন সদস্য লইয়া ট্যারিফ কমিশন নামে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার দরুণ এই কমিশন সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করিতে পারিবেন ।

উনবিংশ অধ্যায়

শিল্প ঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন

Industry : Development under the Five Year Plan

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন—Industrial Development in the Fist 5 year Plan

Q. Comment on the programme of industrial development in the first Five Year Plan. How is this programme proposed to be financed ? (B. A. 1954).

প্রয়োজন—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় পরিকল্পনা কমিশন কৃষিকার্য্য এবং উহার সহায়ক বিষয়গুলির উপরেই সমধিক জোর দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিল্পের উন্নয়নও যে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য্য ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। সেই কারণে শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনাও তাঁহারা প্রদান করিয়াছিলেন। শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা প্রদানের প্রারম্ভেই, পরিকল্পনা কমিশন বর্ত্তমান শিল্প কাঠামোর ফাঁক বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে যে শিল্প সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল তাহা মুদ্রাস্ফীতি এবং দুষ্প্রাপ্যতার অস্বাভাবিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল; সেই কারণে, উৎপাদনের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান, উৎপাদনের পরিধি, কাঁচামাল প্রাপ্তির সুবিধা—এই সকল দীর্ঘকালীন বিষয়গুলির দ্বারা শিল্প সম্প্রসারণের গতি বা প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয় নাই। পুঁজির ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর, উহা পূরণ করিতে এবং নূতন কলকব্জার প্রয়োজন মিটাইতে বহু সময় লাগিবে। অধিকন্তু, এযাবৎ ভিত্তিমূলক পুঁজি সামগ্রীর উৎপাদক শিল্প অবহেলিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছিলেন "এই সকল ফাঁক এবং গলদ যথাসম্ভব পূরণ করা এবং এই অংশের ক্রমবর্দ্ধমান সম্প্রসারণের ভিত্তিরূপে ক্রিয়া করিবে এরূপ উন্নয়নের উদ্যোগ করা—ইহাই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।"

অগ্রাধিকার তালিকা (Scheme of Priority)—ঐ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই কমিশন প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল প্রকারের সমস্ত শিল্পকেই একই সঙ্গে সম্প্রসারণের আয়োজন করা যায় না—সেই জন্য কমিশন, কোন্ শিল্পের আগে এবং কোন্ শিল্পের পরে সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টা করা হইবে তাহার কর্ম্মসূচী রচনা করিয়াছিলেন :

(১) পরিকল্পনা কালের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এইরূপ কতিপয় শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে অধিকতর পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা। ইহার মধ্যে উৎপাদক বস্তু উৎপাদনকারী শিল্পও (producer goods industries) আছে যথা পাট ও প্লাইউড্ এবং ভোগবস্তু উৎপাদনকারী শিল্পও আছে, যথা সুতীবস্ত্র, চিনি, সাবান, বনস্পতি, রং ও বার্ণিশ।

(২) লৌহ ও ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, সার, ভারী রসায়ন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজিবস্তু ও উৎপাদক বস্তুর শিল্পে (capital goods and producer goods industries) উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ (expansion of capacity) করা।

(৩) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পুঁজি-ব্যয় পুর্ব্বেই কিছুটা করা হইয়া গিয়াছে সেগুলির প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করা।

(৪) সমগ্র শিল্প কাঠামোকে শক্তি প্রদান করে এরূপ নূতন কারখানা স্থাপন করা।

এই অগ্রাধিকার কার্যক্রমে, বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণতর ব্যবহার হইতেই (Fuller utilisation of existing capacity) ভোগ্য সামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির আয়োজন করা হইয়াছিল।

মিশ্র আর্থিক কাঠামো

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মিশ্র আর্থিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়াই শিল্পোন্নয়নের কর্ম্মসূচী রচনা করা হইয়াছে; অর্থাৎ রাষ্ট্র উদ্যোগ (State enterprise) এবং ব্যক্তিগত বা বেসরকারী উদ্যোগ (Private enterprise)—ইহাদের সংযুক্ত প্রয়াসে আর্থিক কাঠামো গঠনের আয়োজন করা হইয়াছে।

সরকারী অংশ

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহ যে সকল শিল্প স্থাপন করিবেন বলিয়া পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল উহাদের জন্য পাঁচ বৎসরে ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবার কথা ছিল। ইহার মধ্যে বৃহৎ অংশই (৮৩ কোটি টাকা) কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সম্পাদিত শিল্প প্রচেষ্টার জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল। রাজ্য সরকার সমূহ যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইবার কথা ছিল উহাদের জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল ১১ কোটি টাকা; তবে ইহার মধ্যে ৪·৮ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ হিসাবে প্রদান করিবেন বলিয়া ব্যবস্থা ছিল। সরকারী উদ্যোগভুক্ত কতিপয় শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী পুঁজির অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করাও হইয়াছিল। সরকারী উদ্যোগে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছিল তাহাদের কারবার সংগঠন সম্পর্কেও পরিকল্পনা কমিশন চিন্তা করিয়াছিলেন।

কমিশন সুপারিশ করিয়াছিলেন যে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যৌথ পুঁজি প্রতিষ্ঠানের আদর্শে সংগঠিত করিতে হইবে এবং ঠিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে ইহাদিগকে পরিচালিত করা হইবে—আভ্যন্তরীণ পরিচালনার ভার থাকিবে পরিচালক সংসদের উপর।

বেসরকারী অংশ

শিল্প কাঠামোর বৃহৎ অংশেই প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব বেসরকারী প্রচেষ্টার উপরেই অর্পণ করা হইয়াছিল। এই বেসরকারী অংশের ক্ষেত্রে বিয়াল্লিশটি শিল্পের জন্য সম্প্রসারণের কর্ম্মসূচী রচনা করা হইয়াছিল। এই ৪২টি শিল্প সমগ্র শিল্পকাঠামোর প্রকাণ্ড অংশই জুড়িয়া রহিয়াছিল—কৃষিযন্ত্র হইতে সুরু করিয়া পশম বস্ত্র পর্য্যন্ত।

অর্থ ব্যবস্থা--সরকারী এবং বেসরকারী,—উভয় পর্য্যায়ে সকল প্রকার শিল্প সমূহের জন্য মোট যত অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ লৌহ, ইস্পাত এবং এ্যালুমিনিয়ম শিল্পের জন্য, ১৬ ভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য এবং ৮ ভাগ ভারী রসায়ন, সার এবং ঔষধের জন্য ধরা হইয়াছিল। অন্যান্য সকল শিল্পের জন্য অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগ ধরা হইয়াছিল—কাগজ এবং বোর্ডের জন্য ধরা হইয়াছিল শতকরা ৯ভাগ,বয়ন শিল্পগুলির জন্য (সূতী, পাট, পশম এবং রেয়ন) শতকরা ৬ ভাগ এবং সিমেণ্টের জন্য শতকরা ৫ ভাগ।

সরকারী শিল্পগুলির জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৯৪ কোটি টাকা এবং বেসরকারী শিল্পগুলির জন্য ২৩৩ কোটি টাকা; অর্থাৎ শিল্প সম্প্রসারণ পরিকল্পনার জন্য ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৩২৭ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া শিল্পের যন্ত্রপাতির পরিবর্ত্তনের জন্য এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল। সকল প্রয়োজন ধরিয়া শিল্পের জন্য এই পাঁচ বৎসরে মোট ব্যয় হইবে ৭০৭ কোটি টাকা। এই অর্থ সংগ্রহ করিবার পদ্ধতিও পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন—৭৪ কোটি টাকা সরকারী অংশের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হইতে, ৫৩৩ কোটি টাকা বেসরকারী শিল্পের সঞ্চতি হইতে এবং ১০০ কোটি টাকা বৈদেশিক বিনিয়োগ হইতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল।

কতিপয় বাস্তব কর্ম্ম প্রস্তাব—শিল্পের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন কতিপয় কর্ম্মপ্রস্তাব প্রদান করিয়াছিলেন:

(১) শিল্প সম্প্রসারণের নীতির প্রধান উদ্দেশ্যই হইবে যতখানি পুঁজি পাওয়া যাইবে তাহা যে-সকল দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে সেইদিকে প্রবাহিত করা।

(২) শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা (capital issue) সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন বটে কিন্তু ইহার দ্বারা নিছক নেতিমূলক উদ্দেশ্য (Negative purpose) সাধিত হইয়াছে ; সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় পথে পুঁজি প্রবাহিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা ইহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই। এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য কতিপয় সুনির্দ্দিষ্ট আর্থিক এবং উৎসাহ-প্রদায়ী ব্যবস্থা প্রয়োজন। (৩) বৈদেশিক পুঁজির গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে এবং সেই কারণেই উহা যাচ্ঞা করা প্রয়োজন কিন্তু শুধু সেই সকল ক্ষেত্রেই বৈদেশিক পুঁজিকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে যে সকল ক্ষেত্রে নূতন ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থা প্রয়োজন অথবা বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষত্বশীল নৈপুণ্য প্রয়োজন। (৪) উপ-উৎপাদনগুলিকে (Byeproducts) যথাযথ কাজে লাগাইবার আয়োজন করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হইবে বিবিধ বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং গবেষণা পরিচালনা করা। (৫) কাঁচা মাল, উৎপাদক বস্তু এবং তৈয়ারী সামগ্রীর মান নির্দ্ধারণ (standardisation) করা প্রয়োজন—যাহাতে উৎপাদনকারী এবং ভোগকারীগণ নির্দ্দিষ্ট গুণের সামগ্রী পাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতিতে অগ্রগতি—Progress of Industrial Development during the First Plan

প্রথম পরিকল্পনাকালে কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে বেশ সন্তোষজনক অগ্রগতি হইয়াছে, কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হইয়াছে তবে ততটা সন্তোষজনক নহে এবং আরও কতকগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে তেমন কিছু অগ্রগতি লাভ সম্ভব হয় নাই।

সরকারী শিল্প (Public Sector)—সরকারী শিল্পাংশে যে শিল্পগুলির ক্ষেত্রে উন্নতি পরিকল্পনা কমিশন সন্তোষজনক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন সেগুলি হইল সিন্ধ্রী সার উৎপাদন কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, ভারতীয় টেলিফোন শিল্প, রেলের যাত্রী কাম্‌রা নির্ম্মাণ কারখানা, বৈদ্যুতিক তার কারখানা এবং পেনিসিলিন কারখানা। এই শিল্পগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা এবং উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের দ্বারা উন্নতি সুচিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের দ্বারা স্থাপিত কয়েকটি শিল্পে আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নাই। ইহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ইহাদের দ্বারা উৎপাদন আরম্ভ হইতে যতটা সময় লাগিবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় লাগিয়াছে। এইগুলি হইল মেশিন টুল কারখানা, যুক্তপ্রদেশের সিমেণ্ট কারখানা, মধ্যপ্রদেশে কাগজের কারখানা (Nepa Factory) এবং বিহারের সুপার ফস্‌ফেট্‌ কারখানা।

লৌহ এবং ইস্পাত নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা একটি

কারখানা নির্ম্মাণের কথা ছিল এবং ইহাতে ৩২ লক্ষ টন পিগ্ আয়রণ উৎপাদনের আশা ছিল। ইহা ছাড়া মহীশূর লৌহ এবং ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ ঘটাইয়া আরও ৬০ হাজার টন তৈরী ইস্পাত পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল—প্রথম পরিকল্পনার মধ্যে এই আশা ফলবতী হয় নাই। তবে তিনটি ইস্পাত কারখানায় প্রাথমিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে দ্রুত উন্নতির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনাকালের শেষ দিকে ভারী বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপনের কথা ছিল, কিন্তু প্রাথমিক হিসাব নিকাশ এবং সরকারী ও বেসরকারী অংশের মধ্যে ভাগাভাগির কার্য্যেই অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে এবং বিশেষ কিছু করা হইয়া উঠে নাই।

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী শিল্পগুলির সম্প্রসারণের জন্য মোট ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ের কথা ছিল, কিন্তু কমিশন বলেন যে উহার মধ্যে ৫৭ কোটি টাকা মাত্র ব্যয় করা গিয়াছে।

বেসরকারী অংশ (Private Sector)—নূতন কারখানা স্থাপনের জন্য, পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলাইবার জন্য এবং মোটামুটি আধুনিকীকরণের জন্য বেসরকারী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ৪৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাইবে বলিয়া প্রথম পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু কমিশন হিসাব করিয়াছেন যে বেসরকারী অংশে স্থায়ী পুঁজিতে যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহার মূল্য ৩৪০ কোটি টাকা হইতে পারে। ইহার মধ্যে সব থেকে বেশী বিনিয়োগ করা হইয়াছে সুতী বস্ত্র শিল্পে (৮০ কোটি টাকা), পেট্রোল সংশোধন শিল্পে (৪৫ কোটি টাকা), লৌহ এবং ইস্পাত শিল্পে (৪৯ কোটি টাকা) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে (২৫ কোটি টাকা)। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে যে-সকল শিল্পে খুব বেশী প্রাথমিক পুঁজি বিনিয়োগ প্রয়োজন ছিল (Heavy Capital Investment) অথচ লাভের পরিমাণ ছিল কম সেই সকল শিল্পতেই অনুমিত বিনিয়োগ অপেক্ষা কম বিনিয়োগ ঘটিয়াছে। তবে নূতন কারখানা স্থাপনে এবং পুরাতন কারখানা সম্প্রসারণে যে মোট বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহা প্রায় ২৩৩ কোটি টাকার সমান হইয়াছে ; অবশিষ্ট ২৩০ কোটি টাকা ধরা ছিল পুরাতন যন্ত্রপাতি বদলাইবার জন্য এবং আধুনিকীকরণের জন্য—এইদিকে ততটা অগ্রসর হয় নাই।

বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের স্তর (Production levels of different Industries)—প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার করিয়া যাহতে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তাহার উপর। এই উদ্দেশ্য মোটামুটি সাধিত হইয়াছে এবং এই পদ্ধতি অবলম্বনে

কাপড়ের কলগুলিতে, চিনির কারখানায় এবং বনস্পতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অব্যবহৃত ক্ষমতাকে ব্যবহার করিয়া এবং ক্ষমতার যথেষ্ট যোগ সাধন করিয়া কয়েকটি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ছিল। এই শিল্পগুলির কয়েকটিতে অল্প বিস্তর উৎপাদনের তাগ্ অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে। এই শিল্পগুলি হইল সিমেণ্ট, কাগজ, সোডা এ্যাস্, কস্টিক্ সোডা, রেয়ন, বাইসাইকেল ইত্যাদি।

কতকগুলি শিল্পে বিনিয়োগের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী কার্য্য না হওয়ায় উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে, যথা এ্যালুমিনিয়াম এবং নাইট্রোজেন জাতীয় সার।

কযেকজাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আভ্যন্তরীণ চাহিদা না থাকিবার জন্যই উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে—যথা, ডিজেল ইঞ্জিন, রেডিও, ব্যাটারী, লণ্ঠন, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি।

কতকগুলি শিল্পে বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া যাওয়ার দরুণ অথবা বৈদেশিক রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল শিল্প তাহাদের চাহিদা কমাইয়া দিবার দরুণ তাগ অনুযায়ী উৎপাদন হইতে পারে নাই, যথা পাট শিল্প।

যন্ত্রনির্ম্মাণ

শিল্পের কারখানা এবং যন্ত্র নির্ম্মাণে ও পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে প্রথম পরিকল্পনাকালে মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জ্জিত হইয়াছে। ১৯৪৬-৫০ সালের মধ্যে এদেশে বয়নযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল ৪ কোটি টাকার, ১৯৫১-৫৬ সালের মধ্যে ইহা উৎপাদিত হইয়াছে ১১ কোটি টাকার মতন। সিমেণ্ট উৎপাদনের যন্ত্রের ক্ষেত্রেও, কোন কোন অংশ উৎপাদনের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। পাট কলের যন্ত্রের ক্ষেত্রে, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়, সুতা তৈয়ারীর যন্ত্রের উৎপাদন সম্প্রতি সুরু হইয়াছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক মটর এবং ট্রান্সফর্ম্মারের উৎপাদন বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের উৎপাদন হইয়াছিল, ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদন হইয়াছে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার। বেসরকারী ক্ষেত্রে রেলইঞ্জিন নির্ম্মাণ ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫০টি হইবে বলিয়া আশা করা যায়, ইহার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ইহার উৎপাদন কিছুই ছিল না বলা চলে। ১৯৫০-৫১ সালে দেশীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ শিল্পের উৎপাদনের মূল্য ছিল ৪০ লক্ষ টাকা, প্রথম পরিকল্পনার শেষে উহা এক কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্র এক্ষণে সম্প্রসারণের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়াছে বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহা বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণের মত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে।

***দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের কর্ম্মসূচী*—Programme of Industrial Development in the Second Plan**

এদেশে বৃহদায়তনের শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতির যুগরূপেই প্রথম পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা হইয়াছিল। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই অনেক কিছু প্রস্তুতি-মূলক কার্য্য করিতে হইবে—সুদূর প্রসারী বিভিন্ন প্রকার সমস্যা অধ্যয়ন করিতে হয়। সরকারী এবং বেসরকারী অংশের বিভিন্ন প্রকার শিল্পের মধ্যে (যে সকল শিল্প দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে) এই প্রস্তুতিমূলক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ; সুতরাং আশা করা যায় যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে।

শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে প্রধান দুইটি বিবেচ্য বিষয় হইল, (ক) শিল্পনীতি এবং (খ) শিল্পোন্নতির অগ্রাধিকার বিন্যাস।

(১) ***শিল্পনীতি*** **(Industrial Policy)**—বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিয়া সরকার ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে তাঁহাদের নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন।*

(২) ***শিল্পোন্নতির অগ্রাধিকার বিন্যাস***—এই শিল্পনীতির কাঠামোর মধ্যে শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণের জন্য নিম্নরূপ অগ্রাধিকার বিন্যাস প্রয়োজন :

(ক) লৌহ ও ইস্পাত এবং ভারী রসায়ন (নাইট্রোজেন জাতীয় সার সমেত)—ইহাদের অধিক উৎপাদন করিতেই হইবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এবং যন্ত্র নির্ম্মাণ শিল্পের উন্নয়ন করিতে হইবে। ইহার মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণ সব থেকে বেশী প্রয়োজন।

(খ) এ্যালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট, রসায়ন মণ্ড, ফসফেট জাতীয় সার প্রভৃতি উন্নয়নমূলক বস্তুউৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি (expansion of capacity)। ইহাদের মধ্যে সিমেণ্টের গুরুত্ব সব থেকে বেশী—উন্নয়নমূলক সামগ্রীরূপে ইহার গুরুত্ব শুধু লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পরেই।

(গ) পাট, তুলা এবং চিনি প্রভৃতি যে সকল জাতীয় শিল্প পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে সেগুলির আধুনিকীকরণ এবং নূতন সরঞ্জাম সৃষ্টি। প্রথম পরিকল্পনাকালে পাট এবং কাপড়ের কলের আধুনিকীকরণ এবং নূতন সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠার কার্য্যে (modernisation and re-equipment) কিছুটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও অনেক কিছুই করিবার রহিয়াছে।

---

*উপরে ২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(ঘ) বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতাকে আরও বেশী করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে—যে ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে অনেক ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। পরিকল্পনার মূল কথাই হইল যে দুষ্প্রাপ্য পুঁজি সামগ্রীর সাশ্রয় করিতে হইবে এবং অলস উৎপাদন ক্ষমতাকে কাজে লাগাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(ঙ) ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ করিতে হইবে। এইরূপ সম্প্রসারণের প্রয়োজন এবং অবকাশ যেখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে সেখানেই প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণে অনুমতি ও উৎসাহ দিতে হইবে।

সরকারী অংশের কর্ম্ম

(১) ***লৌহ ও ইস্পাত*** (**Iron and steel**)—দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে সরকার কর্ত্তৃক তিনটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইবে; ইহাদের প্রত্যেকটিতে ১০ লক্ষ টন ইঙ্গট (ingot) উৎপাদন হইতে পারিবে এবং ইহাদের একটিতে ফাউণ্ড্রি স্তরের অবিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড উৎপাদন হইতে পারিবে ৩½ লক্ষ টন। রূঢ়কেল্লায় যে কারখানা স্থাপিত হইবে উহার জন্য পাঁচ বৎসরে (১৯৫৬-৬১) ১২৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে; এই কারখানায় ৭ লক্ষ ২০ হাজার টন ইস্পাত উৎপাদিত হইবে। দ্বিতীয় কারখানা স্থাপিত হইবে মধ্যপ্রদেশের ভিলাই নামক স্থানে। ইহার জন্য ব্যয় হইবে অনুমান ১১০ কোটি টাকা এবং ইহাতে ৭,৭০,০০০ টন বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপাদন হইবে। তৃতীয় কারখানা স্থাপিত হইবে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরে—ইহার জন্য আনুমানিক ব্যয় হইবে ১১৫ কোটি টাকা। ইহাতে বৎসরে ৭,৯০,০০০ টন হাল্কা এবং মাঝারি ধরণের ইস্পাত ও বিলেট উৎপাদিত হইবে।

(২) ***ভারী ফাউণ্ড্রি, ফর্জ্জ ও নির্ম্মাণ কারখানা এবং শিল্পযন্ত্র নির্ম্মাণের সুবিধা*** (**Heavy Foundries, Forges and Structural Shops and Facilities for Fabrication of industrial machinery**)—চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্ম্মাণ কারখানায় বৎসরে এক্ষণে ১২০টি ইঞ্জিন নির্ম্মাণ হইয়া থাকে—উহা যাহাতে ৩০০-তে বর্দ্ধিত হয় তাহার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ভারী ফাউণ্ড্রি, ফর্জ্জ কারখানা এবং ভারী নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছে; ভারী যন্ত্র, যন্ত্র নির্ম্মাণ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য এইগুলি অত্যাবশ্যক। অন্যান্য যে সকল ভারী যন্ত্র শিল্পের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা করা হইবে সেগুলি হইল: ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্ম্মাণ, হিন্দুস্থান মেশিন টুল্‌স্-এর সম্প্রসারণ, জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় শিল্প যন্ত্র ও যন্ত্র নির্ম্মাণের যন্ত্র উৎপাদন।

(৩) ***দক্ষিণ আর্কট লিগ্‌নাইট পরিকল্পনা*** (**South Arcot Lignite Project**)—দক্ষিণ ভারতে কয়লাখনি বিরল ; সেই কারণে নীভেলি নামকস্থানে লিগ্‌নাইট ব্যবহারের জন্য "দক্ষিণ আর্কট লিগ্‌নাইট প্রোজেক্ট" নামে একটি বহু উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা অনুষ্ঠিত হইতেছে। লিগনাইট হইল অপরিপক্ক কয়লা—অর্থাৎ যাহা পুরাপুরি কয়লায় এখনও পরিণত হয় নাই। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি বৎসর ৩৫ লক্ষ টন লিগ্‌নাইট উৎপাদিত হইবে।

(৪) ***সার উৎপাদন*** (**Fertilizer Production**)—প্রথম পরিকল্পনাকালে সিন্ধ্রিতে সার উৎপাদন কারখানার সম্প্রসারণের দ্বারা বাড়তি ৪৭,০০০ টন নাইট্রোজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, আরও দুইটি সার উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হইবে, একটি নাঙ্গলে আরেকটি রুঢ়কেল্লায়। নাঙ্গলে বৎসরে ৭০,০০০ টন এবং রুঢ়কেল্লায় ৮০,০০০ টন নাইট্রোজেন উৎপাদন হইতে পারিবে। নাঙ্গল কারখানার জন্য ২২ কোটি টাকা ও রুঢ়কেল্লার জন্য ৮ কোটি টাকা আপাততঃ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

(৫) ***ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প*** (**Heavy Engineering Industries**)—হিন্দুস্থান জাহাজ নির্ম্মাণকেন্দ্রের সম্প্রসারণের ফলে বিশাখপত্তনমে জাহাজ নির্ম্মাণের হার প্রাচীন ধরনের জাহাজ নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে ৬টিতে এবং আধুনিক ধরণের জাহাজ নির্ম্মাণে ৪টিতে বৃদ্ধি করা হইবে। বিশাখপত্তনমে একটি শুষ্ক ডক্ নির্ম্মিত হইবে এবং দ্বিতীয় একটি জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক কার্য্যের নিমিত্ত ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। একটি ভারী নৌ চলাচলের ডিজেল ইঞ্জিন নির্ম্মাণের পরিকল্পনাও করা হইতেছে।

রেলপথের চলমান সরঞ্জাম (rolling stock) নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন কারখানার সম্প্রসারণ ছাড়াও তিনটি কার্য্য করা হইবে : পেরাম্বুরে যাত্রী কামরা নির্ম্মাণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা, একটি নূতন মিটারগেজ যাত্রী কামরা নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন করা, এবং খুচরা পার্টস তৈরীর জন্য দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা স্থাপন করা। ইহাদের জন্য মোট ব্যয় হইবে ১৭ কোটি টাকা।

(৬) ***অন্যান্য***—অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগ প্রয়োজন হইবে এরূপ কতিপয় কর্ম্মসূচীও কেন্দ্রীয় সরকারের রহিয়াছে : (১) এন্টিবাইয়টিক কারখানা এবং ডিডিটি কারখানার সম্প্রসারণ, (২) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে দ্বিতীয় ডিডিটি কারখানা স্থাপন, (৩) হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌স লিঃ, ন্যাশনাল ইন্‌সট্রুমেণ্টস ফ্যাক্টরী এবং ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর সম্প্রসারণ ; (৪) নিরাপত্তা কাগজ নির্ম্মাণের কল স্থাপন।

রাজ্য সরকারগুলির শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে আছে মহীশুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ, দুর্গাপুরে কয়লাচুল্লী কারখানা (coke-oven plan), মহীশুর এবং বিহারে বৈদ্যুতিক ইনসিউলেটর নির্ম্মাণ, হায়দ্রাবাদে প্রাগ টুল ফ্যাক্টরীর পুনর্গঠন, উত্তরপ্রদেশে সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীর সম্প্রসারণ এবং বিহার সুপারফসফেট্ ফ্যাক্টরী।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প পরিকল্পনাগুলির জন্য, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, নূতন বিনিয়োগ হইবে প্রায় ৫০২ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের শিল্প পরিকল্পনায় ঐ সময়ে বিনিয়োগ ধরা হইয়াছে ৩২ কোটি টাকা।

বেসরকারী অংশের উন্নয়ন

বেসরকারী অংশেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে; এই শিল্পের উন্নতির জন্য ১১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধরা হইয়াছে এবং বেসরকারী অংশের ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন বর্ত্তমানের ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টন হইতে ২৩ লক্ষ টনে বর্দ্ধিত হইবে। অন্যান্য ধাতু শিল্পের মধ্যে, উৎপাদন ক্ষমতার ভাগ্ ধরা হইয়াছে এ্যালুমিনিয়ামের জন্য ৩০,০০০ টন এবং ফেরো ম্যাঙ্গনীজ্ এর জন্য ১,৭২,০০০ টন। সিমেণ্ট এবং রিফ্র্যাক্টরী শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টনে এবং ১০ লক্ষ টনে বর্দ্ধিত করা হইবে। বেসরকারী অংশের উন্নয়ন কর্ম্মসূচীতেও ভারী ও হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। মটরযান, রেলপথের চলমান সরঞ্জাম, কাষ্টিং ও ফর্জ্জিং, বাইসাইকেল, সেলাইকল, মটর ও ট্রান্সফর্ম্মার প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ উৎপাদন স্তর ধরা হইয়াছে। টাটা লোকোমটিভ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী কর্ত্তৃক বর্ত্তমানের ১০০টি ইঞ্জিনের পরিবর্ত্তে ২০০টি ইঞ্জিন যাহাতে নির্ম্মিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এক কোটি টাকা ব্যয়ের হিসাব করা হইয়াছে। মটরযান উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা হইবে। ১৯৬০-৬১ সালে ৫৭০০০ মটরযান নির্ম্মিত হইবে, তবে ইহার মধ্যে ৪০,০০০ হইবে ট্রাক।

বেসরকারী অংশের পরিকল্পনায় শিল্পযন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের জন্য উৎপাদনের ভাগ্ সুপারিশ করা হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি হইল, কাপড়ের কলের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক মটর ও ট্রান্সফর্ম্মার। এই সকল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অধিকাংশতেই বৈদেশিক যন্ত্রকৌশলগত সহায়তা প্রয়োজন; এইরূপ সহায়তা লাভের জন্য আয়োজন করা হইতেছে।

বেসরকারী অংশে রসায়ন শিল্প (Chemical industries) উন্নয়নেরও আয়োজন করা হইতেছে। এই কর্ম্মসূচীর মধ্যে সোডা এ্যাশ, কষ্টিক সোডা, ফসফেট জাতীয় সার প্রভৃতি বস্তুকে গুরুত্বপুর্ণ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে এবং উৎপাদনে বৈচিত্র্য বিধান করা হইবে।

বিশাখপত্তনমে ক্যালটেক্স তৈলশোধনাগার নির্ম্মাণ ১৯৫৭ সালে শেষ হইবে ; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহার দরুণ ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। শক্তি ও শিল্প এ্যালকহলের (Power and industrial alcohol) প্রভূত বৃদ্ধির আয়োজন করা হইতেছে। ভোগসামগ্রীর ক্ষেত্রে কাগজ এবং বোর্ড-এর উৎপাদন দ্বিগুণ কবিবার ব্যবস্থা হইবে। চিনির উৎপাদন বর্ত্তমানের ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন হইতে ১৯৬০-৬১ সালে ২২½ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পাইবে ; ইহার মধ্যে ৩৫,০০০ টন উৎপাদিত হইবে সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত চিনির কলের দ্বারা। বনস্পতি তৈলের উৎপাদন ১৭ লক্ষ হইতে ২১ লক্ষ টনে বর্দ্ধিত করা হইবে। কাপড় এবং সুতার উৎপাদন যথাক্রমে ৮৫০ কোটি গজ ও ১৯৫ কোটি পাউণ্ড হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ডাইষ্টাফ ইণ্টারমিডিয়েট বস্তুর উৎপাদনের যে ব্যবস্থা করা হইতেছে উহার দ্বারা ঔষধ শিল্প যথেষ্ট সহায়তা পাইবে কারণ উহার দ্বারা এই শিল্পের অনেক কাঁচামাল তৈয়ারী হইবে। ঔষধ উৎপাদনের কারখানাগুলি নিছক প্রসেসিং কার্য্য না করিয়া যথার্থ উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এই শিল্পে তিন কোটি টাকা লগ্নী করা হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছেন।

জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন—National Industrial Development Corporation

ভারত সরকার সম্প্রতি "জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন" নামে একটি বিশেষ সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে ইহা স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল ভারতের শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা ও সহায়তা করা। ইহার মেমরেণ্ডাম অফ এসোশিয়েশনে ইহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(১) ইহা পুঁজি-সামগ্রী বা ভোগ-সামগ্রী যে কোন প্রকার বস্তু উৎপাদনের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারিবে। (২) শিল্প উন্নয়নের জন্য ইহা কার্য্যক্রম (Scheme) রচনা ও কার্য্যকরী করিতে পারিবে। (৩) সরকারী বা বেসরকারী যে কোন শিল্পকে ইহা যে কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে —পুঁজি প্রদান করিয়া বা ঋণ প্রদান করিয়া অথবা অন্য কোন সঙ্গতি প্রদান করিয়া। (৪) শিল্প স্থাপনের জন্য কোম্পানী গঠিত হইলে ঐ কোম্পানী গঠনে ইহা সাহায্য করিতে পারে। (৫) কোন কোম্পানীর জন্য ইহা পুঁজি অথবা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে অথবা এইরূপ কোম্পানীর শেয়ারে অগ্র-প্রতিশ্রুতি (underwrite) প্রদান করিতে পারিবে। (৬) পুঁজি বিনিয়োগের নূতন অবকাশ ইহা সন্ধান করিতে পারিবে। (৭) ইহা খনিজ সামগ্রী উত্তোলনের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং খনির সন্ধানে জমি পরীক্ষা করিতে পারে। (৮)

সকল প্রকার জনস্বার্থ সম্পর্কিত (public works) কার্য্য ইহা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারে—যথা জলপথ, রেলপথ, ট্রামপথ, টেলিফোন ইত্যাদি। (৯) কোন কারবার বা শিল্পের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ইহা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে। (১০) কৃষিযন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রের উৎপাদনকারীরূপেও ইহা কার্য্য করিতে পারিবে।

যে সকল শিল্পের উন্নয়ন দায়িত্ব এই কর্পোরেশনের উপর দেওয়া হইয়াছে সেগুলি হইল—ফাউণ্ড্রি প্রোজেক্ট, ইস্পাত, নির্ম্মাণক (Structurals), ডাইষ্টাফ ইণ্টারমিডিয়েট, কাষ্ঠ মণ্ড, কার্ব্বোনজাত কাল রং, পাইরাইট হইতে তৈয়ারী সালফার, মুদ্রাযন্ত্র, এয়ার কম্প্রেশর এবং রিফ্র্যাক্টরী।

সারাংশ

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন—প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপরে সব থেকে বেশী গুরুত্ব দিলেও শিল্পোন্নয়নের কার্য্যক্রমকেও নগণ্য স্থান দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরে অস্বাভাবিক অবস্থায় কৃত্রিম উৎসাহে শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছিল, স্থায়ী ভিত্তিতে নহে। সেইজন্য শিল্প কাঠামোয় অনেক ফাঁক ছিল। ১ম পরিকল্পনায় এই ফাঁক পুরণের কথা বলা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনায় চারি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া অগ্রাধিকার তালিকা রচনা করা হইয়াছিল—প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার অধিকতর ব্যবহার, উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ, পুঁজি ব্যয় হইয়াছে এরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করণ, সর্ব্বশেষে নূতন কারখানা স্থাপন। মিশ্র আর্থিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করিয়াই প্রথম পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ***সরকারী শিল্পের*** জন্য ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছিল। বেসরকারী ক্ষেত্রে ৪২টি শিল্পের উন্নয়ন কর্ম্মসূচী রচিত হইয়াছিল। ***বেসরকারী শিল্পে*** ব্যয় ধরা হইয়াছিল ২৩৩ কোটি টাকা; ইহা ছাড়া যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন, চল্‌তি পুঁজি ইত্যাদিও ছিল, সর্ব্বসমেত ৭০৭ কোটি টাকা খরচা ধরা হইয়াছিল (৭৪ কোটি সরকারী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, ৫৩৩ কোটি বেসরকারী শিল্পের সঙ্গতি এবং ১০০ কোটি বৈদেশিক বিনিয়োগ)। ইহা ছাড়া, দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কতিপয় বাস্তব কর্ম্মপ্রস্তাবও প্রদান করিয়াছিলেন যথা, সব থেকে বেশী অগ্রাধিকারের দিকে পুঁজি প্রবাহিত করা, আর্থিক ও উৎসাহপ্রদায়ী ব্যবস্থার দ্বারা বাঞ্ছিত দিকে পুঁজি বিনিয়োগ প্রণোদিত করা ইত্যাদি।

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি—সরকারী অংশে কতিপয় শিল্পে সন্তোষজনক অগ্রগতি হইয়াছে—যথা সার উৎপাদন কারখানা (সিন্দ্রি), ইঞ্জিন কারখানা (চিত্তরঞ্জন), রেলযাত্রী কামরা নির্ম্মাণ (পেরাম্বুর) ইত্যাদি। কয়েকটি শিল্পে আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নাই,—যথা মেসিনটুল কারখানা, সিমেণ্ট কারখানা

ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৩২ লক্ষ টন পিগ্ আয়রণ এবং মহীশূরে আরও ৬২ হাজার টন তৈরী ইস্পাত উৎপাদনের কথা ছিল, উহা হয় নাই। তবে তিনটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণের প্রাথমিক কার্য্য হইয়াছিল। ভারী বৈদ্যুতিক কারখানা নির্মাণেও বিশেষ অগ্রগতি হয় নাই। সরকারী অংশের জন্য ১০১ কোটি টাকা ধার্য্য ব্যয়ের মধ্যে ৫৭ কোটি মাত্র ব্যয় হইয়াছিল।

বেসরকারী অংশে ৪৬৩ কোটি টাকার মত ধার্য্য বিনিয়োগের মধ্যে প্রকৃত বিনিয়োগ হইয়াছে ৩৪০ কোটি; সবথেকে বেশী বিনিযোগ হইয়াছে বস্ত্র শিল্পে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাইবার উপর। এই পদ্ধতিতে উপকার পাওয়া গিয়াছে যথা চিনি উৎপাদনে। অব্যবহৃত ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া এবং উৎপাদন ক্ষমতার যোগসাধন করিয়া কতিপয় শিল্পে তাগ্ অনুযায়ী উৎপাদনে বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে যথা সিমেণ্ট, কাগজ ইত্যাদি। কতিপয় শিল্পে উৎপাদন কম হইয়াছে যথা এ্যালুমিনিয়াম (বিনিয়োগের কর্মসূচী অনুযায়ী কার্য্য না হওয়ায়)। রেডিও, ডিজেল ইঞ্জিন প্রভৃতি সামগ্রী উৎপাদনে আভ্যন্তরীণ চাহিদার অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে। পাট শিল্পে বৈদেশিক চাহিদা কম হইবার দরুণ তাগ্-অনুযায়ী উৎপাদন হইতে পারে নাই।

যন্ত্রনির্ম্মাণ—শিল্প যন্ত্র নির্ম্মাণে এবং পুঁজি সামগ্রী উৎপাদনে ১ম পরিকল্পনাকালে কিছুটা সুফল পাওয়া গিয়াছে। বয়নযন্ত্র, সিমেণ্ট তৈয়ারীর যন্ত্র, বৈদ্যুতিক মটর ও ট্রান্সফর্ম্মার এবং রেল-ইঞ্জিন—ইহাদের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হইয়াছে। পাটের সুতা তৈয়ারীর যন্ত্র উৎপাদন সুরু হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্ম্মসূচী—প্রথম পরিকল্পনাকে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিমূলক কার্য্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং এই প্রস্তুতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই ধরা যায়। শিল্প উন্নতির জন্য প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট শিল্পনীতি এবং শিল্প উন্নতির অগ্রাধিকার বিন্যাস। সরকার ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই শিল্পনীতির কাঠামোর মধ্যে ২য় পরিকল্পনায় প্রদত্ত অগ্রাধিকার বিন্যাস অনুযায়ী শিল্পোন্নয়নের কর্ম্মসূচী রূপায়িত করা হইবে। এই অগ্রাধিকার বিন্যাস হইল: প্রথম, লৌহ ইস্পাত এবং ভারী রসায়নের অধিক উৎপাদন ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ও যন্ত্র নির্ম্মাণ শিল্পের উন্নয়ন; দ্বিতীয়, এ্যালুমিনিয়াম, সিমেণ্ট প্রভৃতি উন্নয়নমূলক বস্তু উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি; তৃতীয়, পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিল্পের আধুনিকী করণ; চতুর্থ, উৎপাদনের ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে ফাঁক পূরণ; পঞ্চম, ভোগ সামগ্রীর উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ।

সরকারী অংশের কর্ম্মসূচী—সরকারী অংশের কর্ম্মসূচী অনুযায়ী

যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ করা হইবে সেগুলি হইল লৌহ ও ইস্পাত (তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়), ভারী ফাউণ্ড্রি, ফর্জ্জ ও নির্ম্মাণ কারখানা এবং শিল্পযন্ত্র নির্ম্মাণের সুবিধা (চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানার সম্প্রসারণ, ভারী যন্ত্র, যন্ত্র নির্ম্মাণের যন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি), দক্ষিণ আর্কট লিগ্‌নাইট পরিকল্পনা (বৎসরে ৩৫ লক্ষ টন উৎপাদন), সার উৎপাদন কারখানা (সিন্ধ্রির সম্প্রসারণ এবং আরও দুইটি নূতন কারখানা স্থাপন), ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প (হিন্দুস্থান জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ)। এইগুলি ছাড়া অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগের কর্ম্মসূচীও আছে : এ্যান্টিবায়োটিক, ডিডিটি, হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌স নিরাপত্তা কাগজ। ইহা ছাড়া রাজ্য সরকারগুলির কতিপয় পরিকল্পনা আছে যথা মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ, দুর্গাপুরে কয়লাচুল্লী কারখানা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিল্পে যথাক্রমে বিনিয়োগ হইবে ৫০২ কোটি এবং ৩২ কোটি টাকা।

বেসরকারী অংশের উন্নয়ন—বেসরকারী অংশেও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে (১১৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ এবং ২৩ লক্ষ টন উৎপাদন)। এ্যালুমিনিয়াম ৩০ হাজার এবং ফেরো ম্যাঙ্গানীজ ১ লক্ষ ৭২ হাজার টন উৎপাদন হইবে। সিমেণ্ট (১ কোটি ৬০ লক্ষ টন) ও রিফ্র্যাক্টরী শিল্পের (১০ লক্ষ টন) উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে। মটরযান (বেশীর ভাগই ট্রাক), রেলপথের চলমান সরঞ্জাম, কাষ্টিং ও ফর্জ্জিং, শিল্প যন্ত্র, বাইসাইকেল এবং সেলাইকল প্রভৃতিরও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইবে। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র উৎপাদনেরও (কাগজের কল, বৈদ্যুতিক মটর ও ট্রান্সফর্ম্মার) তাগ্‌ স্থির হইয়াছে। রসায়ন শিল্পকেও (সোডা এ্যাস্‌, কষ্টিক সোডা ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য কর্ম্মসূচীগুলি হইল ক্যালটেক্স তৈল শোধনাগার, শক্তি ও শিল্প এ্যালকহল, কাগজ এবং বোর্ড, চিনি, বনস্পতি তৈল, ঔষধ ইত্যাদি।

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন—শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করিবার জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে "জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন" নামে বিশেষ সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য নিছক অর্থ সরবরাহ বা ঋণ প্রদান নহে, ইহার মূল কার্য্য হইল উন্নয়নমূলক (developmental and not financial) ; যথা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিল্প উন্নয়নের কার্যাক্রম রচনা ও প্রয়োগ, সরকারী ও বেসরকারী শিল্পকে সাহায্য প্রদান (আংশিকও হইতে পারে), কোম্পানী গঠনে সাহায্য, পুঁজি বা যন্ত্রপাতি জোগাড় করিয়া দেওয়া, পুঁজি বিনিয়োগের নূতন অবকাশ সন্ধান করা ইত্যাদি।

বিংশ অধ্যায়

শিল্প শ্রমিক

Industrial Labour

General Question : What steps have been taken for the protection and improvement of industrial labour in India ? (B. A. 1953).

***শিল্প শ্রমিক, ইহার ত্রুটি সমূহ*—Industrial labour—its drawbacks**

Q. Examine the main drawbacks of industrial labour in India. Suggest measures for removing these drawbacks (B. A. 1930 ; B. Com. 1946). Examine the problem of industrial labour in India (B. Com. 1939).

আধুনিক সুসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের কতিপয় ত্রুটী রহিয়াছে যাহার জন্য আশানুরূপ শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়।

(১) স্থায়ী শিল্প শ্রমিকদল খুব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ। ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে গ্রামে বসবাসকারীর সংখ্যাই বিপুল, অতএব শ্রমিকগণ মূলতঃ গ্রামবাসী। গ্রাম্য জীবনের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ সদা জাগ্রত থাকে—ফলে সহরের মধ্যে শিল্প জীবনের সহিত তাহারা সহজে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে না। গ্রামে যখন কাজ থাকে না তখনই তাহারা সহরে আসিয়া কারখানা শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহারা গ্রামে ফিরিয়া যায়। এইভাবে স্থায়ী শ্রমিকদল গড়িয়া উঠা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ইহাতে শিল্প পরিচালনার অনেক অসুবিধা ঘটে।

(২) শিল্প শ্রমিকদিগের মধ্যে কামাই করিবার অভ্যাস (absenteeism) অত্যধিক ব্যাপক। বোম্বাইতে শতকরা ৮ হইতে ১২ ভাগ শ্রমিক কাজে অনুপস্থিত থাকে এবং এইরূপ কাজে কামাই বৎসরের কোনো সময়ে খুব বাড়িয়া যায়—যথা বর্ষা, বিবাহ ও উৎসব ঋতুতে, এবং কখনও খুব কমে। মিল মালিকগণ বলেন শ্রমিককে মজুরী প্রদানের পর বা মজুরী বৃদ্ধির পরেই এইরূপ কামাই বাড়িয়া যায়। শ্রমিকদিগের এইরূপ কামাই করিবার অভ্যাস শিল্পের

ভারতীয় অর্থনীতি

[পঞ্চম সংস্করণ]

DUE SLIP

Name...

Address..

....

Book-Seller..

VALID UPTO DECEMBER 31, 1957

A. K. PUBLICATIONS

209, Cornwallis Street, Calcutta-6